

তত্ত্বজ্ঞান
মা'আলমুল
মিনআল

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৩

সিলেবাস

- * সূরা ফাতিহা
- * সূরা বাকারাহ- ২৭৪-২৮৬ আয়াত
- * সূরা আলে ইমরান ১০-২০ এবং ১৩০-১৪৩ আয়াত
- * সূরা আশ্বিয়া ৭৬-৯৩ আয়াত
- * সূরা মুমিনুন ৫১-৭৭ আয়াত
- * সূরা যুমার
- * সূরা হাশর
- * সূরা মুনাফিকুন
- * সূরা মূলক
- * সূরা বালাদ থেকে সূরা আলাক

আয়োজনে



মাউন ফাউন্ডেশন

www.maunfoundation.org

কুরআন অধ্যয়ন
প্রতিযোগিতা
২০২৩

সূরা ফাতিহা

আয়োজনে



মাউন ফাউন্ডেশন

www.maunfoundation.org

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ

সূরা আল-ফাতিহা

এই সূরাটি মকী এবং এর আয়াত সংখ্যা সাত



ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য : সূরা আল-ফাতিহা কোরআনের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সূরা। প্রথমত এ সূরা দ্বারাই পবিত্র কোরআন আরম্ভ হয়েছে এবং এই সূরা দিয়েই সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত নামায আরম্ভ হয়। অবতরণের দিক দিয়েও পূর্ণাঙ্গ সূরারূপে এটিই প্রথম নাযিল হয়। সূরা 'ইকরা', 'মুযাযিল' ও সূরা 'মুন্নাসিরে'র ক'টি আয়াত অবশ্য সূরা আল-ফাতিহার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ সূরারূপে এ সূরার অবতরণই সর্বপ্রথম। যে সকল সাহাবা (রা) সূরা আল-ফাতিহা সর্বপ্রথম নাযিল হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন, তাঁদের সে বক্তব্যের অর্থ বোধ হয় যে, পরিপূর্ণ সূরারূপে এর আগে আর কোন সূরা নাযিল হয়নি। এ জন্যই এই সূরার নাম 'ফাতিহাতুল-কিতাব' বা কোরআনের উপক্রমণিকা রাখা হয়েছে।

'সূরাতুল ফাতিহা' একদিক দিয়ে সমগ্র কোরআনের সারসংক্ষেপ। এ সূরায় সমগ্র কোরআনের সারমর্ম সংক্ষিপ্তাকারে বলে দেওয়া হয়েছে। কোরআনের অবশিষ্ট সূরাগুলো প্রকারান্তরে সূরাতুল ফাতিহারই বিস্তৃত ব্যাখ্যা। কারণ, সমগ্র কোরআন প্রধানত ঈমান এবং নেক আমলের আলোচনাতেই কেন্দ্রীভূত। আর এ দু'টি মূলনীতিই এ সূরায় সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হয়েছে। তফসীরে রুহুল মা'আনী ও রুহুল বয়ানে এর বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। তাই এ সূরাকে সহীহ হাদীসে 'উম্মুল কোরআন' 'উম্মুল কিতাব', 'কোরআনে আযীম' বলেও অভিহিত করা হয়েছে। (কুরতুবী)

অথবা এ জন্য যে, যে ব্যক্তি কোরআন তেলাওয়াত বা অধ্যয়ন করবে তার জন্য এ মর্মে বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যেন প্রথমে পূর্বঘোষিত যাবতীয় ধ্যান-ধারণা অন্তর থেকে দূরীভূত করে একমাত্র সত্য ও সঠিক পথের সন্ধানের উদ্দেশ্যে এ কিতাব তেলাওয়াত আরম্ভ করে এবং আল্লাহর নিকট এ প্রার্থনাও করে যে, তিনি যেন তাকে সিরাতুল-মুস্তাকীমের হেদায়েত দান করেন।

এ সূরার প্রথমই রয়েছে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা। এর অর্থ হচ্ছে—এ প্রশংসার মাধ্যমে আল্লাহর দরবারে হেদায়েতের দরখাস্ত পেশ করা হলো। আর এ দরখাস্তের প্রত্যুত্তরই সমগ্র কোরআন, যা **الْكِتَابُ** দ্বারা আরম্ভ হয়েছে। অর্থাৎ মানুষ আল্লাহর নিকট সঠিক পথের যে সন্ধান চেয়েছে, আল্লাহ পাক তার প্রত্যুত্তরে **الْكِتَابُ** বলে ইশারা করে দিলেন যে, হে আদম সন্তানগণ, তোমরা যা চাও তা এ গ্রন্থেই রয়েছে।

হযরত রাসূলে করীম (সা) এরশাদ করেছেন যে, যাঁর হাতে আমার জীবন-মরণ, আমি তাঁর শপথ করে বলছি—সূরা আল-ফাতিহার দৃষ্টান্ত তওরাত, ইনজীল, যবুর প্রভৃতি অন্য কোন আসমানী কিতাবে তো নেই-ই, এমনকি পবিত্র কোরআনেও এর দ্বিতীয় নেই। ইমাম তিরমিযী আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযুর সালাল্লাহু আলাইহে ওয়া সালাম আরো বলেছেন যে—সূরায়ে ফাতিহা প্রত্যেক রোগের ঔষধবিশেষ।

হাদীস শরীফে সূরা আল-ফাতিহাকে সূরায়ে শেফাও বলা হয়েছে। (কুরতুবী)

বোখারী শরীফে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) এরশাদ করেছেন, -সমগ্র কোরআনে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সূরা হচ্ছে رَبِّ الْعَالَمِينَ (কুরতুবী)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

بِسْمِ اللَّهِ কোরআনের একটি আয়াত : সমস্ত মুসলমান এতে একমত যে, بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ কোরআন শরীফের সূরা নামুলের একটি আয়াত বা অংশ এবং এ ব্যাপারেও একমত যে, সূরা তওবা ব্যতীত প্রত্যেক সূরার প্রথমে.....بِسْمِ اللَّهِ লেখা হয়। সূরা আল-ফাতিহার অংশ না অন্যান্য সকল সূরারই অংশ, এতে ইমামগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। ইমাম আবু হানীফা (র) বলেছেন بِسْمِ اللَّهِ সূরা নামুল ব্যতীত অন্য কোন সূরার অংশ নয়। তবে এটি এমন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আয়াত যা প্রত্যেক সূরার প্রথমে লেখা এবং দুটি সূরার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করার জন্য এটি অবতীর্ণ হয়েছে।

কোরআন তেলাওয়াত ও প্রত্যেক কাজ বিসমিল্লাহুসহ আরম্ভ করার আদেশ : জাহেলিয়াত যুগে লোকদের অভ্যাস ছিল, তারা তাদের প্রত্যেক কাজ উপাস্য দেব-দেবীদের নামে শুরু করতো। এ প্রথা রহিত করার জন্য হযরত জিবরাঈল (আ) পবিত্র কোরআনের সর্বপ্রথম যে আয়াত নিয়ে এসেছিলেন, তাতে আল্লাহর নামে কোরআন তেলাওয়াত আরম্ভ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। যথা.....اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ

আল্লামাহ সূফী (র) বলেছেন যে, শুধু কোরআনই নয়, বরং অন্যান্য আসমানী কিতাবও বিসমিল্লাহু দ্বারা আরম্ভ করা হয়েছিল। কোন কোন আলিম বলেছেন যে, বিসমিল্লাহু পবিত্র কোরআন ও উম্মতে মুহাম্মদীর বিশেষত্ব। উল্লেখিত দু'টি মতের মীমাংসা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তা'আলার নামে আরম্ভ করার আদেশ সকল আসমানী কিতাবের জন্যই বিদ্যমান ছিল। তবে بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ এর শব্দগুলো কোরআনের বিশেষত্ব। যেমন, কোন কোন বর্ণনায় দেখা যায়, স্বয়ং রাসূলে করীম (সা)-ও প্রথমে প্রত্যেক কাজ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ বলে আরম্ভ করতেন এবং কোন কিছু লেখাতে হলেও এ কথা প্রথমে লেখাতেন। কিন্তু بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ অবতীর্ণ হওয়ার পর এ বর্ণনালোকেই গ্রহণ করা হলো এবং সর্বকালের জন্য বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলে সব কাজ শুরু করার নিয়ম প্রবর্তিত হলো। (কুরতুবী, রুহুল মা'আনী)

কোরআন শরীফের স্থানে স্থানে উপদেশ রয়েছে যে, প্রত্যেক কাজ বিসমিল্লাহু বলে আরম্ভ কর। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন যে, “যে কাজ বিসমিল্লাহ ব্যতীত আরম্ভ করা হয়, তাতে কোন বরকত থাকে না।”

এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে, ঘরের দরজা বন্ধ করতে বিসমিল্লাহ্ বলবে, বাতি নেভাতেও বিসমিল্লাহ্ বলবে, পাত্র আবৃত করতেও বিসমিল্লাহ্ বলবে। কোন কিছু খেতে, পানি পান করতে, ওয়ু করতে, সওয়ারীতে আরোহণ করতে এবং তা থেকে অবতরণকালেও বিসমিল্লাহ্ বলার নির্দেশ কোরআন-হাদীসে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। (কুরতুবী)

প্রত্যেক কাজে বিসমিল্লাহ্ বলার রহস্য : ইসলাম প্রত্যেক কাজ বিসমিল্লাহ্ বলে শুরু করার নির্দেশ দিয়ে মানুষের গোটা জীবনের গতিই অন্য সকল কিছুর দিক থেকে সরিয়ে নিয়ে একমাত্র আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে দিয়েছে। বারবার আল্লাহর নামে কাজ শুরু করার মাধ্যমে সে প্রতি মুহূর্তেই আনুগত্যের এ স্বীকারোক্তি নবায়ন করে যে, আমার অস্তিত্ব ও আমার যাবতীয় কাজকর্ম আল্লাহর ইচ্ছা ও সাহায্য ছাড়া হতে পারে না। এ নিয়তের ফলে তার ওঠাবসা, চলাফেরাসহ পার্থিব জীবনের সকল কাজকর্ম ইবাদতে পরিণত হয়ে যায়।

কাজটা কতই না সহজ ! এতে সময়ের অপচয় হয় না, পরিশ্রমও হয় না, কিন্তু উপকারিতা একান্তই সুদূরপ্রসারী। এতে দুনিয়াদারীর প্রতিটি কাজ দীনের কাজে রূপান্তরিত হয়ে যায়। মুসলমান-অমুসলমান নির্বিশেষে সকলেই পানাহার করে, কিন্তু মুসলমান আহার গ্রহণের পূর্বে বিসমিল্লাহ্ বলে এ স্বীকারোক্তি জানায় যে, আহার্যবস্তু যমীনে উৎপন্ন হওয়া থেকে শুরু করে পরিপক্ব হওয়া পর্যন্ত তাতে কত পরিশ্রমই না নিয়োজিত হয়েছে। আকাশ-বাতাস, গ্রহ-নক্ষত্রের কত অবদানেই না এক একটি শস্যদানার দেহ পুষ্টি লাভ করেছে। মানুষ, প্রকৃতি এবং উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত অন্যান্য জীব-জানোয়ারের যে অবদান খাদ্যের প্রতিটি কণায় বিদ্যমান, তা আমার শ্রম বা চেষ্টা দ্বারা সম্ভবপর ছিল না। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই অনুগ্রহ করে এগুলোকে বিবর্তনের সকল স্তর অতিক্রম করিয়ে উপাদেয় আহার্যরূপে আমাকে দান করেছেন।

মুসলমান-অমুসলমান সকলেই শোয়, ঘুমায়, আবার জেগে ওঠে। কিন্তু মু'মিন তার শোয়ার এবং জেগে ওঠার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে আল্লাহর সাথে তার যোগাযোগের সম্পর্ক নবায়ন করে। ফলে তার জাগতিক কাজকর্মও আল্লাহর যিকিরে রূপান্তরিত হয়ে বন্দেগীরূপে লিখিত হয়। একজন মু'মিন কোন যানবাহনে আরোহণকালে আল্লাহর নাম স্মরণ করে এ কথারই সাক্ষ্য দেয় যে, এ যানবাহনের সৃষ্টি এবং আমার ব্যবহারে এনে দেওয়া ছিল মানবীয় ক্ষমতার উর্ধ্বে। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টি এক পরিচালনা পদ্ধতির বদৌলতে কোথাকার কাঠ, কোথাকার লোহা, কোথাকার কারিগর, কোথাকার চালক সবকিছু সমবেত করে সবগুলোকে মিলিয়ে আমার খেদমতে নিয়োজিত করেছেন। সামান্য কয়টি পয়সা ব্যয় করে আল্লাহর এতবড় সৃষ্টি আমার নিজের কাজে ব্যবহার করতে পারছি এবং সে পয়সা আমি নিজে কোন জায়গা হতে সঙ্গে নিয়ে আসিনি ; বরং তা সংগ্রহ করার সকল ব্যবস্থাও তিনিই করে দিয়েছেন। চিন্তা করুন, ইসলামের এ সামান্য শিক্ষা মানুষকে কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে দিয়েছে। এজন্য এরূপ বলা যথার্থ যে, বিসমিল্লাহ্ এমন এক পরশপাথর যা শুধু তামাকে নয়, বরং মাটিকেও স্বর্ণে পরিণত করে।

فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ عَلَىٰ دِينِ الْإِسْلَامِ وَتَعْلِيْمَاتِهِ .

মাসআলা : কোরআন তেলাওয়াত শুরু করার আগে প্রথমে **أَمُوذُ بِاللَّهِ مِنْ** পাঠ করা সুন্নত।
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ এবং পরে **الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ** পাঠ করা সুন্নত।
 তেলাওয়াতের মধ্যেও সূরা তওবা ব্যতীত সকল সূরার প্রথমে বিসমিল্লাহ পাঠ করা সুন্নত।

বিসমিল্লাহর তফসীর

বিসমিল্লাহ বাক্যটি তিনটি শব্দ দ্বারা গঠিত। প্রথমত 'বা' বর্ণ, দ্বিতীয়ত 'ইসম' ও তৃতীয়ত 'আল্লাহ'। আরবী ভাষায় 'বা' বর্ণটি অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তন্মধ্যে তিনটি অর্থ এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে এবং এ তিনটির যে কোন একটি অর্থ এক্ষেত্রে গ্রহণ করা যেতে পারে। এক—সংযোজন। অর্থাৎ এক বস্তুকে অপর বস্তুর সাথে মিলানো বা সংযোগ ঘটানো অর্থে। দুই—এস্তেয়ানাত—অর্থাৎ কোন বস্তুর সাহায্য নেওয়া। তিন—কোন বস্তু থেকে বরকত হাসিল করা।

ইসম শব্দের ব্যাখ্যা অত্যন্ত ব্যাপক। মোটামুটিভাবে এতটুকু জেনে রাখা যথেষ্ট যে, 'ইসম' নামকে বলা হয়। 'আল্লাহ' শব্দ সৃষ্টিকর্তার নামসমূহের মধ্যে সবচেয়ে মহত্তর ও তাঁর যাবতীয় গুণের সম্মিলিত রূপ। কোন কোন আলিম একে ইসমে আ'যম বলেও অভিহিত করেছেন।

এ নামটি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য প্রযোজ্য নয়। এজন্যই এ শব্দটির দ্বিবাচন বা বহুবচন হয় না। কেননা, আল্লাহ এক; তাঁর কোন শরীক নেই। মোটকথা, আল্লাহ এমন এক সত্তার নাম, যে সত্তা পালনকর্তার সমস্ত গুণের এক অসাধারণ প্রকাশবাচক। তিনি অদ্বিতীয় ও নজীরবিহীন। এজন্য বিসমিল্লাহ শব্দের মধ্যে 'বা'-এর তিনটি অর্থের সামঞ্জস্য হচ্ছে আল্লাহর নামের সাথে, তাঁর নামের সাহায্যে এবং তাঁর নামের বরকতে।

কিন্তু তিন অবস্থাতেই যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর নামের সাথে তাঁর নামের সাহায্যে এবং তাঁর নামের বরকতে, যে কাজ করা উদ্দেশ্য তা উল্লেখ করা না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত বাক্যটি অসম্পূর্ণ থাকে। এজন্য 'ইলমে নাহবের' (আরবী ব্যাকরণশাস্ত্র) নিয়মানুযায়ী স্থান-উপযোগী ক্রিয়া উহ্য ধরে নিতে হয়। যথা, 'আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি বা পড়ছি।' এ ক্রিয়াটিকে উহ্যই ধরতে হবে, যাতে 'আরম্ভ আল্লাহর নামে' কথাটি প্রকাশিত হয়। সে উহ্য বিষয়টিও আল্লাহর নামের পূর্বে হবে না। আরবী ভাষার নিয়মানুযায়ী শুধু 'বা' বর্ণটি আল্লাহর নামের পূর্বে ব্যবহৃত হয়েছে। এ ব্যাপারে মাসহাফে-উসমানীতে সাহাবাগণের সম্মিলিত অভিমত উদ্ধৃত করে মস্তব্য করা হয়েছে যে, 'বা' বর্ণটি 'আলিফ'-এর সঙ্গে মিলিয়ে এবং 'ইসম' শব্দটি পৃথকভাবে লেখা উচিত ছিল। এমতাবস্থায় শব্দের রূপ হতো **بِسْمِ اللَّهِ** কিন্তু মাসহাফে-উসমানীর লিখন-পদ্ধতিতে 'হামযা' বর্ণটি উহ্য রেখে 'বা'-কে 'সীন'-এর সাথে যুক্ত করে লিখে 'বা'-কে ইসমের অংশ করে দেওয়া হয়েছে, যাতে আরম্ভটা 'আল্লাহর নামেই হয়'। একই কারণে অন্যত্র আলিফকে উহ্য রাখা হয় না। যথা **أَفْرَأَ بِاسْمِ رَبِّكَ** এতে 'বা'-কে 'আলিফের' সাথে লেখা হয়েছে। মোটকথা, বিসমিল্লাহর বেলায় বিশেষ এক পদ্ধতি অনুসরণ করেই 'বা' বর্ণকে 'ইসম'-এর সঙ্গে মিলিত করে লেখার নিয়ম নির্ধারণ করা হয়েছে। **الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** রহমান ও রহীম উভয়ই আল্লাহর গুণবাচক নাম। রহমান অর্থ সাধারণ ও ব্যাপক রহমত এবং রহীম অর্থ পরিপূর্ণ ও বিশেষ রহমত।

সাধারণ রহমতের অর্থ হচ্ছে যে, এ রহমত বা দয়া সমগ্র জাহানে যা সৃষ্টি হয়েছে এবং ভবিষ্যতে যা সৃষ্টি হবে, সে সকলের জন্যই সমভাবে প্রযোজ্য। পরিপূর্ণ রহমত অর্থ হচ্ছে যে, তা সম্পূর্ণ বা পূর্ণাঙ্গ। আর এ জন্যই ‘রহমান’ শব্দ আল্লাহ্ তা‘আলার ‘যাতের’ জন্য নির্দিষ্ট। কোন সৃষ্টিকে রহমান বলা চলে না। কারণ আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কোন সত্তা নেই, যার রহমত বা দয়া সমস্ত বিশ্ব-চরাচরে সমভাবে বিস্তৃত হতে পারে। এজন্য ‘আল্লাহ্’ শব্দের ন্যায় ‘রহমান’ শব্দেরও দ্বি-বচন বা বহুবচন হয় না। কেননা, এ শব্দটি একক সত্তার সাথে সংযুক্ত বা একক সত্তার জন্য নির্দিষ্ট। তাই এখানে দ্বিতীয় বা তৃতীয় কারো উপস্থিতির সম্ভাবনা নেই। (কুরতুবী)

‘রহীম’ শব্দের অর্থ ‘রহমান’ শব্দের অর্থ থেকে স্বতন্ত্র। কারণ, কোন ব্যক্তির পক্ষে অন্য ব্যক্তির প্রতি দয়া প্রদর্শন করা সম্ভব, সুতরাং সে দয়া বা রহমত এ শব্দে প্রযোজ্য হওয়া অসম্ভব নয়। এ জন্য ‘রহীম’ শব্দ মানুষের জন্যও বলা যেতে পারে। আল-কোরআনে রাসূল (সা)-এর জন্যও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। বলা হয়েছে—**بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ**

মাসআলা : আজকাল ‘আবদুর রহমান’, ‘ফজলুর রহমান’ প্রভৃতি নাম সংক্ষেপ করে শুধু ‘রহমান’ বলা হয়ে থাকে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ‘রহমান’ বলে ডাকা হয়। একরূপ সংক্ষেপ করা জায়েয নয়; পাপের কাজ।

জ্ঞাতব্য : বিসমিল্লাহ্তে আল্লাহ্ তা‘আলার সুন্দর নাম ও পূর্ণাঙ্গ গুণাবলীর মধ্যে মাত্র দু’টি গুণের উল্লেখ করা হয়েছে। শব্দ দু’টিই ‘রহমত’ শব্দ হতে গঠিত হয়েছে, যা রহমতের ব্যাপকতার প্রতি ইশারা করে। এতে একথাও বোঝানো হয়েছে যে, এ বিশ্ব চরাচর, আকাশ, বাতাস, সৃষ্টিরাজি পয়দা করা, এ সবার রক্ষণাবেক্ষণ ও লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করাও আল্লাহ্ তা‘আলার গুণাবলীতে সংযুক্ত। কোন বস্তুকেই তিনি স্বীয় প্রয়োজনে বা অন্য কারো প্রয়োচনায় বা অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সৃষ্টি করেন নি। বরং তাঁর রহমত বা দয়ার তাকিদেই সৃষ্টি করে এর রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রতিপালনের ব্যবস্থা করেছেন।

‘তাআব্বুজ’ শব্দের অর্থ **أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ** পাঠ করা। আল-কোরআনে এরশাদ হয়েছে—যখন কোরআন পাঠ কর, তখন শয়তানের প্রতারণা হতে আল্লাহ তা‘আলার নিকট আশ্রয় চাও। দ্বিতীয়ত, কোরআন পাঠের প্রাক্কালে আ‘উযুবিল্লাহ পাঠ করা ইজমায়ে-উম্মত দ্বারা সুন্নত বলে স্বীকৃত হয়েছে। এ পাঠ নামাযের মধ্যেই হোক বা নামাযের বাইরেই হোক। কোরআন তেলাওয়াত ব্যতীত অন্যান্য কাজে শুধু বিসমিল্লাহ পাঠ করা সুন্নত, আ‘উযুবিল্লাহ নয়। যখন কোরআন তেলাওয়াত আরম্ভ করা হয়, তখন আ‘উযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ উভয়টিই পাঠ করা সুন্নত। তেলাওয়াতকালে একটি সূরা শেষ করে অপর সূরা আরম্ভ করার পূর্বে শুধু সূরা তওবা ব্যতীত অন্য সব সূরা তেলাওয়াতের আগে বিসমিল্লাহ পাঠ করতে হয়। তেলাওয়াত করার সময় মধ্যে সূরা-বারাআত এলে তখন বিসমিল্লাহ পড়া নিষেধ। কিন্তু প্রথম তেলাওয়াতই যদি সূরা বারাআত দ্বারা আরম্ভ হয়, তবে আ‘উযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ উভয়টিই পাঠ করতে হবে। (আলমগিরী)

‘বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম’, কোরআনের সূরা নামল-এর একটি আয়াতের অংশ এবং দু’টি সূরার মাঝখানে একটি পূর্ণাঙ্গ আয়াত। তাই অন্যান্য আয়াতের ন্যায় এ আয়াতটির সম্মান

করাও ওয়াজিব। ওয়ূ ছাড়া উহাকে স্পর্শ করা জায়েয নয়। অপবিত্র অবস্থায় যথা হায়েয-নেফাসের সময় (পবিত্র হওয়ার পূর্বে) তেলাওয়াতরূপে পাঠ করাও না-জায়েয। তবে কোন কাজকর্ম আরম্ভ করার পূর্বে (যথা-পানাহার) দোয়াস্বরূপ পাঠ করা সব সময়ই জায়েয।

মাসআলা : নামাযের প্রথম রাক'আত আরম্ভ করার সময় আ'উযুবিল্লাহ্-এর পরে বিসমিল্লাহ্ পাঠ করা সুন্নত। তবে আন্তে পাঠ করবে, না সরবে পাঠ করবে, এতে ভিন্ন ভিন্ন মত দেখা যায়। ইমাম আবু হানীফা (র) ও তাঁর অনুসারী ইমামগণ নীরবে পাঠ করাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। নামাযের প্রথম রাক'আতের পর অন্যান্য রাক'আতে বিসমিল্লাহ্ পাঠ করা সুন্নত বলে সকলে একমত হয়েছেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে প্রত্যেক রাক'আতের শুরুতে বিসমিল্লাহ্ পড়াকে ওয়াজিব বলা হয়েছে। (শরহে-মানিয়াহ)

মাসআলা : নামাযে সূরা-ফাতিহা পাঠ করার পর অন্য সূরা পাঠ করার পূর্বে বিসমিল্লাহ্ পাঠ না করা উচিত। নবী করীম (সা) এবং খোলাফায়ে রাশেদীন থেকে ইহা পাঠ করার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। 'শরহে মানিয়াতে' একে ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর অভিমত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শরহে মানিয়াত, দুররে-মুখতার, বুরহান প্রভৃতি কিতাবে এ অভিমতকেই গ্রহণযোগ্য বলে মত প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেছেন, যেসব নামাযে নীরবে কুরআত পড়া হয়, সেসব নামাযে বিসমিল্লাহ্ পড়া উত্তম। আবার কোন কোন বর্ণনাতে ইহা ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। শামী কোন কোন ফেকাহ শাস্ত্রবিদের মতামত বর্ণনা করে এ মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তবে এতেও সকলেই একমত হয়েছেন যে, যদি কেউ তা পাঠ করে তবে তাতেও কোন দোষের কারণ নেই।

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 ۝ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ
 نَسْتَعِينُ ۝ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝
 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ
 عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। ২. যিনি অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়ালু। ৩. যিনি বিচার-দিনের মালিক। ৪. আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। ৫. আমাদেরকে সরল পথ দেখাও। ৬. সে সমস্ত লোকের পথ, যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। ৭. তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার যিনি সকল সৃষ্টিজগতের পালনকর্তা। (সৃষ্টির প্রতিটি প্রকারকেই এক একটি 'আলম' বা জগতরূপে গণ্য করা হয়। যথা-ফেরেশতা জগত, মানব-জগত, জ্বিন-জগত।)

يَوْمَ لِكِ يَوْمَ الدِّينِ যিনি অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়ালু যিনি বিচার ও প্রতিদান-দিবসের মালিক। (কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তার আমলের প্রতিদান দেওয়া হবে।) اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ আমরা তোমারই ইবাদত করি আর তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ আমাদের পথ দেখাও। صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ সে সমস্ত লোকের পথ, যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। غَيْرِ الْمَفْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ যাদের উপর তোমার গণ্য নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট তাদের পথ নয়।

হেদায়েতের পথ ত্যাগ করার দু'টি পন্থা। এক এই যে, পথের পুরোপুরি ঝোঁজ-খবর নেয়নি-ضَالِّينَ শব্দে তাই বোঝানো হয়েছে। দ্বিতীয়ত, পুরোপুরি ঝোঁজ-খবর নেওয়ার পর এবং তা সঠিক প্রমাণিত হওয়ার পরও উহাতে আমল করেনি। مَفْضُوبِ عَلَيْهِمْ দ্বারা ঐ সমস্ত লোককে বোঝানো হয়েছে। কেননা, জেনে-ওনে যারা কাজ করে না, তাদের আচরণ অসন্তুষ্টির কারণ হওয়াই স্বাভাবিক।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরাতুল ফাতিহাঃ বিষয়বস্তু : সূরাতুল-ফাতিহাঃ আয়াত সংখ্যা সাত। প্রথম তিনটি আয়াতে আল্লাহর প্রশংসা এবং শেষের তিনটি আয়াতে মানুষের পক্ষ হতে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা ও দরখাস্তের বিষয়বস্তু, যা আল্লাহ তা'আলা নিজেই দয়াপরবশ হয়ে মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন। মধ্যের একটি আয়াত প্রশংসা ও দোয়া-মিশ্রিত বিষয়বস্তুর সংমিশ্রণ।

মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (সা) এরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন—নামায (অর্থাৎ সূরাতুল-ফাতিহা) আমার এবং আমার বান্দাদের মধ্যে দু'ভাগে বিভক্ত ; অর্ধেক আমার জন্য আর অর্ধেক আমার বান্দাদের জন্য। আমার বান্দাগণ যা চায়, তা তাদেরকে দেওয়া হবে। অতঃপর রাসূল (সা) বলেছেন যে, যখন বান্দাগণ বলে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ তখন আল্লাহ বলেন যে, আমার বান্দাগণ আমার প্রশংসা করছে। আর যখন বলে الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ তখন তিনি বলেন যে, তারা আমার মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করছে। আর যখন বলে يَوْمَ الدِّينِ তখন তিনি বলেন যে, আমার বান্দাগণ আমার গুণগান করছে। আর যখন বলে اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ তখন তিনি বলেন যে, এ আয়াতটি আমি এবং আমার বান্দাগণের মধ্যে সংযুক্ত। কেননা, এর এক অংশে আমার প্রশংসা এবং অপর অংশে বান্দাগণের দোয়া ও আরম্ভ হয়েছে। এ সঙ্গে এ কথাও বলা হয়েছে যে, বান্দাগণ যা চাইবে তারা তা পাবে।

অতঃপর বান্দাগণ যখন বলে اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ (শেষ পর্যন্ত) তখন আল্লাহ বলেন, এসবই আমার বান্দাগণের জন্য এবং তারা যা চাইবে তা পাবে। (মাহাহারী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার। অর্থাৎ দুনিয়াতে যে কোন স্থানে যে কোন বস্তুর প্রশংসা করা হয়, বাস্তবে তা আল্লাহরই প্রশংসা। কেননা, এ বিশ্ব চরাচরে অসংখ্য মনোরম দৃশ্যাবলী, অসংখ্য মনোমুগ্ধকর সৃষ্টিরাজি আর সীমাহীন উপকারী বস্তুসমূহ সর্বদাই মানব মনকে আল্লাহ তা'আলার প্রতি আকৃষ্ট করতে থাকে এবং তাঁর প্রশংসায় উদ্বুদ্ধ করতে

থাকে। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে, সকল বস্তুর অন্তরালেই এক অদৃশ্য সত্তার নিপুণ হাত সদা সক্রিয় রয়েছে।

যখন পৃথিবীর কোথাও কোন বস্তুর প্রশংসা করা হয়, তখন প্রকৃতপক্ষে তা উক্ত বস্তুর সৃষ্টিকর্তার প্রতিই গিয়ে বর্তায়। যেমন কোন চিত্র, কোন ছবি বা নির্মিত বস্তুর প্রশংসা করা হলে প্রকৃতপক্ষে সে প্রশংসা প্রস্তুতকারকেরই করা হয়।

এ বাক্যটি প্রকৃতপক্ষে মানুষের সামনে বাস্তবতার একটি নতুন দ্বার উন্মুক্ত করে দেখিয়ে দিয়েছে যে, আমাদের সামনে যা কিছু রয়েছে এ সব কিছুই একটি একক সত্তার সাথে জড়িত এবং সকল প্রশংসাই সে অনন্ত অসীম শক্তির। এ সব দেখে কারো অন্তরে যদি প্রশংসাবাহিনীর উদ্বেগ হয় এবং মনে করে যে, তা অন্য কারো প্রাণ্য, তবে এ ধারণা জ্ঞান-বুদ্ধির সংকীর্ণতারই পরিচায়ক। সুতরাং নিঃসন্দেহে একথাই বলতে হয় যে, **الْحَمْدُ لِلَّهِ** যদিও প্রশংসার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু এর মধ্যে অতি সূক্ষ্মতার সাথে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সকল সৃষ্ট বস্তুর উপাসনা রহিত করা হলো। তাছাড়া এর দ্বারা অত্যন্ত আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে একত্ববাদের শিক্ষাও দেওয়া হয়েছে। আল-কোরআনের এ ক্ষুদ্র বাক্যটিকে একদিকে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করা হয়েছে এবং অপরদিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে নিমগ্ন মানব মনকে এক অতিবাস্তবের দিকে আকৃষ্ট করত যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুর পূজা-অর্চনাকে চিরতরে রহিত করা হয়েছে। এতদসঙ্গে অতি হেকমতের সাথে বা অকাট্যভাবে ঈমানের সর্বপ্রথম স্তম্ভ 'তওহীদ' বা একত্ববাদের পরিপূর্ণ নকশাও তুলে ধরা হয়েছে। একটু চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, বাক্যটিতে যে দাবি করা হয়েছে, সে দাবির স্বপক্ষে দলীলও দেওয়া হয়েছে। **فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ**

رَبِّ الْعَالَمِينَ এ ক্ষুদ্র বাক্যটির পরেই আল্লাহ তা'আলার প্রথম গুণবাচক নাম 'রাব্বুল আলামীন'-এর উল্লেখ করা হয়েছে। সংক্ষিপ্তভাবে এর তফসীর লক্ষণীয়। আরবী ভাষায় **رَبُّ** শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে পালনকর্তা। লালন-পালন বলতে বোঝায়, কোন বস্তুকে তার সমস্ত মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রেখে ধীরে ধীরে বা পর্যায়ক্রমে সামনে অগ্রসর করে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে দেওয়া।

এ শব্দটি একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। সর্বস্বপদ রূপে অন্যের জন্যেও ব্যবহার করা চলে, সাধারণভাবে নয়। কেননা, প্রত্যেকটি প্রাণী বা সৃষ্টিই প্রতিপালিত হওয়ার মুখাপেক্ষী, তাই সে অন্যের প্রকৃত প্রতিপালনের দায়িত্ব নিতে পারে না।

رَبِّ الْعَالَمِينَ শব্দটি **عَالَم** শব্দের বহুবচন। এতে পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্টিই অন্তর্ভুক্ত। যথা-আকাশ-বাতাস, চন্দ্র-সূর্য, তারা-নক্ষত্ররাজি, বিজলী, বৃষ্টি, ফেরেশতাকুল, জ্বীন, যমীন এবং এতে যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে। জীবজন্তু, মানুষ, উদ্ভিদ, জড় পদার্থ সব কিছুই এর অন্তর্ভুক্ত। অতএব **رَبِّ الْعَالَمِينَ**-এর অর্থ হচ্ছে-আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টির পালনকর্তা। তাছাড়া একথাও চিন্তার উদ্বেগ নয় যে, আমরা যে দুনিয়াতে বসবাস করছি এর মাধ্যমে কোটি কোটি সৃষ্ট বস্তু রয়েছে। এ সৃষ্টিগুলোর মধ্যে যা কিছু আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় এবং যা আমরা দেখি না সে সবগুলোই এক একটা আলম বা জগত।

তাছাড়া আরো কোটি কোটি সৃষ্টি রয়েছে, যা সৌরজগতের বাইরে, যা আমরা অবলোকন করতে পারি না। ইমাম রাযী তফসীরে-কবীরে লিখেছেন যে, এ সৌরজগতের বাইরে আরো সীমাহীন জগত রয়েছে। যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত এবং একথা সর্বজনবিদিত যে, সকল বস্তুই

আল্লাহর ক্ষমতার অধীন। সুতরাং তাঁর জন্য সৌরজগতের অনুরূপ আরো সীমাহীন কতকগুলো জগত সৃষ্টি করে রাখা অসম্ভব মোটেই নয়।

হযরত আবু সা'ঈদ খুদরী (রা) বলেছেন যে, চল্লিশ হাজার জগত রয়েছে। আর এ পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম ও উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত একটি জগত। বাকীগুলির প্রত্যেকটিও অনুরূপ। হযরত মাকাতিল (রা) থেকেও বর্ণিত হয়েছে যে, জগতের সংখ্যা ৮০ হাজার। (কুরতুবী) এতে সন্দেহ করা হয় যে, মহাশূন্যে বায়ু না থাকায় মানুষ বা কোন প্রাণীর বাস করার উপযোগী নয় বলে কোন প্রাণী সেখানে জীবিত থাকতে পারে না। ইমাম রাযী এর উত্তরে বলেছেন যে, এটা এমন কোন জরুরী ব্যাপার নয় যে, এই জগতের বাইরে মহাশূন্যে যে অন্যান্য জগত রয়েছে, সেসব জগতের অধিবাসীদের প্রকৃতি ও অভ্যাস এই জগতের অধিবাসীদের মতই হতে হবে, যে জন্য তারা মহাশূন্যে জীবিত থাকতে পারবে না। বরং এরকমই বা হবে না কেন যে, সেসব জগতের অধিবাসীদের অভ্যাস ও প্রকৃতি এই জগতের অধিবাসীদের অভ্যাস ও প্রকৃতি হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

আজ থেকে প্রায় সাতশ' সত্তর বছর আগে যখন মহাশূন্য ভ্রমণের উপকরণও আবিষ্কৃত হয়নি, সে যুগেই মুসলিম দার্শনিক ইমাম রাযী এসব তথ্য লিখেছেন। আজকাল রকেট প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক যানের যুগে মহাশূন্য ভ্রমণকারীরা যা কিছু বলেন, তা ইমাম রাযীর বর্ণনার চেয়ে বেশি কিছু নয়।

এ জগতের বাইরে মহাশূন্যের কোন সীমা-পরিসীমা মানুষের জানা নেই। অতএব, নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন যে, সীমাহীন মহাশূন্যে আর কত সৃষ্টি রয়েছে। এই দুনিয়ার নিকটতম গ্রহ-উপগ্রহ চন্দ্র ইত্যাদির বাসিন্দা সম্পর্কে বর্তমান যুগের বিজ্ঞ বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, তাও তো এই যে, এ সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহে যদি কোন প্রাণী-জগতের অস্তিত্ব থেকেও থাকে, তবে তাদের স্বভাব-চরিত্র এ দুনিয়ার বাসিন্দাদের অনুরূপ হতে হবে, এমন কোন কথা নেই। বরং গ্রহণযোগ্য যুক্তি হচ্ছে এই যে, তাদের স্বভাব-চরিত্র, আদত-অভ্যাস, আহাৰ্য ও প্রয়োজন এখানকার বাসিন্দাগণ হতে সম্পূর্ণ পৃথক ও ভিন্ন হবে। এ জন্য একটিকে অপরটির উপর কিয়াস করার কোন কারণ থাকতে পারে না। ইমাম রাযীর এই উক্তির সমর্থনে, আমেরিকার মহাশূন্য ভ্রমণকারী জনৈক বিজ্ঞানী আকাশ ভ্রমণ হতে প্রত্যাবর্তন করে মহাশূন্য সম্পর্কে কিছুটা অনুমান ব্যক্ত করেছেন এবং বলেছেন যে, মহাশূন্যের সীমারেখা সম্পর্কে কোন কিছুই বলার উপায় নেই। মহাশূন্যের আয়তন ও সীমারেখা কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত, তা অনুমান করাও কঠিন ব্যাপার।

আল-কোরআনের এ ছোট বাক্যটির প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিজগতের লালন-পালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কত সুদৃঢ় ও কত অচিন্ত্যনীয় ব্যবস্থা করে রেখেছেন! আকাশ থেকে পাতাল পর্যন্ত এবং গ্রহ থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধূলিকণা পর্যন্ত এই ব্যবস্থাপনার আওতাভুক্ত এবং একজন অতি প্রাজ্ঞ পরিচালকের অধীনে প্রতিটি সৃষ্ট বস্তুই নিজ নিজ কর্তব্যে নিয়োজিত। মানুষের সামান্য খাদ্য, যা সে তাঁর মুখে দেয় তাতে চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে, এর উৎপাদনের জন্য আকাশ ও যমীনের সমস্ত শক্তি এবং কোটি কোটি মানুষ ও জীব-জন্তুর পরিশ্রম তাতে शामिल রয়েছে। সমগ্র জগতের শক্তি এই এক লোকমা খাদ্য প্রস্তুতে এমনভাবে ব্যস্ত যে, মানুষ এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করেই তা দ্বারা যেন

পরম জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হয়। সে যেন অনুধাবন করতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা আকাশ ও যমীনের সকল সৃষ্টিকে মানবের উপকারের জন্য নিয়োজিত রেখেছেন। যার সেবায় এত কিছু নিয়োজিত, তার জন্য অনর্থক নয়। বরং তারও কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য অবশ্যই রয়েছে।

আল-কোরআনের এ আয়াতটিতে মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও মানব জীবনের মকসুদ বা লক্ষ্য বর্ণনা করা হয়েছে :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ .

অর্থাৎ জিন ও মানুষকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্যেই সৃষ্টি করেছি। অন্য কোন কাজের জন্য নয়।

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, رَبُّ الْعَالَمِينَ-এর নিখুঁত প্রতিপালন নীতিই পূর্বের বাক্য لِلَّهِ الْحَمْدُ-এর দলীল বা প্রমাণ। সমগ্র সৃষ্টির লালন-পালনের দায়িত্ব একই পবিত্র সত্তার ; তাঁই তারিফ-প্রশংসারও প্রকৃত প্রাপক তিনিই ; অন্য কেউ নয়। এজন্য প্রথম আয়াত رَبُّ الْعَالَمِينَ-এ তারিফ-প্রশংসার সাথে ঈমানের প্রথম স্তম্ভ আল্লাহ তা'আলার একত্ব বা তওহীদেঁর কথা অতি সূক্ষ্মভাবে এসে গেছে।

দ্বিতীয় আয়াতে তাঁর গুণ, দয়ার প্রসঙ্গ رَحِيمٌ وَرَحْمَنٌ শব্দদ্বয়ের দ্বারা বর্ণনা করেছেন। উভয় শব্দই “গুণের আধিক্যবোধক বিশেষ্য” যাতে আল্লাহ্র দয়ার অসাধারণত্ব ও পূর্ণতার কথা বোঝায়। এ স্থলে এ গুণের উল্লেখ সম্ভবত এজন্য যে, আল্লাহ তা'আলা যে সমগ্র সৃষ্টিজগতের লালন-পালন, ভরণ-পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। এতে তাঁর নিজস্ব কোন প্রয়োজন নেই বা অন্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েও নয় ; বরং তাঁর রহমত বা দয়ার তাকীদেই তিনি এ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। যদি সমগ্র সৃষ্টির অস্তিত্বও না থাকে, তাতেও তাঁর কোন লাভ-ক্ষতি নেই। আর যদি সমগ্র সৃষ্টি অবাধ্যও হয়ে যায় তবে তাতেও তাঁর কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই।

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ .

مَلِكُ শব্দ مَالِكٌ ধাতু হতে গঠিত। এর অর্থ কোন বস্তুর উপর এমন অধিকার থাকা, যাকে ব্যবহার, রদবদল, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সব কিছু করার সকল অধিকার থাকবে। دَيْنٌ অর্থ প্রতিদান দেয়া। مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ-এর শাব্দিক অর্থ—প্রতিদান-দিবসের মালিক বা অধিপতি। অর্থাৎ প্রতিদান-দিবসের অধিকার ও আধিপত্য কোন্ বস্তুর উপরে হবে, তার কোন বর্ণনা দেওয়া হয়নি। তফসীরে কাশ্শাফে বলা হয়েছে যে, এতে ‘আম’ বা অর্থের ব্যাপকতার প্রতি ইশারা করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রতিদান দিবসে সকল সৃষ্টিরাজি ও সকল বিষয়ই আল্লাহ তা'আলার অধিকারে থাকবে। (কাশ্শাফ)

প্রতিদান দিবসের স্বরূপ ও তার প্রয়োজনীয়তা

প্রথমত, প্রতিদান দিবস কাকে বলে এবং এর স্বরূপ কি? দ্বিতীয়ত, সমগ্র সৃষ্টিরাজির উপর প্রতিদান দিবসে যেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলার একক অধিকার থাকবে, অনুরূপভাবে আজও

তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (১ম খণ্ড) — ১০

সকল কিছুর উপর তাঁরই তো একক অধিকার রয়েছে ; সুতরাং প্রতিদান দিবসের বৈশিষ্ট্য কোথায় ?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে এই যে, 'প্রতিদান-দিবস' সে দিনকেই বলা হয়, যেদিন আল্লাহ তা'আলা ভাল-মন্দ সকল কাজ-কর্মের প্রতিদান দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন। 'রোযে-জাযা' শব্দ দ্বারা বোঝানো হয়েছে, দুনিয়া ভাল-মন্দ কাজ-কর্মের প্রকৃত ফলাফল পাওয়ার স্থান নয় ; বরং ইহা কর্মস্থল, কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের জায়গা। যথার্থ প্রতিদান বা পুরস্কার গ্রহণেরও স্থান এটা নয়। এতে এ কথাও বোঝা যাচ্ছে যে, পৃথিবীতে কারও অর্থ-সম্পদের আধিক্য ও সুখ-শান্তির ব্যাপকতা দেখে বলা যাবে না যে, এ লোক আল্লাহর দরবারে মকবুল হয়েছেন বা তিনি আল্লাহর প্রিয়পাত্র। অপরপক্ষে কাকেও বিপদাপদে পতিত দেখেও বলা যাবে না যে, তিনি আল্লাহর অভিশপ্ত। যেমনি করে কর্মস্থলে বা কারখানার কোন কোন লোককে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে ব্যস্ত দেখে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাকে বিপদগ্রস্ত বলতে পারে না এবং সে নিজেও দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত বলে নিজেকে বিপদগ্রস্ত বলে ভাবে না ; বরং সে এ ব্যস্ততাকে জীবনের সাফল্য বলেই গণ্য করে এবং যদি কেউ অনুগ্রহ করে তাকে এ ব্যস্ততা থেকে রেহাই দিতে চায়, তবে তাকে সে সবচেয়ে বড় ক্ষতিকর বলে মনে করে। সে তার এ ত্রিশ দিনের পরিশ্রমের অন্তরালে এমন এক আরাম দেখতে পায়, যা তার বেতনস্বরূপ সে লাভ করে।

এই জন্যই নবীগণ এ দুনিয়ার জীবনে সর্বাপেক্ষা বেশি বিপদাপদে পড়েছেন এবং তারপর ওলী-আউলিয়াগণ সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়েছেন। কিন্তু দেখা গেছে, বিপদের তীব্রতা যত কঠিনই হোক না কেন, দৃঢ়পদে তাঁরা তা সহ্য করেছেন। এমনকি আনন্দিত চিত্তেই তাঁরা তা মেনে নিয়েছেন। মোটকথা, দুনিয়ার আরাম-আয়েশকে সত্যবাদিতা ও সঠিকতা এবং বিপদাপদকে খারাপ কাজের নিদর্শন বলা যায় না।

অবশ্য কখনো কখনো কোন কোন কর্মের সামান্য ফলাফল দুনিয়াতেও প্রকাশ করা হয় বটে, তবে তা সে কাজের পূর্ণ বদলা হতে পারে না। এগুলো সাময়িকভাবে সতর্ক করার জন্য একটু নিদর্শন মাত্র। এ প্রসঙ্গে আল-কোরআনে এরশাদ হয়েছে :

وَلَنَذِقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ .

অর্থাৎ—এবং আমরা মানুষকে (পরকালের বড় শাস্তির) আগেই দুনিয়াতে কিছু শাস্তি দিয়ে থাকি, যেন তারা মন্দ কাজ থেকে ফিরে আসে।

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে :

كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ .

অর্থাৎ—এরূপ শাস্তি হয়ে থাকে এবং পরকালের শাস্তি আরো বড়, যদি তা তারা বুঝে !

মোটকথা, দুনিয়ার আরাম-আয়েশ এবং বিপদাপদ কোন কোন সময় পরীক্ষা স্বরূপও হয়ে থাকে, আবার কোন কোন সময় সতর্কীকরণের জন্যও শাস্তিরূপে প্রবর্তিত হয়।

কিন্তু তা কর্মের পূর্ণ ফলাফল নয়, সামান্য নমুনা মাত্র। কেননা, এ সব কিছুই ক্ষণিকের এবং ক্ষণস্থায়ী। চিরস্থায়ী বা দীর্ঘস্থায়ী শাস্তি ও শাস্তি হবে পরকালে। যেদিন সে শাস্তি অথবা শাস্তি দেওয়া হবে, সেদিনের নামই প্রতিদান দিবস। যখন বোঝা গেল যে, ভাল ও মন্দ কাজের পরিপূর্ণ প্রতিদানের স্থান এ পৃথিবী নয়, তখন বিচার-বুদ্ধি ও যুক্তির কথা হচ্ছে এই যে, ভাল ও

মন্দ যেন একই পর্যায়ভুক্ত হয়ে না যায়, সে জন্য প্রত্যেক কাজের প্রতিদান অবশ্যই পাওয়া উচিত। এজন্যই এ জগৎ ব্যতীত একটি ভিন্ন জগতের প্রয়োজন। যেখানে ছোট-বড়, ভাল-মন্দ সকল কাজের প্রতিদান ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে দেওয়া হবে। কোরআনের ভাষায় তাকেই ‘প্রতিদান দিবস’—কিয়ামত বা পরকাল বলা হয়।

সূরা আল-মু’মিনে আত্মাহু তা’আলা এ বিষয়ে বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন :

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ . إِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ .

অর্থাৎ—অন্ধ এবং দৃষ্টিশক্তিহীন ব্যক্তি যেমন এক পর্যায়ের নয়, তেমনি যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করে, আর যারা মন্দ কাজ করে তারা পরস্পর সমান নয়। তোমরা অত্যন্ত কম বুঝ। কিয়ামত অবশ্যই হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা বিশ্বাস করে না।

মালিক কে ?

مَالِكُ يَوْمِ الدِّينِ বাক্যটিতে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই একথা জানেন যে, সেই একক সত্তাই প্রকৃত মালিক, যিনি সমগ্র সৃষ্টি জগতকে সৃষ্টি করেছেন এবং এর লালন-পালন ও বর্ধনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং যাঁর মালিকানা পূর্ণরূপে প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই সর্বাবস্থায় পরিব্যাপ্ত। অর্থাৎ—প্রকাশ্যে, গোপনে, জীবিতাবস্থায় ও মৃতাবস্থায় তিনিই একমাত্র মালিক এবং যার মালিকানার আরম্ভ নেই, শেষও নেই। এ মালিকানার সাথে মানুষের মালিকানার কোন তুলনা চলে না। কেননা, মানুষের মালিকানা আরম্ভ ও শেষের চৌহদ্দিতে সীমাবদ্ধ। এক সময় তা চলে না, কিছুদিন পরেই তা থাকবে না। অপরদিকে মানুষের মালিকানা হস্তান্তরযোগ্য। বস্তুর বাহ্যিক দিকের ওপরই তা বর্তায়, গোপনীয় দিকের ওপর নয়। জীবিতের ওপর, মৃতের ওপর নয়। এজন্যই প্রকৃত প্রস্তাবে আত্মাহু তা’আলার মালিকানা কেবলমাত্র প্রতিদান দিবসেই নয়, পৃথিবীতেও সমস্ত সৃষ্টজগতের প্রকৃত মালিক আত্মাহু তা’আলা। তবে এ আয়াতে আত্মাহু তা’আলার মালিকানা বিশেষভাবে ‘প্রতিদান-দিবসের’ এ কথা বলার তাৎপর্য কি ? আল-কোনআনের অন্য আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে, যদিও দুনিয়াতেও প্রকৃত মালিকানা আত্মাহু তা’আলারই কিন্তু তিনি দয়াপূরবশ হয়ে আংশিক বা ক্ষণস্থায়ী মালিকানা মানবজাতিকেও দান করেছেন এবং জাগতিক জীবনের আইনে এ মালিকানার প্রতি সম্মানও দেখানো হয়েছে। বিশ্বচরাচরে মানুষ ধন-সম্পদ, জায়গা-জমি, বাড়ি-ঘর এবং আসবাবপত্রের ক্ষণস্থায়ী মালিক হয়েও এতে একেবারে ডুবে রয়েছে। আত্মাহু তা’আলা مَالِكُ يَوْمِ الدِّينِ একথা ঘোষণা করে এ অহংকারী ও নির্বোধ মানব-সমাজকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, তোমাদের এ মালিকানা, আধিপত্য ও সম্পর্ক মাত্র কয়েক দিনের এবং ক্ষণিকের। এমন দিন অতি সত্ত্বরই আসছে, যে দিন কেউই জাহেরী মালিকও থাকবে না, কেউ কারো দাস বা কেউ কারো সেবা পাবার উপযোগীও থাকবে না। সমস্ত বস্তুর মালিকানা এক একক সত্তা হয়ে যাবে। এ আয়াতের বিস্তারিত বর্ণনা সূরা আল-মু’মিনের এ আয়াতে দেওয়া হয়েছে :

يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْئٌ لَمَّا الْمَلِكُ الْيَوْمَ ط
لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ . الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ - إِنَّ
اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ .

অর্থাৎ—“যেদিন সমস্ত মানুষ আল্লাহ তা'আলার দরবারে উপস্থিত হবে, সেদিন তাদের কোন কথাই আল্লাহর নিকট গোপন থাকবে না। আজ কার রাজত্ব? (উত্তরে) সে আল্লাহ তা'আলার যিনি একক ও পরাক্রান্ত। আজ প্রত্যেককে তার কর্মফল দান করা হবে। আজ কারো প্রতি অবিচার করা হবে না। আল্লাহ তা'আলা অতি তাড়াতাড়ি হিসাব নিতে পারেন।”

সূরা আল-ফাতিহার প্রথমে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ সূরার প্রথম তিনটি আয়াতে আল্লাহর প্রশংসা ও তা'রীফের বর্ণনা করা হয়েছে এবং এর তফসীরে একথা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, তা'রীফ ও প্রশংসার সাথে সাথে ঈমানের মৌলিক নীতি ও আল্লাহর একত্ববাদের বর্ণনাও সূক্ষ্মভাবে দেওয়া হয়েছে।

তৃতীয় আয়াতের তফসীরে আপনি অবগত হলেন যে, এর দু'টি শব্দে তা'রীফ ও প্রশংসার সাথে সাথে ইসলামের বিপ্লবাত্মক মহত্তম আকীদা যথা কিয়ামত ও পরকালের বর্ণনা প্রমাণসহ উপস্থিত করা হয়েছে।

এখন চতুর্থ আয়াতের বর্ণনা : اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ এ আয়াতের এক অংশে তা'রীফ ও প্রশংসা এবং অপর অংশে দোয়া ও দরখাস্ত। نَعْبُدُ শব্দ হতে গঠিত। এর অর্থ হচ্ছে : কারো প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা ও ভালবাসার দরুন তাঁর নিকট নিজের আন্তরিক কাকুতি-মিনতি প্রকাশ করা। اَسْتَعَاْنَتْ হতে গঠিত। এর অর্থ হচ্ছে কারো সাহায্য প্রার্থনা করা। আয়াতের অর্থ হচ্ছে, ‘আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং একমাত্র তোমার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করি।’ মানবজীবন তিনটি অবস্থায় অতিবাহিত হয়। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। পূর্বের তিনটি আয়াতের মধ্যে الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ এবং এ দু'টি আয়াতে মানুষকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, অতীতে সে কেবল একমাত্র আল্লাহ তা'আলার মুখাপেক্ষী ছিল, বর্তমানেও সে একমাত্র তাঁরই মুখাপেক্ষী। অস্তিত্বহীন এক অবস্থা থেকে তিনি তাকে অস্তিত্ব দান করেছেন। তাকে সকল সৃষ্টির মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর আকার-আকৃতি এবং বিবেক ও বুদ্ধি দান করেছেন। বর্তমানে তার লালন-পালন ও ভরণ-পোষণের নিয়মিত সুব্যবস্থা তিনিই করেছেন। অতঃপর مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ এর মধ্যে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ভবিষ্যতেও সে আল্লাহ তা'আলারই মুখাপেক্ষী। প্রতিদান দিবসে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো সাহায্য পাওয়া যাবে না।

এ তিনটি আয়াতের দ্বারা যখন একথা প্রমাণিত হলো যে, মানুষ তার জীবনের তিনটি কালেই একান্তভাবে আল্লাহর মুখাপেক্ষী, তাই সাধারণ যুক্তির চাহিদাও এই যে, ইবাদতও তাঁরই করতে হবে। কেননা, ইবাদত যেহেতু অশেষ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সাথে নিজের অফুরন্ত কাকুতি-মিনতি নিবেদন করার নাম, সুতরাং তা পাওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন অন্য কোন সত্তা নেই। ফল কথা এই যে, একজন বুদ্ধিমান ও বিবেকবান ব্যক্তি মনের গভীরতা থেকেই এ স্বতঃস্ফূর্ত

স্বীকৃতি উচ্চারণ করছে যে, আমরা তোমাকে ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করি না। এ মৌলিক চাহিদাই **وَإِلَّاكَ نَعْبُدُ** -তে বর্ণনা করা হয়েছে।

যখন স্থির হলো যে, অভাব পূরণকারী একক সত্তা আল্লাহ তা'আলা, সুতরাং নিজের সকল কাজে সাহায্যও তাঁর নিকটই চাওয়া দরকার। এ মৌলিক চাহিদারই বর্ণনা **وَأِيَّاكَ نَسْتَعِينُ** -এ করা হয়েছে। মোটকথা, এ চতুর্থ আয়াতে একদিকে আল্লাহ তা'আলার ও প্রশংসার সাথে একধারও স্বীকৃতি রয়েছে যে, ইবাদত ও শ্রদ্ধা পাওয়ার একমাত্র তিনিই যোগ্য। অপরদিকে তাঁর নিকট সাহায্য ও সহায়তার প্রার্থনা করা এবং তৃতীয়ত আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না করার শিক্ষাও দেওয়া হয়েছে। এতদসঙ্গে এও বলে দেওয়া হয়েছে যে, কোন বান্দাই আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকেও অভাব পূরণকারী মনে করবে না। অপর কারো নিকট প্রার্থনার হাত প্রসারিত করা যাবে না। অবশ্য কোন নবী বা কোন ওলীর বরাত দিয়ে প্রার্থনা করা এ আয়াতের মর্মবিরোধী নয়।

এ আয়াতে এ বিষয়ও চিন্তা করা কর্তব্য যে, “আমরা তোমারই নিকট সাহায্য চাই।” কিন্তু কোন কাজের সাহায্য চাই, তার কোন উল্লেখ নেই। জমহুর মুফাস্সিরীনের অভিমত এই যে, নির্দিষ্ট কোন ব্যাপারে সাহায্যের কথা উল্লেখ না করে ‘আম বা সাধারণ সাহায্যের প্রতি ইশারা করা হয়েছে যে, আমি আমার ইবাদত এবং প্রত্যেক ধর্মীয় ও পার্শ্বিক কাজে এবং অন্তরে পোষিত প্রতিটি আশা-আকাঙ্ক্ষায় কেবল তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।

ইবাদত শুধু নামায-রোযারই নাম নয়। ইমাম গায্বালী (র) স্বীয় গ্রন্থ ‘আরবাইন’-এ দশ প্রকার ইবাদতের কথা লিখেছেন। যথা-নামায, যাকাত, রোযা, কোরআন তিলাওয়াত, সর্বাবস্থায় আল্লাহর স্মরণ, হালাল উপার্জনের চেষ্টা করা, প্রতিবেশী এবং সাধীদের প্রাপ্য পরিশোধ করা, মানুষকে সংকাজের আদেশ ও খারাপ কাজ হতে বিরত থাকার উপদেশ দেওয়া, রসূলের সুনুত পালন করা।

একই কারণে ইবাদতে আল্লাহর সাথে কাউকেও অংশীদার করা চলে না। এর অর্থ হচ্ছে, কারো প্রতি ভালবাসা আল্লাহর প্রতি ভালবাসার সমতুল্য হবে না। কারো প্রতি ভয়, কারো প্রতি আশা-আকাঙ্ক্ষা পোষণ আল্লাহর ভয় ও তাঁর প্রতি পোষিত আশা-আকাঙ্ক্ষার সমতুল্য হবে না। আবার কারো ওপর একান্ত ভরসা করা, কারো আনুগত্য ও খেদমত করা, কারো কাজকে আল্লাহর ইবাদতের সমতুল্য আবশ্যকীয় মনে করা, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে মানত করা, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো সামনে স্বীয় কাকুতি-মিনতি প্রকাশ করা এবং যে কাজে অন্তরের আবেগ-আকুতি প্রকাশ পায়, এমন কাজ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য করা যথা রুকু বা সিজদা করা ইত্যাদি কোন অবস্থাতেই বৈধ হবে না।

শেষ তিনটি আয়াতে মানুষের দোয়া ও আবেদনের বিষয়বস্তু এবং এক বিশেষ প্রার্থনা-পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। তা হচ্ছে :

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ . صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ . غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ .

অর্থাৎ-আমাদেরকে সরল পথ দেখাও ; সে সমস্ত মানুষের পথ, যারা তোমার অনুগ্রহ লাভ করেছে। যে পথে তোমার অভিশপ্ত বান্দাগণ চলেছে সে পথে নয়, এবং ঐ সমস্ত লোকের রাস্তাও নয় যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

এ তিনটি আয়াতে কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যেমন সরল পথের হেদায়েতের জন্য যে আবেদন এ আয়াতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, এর আবেদনকারী যেমনিভাবে সাধারণ মানুষ, সাধারণ মু'মিনগণ, ঠিক অনুরূপভাবে আওলিয়া, গাউস-কুতুব এবং নবী-রসূলগণও। নিঃসন্দেহে যারা হেদায়েতপ্রাপ্ত, বরং অন্যের হেদায়েতের উৎসস্বরূপ, তাঁদের পক্ষে পুনরায় সে হেদায়েতের জন্যই বারংবার প্রার্থনা করার উদ্দেশ্য কি? এ প্রশ্নের উত্তর 'হেদায়েত' শব্দের তাৎপর্য পরিপূর্ণরূপে অনুধাবন করার ওপর নির্ভরশীল। এ বিষয়ে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন, যাতে আলোচ্য প্রশ্নের উত্তর ছাড়াও 'হেদায়েত' শব্দের তাৎপর্য সম্পর্কে অজ্ঞ লোকেরা যেসব পরম্পর বিরোধিতা আঁচ করেন, তাদের সকল প্রশ্নেরও মীমাংসা হয়ে যায়।

ইমাম রাগেব ইস্ফাহানী 'মুফরাদাতুল-কোরআনে' হেদায়েত শব্দের অতি সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এর সারমর্ম হচ্ছে, 'কাউকে গন্তব্যস্থানের দিকে অনুগ্রহের সাথে পথপ্রদর্শন করা।' তাই হেদায়েত করা প্রকৃত প্রস্তাবে একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই কাজ এবং এর বিভিন্ন স্তর রয়েছে। হেদায়েতের একটি স্তর হচ্ছে সাধারণ ও ব্যাপক। এতে সমগ্র সৃষ্টি অন্তর্ভুক্ত। জড় পদার্থ উদ্ভিদ এবং প্রাণী জগৎ পর্যন্ত এর আওতাধীন। প্রসঙ্গত প্রশ্ন উঠতে পারে যে, প্রাণহীন জড় পদার্থ বা ইতর প্রাণী ও উদ্ভিদ-জগতের সঙ্গে হেদায়েতের সম্পর্ক কোথায়?

কোরআনের শিক্ষায় স্পষ্টতই এ তথ্য ব্যক্ত হয়েছে যে, সৃষ্টির প্রতিটি স্তর, এমনকি প্রতিটি অণু-পরমাণু পর্যন্ত নিজ নিজ অবস্থানুযায়ী প্রাণ ও অনুভূতির অধিকারী। স্ব-স্ব পরিমণ্ডলে প্রতিটি বস্তুর বুদ্ধি-বিবেচনা রয়েছে। অবশ্য এ বুদ্ধি ও অনুভূতির তারতম্য রয়েছে। কোনটাতে তা স্পষ্ট এবং কোনটাতে নিতান্তই অনুল্লেখ্য। যে সমস্ত বস্তুতে তা অতি অল্পমাত্রায় বিদ্যমান সেগুলোকে প্রাণহীন বা অনুভূতিহীন বলা যায়। বুদ্ধি ও অনুভূতির ক্ষেত্রে এ তারতম্যের জন্যই সমগ্র সৃষ্টিজগতের মধ্যে একমাত্র মানুষ ও জিন জাতিকেই শরীয়তের হুকুম-আহকামের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। কারণ, সৃষ্টির এ দু'টি স্তরের মধ্যেই বুদ্ধি ও অনুভূতি পূর্ণমাত্রায় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু, তাই বলে একথা বলা যাবে না যে, একমাত্র মানুষ ও জিন জাতি ছাড়া সৃষ্টির অন্য কোন কিছুর মধ্যে বুদ্ধি ও অনুভূতির অস্তিত্ব নেই। কেননা, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন :

وَأَنْ مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ .

অর্থাৎ-এমন কোন বস্তু নেই যা আল্লাহর প্রশংসার তসবীহ পাঠ করে না, কিন্তু তোমরা তাদের তসবীহ বুঝতে পার না। (সূরা বনী-ইসরাঈল)

সূরা নূরে এরশাদ হয়েছে :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَفَّتْ
كُلُّ قَدَمٍ مَّلٰوٰتَهُ وَتَسْبِيحُهُ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌۢ بِمَا يَفْعَلُونَ .

অর্থাৎ-তোমরা কি জান না যে, আসমান-যমীনে যা কিছু রয়েছে, সকলেই আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা ও গুণগান করে? বিশেষত পাখিকুল যারা দু'পাখা বিস্তার করে শূন্যে উড়ে

বেড়ায়, তাদের সকলেই স্ব-স্ব দোয়া-তসবীহ সম্পর্কে জ্ঞাত এবং আল্লাহ তা'আলাও ওদের তসবীহ সম্পর্কে খবর রাখেন।

একথা সর্বজনবিদিত যে, আল্লাহ তা'আলার পরিচয়ের ওপরই তাঁর তারীফ ও প্রশংসা নির্ভরশীল। আর এ কথাও স্বতঃসিদ্ধ যে, আল্লাহর পরিচয় লাভ করাই সর্বাপেক্ষা বড় জ্ঞান। এটা বুদ্ধি-বিবেক ও অনুভূতি ব্যতীত সম্ভব নয়। এ আয়াতগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, সৃষ্টিজগতের প্রতিটি বস্তুই প্রাণ ও জীবন আছে এবং বুদ্ধি ও অনুভূতিও রয়েছে। তবে কোন কোনটির মধ্যে এর পরিমাণ এত অল্প যে, সাধারণ দৃষ্টিতে তা অনুভব করা যায় না। তাই পরিভাষাগতভাবে ওগুলোকে প্রাণহীন ও বুদ্ধিহীন জড় পদার্থ বলা হয়। আর এ জন্যেই ওদেরকে শরয়ী আদেশের আওতাভুক্ত করা হয়নি। গোটা বস্তুজগত সম্পর্কিত এ মীমাংসা আল-কোরআনে সে যুগেই দেওয়া হয়েছিল, যে যুগে পৃথিবীর কোথাও আধুনিককালের কোন দার্শনিকও ছিল না, দর্শনবিদ্যার কোন পুস্তকও রচিত হয়নি। পরবর্তী যুগের দার্শনিকগণ এ তথ্যের যথার্থতা স্বীকার করেছেন এবং প্রাচীন দার্শনিকদের মধ্যেও এ মত পোষণ করার মত অনেক লোক ছিল। মোটকথা, আল্লাহর হেদায়েতের এ প্রথম স্তরে সমস্ত সৃষ্টিজগত যথা-জড় পদার্থ, উদ্ভিদ, প্রাণিজগত, মানবমণ্ডলী ও জ্বিন প্রভৃতি সকলেই অন্তর্ভুক্ত। এ সাধারণ হেদায়েতের উল্লেখই আল-কোরআনের এ আয়াতে **كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ثُمَّ هَدَى** করা হয়েছে। অর্থাৎ—“আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর অস্তিত্ব দান করেছেন এবং সে অনুপাতে তাকে হেদায়েত দান করেছেন।”

এ বিষয়ে সূরা আ'লায় এরশাদ হয়েছে :

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى .

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের মহান পালনকর্তার গুণগান কর। যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং সেগুলোকে সঠিক অবস্থা দান করেছেন। যিনি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন এবং পথ দেখিয়েছেন।

অর্থাৎ—যিনি সমস্ত সৃষ্টিজগতের জন্য বিশেষ অভ্যাস এবং বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব নির্ধারণ করেছেন এবং সে মেজাজ ও দায়িত্বের উপযোগী হেদায়েত দান করেছেন। এ ব্যাপারে হেদায়েতের পরিকল্পনা অনুযায়ী সৃষ্টিজগতের প্রতিটি বস্তুই অতি নিপুণভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে চলেছে। যে বস্তুকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, সে সেই কাজ অত্যন্ত গুরুত্ব ও নৈপুণ্যের সাথে পালন করছে। যথা—মুখ হতে নির্গত শব্দ নাক বা চক্ষু কেউই শ্রবণ করতে পারে না, অথচ এ দু'টি মুখের নিকটতম অঙ্গ। পক্ষান্তরে এ দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা যেহেতু কানকে অর্পণ করেছেন, তাই একমাত্র কানই মুখের শব্দ শ্রবণ করে ও বুঝে। অনুরূপভাবে কান দ্বারা দেখা বা শ্রাণ লওয়ার কাজ করা চলে না। নাক দ্বারা শ্রবণ করা বা দেখার কাজও করা চলে না।

সূরা মরিয়মে এ বিষয়ে এরশাদ হয়েছে :

إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا

অর্থাৎ-আকাশ ও যমীনে এমন কোন বস্তু নেই, যা আল্লাহর বান্দারূপে আগমন করেনি।

হেদায়েতের দ্বিতীয় স্তর এর তুলনায় অনেকটা সংকীর্ণ। অর্থাৎ সে সমস্ত বস্তুর সাথে জড়িত, পরিভাষায় যাদেরকে বিবেকবান বুদ্ধিসম্পন্ন বলা হয়। অর্থাৎ মানুষ এবং জ্বিন জাতি। এ হেদায়েত নবী-রসূল ও আসমানী কিতাবের মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষের নিকট পৌছেছে। কেউ এ হেদায়েতকে গ্রহণ করে মু'মিন হয়েছে আবার কেউ একে প্রত্যাখ্যান করে কাফির-বেদীনে পরিণত হয়েছে।

হেদায়েতের তৃতীয় স্তর আরো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তা শুধু মু'মিন ও মুত্তাকী বা ধর্মভীরুদের জন্য। এ হেদায়েত আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কোন প্রকার মাধ্যম ব্যতীতই মানুষকে প্রদান করা হয়। এরই নাম তওফীক। অর্থাৎ এমন অবস্থা, পরিবেশ ও মনোভাব সৃষ্টি করে দেওয়া যে, তার ফলে কোরআনের হেদায়েতকে গ্রহণ করা এবং এর ওপর আমল করা সহজসাধ্য হয়ে যায় এবং এর বিরুদ্ধাচরণ কঠিন হয়ে পড়ে। এ তৃতীয় স্তরের পরিসীমা অতি ব্যাপক। এ স্তরই মানবের উন্নতির ক্ষেত্র। নেক কাজের সাথে এ হেদায়েতের বৃদ্ধি হতে থাকে। কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে এ বৃদ্ধির উল্লেখ রয়েছে :

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا .

অর্থাৎ—“যারা আমার পথে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে আমি তাদেরকে আমার পথে আরো অধিকতর অগ্রসর হওয়ার পথ অবশ্যই দেখিয়ে থাকি।” এটি সেই কর্মক্ষেত্র যেখানে নবী-রাসূল এবং বড় বড় ওলী-আউলিয়া, কুতুবগণকেও জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আরো অধিকতর হেদায়েত ও তওফীকের জন্য চেষ্টায় রত থাকতে দেখা গেছে।

হেদায়েতের এ ব্যাখ্যা দ্বারা স্পষ্টভাবে বোঝা গেল যে, হেদায়েত এমন এক বস্তু যা সকলেই লাভ করেছে এবং এর আধিক্য লাভ করার জন্য বড় হতে বড় ব্যক্তির পক্ষেও কোন বাধা-নিষেধ নেই। এ জন্যই সূরা আল-ফাতিহায় গুরুত্বপূর্ণ দোয়ারূপে হেদায়েত প্রার্থনা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যা একজন সাধারণ মু'মিনের জন্যও উপযোগী, আবার একজন বড় হতে বড় রসূলের জন্যও উপযোগী। এজন্যই হযরত রসূলে আকরাম (সা)-এর শেষ জীবনে সূরা ফাতহাতে মক্কা বিজয়ের ফলাফল বর্ণনা করতে গিয়ে একথাও বলা হয়েছে যে, وَيَهْدِيكَ وَيُخْرِجُكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ إِنَّكَ لَكُلِّ شَيْءٍ مُّشْفِقٌ ۝ (আল-ফাতিহা: ২-৫) অর্থাৎ মক্কা বিজয় এজন্যই আপনার দ্বারা সম্পন্ন করা হয়েছে, যাতে সিরাত-ে-মুস্তাকীমের হেদায়েত লাভ হয়।

রসূলুল্লাহ (সা) কেবল নিজেই হেদায়েতপ্রাপ্ত ছিলেন না ; বরং অন্যের জন্যও ছিলেন হেদায়েতের উৎস। এমতাবস্থায় তাঁর হেদায়েত লাভের একমাত্র অর্থ হতে পারে, এ সময় হেদায়েতের কোন উচ্চতর অবস্থা তিনি লাভ করেছেন।

হেদায়েতের এ ব্যাখ্যা পবিত্র কোরআন বুঝবার ক্ষেত্রে যে সব ফায়দা প্রদান করবে সংক্ষেপে তা নিম্নরূপ :

এক পবিত্র কোরআনের কোথাও কোথাও মু'মিন ও কাফের নির্বিশেষে সবার জন্যই হেদায়েত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আবার কোথাও শুধুমাত্র মুত্তাকীদের জন্য বিশেষ অর্থে হেদায়েত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতে করে অজ্ঞ লোকদের পক্ষে সন্দেহে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। কিন্তু হেদায়েতের সাধারণ ও বিশেষ স্তরসমূহ জানার পর এ সন্দেহ

আপনা-আপনিতেই দূরীভূত হয়ে যাবে। বুঝতে হবে যে, কারো বেলায় ব্যাপক অর্থে এবং কারো বেলায় বিশেষ অর্থে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

দুই. আল-কোরআনের স্থানে স্থানে এরশাদ হয়েছে যে, জালেম ও ফাসেকদেরকে আল্লাহ তা'আলা হেদায়েত দান করেন না। অন্যত্র বারবার এরশাদ হয়েছে যে, তিনি সকলকেই হেদায়েত দান করেন। এর উত্তর ও হেদায়েতের স্তরসমূহের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলে দেওয়া হয়েছে যে, হেদায়েতের ব্যাপক অর্থে সকলেই হেদায়েতপ্রাপ্ত এবং বিশেষ অর্থে জালেম ও ফাসেকরা বাদ পড়েছে।

তিন. হেদায়েতের তিনটি স্তরের মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় স্তর সরাসরি আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এ পর্যায়ের হেদায়েত একান্তভাবে একমাত্র তাঁরই কাজ। এতে নবী-রসূলগণেরও কোন অধিকার নেই। নবী-রসূলগণের কাজ শুধু হেদায়েতের দ্বিতীয় স্তরে সীমিত। কোরআনের যেখানে যেখানে নবী-রসূলগণকে হেদায়েতকারী বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তা হেদায়েতের দ্বিতীয় স্তরের ভিত্তিতেই বলা হয়েছে। আর যেখানে এরশাদ হয়েছে : **اِنَّكَ لَنْ تَهْدِيَ مَنْ** অর্থাৎ “আপনি যাকে চান তাকেই হেদায়েত করতে পারবেন না”—এতে হেদায়েতের তৃতীয় স্তরের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ কাউকে তওফীক দান করা আপনার কাজ নয়।

মোটকথা, **اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ** একটি ব্যাপক ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দোয়া, যা মানুষকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। মানবসমাজের কোন ব্যক্তিই এর আওতার বাইরে নেই। কেননা, সরল-সঠিক পথ ব্যতীত দীন-দুনিয়ার কোন কিছুতেই উন্নতি ও সাফল্য সম্ভব নয়। দুনিয়ার আবর্তন-বিবর্তনের মধ্যেও সিরাতে-মুস্তাকীমের প্রার্থনা পরশপাথরের মত। কিন্তু মানুষ তা লক্ষ্য করে না। আয়াতের অর্থ হচ্ছে : “আমাদিগকে সরল পথ দেখিয়ে দিন।”

সরল পথ কোনটি? সোজা সরল রাস্তা সে পথকে বলে, যাতে কোন মোড় বা ঘোরপ্যাচ নেই। এর অর্থ হচ্ছে, ধর্মের সে রাস্তা যাতে ‘ইফরাত’ বা ‘তফরীত’-এর অবকাশ নেই। ইফরাতের অর্থ সীমা অতিক্রম করা এবং তফরীত অর্থ মর্জিমত কাট-ছাঁট করে নেওয়া। এরশাদ হয়েছে : **صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ**

অর্থাৎ—যে সকল লোক আপনার অনুগ্রহ লাভ করেছে তাদের রাস্তা। যে সকল ব্যক্তি আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করেছে তাদের পরিচয় অন্য একটি আয়াতে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে :

**الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
وَالصَّالِحِينَ**

অর্থাৎ—যাদের প্রতি আল্লাহ পাক অনুগ্রহ করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সৎকর্মশীল সালেহীন। আল্লাহর দরবারে মকবুল উপরোক্ত লোকদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তর নবীগণের। অতঃপর নবীগণের উম্মতের মধ্যে যাঁরা সর্বাপেক্ষা বড় মরতবা ও মর্যাদার অধিকারী, তাঁরা হলেন সিদ্দীক। যাঁদের মধ্যে রূহানী কামালিয়াত ও পরিপূর্ণতা রয়েছে, সাধারণ ভাষায় তাঁদেরকে ‘আউলিয়া’ বলা হয়। আর যাঁরা দীনের প্রয়োজনে স্বীয় জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করেছেন, তাঁদেরকে বলা হয় শহীদ। আর সালেহীন হচ্ছেন—যাঁরা ওয়াজিব, মুস্তাহাব প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে শরীয়তের পুরোপুরি অনুসরণ ও আমলকারী, সাধারণ পরিভাষায় এঁদেরকে দীনদার বলা হয়।

এ আয়াতের প্রথম অংশে হ্যাঁ-সূচক বাক্য ব্যবহার করে সরল পথের সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। উপরোক্ত চার স্তরের মানুষ যে পথে চলেছেন তা-ই সরল পথ। পরে শেষ আয়াতে না-সূচক বাক্য ব্যবহার করেও এর সমর্থন করা হয়েছে। বলা হয়েছে :

غَيْرِ الْمَفْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ .

অর্থাৎ-যারা আপনার অভিসম্পাতগ্রস্ত তাদের পথ নয় এবং তাদের পথও নয়, যারা পথহারা হয়েছে।

مَفْضُوبٌ عَلَيْهِمْ বলতে ঐ সকল লোককে বোঝানো হয়েছে, যারা ধর্মের হুকুম-আহকামকে বুঝে-জানে, তবে স্বীয় অহমিকা ও ব্যক্তিগত স্বার্থের বশবর্তী হয়ে বিরুদ্ধাচরণ করেছে। অন্য শব্দে বলা যায়, যারা আল্লাহ তা'আলার আদেশ মান্য করতে গাফলতি করেছে। যেমন, সাধারণভাবে ইহুদীদের নিয়ম ছিল, সামান্য স্বার্থের জন্য দীনের নিয়ম-নীতি বিসর্জন দিয়ে তারা নবী-রাসূলগণের অবমাননা পর্যন্ত করতে দ্বিধাবোধ করত না। ضَالِّينَ-তাদেরকে বলা হয়, যারা না বুঝে অজ্ঞতার দরুন ধর্মীয় ব্যাপারে ভুল পথের অনুসারী হয়েছে এবং ধর্মের সীমালঙ্ঘন করে অতিরঞ্জনের পথে অগ্রসর হয়েছে। যথা-নাসারাগণ। তারা নবীর শিক্ষাকে অগ্রাধিকার প্রদানের নামে বাড়াবাড়ি করেছে ; যেমন নবীদেরকে আল্লাহর পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে। ইহুদীদের বেলায় এটা অন্যায় এজন্য যে, তারা আল্লাহর নবীদের কথা মানেনি ; এমন কি তাঁদেরকে হত্যা পর্যন্ত করেছে।

আয়াতের সারমর্ম হচ্ছে—আমরা সে পথ চাই না, যা নফসানী উদ্দেশ্যের অনুগত হয় এবং মন্দ কাজে উদ্বুদ্ধ করে ও ধর্মের মধ্যে সীমালঙ্ঘনের প্রতি প্ররোচিত করে। সে পথও চাই না, যে পথ অজ্ঞতা ও মূর্খতার দরুন ধর্মের সীমারেখা অতিক্রম করে। বরং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সোজা-সরল পথ চাই। যার মধ্যে না অতিরঞ্জন আছে, আর না কম-কছুরী আছে এবং যা নফসানী প্রভাব ও সংশয়ের উর্ধ্বে।

সূরা আল-ফাতিহার আয়াত সাতটির তফসীর শেষ হয়েছে। এখন সমগ্র সূরার সারমর্ম হচ্ছে এ দোয়া—‘হে আল্লাহ ! আমাদের সরল পথ দান করুন। কেননা, সরল পথের সন্ধান লাভ করাই সবচাইতে বড় জ্ঞান ও সর্বাপেক্ষা বড় কামিয়াবী। বহুত সরল পথের সন্ধানে ব্যর্থ হয়েই দুনিয়ার বিভিন্ন জাতি ধ্বংস হয়েছে। অন্যথায় অ-মুসলমানদের মধ্যেও সৃষ্টিকর্তার পরিচয় লাভ করা এবং তাঁর সন্তুষ্টির পথ অনুসরণ করার আগ্রহ-আকৃতির অভাব নেই। এজন্যই কোরআন পাকে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় পদ্ধতিতেই সিরাতে-মুস্তাকীমের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।

আল্লাহর কিতাবের শিক্ষা এবং তাঁর প্রিয় বান্দাদের অনুসরণের মধ্যেই সরল পথ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা রয়েছে : এখানে একটা বিষয় বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। আর এ ব্যাপারে একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে জ্ঞানের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়ে যায়। তা হচ্ছে, সিরাতে-মুস্তাকীম নির্ধারণ করার জন্য বহুত সিরাতে রাসূল, সিরাতে-কোরআন বলে দেওয়াই তো যথেষ্ট ছিল। উপরোক্ত দু'টি পথ চিহ্নিত করা যেমন সংক্ষিপ্ত ছিল, তেমনি ছিল সুস্পষ্ট। কেননা সমগ্র কোরআনই তো সিরাতে মুস্তাকীমের বিস্তারিত বর্ণনা। অপরদিকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সমগ্র শিক্ষা হচ্ছে কোরআনেরই বিস্তারিত বর্ণনা। অথচ আলোচ্য এ

ছোট সূরাটির দু'টি আয়াতে সহজ এবং স্বচ্ছ দু'টি পন্থা বাদ দিয়ে প্রথম ইতিবাচক এবং পরে নেতিবাচক পদ্ধতিতে সিরাতে-মুস্তাকীম চিহ্নিত করতে গিয়ে বলেছেন—যদি সিরাতে মুস্তাকীম চাও, তবে এ সমস্ত লোককে তালাশ করে তাদের পথ অবলম্বন কর। কেননা, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এ দুনিয়াতে চিরকাল অবস্থান করবেন না। তাঁর পরে আর কোন নবী বা রসূলেরও আগমন হবে না। তাই তাঁদের মধ্যে নবীগণ ছাড়াও সিদ্দীক, শহীদান ও সালেহীনকেও অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। কারণ, কিয়ামত পর্যন্ত এঁদের অস্তিত্ব দুনিয়াতে থাকবে।

ফলকথা এই যে, সরল পথ অনুসন্ধানের জন্য আল্লাহ তা'আলা কিছু সংখ্যক মানুষের সন্ধান দিয়েছেন ; কোন পুস্তকের হাওয়ালা দেননি। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) যখন সাহাবীগণকে জানিয়েছেন যে, আমার উম্মতও পূর্ববর্তী উম্মতগণের ন্যায় সত্ত্বরটি দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। তন্মধ্যে মাত্র একটি দলই সরল পথে থাকবে। তখন সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, সেটি কোন দল? প্রত্যুত্তরে তিনি যা বলেছিলেন, তাতেও তিনি কিছু লোকের সন্ধান দিয়েছেন। এরশাদ করেছেন : **ما انا عليه واصحابي** অর্থাৎ আমি এবং আমার সাহাবীগণ যে পথে রয়েছে সে পথই সত্য ও ন্যায়ের পথ। বিশেষ ধরনের এ বর্ণনা পদ্ধতিতে হয়তো সে দিকে ইশারা করা হয়েছে যে, মানুষের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা-দীক্ষা কেবল কিতাব ও বর্ণনা দ্বারা সম্ভব হয় না, বরং দক্ষ ব্যক্তিগণের সাহচর্য ও সংশ্রবের মাধ্যমেই তা সম্ভব হতে পারে। বাস্তবপক্ষে মানুষের শিক্ষক এবং অভিভাবক মানুষই হতে পারে। কেবল কিতাব বা পুস্তক শিক্ষক ও অভিভাবক হতে পারে না।

এ এমনই এক বাস্তব সত্য যে, দুনিয়ার যাবতীয় কাজকর্মেও এর নিদর্শন বিদ্যমান। শুধু পুঁথিগত বিদ্যার দ্বারা কেউ না পারে কাপড় সেলাই করতে, না পারে আহার করতে। শুধু ডাক্তারী বইপত্র পাঠ করে কেউ ডাক্তার হতে পারে না। ইঞ্জিনিয়ারিং বইপত্র পাঠ করে কেউ ইঞ্জিনিয়ারও হতে পারে না। অনুরূপভাবে শুধু কোরআন-হাদীস পাঠ করাই কোন মানুষের পরিপূর্ণ তা'লীম ও তরবিয়তের জন্য যথার্থ হতে পারে না। যে পর্যন্ত কোন বিজ্ঞ লোকের নিকট বাস্তবভাবে শিক্ষা গ্রহণ না করে, সে পর্যন্ত দীনের তা'লীম অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কোরআন ও হাদীসের ব্যাপারে অনেকেই এ ভুল ধারণা পোষণ করে যে, কোরআনের অর্থ ও তফসীর পাঠ করে কোরআন ও হাদীস সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায়। এটা সম্পূর্ণ প্রকৃতি বিরুদ্ধ ধারণা। কেননা, যদি কিতাব এ ব্যাপারে যথেষ্ট হতো তবে নবী ও রাসূল প্রেরণের প্রয়োজন হতো না। কিতাবের সাথে রাসূলকে শিক্ষকরূপে পাঠানো হয়েছে।

আর সরল পথ নির্ধারণের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক স্বীয় মকবুল বান্দাদের তালিকা প্রদানও এর প্রমাণ যে, শুধু কিতাবের পাঠই পূর্ণ তা'লীম ও তরবিয়তের জন্য যথেষ্ট নয় ; বরং কোন কোন বিজ্ঞ লোকের নিকট এর শিক্ষালাভ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

বোঝা গেল, মানুষের প্রকৃত মুক্তি এবং কল্যাণপ্রাপ্তির জন্য দু'টি উপাদানের প্রয়োজন। প্রথম, আল্লাহর কিতাব যাতে মানবজীবনের সকল দিকের পথনির্দেশ রয়েছে এবং অপরটি হচ্ছে আল্লাহর প্রিয় বান্দা বা আল্লাহ-ওয়ালাগণ। তাঁদের কাছ থেকে ফায়দা হাসিল করার মাপকাঠি হচ্ছে এই যে, আল্লাহর কিতাবের নিরিখে তাঁদেরকে পরীক্ষা করতে হবে। এ পরীক্ষায় যারা টিকবে না তারা আল্লাহর প্রিয়পাত্র নয় বলেই যারা সঠিক অর্থে আল্লাহর প্রিয়পাত্র স্থির হয়, তাঁদের নিকট আল্লাহর কিতাবের শিক্ষা লাভ করে তৎপ্রতি আমল করতে হবে।

মতানৈক্যের কারণ : একশ্রেণীর লোক শুধু আল্লাহর কিতাবকে গ্রহণ করেছে এবং আল্লাহর পিয়াদ্রাগণ থেকে দূরে সরে গিয়েছে ; তাঁদের তফসীর ও শিক্ষাকে কোন গুরুত্বই দেয়নি। আবার কিছু লোক আল্লাহর প্রিয়পাত্রগণকেই সত্যের মাপকাঠি স্থির করে আল্লাহর কিতাব থেকে দূরে সরে পড়েছে। বলা বাহুল্য, এই দুই পথের পরিণতিই গোমরাহী।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরাতুল ফাতিহাতে প্রথমে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও তা'রীফ রয়েছে। অতঃপর তাঁর ইবাদতের উল্লেখ রয়েছে। এতদসঙ্গে এ কথারও উল্লেখ করা হয়েছে যে, আমরা তাঁকে ব্যতীত অন্য কাউকেও অভাব পূরণকারী মনে করি না। প্রকারান্তরে এটি আল্লাহর সাথে মানুষের একটা শপথ বিশেষ। অতঃপর রয়েছে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রার্থনা, যাতে মানুষের সর্বপ্রকার প্রয়োজন এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, এতে কতিপয় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় এবং গুরুত্বপূর্ণ মাসআলাও সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রাসঙ্গিক কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হচ্ছে :

দোয়া করার পদ্ধতি : এ সূরায় একটা বিশেষ ধরনের বর্ণনারীতির মাধ্যমে মানুষকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, যখন আল্লাহর নিকট কোন দোয়া বা কোন আকুতি পেশ করতে হয়, তখন প্রথমে তাঁর তা'রীফ কর, তাঁর দোয়া সীমাহীন নিয়ামতের স্বীকৃতি দাও। অতঃপর একমাত্র তিনি ছাড়া অন্য কাউকেও দাতা ও অভাব পূরণকারী মনে করো না কিংবা অন্য কাউকেই ইবাদতের যোগ্য বলে স্বীকার করো না। অতঃপর স্বীয় উদ্দেশ্যের জন্য আরজী পেশ কর। এ নিয়মে যে দোয়া করা হয়, তা কবুল হওয়ার ব্যাপারে বিশেষ আশা করা যায়। দোয়া করতেও এমন ব্যাপক পদ্ধতি অবলম্বন কর, যাতে মানুষের সকল মকসুদ তার অন্তর্ভুক্ত থাকে। যথা, সরল পথ লাভ করা এবং দুনিয়ার যাবতীয় কাজে সরল-সঠিক পথ পাওয়া, যাতে কোথাও কোন ক্ষতি বা পদমূল্যনের আশংকা না থাকে। মোটকথা, এ স্থলে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাঁর তা'রীফ প্রশংসা করার প্রকৃত উদ্দেশ্যই হলো মানবকুলকে শিক্ষা দেওয়া।

আল্লাহর তা'রীফ বা প্রশংসা করা মানুষের মৌলিক দায়িত্ব : এ সূরার প্রথম বাক্যে আল্লাহর তা'রীফ বা প্রশংসা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। তা'রীফ বা প্রশংসা সাধারণত কোন গুণের বা প্রতিদানের পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখ হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে কোন গুণের বা প্রতিদানের উল্লেখ নেই।

এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহর নিয়ামত অগণিত। কোন মানুষ এর পরিমাপ করতে পারে না। কোরআনে এরশাদ হয়েছে : **وَأَنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا**—যদি তোমরা আল্লাহর নিয়ামতের গণনা করতে চাও, তবে তা পারবে না। মানুষ যদি সারা বিশ্ব হতে মুখ ফিরিয়ে শুধু নিজের অস্তিত্বের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, তবে বুঝতে পারবে যে, তার শরীরই এমন একটি ক্ষুদ্র জগত, যাতে বৃহৎ জগতের সকল নিদর্শন বিদ্যমান। তার শরীর যমীন তুল্য। কেশরাজি উদ্ভিদ তুল্য। তার হাড়গুলো পাহাড়ের মত এবং শিরা-উপশিরা যাতে রক্ত চলাচল করে, সেগুলো নদী-নালা বা সমুদ্রের নমুনা। দু'টি বস্তুর সংমিশ্রণে মানুষের অস্তিত্ব। একটি শরীর ও অপরটি আত্মা। এ কথাও স্বীকৃত যে, মানবদেহে আত্মা সর্বাপেক্ষা উত্তম অংশ আর তার শরীর হচ্ছে আত্মার অনুগত এবং অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট মানের অধিকারী। এ নিকৃষ্ট অংশের পরীক্ষা-নিরীক্ষাকারী চিকিৎসকগণ বলেছেন যে, মানবদেহে আল্লাহ তা'আলা

পাঁচ হাজার প্রকার উপাদান রেখেছেন। এতে তিন শতেরও অধিক জোড়া রয়েছে। প্রত্যেকটি জোড়া আল্লাহর কুদরতে এমন সুন্দর ও মজবুতভাবে দেওয়া হয়েছে যে, সর্বদা নড়াচড়া করা সম্ভব ও তার মধ্যে কোন পরিবর্তন হয় না এবং কোন প্রকার মেরামতেরও প্রয়োজন হয় না। সাধারণ মানুষের বয়স ষাট-সত্তর বছর হয়ে থাকে। এ দীর্ঘ সময় তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো সর্বদা নড়াচড়া করছে, অথচ এর মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন—**نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ**

অর্থ—“আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং আমিই তাদের জোড়াগুলোকে মজবুত করেছি।” এ কুদরতী মজবুতির পরিণাম হয়েছে এই যে, সাধারণভাবে উহা অত্যন্ত নরম ও নড়বড়ে অথচ এ নড়বড়ে জোড়া সত্তর বছর বা এর চাইতেও অধিক সময় পর্যন্ত কর্মরত থাকে। মানুষের অঙ্গগুলোর মধ্যে শুধু চক্ষুর কথাই ধরুন, এতে আল্লাহ তা'আলার অসাধারণ হেকমত প্রকাশিত হয়েছে, সারাজীবন সাধনা করেও এ রহস্যটুকু উদ্ধার করা সম্ভব নয়।

এই চোখের এক পলকের কার্যক্রম লক্ষ্য করলে বুঝতে পারা যাবে যে, এর এক মিনিটের কার্যক্রমে আল্লাহ তা'আলার কত নিয়ামত যে কাজ করছে, তা ভেবে অবাক হতে হয়। কেননা চক্ষু খুলে এর দ্বারা কত বস্তুকে সে দেখছে। এতে যেভাবে চক্ষুর ভেতরের শক্তি কাজ করছে, অনুরূপভাবে বহির্জগতের সৃষ্টিরাজিও এতে বিশেষ অংশ নিচ্ছে। সূর্যের কিরণ না থাকলে চোখের দৃষ্টিশক্তি কোন কাজ করতে পারে না। সূর্যের জন্য আকাশের প্রয়োজন হয়। মানুষের দেখার জন্য এবং চক্ষু দ্বারা কাজ করার জন্য আহাৰ্য ও বায়ুর প্রয়োজন হয়। এতে বোঝা যায়, চোখের এক পলকের দৃষ্টির জন্য বিশ্বের সকল শক্তি ব্যবহৃত হয়। এ তো একবারের দৃষ্টি। এখন দিনে কতবার দেখে এবং জীবনে কতবার দেখে তা হিসাব করা মানুষের শক্তির উর্ধ্বে। এমনভাবে কান, জিহবা, হাত ও পায়ের যত কাজ আছে তাতে সমগ্র জগতের শক্তি যুক্ত হয়ে কার্য সমাধা হয়। এ তো সে মহা দান যা প্রতিটি জীবিত মানুষ ভোগ করে। এতে রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্রের কোন পার্থক্য নেই। তাছাড়া আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য নিয়ামত এমন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে রাখা হয়েছে যা প্রতিটি প্রাণী ভোগ করেও উপকৃত হয়। আকাশ-যমীন এবং এ দুটির মধ্যে সৃষ্ট সকল বস্তু যথা চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, বায়ু প্রভৃতি প্রতিটি প্রাণীই উপভোগ করে।

এরপর আল্লাহর বিশেষ দান, যা মানুষের হেকমতের তাগিদে কম-বেশি দেওয়া হয়েছে, ধন-সম্পদ, মান-সম্মান, আরাম-আয়েশ সবই এর অন্তর্ভুক্ত। যদিও একথা অত্যন্ত মৌলিক যে, সাধারণ নিয়ামত যা সকল স্তরের মানুষের মধ্যে সমভাবে উপভোগ্য; যথা-আকাশ, বাতাস, জমি এবং বিরাট এ প্রকৃতি, এ সমস্ত নিয়ামত বিশেষ নিয়ামতের (যথা ধন-সম্পদ) তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও উত্তম। অথচ এসব নিয়ামত সকল মানুষের মধ্যে সমভাবে পরিব্যাপ্ত বলে, এত বড় নিয়ামতের প্রতি মানুষ দৃষ্টিপাত করে না। ভাবে, কি নিয়ামত! বরং আশপাশের সামান্য বস্তু যথা—আহার্য, পানীয়, বসবাসের নির্ধারিত স্থান, বাড়ি-ঘর প্রভৃতির প্রতিই তাদের দৃষ্টি সাধারণত সীমাবদ্ধ থাকে।

মোটকথা, সৃষ্টিকর্তা মানবজাতির জীবন-ধারণ এবং দুনিয়ার জীবনে বেঁচে থাকার সুবিধার্থে যে অফুরন্ত নিয়ামত দান করেছেন, তার অতি অল্পই এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের পক্ষে দুনিয়ার জীবনে চোখ মেলেই মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেই মহান দাতার

প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকা ছিল স্বাভাবিক। বলা বাহুল্য যে, মানব-জীবনের সে চাহিদার প্রেক্ষিতে কোরআনের সর্বপ্রথম সূরার সর্বপ্রথম বাক্য **الحمد** ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেই মহান সত্তার তারীফ বা প্রশংসাকে ইবাদতের শীর্ষস্থানে রাখা হয়েছে।

রাসূল (সা) এরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর কোন নিয়ামত কোন বান্দাকে দান করার পর যখন সে **الحمد لله** বলে তখন বুঝতে হবে, যা সে পেয়েছে, এই শব্দ তার চেয়ে অনেক উত্তম। (কুরতুবী)

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি যদি বিশ্ব-চরাচরের সকল নিয়ামত লাভ করে এবং সেজন্য সে আলহামদুলিল্লাহ বলে তবে বুঝতে হবে যে, সারা বিশ্বের নিয়ামতসমূহ অপেক্ষা তার **الحمد** বলা অতি উত্তম। (কুরতুবী)

কোন কোন আলিমের মন্তব্য উদ্ধৃত করে কুরতুবী লিখেছেন যে, মুখে **الحمد لله** বলা একটি নিয়ামত এবং এ নিয়ামত সারা বিশ্বের সকল নিয়ামত অপেক্ষা উত্তম। সহীহ হাদীসে আছে যে, **الحمد لله** পরকালের তৌলদত্তের অর্ধেক পরিপূর্ণ করবে।

হযরত শকীক ইবনে ইবরাহীম **الحمد**-এর ফযীলত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, যখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কোন নিয়ামত দান করেন, তখন প্রথমে দাতাকে চেন এবং পরে তিনি যা দান করেছেন তাতে সন্তুষ্ট থাক। আর তাঁর দেয়া শক্তি ও ক্ষমতা তোমাদের শরীয়ে যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর অবাধ্যতার কাছও যেও না।

দ্বিতীয় শব্দ **الله** এর সাথে **م** বর্ণটি যুক্ত। যাকে আরবী ভাষার নিয়ম অনুযায়ী খাস **لام** বলা হয়। যা কোন আদেশ বা গুণের বিশেষত্ব বোঝায়। এখানে অর্থ হচ্ছে যে, শুধু তারীফ বা প্রশংসাই মানবের কর্তব্য নয়। বরং এ তারীফ বা প্রশংসা তাঁর অস্তিত্বের সাথে সংযুক্ত। বাস্তবিক পক্ষে তিনি ব্যতীত এ জগতে অন্য কেউ তারীফ বা প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য নয়। এর বিস্তারিত বর্ণনা পূর্বে করা হয়েছে। এতদসঙ্গে এও তাঁর নিয়ামত যে, মানুষকে চরিত্র গঠন শিক্ষাদানের জন্য এ আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, আমার নিয়ামতসমূহ যে সকল মাধ্যম অতিক্রম করে আসে, সেগুলোরও শুকরিয়া আদায় করতে হবে। আর যে ব্যক্তি এহসানকারীর শৌকর আদায় করে না, সে বাস্তবপক্ষে আল্লাহ তা'আলারও শৌকর করে না।

কোন মানুষের জন্যই নিজের প্রশংসা জ্ঞায়েব নয় : কোন মানুষের জন্য নিজের তারীফ বা প্রশংসা করা জ্ঞায়েব নয়। কোরআনে এরশাদ হয়েছে :

فَلَا تَزْكُوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى অর্থাৎ তোমরা আত্ম-প্রশংসা বা পবিত্রতার দাবি করো না, আল্লাহই ভাল জানেন, কে মুত্তাকী। কেননা, মানুষের পক্ষে তারীফ বা প্রশংসার যোগ্য হওয়া তার তাকওয়া-পরহেযগারীর উপর নির্ভরশীল। কার পরহেযগারী কোন্ স্তরের তা আল্লাহই ভাল জানেন। প্রশ্ন ওঠে যে, আল্লাহ তা'আলা তো তাঁর প্রশংসা নিজেই করেছেন। উত্তর হচ্ছে এই, আল্লাহর প্রশংসা বা তারীফ কিভাবে করতে হবে সে পদ্ধতি উদ্ভাবন করার যোগ্যতা মানুষের নেই। পরন্তু আল্লাহ তা'আলার উপযোগী তারীফ বা প্রশংসা করাও মানুষের ক্ষমতার উর্ধ্বে। রাসূল (সা) এরশাদ করেছেন : **لا احصى ثناء عليك** আমি আপনার উপযোগী তারীফ বা প্রশংসা করতে পারি না। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা তাঁর তারীফ বা প্রশংসা পদ্ধতি মানুষকে নিজের তরফ থেকে শিক্ষা দিয়েছেন।

‘রব’ আল্লাহর এক বিশেষ নাম, অন্য কাউকে এ নামে সম্বোধন জায়েয নয় : কোন বস্তুর মালিক, পালনকর্তা এবং সর্ববিষয়ে সে বস্তুর পূর্ণতা বিধানের একচ্ছত্র অধিকারী কোন সত্তার প্রতিই কেবল ‘রব’ শব্দ প্রয়োগ করা যেতে পারে। আর এ কথা সর্বজনবিদিত যে, সমগ্র সৃষ্টিজগতের এরূপ মালিক ও পালনকর্তা একমাত্র আল্লাহ্ রাক্বুল আলামীন ছাড়া অন্য কেউ হতে পারে না। এ কারণেই এ শব্দ একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার নামের সাথেই ব্যবহৃত হতে পারে এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে ‘রব’ বলা জায়েয নয়। সহীহ মুসলিম শরীফের হাদীসে এ ব্যাপারে নিষেধবাণী উচ্চারণ করে বলা হয়েছে যে, কোন গোলাম বা কর্মচারী যেন তার মালিককে ‘রব’ শব্দ দ্বারা সম্বোধন না করে। অবশ্য বিশেষ কোন বস্তুর মালিকানা বোঝানোর অর্থে এ শব্দের প্রয়োগ চলতে পারে। যথা, রাক্বুল-বাইত, -বাড়ির মালিক ইত্যাদি। (কুরতুবী)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ—এর অর্থ মুফাসসিরকুল-শিরোমণি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, আমরা তোমারই ইবাদত করি, তুমি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করি না। আর তোমারই সাহায্য চাই, তুমি ব্যতীত অন্য কারো সাহায্য চাই না। (ইবনে জরীর, ইবনে আবি হাতেম)

সলফে-সালেহীনদের কেউ কেউ বলেছেন যে, সূরা আল-ফাতিহা সমগ্র কোরআনের সারমর্ম এবং إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ সমগ্র সূরা আল-ফাতিহা সারমর্ম। কেননা, এর প্রথম বাক্য রয়েছে শিরক থেকে মুক্তির ঘোষণা এবং দ্বিতীয় বাক্যে তার পরিপূর্ণ শক্তি ও কুদরতের স্বীকৃতি। মানুষ দুর্বল, আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কোন কিছুই সে করতে পারে না। তাই সকল ব্যাপারে আল্লাহর উপর একান্তভাবে নির্ভর করা ব্যতীত তার গত্যন্তর নেই। এ উপদেশ কোরআনের স্থানে স্থানে দেওয়া হয়েছে। যথা :

— فاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ (هود)

— قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أُمَّنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا (ملك)

— رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا (مزمল)

এ আয়াতগুলোর সারমর্ম হচ্ছে যে, মু‘মিন স্বীয় আমল বা নিজের যোগ্যতার উপর নির্ভর করে না, আবার অন্য কারো সাহায্যের উপরও নয়। বরং একমাত্র আল্লাহর সাহায্যের উপরই তাকে পূর্ণ ভরসা করতে হবে। এতে আকায়েদের দু’টি মাসআলাও মীমাংসা হয়ে গেছে। যথা :

এক. আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত জায়েয নয়, তাঁর ইবাদতে অন্য কাউকে অংশীদার করা ক্রমার অযোগ্য অপরাধ : ইতিপূর্বে ইবাদতের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, কোন সত্তার অসীমতা, মহত্ত্ব এবং তাঁর প্রতি ভালবাসার ভিত্তিতে, তাঁর সামনে অশেষ কাকুতি-মিনতি পেশ করার নাম ইবাদত। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো সাথে অনুরূপ আচরণ করাই শিরক। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, মূর্তিপূজার মত প্রতীকপূজা বা পাথরের মূর্তিকে খোদায়ী শক্তির আধার মনে করা বা কারো প্রতি সন্তম বা ভালবাসা এ পর্যায়ে পৌছে দেওয়া, যা আল্লাহর জন্য করা হয়, তাও শিরকের অন্তর্ভুক্ত। কোরআনে ইহুদী ও নাসারাদের অনুসৃত শিরকের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ .

অর্থাৎ, তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের সাধু-সন্ন্যাসীদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে। আদী ইবনে হাতেম খৃষ্টধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হবার পর এ আয়াত সম্বন্ধে রাসূল (সা)-কে প্রশ্ন করেছিলেন যে, আমরা তো আমাদের পুরোহিতদের ইবাদত করিনি, কোরআন আমাদের প্রতি কিভাবে এ অপবাদ দিয়েছে? প্রত্যুত্তরে রাসূল (সা) এরশাদ করেছিলেন : “পুরোহিত আলিমগণ এমন অনেক বস্তুকে কি হারাম বলেনি, যেগুলোকে আল্লাহ হালাল করেছেন এবং এমন অনেক বস্তুকে হালাল বলেনি, যেগুলোকে আল্লাহ হারাম বলেছেন? আদী ইবনে হাতেম স্বীকার করেছিলেন যে, তা অবশ্য করেছেন। তখন রাসূল (সা) বলেছিলেন যে, এ তো প্রকারান্তরে তাদের ইবাদতই হলো।”

এতে বোঝা যাচ্ছে যে, কোন বস্তুকে হালাল বা হারাম ঘোষণা করা একমাত্র আল্লাহরই কাজ। যে ব্যক্তি এ কাজে অন্যকে অংশীদার করে, হালাল ও হারাম জানা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কথাকে অবশ্যকরণীয় মনে করে, তবে প্রকারান্তরে সে তার ইবাদতই করে এবং শিরকে পতিত হয়। সাধারণ মুসলমান যারা কোরআন-হাদীস সরাসরি বুঝতে পারে না, শরীয়তের হুকুম-আহকাম নির্ধারণের যোগ্যতা রাখে না; এজন্য কোন ইমাম, মুজতাহিদ, আলিম বা মুফতীর কথার উপর বিশ্বাস রেখে কাজ করে; তাদের সাথে এ আয়াতের মর্মের কোন সম্পর্ক নেই। কেননা, প্রকৃতপক্ষে তারা কোরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক আমল করে; আল্লাহর নিয়ম-বিধানেরই অনুকরণ করে, আলিমগণের নিকট থেকে তারা আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহর ব্যাখ্যা গ্রহণ করে মাত্র। কোরআনই তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছে :

فَاسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ .

অর্থাৎ—“যদি আল্লাহর আদেশ তোমাদের জানা না থাকে, তবে আলিমদের নিকট জেনে নাও।”

হালাল-হারাম নির্ধারণের ব্যাপারে আল্লাহ ব্যতীত অন্য যে কাউকেই অংশীদার করা শিরক। অনুরূপভাবে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে মানত করাও শিরক। প্রয়োজন যেটানো বা বিপদ মুক্তির জন্য আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে দোয়া করাও শিরক। কেননা, হাদীসে দোয়াকে ইবাদতরূপে গণ্য করা হয়েছে। কাজেই যে সকল কার্যকলাপে শিরকের নিদর্শন রয়েছে, সে সব কাজ করাও শিরকের অন্তর্ভুক্ত। হযরত আদী ইবনে হাতেম বলেন—ইসলাম কবুল করার পর আমি আমার গলায় ক্রুশ পরিহিত অবস্থায় রাসূল (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়েছিলাম। এটা দেখে হুম্বর (সা) আদেশ করলেন, এ মূর্তিটা গলা হতে ফেলে দাও। আদী ইবনে হাতেম যদিও ক্রুশ সম্পর্কে তখন নাসারাদের ধারণা পোষণ করতেন না, এতদসত্ত্বেও প্রকাশ্যভাবে শিরকের নিদর্শন থেকে বেঁচে থাকা অভাব্যাবশ্যকীয় বলে রাসূল (সা) তাঁকে এ নির্দেশ দিয়েছিলেন।

আফসোসের বিষয় ! আজকাল হাজার হাজার মুসলমান খৃষ্টানদের ধর্মীয় নিদর্শন ক্রুশ-এর বিকল্প নেকটাই সংগীরবে গলায় লাগিয়ে প্রকাশ্য শিরকীতে লিপ্ত হচ্ছে। এমনভাবে কারো প্রতি রুকু বা সিজদা করা, বায়তুল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর ভণ্ডাফ করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

এসব থেকে বেঁচে থাকার স্বীকারোক্তি এবং আনুগত্যের অঙ্গীকারই **إِيَّاكَ نَعْبُدُ** -তে করা হয়েছে।

দ্বিতীয় মাসআলা : কারো সাহায্য চাওয়ার বিষয়টি কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা সাপেক্ষ। কেননা, বৈষয়িক সাহায্য তো একজন অপরজনের কাছ থেকে সব সময়ই নিয়ে থাকে। এ ছাড়া দুনিয়ার কাজ-কারবার চলতেই পারে না যথা—প্রস্তুতকারক, দিন-মজুর, নির্মাতা, কর্মকার, কৃষকার প্রভৃতি সকল শ্রেণীর কারিগরই অন্যের সাহায্যে নিয়োজিত, অন্যের খেদমতে সর্বদা ব্যস্ত এবং প্রত্যেকেই তাদের সাহায্যপ্রার্থী ও সাহায্য গ্রহণে বাধ্য। এরূপ সাহায্য নেওয়া কোন ধর্মমতেই বা কোন শরীয়তেই নিষেধ নয়। কারণ, এ সাহায্যের সাথে আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থিত সাহায্য কোন অবস্থাতেই সম্পৃক্ত নয়, অনুরূপভাবে কোন নবী বা ওলীর বরাতে দিয়েও আল্লাহ তা'আলার সাহায্য প্রার্থনা করা কোরআনের নির্দেশ ও হাদীসের বর্ণনায় বৈধ প্রমাণিত হয়েছে। এরূপ সাহায্য প্রার্থনাও আল্লাহর সম্পর্কযুক্ত সাহায্য প্রার্থনার অন্তর্ভুক্ত নয়, যা কোরআন ও হাদীসে শিরকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আল্লাহর নিকট বিশেষভাবে প্রার্থিত সাহায্য দু'প্রকার। এক—আল্লাহ ব্যতীত কোন ফেরেশতা, কোন নবী, কোন ওলী বা কোন মানুষকে একক ক্ষমতালী বা একক ইচ্ছাশক্তির অধিকারী মনে করে তাদের নিকট কিছু চাওয়া—ইহা প্রকাশ্য কুফরী। একে কাফের-মুশরিকরাও কুফরী বলে মনে করে। তারা নিজেদের দেবীদেরকেও আল্লাহর ন্যায় সর্বশক্তিমান একক ইচ্ছাশক্তির অধিকারী মনে করে না।

দুই. সাহায্য প্রার্থনার যে পছা কাফেরগণ করে থাকে, কোরআন তাকে বাতিল ও শিরক বলে ঘোষণা করেছে। তা হচ্ছে কোন ফেরেশতা, নবী, ওলী বা দেবদেবী সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণ করা যে, প্রকৃত শক্তি ও ইচ্ছার মালিক তো আল্লাহ তা'আলাই, তবে তিনি তাঁর কুদরতে সে ক্ষমতা ও ইচ্ছাশক্তির কিছু অংশ অমুককে দিয়েছেন এবং এ ব্যাপারে তাকে ক্ষমতা দান করেছেন এবং সে ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সম্পূর্ণ স্বাধীন। কোরআনের **إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ** দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, এরূপ সাহায্য আমরা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো নিকট চাইতে পারি না।

সাহায্য-সহায়তা সম্পর্কিত এ ধারণা মু'মিন ও কাফের এবং ইসলাম ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে। কোরআন একে হারাম ও শিরক ঘোষণা করেছে এবং কাফেরগণ একে সমর্থন করে এ অনুযায়ী আমল করেছে। এ ব্যাপারে যেখানে সংশয়ের উদ্ভব হয় তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তাঁর কোন কোন ফেরেশতার উপর পার্থিব ব্যবস্থা পরিচালনার অনেক দায়িত্ব অর্পণ করেছেন বলে বর্ণনা রয়েছে। এরূপ ধারণা সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নয় যে, ফেরেশতাগণকে স্ব-স্ব দায়িত্ব পালনে আল্লাহ নিজেই তা ক্ষমতা দিয়েছেন, তদনুরূপ নবীগণকেও এমন কিছু কাজ করার ক্ষমতা দিয়েছেন যা অন্য মানুষের ক্ষমতার উপরে; যথা : মু'জিয়া। অনুরূপ আওলিয়াগণকেও এমন কিছু কাজের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, যা সাধারণ মানুষ করতে পারে না। যেমন কারামত। সুতরাং স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে এরূপ ধারণায় পতিত হওয়া বিচিত্র নয় যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ক্ষমতার কিয়দংশ যদি তাঁদের মধ্যে না-ই দিতেন, তবে তাঁদের দ্বারা এমন সব কাজ কি করে হয়ে থাকে? এতে নবী ও ওলীগণের প্রতি কর্মে স্বাধীন হওয়ার বিশ্বাস জন্মে। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। বরং মু'জিয়া এবং কারামত একমাত্র আল্লাহরই কাজ। এর প্রকাশ

নবী ও ওলীগণের মাধ্যমে করে থাকেন শুধু তাঁর হেকমত ও রহস্য বোঝাবার জন্য। নবী ও ওলীগণের পক্ষে সরাসরি এসব কাজ করার ক্ষমতা নেই। এ সম্পর্কে অসংখ্য আয়াত রয়েছে। যথা, এরশাদ হয়েছে :

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ .

বদরের যুদ্ধে রাসূল (সা) শত্রু সৈন্যদের প্রতি একমুষ্টি কঙ্কর নিক্ষেপ করেছিলেন এবং সে কঙ্কর সকল শত্রু সৈন্যের চোখে গিয়ে পড়েছিল। সে মু'জিয়া সম্পর্কে এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, “হে মুহাম্মদ (সা) ! এ কঙ্কর আপনি নিক্ষেপ করেন নি, বরং আল্লাহ তা'আলাই নিক্ষেপ করেছেন।” এতে বোঝা যায় যে, নবীগণের মাধ্যমে মু'জিয়ারূপে যেসব অস্বাভাবিক কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে সেগুলো ছিল আল্লাহরই কাজ। অনুরূপ, হযরত নূহ (আ)-কে তাঁর জাতি বলেছিল যে, আপনি যদি সত্য নবী হয়ে থাকেন, তবে যে শাস্তি সম্পর্কে আমাদের ভীতি প্রদর্শন করছেন, তা এনে দেখান। তখন তিনি বলেছিলেন : اِنَّمَا يَأْتِيَكُمْ بِهِ اللَّهُ . মু'জিয়ারূপে আসমানী বালা নিয়ে আসা আমার ক্ষমতার উর্ধ্বে। যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন তবে আসবে, তখন তোমরা তা থেকে পালাতে পারবে না।

সূরা ইবরাহীমে নবী ও রাসূলগণের এক দলের কথা উল্লেখিত হয়েছে। তাঁরা বলেছেন :

مَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ .

অর্থাৎ—“কোন মু'জিয়া দেখানো আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই হতে পারে না।” তাই কোন নবী বা ওলী কোন মু'জিয়া বা কারামত যখন ইচ্ছা বা যা ইচ্ছা দেখাবেন, এমন ক্ষমতা তাদের কাউকেই দেওয়া হয়নি।

রাসূল ও নবীগণকে মুশরিকরা কত রকমের মু'জিয়া দেখাতে বলেছে, কিন্তু যেগুলোতে আল্লাহর ইচ্ছা হয়েছে সেগুলোই প্রকাশ পেয়েছে। আর যেগুলোতে আল্লাহর ইচ্ছা হয়নি, সেগুলো প্রকাশ পায়নি। কোরআনের সর্বত্র এ সম্পর্কিত তথ্য বিদ্যমান।

একটি স্থূল উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি উপলব্ধি করা সহজ হবে। যেমন, ঘরে বসে আমরা যে বাস্তবের আলো ও বৈদ্যুতিক পাখার বাতাস পাই, সে বাস্তব ও পাখা এই আলো ও হাওয়া প্রদানের ব্যাপারে নিজস্বভাবে কখনও ক্ষমতার অধিকারী নয়। প্রকৃতপক্ষে তার সংযোগের মাধ্যমে বিদ্যুৎ-কেন্দ্রের সাথে এগুলোর যে সম্পর্ক স্থাপিত, আলো এবং বাতাস প্রদান একান্তভাবে সে সংযোগের উপর নির্ভরশীল। এক মুহূর্তের জন্যও যদি এ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয় তবে না বাস্তব আপনাকে আলো দিতে পারবে, না পাখা বাতাস দিতে সক্ষম হবে। কেননা এ আলো বাস্তবের নয় ; বরং বিদ্যুতের, যা বিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্র হতে বাস্তব ও পাখার মধ্যে পৌঁছে থাকে। নবী, রাসূল, আউলিয়া ও ফেরেশতাগণ প্রত্যেকেই প্রতিটি কাজের জন্য প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলার মুখাপেক্ষী। তাঁর ইচ্ছায়ই বাস্তব ও পাখার মধ্যে বিদ্যুৎ সংকালনের ন্যায় নবী ও আউলিয়াগণের মাধ্যমে মু'জিয়া ও কারামতরূপে আল্লাহর ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়।

এই উদাহরণে এ কথাও বোঝা গেল যে, মু'জিয়া ও কারামত প্রতিফলনে নবী-রাসূল ও ওলীগণের কোন একচ্ছত্র ক্ষমতা নেই। তবে তাঁরা যে একেবারেই ক্ষমতাহীন তাও নয়। যেমনিভাবে বাস্তব ও পাখা ব্যতীত আলো ও বাতাস পাওয়া অসম্ভব, তেমনিভাবে মু'জিয়া ও কারামত প্রকাশের ব্যাপারে নবী ও ওলীগণের মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। পার্থক্য শুধু এইটুকু যে,

সমস্ত ফিটিং সংযোজন ঠিক হওয়া সত্ত্বেও বাস্তব এবং পাখা ব্যতীত আলো-বাতাস পাওয়া অসম্ভব, কিন্তু মু'জিয়া ও কারামতের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা সব কিছুই করতে পারেন। তবে সাধারণত তিনি নবী-রাসূল ও ওলীগণের মাধ্যম ব্যতীত তা করেন না। কারণ তাতে এগুলোর প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না।

তাই এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, সব কিছুই একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাতেই হয়ে থাকে এবং এতদসঙ্গে নবী-রাসূল ও ওলী-আউলিয়াগণের গুরুত্বের বিশেষভাবে স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে। এ বিশ্বাস এবং স্বীকৃতি ব্যতীত আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তাঁর বিধানের অনুসরণ থেকে বঞ্চিত হতে হবে। যেভাবে কোন ব্যক্তি বাস্তব ও পাখার গুরুত্ব অনুধাবন না করে একে নষ্ট করে দিয়ে আলো-বাতাস পাওয়ার আশা করতে পারে না, তেমনি নবী-রাসূল ওলী-আউলিয়াগণের গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি ব্যতীত আল্লাহর সন্তুষ্টি আশা করা যায় না।

সাহায্য প্রার্থনা ও ওসীলা তালাশ করা এবং তা গ্রহণ করার প্রশ্নে নানা প্রকার প্রশ্ন ও সংশয়ের উৎপত্তি হতে দেখা যায়। আশা করা যায় যে, উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা সে সংশয় ও সন্দেহের নিরসন হবে।

নবী-রাসূল এবং ওলীগণকে ওসীলা বানানো সম্পূর্ণ জায়েয বা একেবারেই না-জায়েয বলা সম্ভব নয়। বরং উপরের আলোচনার ভিত্তিতে এতটুকু বলা যায় যে, যদি কেউ তাঁদেরকে বাস্তব ক্ষমতাবান, স্বীয় শক্তিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং হাজত পূরণের অধিকারী মনে করে, তবে তা হারাম এবং শিরক হবে। কিন্তু যদি তাঁদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টি আহরণের মাধ্যম জ্ঞান করে তাঁদের ওসীলা গ্রহণ করা হয়, তবে এটা সম্পূর্ণ বৈধ হবে। কিন্তু এ প্রশ্নে সাধারণত বাড়াবাড়ি করতে দেখা যায়।

সিরাতে মুস্তাকীমের হেদায়েতই দীন দুনিয়ার সাফল্যের চাবিকাঠি : আলোচ্য তফসীরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা যে দোয়াকে সর্বক্ষণ সকল লোকের সকল কাজের জন্য নির্ধারণ করেছেন তা হচ্ছে সিরাতুল মুস্তাকীমের হেদায়েতপ্রাপ্তির দোয়া। এমনভাবে আখিরাতের মুক্তি যেমন সে সরল পথে রয়েছে যা মানুষকে জ্ঞানান্তে নিয়ে যাবে, অনুরূপভাবে দুনিয়ার যাবতীয় কাজের উন্নতি-অগ্রগতিও সিরাতুল মুস্তাকীম বা সরল পথের মধ্যে নিহিত। যে সমস্ত পন্থা অবলম্বন করলে উদ্দেশ্য সফল হয়, তাতে পূর্ণ সফলতাও অনিবার্যভাবেই হয়ে থাকে।

وَاللّٰهُ اَسْأَلُ الصَّوَابَ وَالسَّدَادَ وَبِيَدِهِ الْمُبْدَءُ وَالْمَعَادُ .

যে সব কাজে মানুষ সফলতা লাভ করতে পারে না, তাতে গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, সে কাজের ব্যবস্থাপনা ও পদ্ধতিতে নিশ্চয়ই কোন ভুল হয়েছে।

সারকথা, সরল পথের হেদায়েত কেবল পরকাল বা দীনী জীবনের সাফল্যের জন্যই নির্দিষ্ট নয়, বরং দুনিয়ার সকল কাজের সফলতাও এরই উপর নির্ভরশীল। এজন্যই প্রত্যেক মু'মিনের এ দোয়া তসবীহস্বরূপ সর্বদা স্মরণ রাখা কর্তব্য। তবে মনোযোগ সহকারে স্মরণ রাখতে ও দোয়া করতে হবে; শুধু শব্দের উচ্চারণ যথেষ্ট নয়।

وَاللّٰهُ الْمَوْفِقُ وَالْمَعِينُ .

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৩

সূরা বাকারাহ- ২৭৪-২৮৬ আয়াত

আয়োজনে



মাউন ফাউন্ডেশন

www.maunfoundation.org

سُورَةُ الْبَقَرَةِ

সূরা আল-বাকারাহ্



নামকরণ ও আয়াত সংখ্যা : এ সূরার নাম 'সূরা আল-বাকারাহ্'। হাদীসেও এ নামেরই উল্লেখ রয়েছে। যে বর্ণনায় এ সূরাকে 'সূরা আল-বাকারাহ্' বলতে নিষেধ করা হয়েছে সে বর্ণনা ঠিক নয়। (ইবনে-কাসীর)

এ সূরার আয়াত সংখ্যা ২৮৬, শব্দ সংখ্যা ৬২২১, বর্ণসংখ্যা ৫০,৫০০।

অবতরণকাল : এ সূরাটি মদনী। অর্থাৎ নবী করীম (সা)-এর মদীনায়ে হিজরত করার পর অবতীর্ণ হয়। অবশ্য কয়েকটি আয়াত হজ্জের সময় মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু তফসীরকারগণ ঐ আয়াতগুলোকেও মদনীই বলেছেন।

সূরা আল-বাকারাহ্ কোরআনের সবচাইতে বড় সূরা। হিজরতের পর মদীনায়ে সর্বপ্রথম এ সূরারই অবতরণ শুরু হয় এবং পরে বিভিন্ন আয়াত বিভিন্ন সময়ে অবতীর্ণ হতে থাকে। সুদ সম্পর্কিত আয়াতটি নবী করীম (সা)-এর শেষ বয়সে মক্কা বিজয়ের পর অবতীর্ণ হয়। **وَأَنفُوا**। দশম হিজরীর দশই যিলহজ্জ বিদায় হজ্জের সময় এটি মিনায় অবতীর্ণ হয়। এর ৮০/৯০ দিন পর নবী করীম (সা) ইন্তিকাল করেন এবং ওহী আসা চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়।

সূরা বাকারাহ্‌র ফযীলত : এ সূরা বহু আহ্‌কাম সম্বলিত সব চাইতে বড় সূরা। নবী করীম (সা) এরশাদ করেছেন যে, সূরা বাকারাহ্‌ পাঠ কর। কেননা, এর পাঠে বরকত লাভ হয় এবং পাঠ না করা অনুতাপ ও দুর্ভাগ্যের কারণ। যে ব্যক্তি এ সূরা পাঠ করে তার উপর কোন আহ্‌লে-বাতিল কখনও প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

ইমাম কুরতুবী এ প্রসঙ্গে হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর এক বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, উপরিউক্ত হাদীসে আহ্‌লে-বাতিল অর্থ যাদুকর। অর্থাৎ যে ব্যক্তি এ সূরা পাঠ করবে তার উপর কোন যাদুকরের যাদু প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। (কুরতুবী, মুসলিম, আবু উমামা বাহেলী)

নবী করীম (সা) এরশাদ করেছেন, “যে ঘরে সূরা বাকারাহ্‌ পাঠ করা হয়, সে ঘর থেকে শয়তান পলায়ন করে।” (ইবনে কাসীর হাকেম থেকে বর্ণনা করেছেন)

নবী করীম (সা) এ সূরাকে **سَنَامُ الْقُرْآن** (সেনামুল-কোরআন) ও **زُرُوءُ الْقُرْآن** (যারওয়াতুল-কোরআন) বলে উল্লেখ করেছেন। সেনাম ও যারওয়াহ বস্তুর উৎকৃষ্টতম অংশকে

বলা হয়। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, সূরায়ে-বাকারায় আয়াতুল কুরসী নামে যে আয়াতগুলো রয়েছে তা কোরআন শরীফের অন্য সকল আয়াত থেকে উত্তম। (ইবনে-কাসীর)

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন যে, এ সূরায় এমন দশটি আয়াত রয়েছে, কোন ব্যক্তি যদি সে আয়াতগুলো রাতে নিয়মিত পাঠ করে, তবে শয়তান সে ঘরে প্রবেশ করতে পারবে না এবং সে রাতের মত সকল বালা-মুসীবত, রোগ-শোক ও দুষ্টিস্তা এবং দুর্ভাবনা থেকে নিরাপদে থাকবে। তিনি আরো বলেছেন, যদি বিকৃতমস্তিষ্ক লোকের উপর এ দশটি আয়াত পাঠ করে দম করা হয়, তবে সে ব্যক্তি সুস্থতা লাভ করবে। আয়াত দশটি হচ্ছে : সূরার প্রথম চার আয়াত, মধ্যের তিনটি অর্থাৎ আয়াতুল-কুরসী ও তার পরের দু'টি আয়াত এবং শেষের তিনটি আয়াত।

আহকাম ও মাসায়েল : বিষয়বস্তু ও মাসায়েলের দিক দিয়েও সূরা বাকারাহ সমগ্র কোরআনের মধ্যে অনন্য বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদার অধিকারী। ইবনে আরাবী (র) বলেছেন যে, তিনি তাঁর বুয়ুর্গানের নিকট শুনেছেন—এ সূরায় এক হাজার আদেশ, এক হাজার নিষেধ, এক হাজার হেকমত এবং এক হাজার সংবাদ ও কাহিনী রয়েছে। তাই হযরত উমর ফারুক (রা) এ সূরার তফসীর অধ্যয়নে বার বছর এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) আট বছর অতিবাহিত করেছিলেন। (কুরতুবী)

প্রকৃতপক্ষে সূরাতুল-ফাতিহা সমগ্র কোরআনের সারমর্ম বা সার-সংক্ষেপ। এর মৌলিক বিষয়বস্তু তিনটি। এক, আল্লাহ্ তা'আলার রবুবিয়ত। অর্থাৎ তিনিই যে, সমগ্র বিশ্বের পালনকর্তা এ তখ্যের বর্ণনা। দুই, আল্লাহ্ তা'আলাই ইবাদতের একমাত্র হকদার। তিনি ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্য না হওয়া। তিন, হেদায়েত বা পথ প্রদর্শনের প্রার্থনা। সূরা ফাতিহার শেষাংশে সিরাতুল-মুস্তাকীম বা সরল সঠিক পথের যে প্রার্থনা করা হয়েছে, সমগ্র কোরআন তারই প্রত্যুত্তর। যদি কেউ সরল ও সত্য পথের সন্ধান চায়, তবে সে পবিত্র কোরআনেই তা পেতে পারে।

সে জন্যই সূরাতুল-ফাতিহার পর সূরা বাকারাহ সন্নিবেশিত হয়েছে এবং **ذَلِكَ الْكِتَابُ** দ্বারা সূরা আরম্ভ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তোমরা যে সিরাতুল মুস্তাকীমের সন্ধান করছ তা হচ্ছে এ কিতাব। অতঃপর এ সূরার প্রথমে ঈমানের মূলনীতিসমূহ, তওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের বর্ণনা সংক্ষিপ্তাকারে এবং সূরার শেষাংশে ঈমান সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। মধ্যভাগে জীবন যাপন পদ্ধতির বিভিন্ন দিকসমূহ যথা ইবাদত, আচার-ব্যবহার, মুয়াশেরাত, চরিত্র গঠন এবং আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সংশোধন এবং সংস্কার সম্পর্কিত মূলনীতি ছাড়াও অন্যান্য বহু ছোট-খাট বিষয়সমূহের বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

بِأَخْذِهِ إِلَّا أَنْ تُغِيثُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٩٩﴾
 الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ۚ وَاللَّهُ يَعِدُكُمُ
 مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٠﴾ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ
 مَنْ يَّشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۚ وَمَا
 يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿١٠١﴾ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ أَوْ
 نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذِيرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ۚ وَمَا لِلظَّالِمِينَ
 مِنْ أَنْصَارٍ ﴿١٠٢﴾ إِنْ تُبَدُّوا إِلَى الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ وَإِنْ تُخْفُوهَا
 وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّنْ
 سَيِّئَاتِكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٠٣﴾ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ
 وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا يُفْسِدْكُمْ
 وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ
 خَيْرٍ يُّؤْتِ الْيَتَامَىٰ وَإِنَّكُمْ لَا تَظْلُمُونَ ﴿١٠٤﴾ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ
 أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسِبُهُمُ
 الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعْقُفِ ۚ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ ۚ لَا يَسْأَلُونَ
 النَّاسَ الْإِحْقَاقَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿١٠٥﴾
 الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالْكَيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً
 فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

يَحْزَنُونَ ﴿١٠٦﴾

(২৬৭) হে ইমানদারগণ ! তোমরা স্বীয় উপার্জন থেকে এবং যা আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় কর এবং তা থেকে নিকৃষ্ট জিনিস ব্যয় করতে মনস্থ করো না; কেননা, তা তোমরা কখনও গ্রহণ করবে না; তবে যদি তোমরা চোখ বন্ধ করে নিরে নাও ! জেনে রেখ আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, গুণী। (২৬৮) শরতান তোমাদেরকে অভাব-অনটনের ভীতি প্রদর্শন করে, এবং অশ্রীলতার আদেশ দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে কমা ও বেশি অনুগ্রহের ওয়াদা করেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সুবিজ্ঞ। (২৬৯) তিনি যাকে ইচ্ছা বিশেষ জ্ঞান দান করেন এবং যাকে বিশেষ জ্ঞান দান করা হয়, সে প্রভূত কল্যাণকর বস্তু প্রাপ্ত হয়। উপদেশ তারাই গ্রহণ করে, যারা জ্ঞানবান। (২৭০) তোমরা যে খয়রাত বা সন্ধ্যর কর কিংবা কোন মানত কর, আল্লাহ্ নিশ্চয়ই সেসব কিছু জানেন। অন্যায়কারীদের কোন সাহায্যকারী নেই। (২৭১) যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান-খয়রাত কর, তবে তা কতই না উত্তম। আর যদি খয়রাত গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তদের দিবে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য আরও উত্তম। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কিছু গোনাহ্ দূর করে দেবেন। আল্লাহ্ তোমাদের কাজ-কর্মের খুব খবর রাখেন। (২৭২) তাদেরকে সংপথে আনার দায় তোমার নয়। বরং আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সংপথে পরিচালিত করেন। যে মাল তোমরা ব্যয় কর, তা নিজ উপকারার্থে কর। আল্লাহ্ সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যয় করো না। তোমরা যে অর্থ ব্যয় করবে, তার পুরস্কার পুরোপুরি পেয়ে যাবে এবং তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না। (২৭৩) খয়রাত এসব লোকের জন্য, যারা আল্লাহ্‌র পথে আবদ্ধ হয়ে গেছে—জীবিকার সন্ধানে অন্যত্র ঘোরাফিরা করতে সক্ষম নয়। অস্ত্র লোকেরা যাচঞা না করার কারণে তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে। তোমরা তাদেরকে তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনবে। তারা মানুষের কাছে কাকুতি-মিনতি করে ভিক্ষা চায় না। তোমরা যে অর্থ ব্যয় করবে, তা আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই পরিজ্ঞাত। (২৭৪) যারা স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে রাতে এবং দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে। তাদের জন্য তাদের সওয়াব রয়েছে তাদের পালনকর্তার কাছে। তাদের কোন আশংকা নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে ইমানদারগণ ! স্বীয় উপার্জন থেকে উত্তম বস্তু (সং কাজে) ব্যয় কর এবং তা (উত্তম বস্তু) থেকে যা আমি তোমাদের (ব্যবহারের) জন্য ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি এবং অকেজো বস্তু ব্যয় করতে মনস্থ করো না, অথচ (এমন বস্তুই যদি কেউ তোমাদেরকে প্রাপ্যের বিনিময়ে কিংবা উপটৌকনরূপে দিতে চায়, তবে) তোমরা কখনও তা নেবে না; কিন্তু চক্ষু বুঁজে (এবং

খাতিরে যদি নিয়ে নাও, তবে ভিন্ন কথা) এবং জেনে রেখ যে, আল্লাহ্ কারও মুখাপেক্ষী নন, (যে, তিনি এমন একেজো বস্তুতে সমুদ্র হবেন, তিনি) প্রশংসার যোগ্য (অর্থাৎ সন্তা ও গুণাবলীতে স্বয়ংসম্পূর্ণ। অতএব তাঁর দরবারে প্রশংসার যোগ্য বস্তুই পেশ করা দরকার)। শয়তান তোমাদিগকে অভাব-অনটনের ভীতি প্রদর্শন করে (অর্থাৎ যদি ব্যয় কর কিংবা উত্তম বস্তু ব্যয় কর, তবে দরিদ্র হয়ে যাবে) এবং তোমাদের মন্দ বিষয়ের (অর্থাৎ কুপণতার) পরামর্শ দেয় এবং আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সাথে ওয়াদা করেন (ব্যয় করলে এবং উত্তম বস্তু ব্যয় করলে) নিজের পক্ষ থেকে ক্ষমা করে দেওয়ার এবং বেশি দেওয়ার (অর্থাৎ সংকাজে ব্যয় করা যেহেতু ইবাদত এবং ইবাদত গোনাহর কাঙ্ক্ষার হয়ে যায়, তাই ব্যয় দ্বারা গোনাহও মাফ হয়। আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে দুনিয়াতেই এবং পরকালে সবাইকে ব্যয়ের প্রতিদান-বেশি বেশি দান করবেন।) এবং আল্লাহ্ তা'আলা প্রাচুর্যময় (তিনি সবকিছু দিতে পারেন), সুবিজ্ঞ (নিয়ত অনুযায়ী ফল দান করেন। এসব কথা সুস্পষ্ট, কিন্তু এগুলো সেই বুঝে)। যার মধ্যে ধর্মের জ্ঞান রয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা ধর্মের জ্ঞান দান করেন এবং (সত্য কথা হলো এই যে,) যাকে ধর্মের জ্ঞান দান করা হয় সে বিরাট কল্যাণকর বস্তু প্রাপ্ত হয়। (কেননা, জগতের কোন নিয়ামত এ নিয়ামতের সমান উপকারী নয়।) বস্তুত উপদেশ তারাই গ্রহণ করে, যারা জ্ঞানবান (অর্থাৎ বিদ্বৎ জ্ঞানের অধিকারী)। তোমরা যে কোন প্রকার ব্যয় কর কিংবা কোন রকম মানত কর, আল্লাহ্ তা'আলা নিশ্চয়ই সবকিছু জানেন এবং অন্যায়কারীদের (কিয়ামতে) কোন সাধী (সাহায্যকারী) হবে না। যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান-খয়রাত কর, তবুও ভাল, আর যদি গোপনে কর এবং (গোপনে) অভাবগ্রস্তদেরকে দিয়ে দাও, তবে গোপনে দেওয়া তোমাদের জন্য আরো উত্তম এবং আল্লাহ্ তা'আলা (এর বরকতে) তোমাদের কিছু গোনাহও দূর করে দেবেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কৃতকর্মের খুবই খবর রাখেন। (অনেক সাহাবী কাফিরদেরকে এ উদ্দেশ্যে খয়রাত দিতেন যে, সম্ভবত এ কৌশলে কিছু লোক মুসলমান হয়ে যাবে এবং রাসূলুল্লাহ্ [সা]ও এ মতই প্রকাশ করেছিলেন। তাই এ আয়াতে উভয় প্রকার সম্বোধন করে বলা হচ্ছে : হে মুহাম্মদ [সা]) তাদেরকে (কাফিরদেরকে) সংপথে নিয়ে আসা আপনার দায়িত্বে (ফরয-ওয়াজিব) নয় (যে কারণে এত সূক্ষ্ম আয়োজন করতে হবে), কিন্তু (এটি তো) আল্লাহ্ তা'আলা (র কাজ) যাকে ইচ্ছা, সংপথে নিয়ে আসবেন। (আপনার কাজ শুধু হেদায়েত পৌঁছে দেওয়া—কেউ হেদায়েতে আসুক বা না আসুক। হেদায়েত পৌঁছানো এ নিষেধাজ্ঞার উপর নির্ভরশীল নয় এবং (মুসলমানরা) তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, নিজ উপকারার্থেই কর। (এ উপকারের বর্ণনা এই যে,) তোমরা আল্লাহ্র সমুদ্রি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যয় করো না (সওয়াব হলো দানের অবশ্যস্বাভাবী ফল। এ উদ্দেশ্যে যে কোন অভাবগ্রস্তের অভাব দূর করলে তা অর্জিত হয়। এমতাবস্থায় মুসলমান অভাবগ্রস্তকেই বিশেষভাবে কেন দেওয়া হবে ?) এবং তোমরা যা কিছু ব্যয় করছ, তার সবই (অর্থাৎ এর প্রতিদান ও সওয়াব) পুরোপুরি তোমরা (পরকালে) পেয়ে যাবে এবং তোমাদের জন্য মোটেও হ্রাস করা হবে না। (অতএব, প্রতিদানের

প্রতিই তোমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রতিদান সর্বাবস্থায় পাওয়া যাবে। কাজেই তোমাদের এ চিন্তা করা উচিত নয় যে, তোমাদের সদকা মুসলমানরাই পাবে—কাফিররা পাবে না। সদকা-খয়রাতের) প্রকৃত হকদার ঐ সকল গরীব লোক; যারা আল্লাহর পথে (অর্থাৎ ধর্মের কাজে) আবদ্ধ হয়ে গেছে (এবং ধর্মের কাজে বন্দী ও মশগুল হওয়ার কারণে) তারা (জীবিকার খোঁজে) দেশের কোথাও চলাফেরা করার (স্বভাবগতভাবে) শক্তি রাখে না (এবং) অজ্ঞ লোকেরা এদেরকেই ধনী মনে করে তাদের যাচুঞ্জা থেকে বিরত থাকার কারণে। (তবে) তোমরা তাদেরকে তাদের (লক্ষণ ও) গতি-প্রকৃতি দেখে চিনতে পার। (কেননা, দারিদ্র্য ও উপবাসের কারণে তাদের মুখমণ্ডল ও শরীরে এক প্রকার দুর্বলতা অবশ্যই বিরাজ করে এবং এমনিতেও) তারা মানুষকে পথ আগলিয়ে ভিক্ষা করে না—(যাতে কেউ তাদেরকে অভাবগ্রস্ত বলে মনে করতে পারে। অর্থাৎ তারা ভিক্ষা চায়-ই না। কেননা, যারা চেয়ে অভ্যস্ত, তারা অধিকাংশ সময় পথ আগলিয়েই চায়) এবং (তাদের সেবার জন্য) তোমরা যা ব্যয় করবে, নিশ্চয় আল্লাহ তা খুব পরিজ্ঞাত। (অন্যদেরকে দেওয়ার চাইতে তাদের সেবার সওয়াব অধিক দেবেন) যারা স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে রাতে অথবা দিনে (অর্থাৎ কোন বিশেষ সময় নির্দিষ্ট না করে) গোপনে ও প্রকাশ্যে (অর্থাৎ কোন বিশেষ অবস্থা নির্দিষ্ট না করে) তারা তাদের সওয়াব পাবে (কিয়ামতের দিন) স্বীয় পালনকর্তার কাছে। আর (সেদিন) তাদের কোন বিপদাশঙ্কা নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

আনুমানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী রুকুতে আল্লাহর পথে ব্যয় করার বর্ণনা ছিল। এখন এর সাথেই সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি আলোচ্য রুকুর সাতটি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এর বিবরণ নিম্নরূপ :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا... غَنَىٰ حَمِيدٌ — শানে-নুযুল দৃষ্টে طيب শব্দের অর্থ করা হয়েছে 'উৎকৃষ্ট'। কেউ কেউ দান করার জন্য নিকট বস্তু নিয়ে আসত; এর পরিপ্রেক্ষিতেই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। কোন কোন তফসীরকার শব্দের ব্যাপকতা দৃষ্টে এর অর্থ করেছেন 'হালাল'। কেননা, মাল পূর্ণরূপে উৎকৃষ্ট তখনই হয়, যখন তা হালালও হয়। এ তফসীর অনুযায়ী আয়াতে হালালেরও তাকীদ হবে। তবে প্রথমোক্ত তফসীর অনুযায়ী অন্যান্য প্রমাণ দ্বারা এও প্রমাণিত হয় যে, খয়রাতের মাল হালাল এবং উৎকৃষ্ট—দু'টোই হওয়া শর্ত। মনে রাখা দরকার যে, আয়াতে উৎকৃষ্ট মাল দেওয়ার নির্দেশ ঐ ব্যক্তির জন্য, যার কাছে উৎকৃষ্ট বস্তু থাকা সত্ত্বেও মন্দ ও নিকট বস্তু আল্লাহর পথে ব্যয় করে مَأْكُوت এবং اٰخْرَجْنَا শব্দ দ্বারা বোঝা যায় যে, উৎকৃষ্ট বস্তু বিদ্যমান রয়েছে। আর لَا تَيْمَمُوا الْخَبِيثَاتِ বাক্য দ্বারা বোঝা যায় যে, সে ইচ্ছাকৃতভাবে একেজো জিনিস ব্যয় করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির কাছে মূলতই উৎকৃষ্ট বস্তু নেই, সে এ নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত নয়। সে নিকট বস্তু ব্যয় করলেও গ্রহণীয় হবে।

مَا كَسَبْتُمْ শব্দ থেকে কোন কোন আলেম মাস'আলা চয়ন করেছেন যে, পিতা পুত্রের উপার্জন ভোগ করতে পারে, এটা জায়েয। কেননা, মহানবী (সা) বলেন : اولادكم من — طيب اكسابكم فكلوا من اموال اولادكم هنيئاً তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের উপার্জনের একটি পুত-পবিত্র অংশ। অতএব, তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে সন্তান-সন্ততির উপার্জন ভক্ষণ কর। —(কুরতুবী)

اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ওশরী জমিনে (যে জমিনের উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশ ইসলামী বিধান অনুযায়ী সরকারী তহবিলে জমা দিতে হয়) যে ফসল উৎপন্ন হয়, তার এক-দশমাংশ দান করা ওয়াজিব। আয়াতের ব্যাপকতাদৃষ্টে ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন যে, ওশরী যমীনে ফসল অল্প হোক বা বেশি হোক ওশর দেওয়া ওয়াজিব। সূরা আন'আমের اَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ আয়াতটি ওশর ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশসূচক।

'ওশর' ও 'খেরাজ' ইসলামী শরীয়তের দু'টি পারিভাষিক শব্দ। এ দু'য়ের মধ্যে একটি বিষয় অভিন্ন। উভয়টিই ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ভূমির উপর আরোপিত কর। পার্থক্য এই যে, 'ওশর' শুধু কর নয়, এতে আর্থিক ইবাদতের দিকটিই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ; যেমন—যাকাত। এ কারণেই ওশরকে 'যাকাতুল-আরদ' বা ভূমির যাকাতও বলা হয়। পক্ষান্তরে খেরাজ নিরেট কর। এতে ইবাদতের কোন দিক নেই। মুসলমানরা ইবাদতের যোগ্য ও অনুসারী। তাই তাদের কাছ থেকে ভূমির উৎপন্ন ফসলের যে অংশ নেওয়া হয়, তাকে 'ওশর' বলা হয়। অমুসলিমরা ইবাদতের যোগ্য নয়। তাই তাদের ভূমির উপর যে কর ধার্য করা হয়, তাকে 'খেরাজ' বলা হয়। যাকাত ও ওশরের মধ্যে কার্যগত আরও পার্থক্য এই যে, স্বর্ণ, রৌপ্য ও পণ্যদ্রব্যের উপর বছরান্তে যাকাত ওয়াজিব হয়, কিন্তু ওশরী জমিনে উৎপাদনের সাথেই ওশর ওয়াজিব হয়ে যায়।

দ্বিতীয় পার্থক্য এই যে, জমিনে ফসল উৎপন্ন না হলে ওশর দিতে হয় না। কিন্তু পণ্যদ্রব্য ও স্বর্ণ-রৌপ্যে মুনাফা না হলেও বছরান্তে যাকাত ফরয হবে। ওশর ও খেরাজের বিস্তারিত মাস'আলা বর্ণনার স্থান এটা নয়। ফিক্হ গ্রন্থসমূহে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ.....وَمَا يَذْكُرُ الاْ اَوَّلُوْا الْاَنْبَاَبِ -

যখন কারও মনে এ ধারণা জন্মে যে, দান-খয়রাত করলে ফকীর হয়ে যাবে, বিশেষত আল্লাহ তা'আলার তাকীদ শুনেও স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করার সাহস না হয় এবং খোদায়ী ওয়াদা থেকে মুখ ফিরিয়ে শয়তানী ওয়াদার দিকে ঝুঁকে পড়ে, তখন বুঝে নেওয়া উচিত যে, এ প্ররোচনা শয়তানের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। এখানে এরূপ বলা ঠিক নয় যে, আমরা তো শয়তানের চেহারাও দেখিনি—প্ররোচনা ও নির্দেশ নেওয়া দূরের কথা। পক্ষান্তরে যদি মনে ধারণা জন্মে যে, সদকা-খয়রাত করলে গোনাহ্ মাফ হবে এবং ধন-সম্পদও বৃদ্ধি পাবে ও বরকত হবে, তখন মনে করতে হবে, এ বিষয়টি আল্লাহর পক্ষ থেকে। এমতাবস্থায় আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। আল্লাহর ভাণ্ডারে কোন কিছুই অভাব নেই। তিনি সবার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং নিয়ত ও কর্ম সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত।

হিকমতের অর্থ ও ব্যাখ্যা : يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاءُ — 'হিকমত' শব্দটি কোরআন পাকে বারবার ব্যবহৃত হয়েছে। প্রত্যেক জায়গায় এর ব্যাখ্যায় বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা

করা হয়েছে। তফসীর বাহুরে-মুহীতে তফসীরকারগণের এ সম্পর্কিত প্রায় ত্রিশটি উক্তি উদ্ধৃত করার পর বলা হয়েছে : প্রকৃতপক্ষে এগুলো প্রায় কাছাকাছি উক্তি। এগুলোর মধ্যে কোন বিরোধ নেই, অভিব্যক্তির পার্থক্য মাত্র **حكمة** শব্দটি **احكام** -এর ধাতু। এর অর্থ কোন কর্ম অথবা উক্তিকে তার গুণাবলীসহ পূর্ণ করা।

এ কারণেই বাহুরে-মুহীতে হযরত দাউদ (আ) সম্পর্কিত সূরা বাকারার **اِنَّهُ اللّٰهُ الْمَلِكُ وَالْحَكْمَةُ** —আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

والحكمة وضع الامور في محلها على الصواب وكمال ذلك انما يحصل بالنبوة—

—হিকমতের আসল অর্থ প্রত্যেক বস্তুকে যথাস্থানে স্থাপন করা। এর পূর্ণত্ব শুধুমাত্র নবুয়তের মাধ্যমেই সাধিত হতে পারে। তাই এখানে হেকমত বলতে নবুয়ত বোঝান হয়েছে।

ইমাম রাগেব ইম্পাহানী মুফরাদাতুল-কোরআনে বলেন : হেকমত শব্দটি আল্লাহর জন্য ব্যবহার করা হলে এর অর্থ হবে সমগ্র বিষয়ের পূর্ণ জ্ঞান এবং নিখুঁত আবিষ্কার। অন্যের জন্য এ শব্দটি ব্যবহার করা হলে এর অর্থ হয় সৃষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞান এবং তদনুযায়ী কর্ম।

এ অর্থটিই বিভিন্ন শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। কোথাও এর অর্থ নেওয়া হয়েছে কোরআন, কোথাও হাদীস, কোথাও বিত্তজ্ঞান, কোথাও সংকর্ম, কোথাও সত্য কথা, কোথাও সুস্থ বুদ্ধি, কোথাও ধর্মের বোধ, কোথাও মতামতের নির্ভুলতা এবং কোথাও আল্লাহর ভয়। শেষোক্ত অর্থটি স্বয়ং হাদীসে উল্লিখিত আছে। বলা হয়েছে **رأس الحكمة خشية الله** —অর্থাৎ আল্লাহর ভয়ই প্রকৃত হেকমত।

يَعْلَمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ আয়াতে হেকমতের ব্যাখ্যা সাহাবী ও তাবে তাবেয়ীগণ কর্তৃক হাদীস ও সুন্নাহ বর্ণিত হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, আলোচ্য **بُؤَتِ الْحِكْمَةُ** আয়াতে পূর্ববর্ণিত সবগুলো অর্থই বোঝানো হয়েছে। —(বাহুরে-মুহীত, ৩২০ পৃষ্ঠা, দ্বিতীয় খণ্ড)

এ উক্তিই শব্দটির সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট অর্থবোধক। **وَمَنْ يُّؤَتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ** বাক্য থেকেও এর দিকে ইশারা বোঝা যায়। কারণ, এর অর্থ হচ্ছে, যাকে হেকমত দেওয়া হয়েছে, তাকে প্রভূত মঙ্গল ও কল্যাণ দেওয়া হয়েছে।

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ ... وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

কোন প্রকার ব্যয় বলতে সর্বপ্রকার ব্যয়ই অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে ; যে ব্যয়ে সব শর্তের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে এবং যে ব্যয়ে সবগুলোর কিংবা কতকগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়নি। উদাহরণত আল্লাহর পথে ব্যয় করা হয়নি বরং গোনাহর কাজে ব্যয় করা হয়েছে, কিংবা লোক-দেখানো ব্যয় করা হয়েছে অথবা ব্যয় করে অনুগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে কিংবা হালাল ও উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করা হয়নি ইত্যাদি, সর্বপ্রকার ব্যয়ই এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এমনভাবে ‘মানত’ শব্দের ব্যাপকতায় সর্বপ্রকার মানতই এসে গেছে। উদাহরণত আর্থিক ইবাদতের মানত। এ সাদৃশ্যের কারণেই ব্যয়ের সাথে মানতের উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে দৈহিক ইবাদতের মানত; তা আবার শর্তহীন হোক কিংবা শর্তযুক্ত হোক, তা পূর্ণ করা হোক বা না করা হোক ইত্যাদি সর্বপ্রকার মানতই আয়াতে বোঝানো হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে,

আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রকার ব্যয় ও সর্বপ্রকার মানত সম্পর্কেই পরিজ্ঞাত। তিনি এগুলোর প্রতিদানও দেবেন। সীমা ও শর্তাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখতে উৎসাহিত করা এবং লক্ষ্য না রাখার জন্য ভীতি-প্রদর্শন করার লক্ষ্যেই একথা শোনানো হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা প্রয়োজনীয় শর্তাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখে না, তাদেরকে স্পষ্টভাবে শাস্তিবাণী শুনিতে দেওয়া হয়েছে।

انْ تَبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنَنْعَمْ هِيَ... وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

বাহ্যত এ আয়াতে ফরয ও নফল সব রকম দান-খয়রাতকে অন্তর্ভুক্ত করে বলা হয়েছে যে, সর্বপ্রকার দানের ক্ষেত্রে গোপনীয়তাই উত্তম। এতে ধর্মীয় ও জাগতিক উভয় প্রকার উপকারিতাই বর্তমান রয়েছে। ধর্মীয় উপকারিতা এই যে, এতে রিয়া তথা লোক-দেখানোর সম্ভাবনা নেই এবং দান গ্রহণকারীও লজ্জিত হয় না। জাগতিক উপকারিতা এই যে, স্বীয় অর্থের পরিমাণ সাধারণ মানুষের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে না। গোপনীয়তা উত্তম হওয়ার মানে স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে উত্তম হওয়া। সুতরাং অপবাদ খণ্ডন করা, অন্যে তা অনুসরণ করবে এরূপ আশা করা ইত্যাদি কারণে যদি কোন স্থলে প্রকাশ্যে দান করা উত্তম বিবেচিত হয়, তবে তা এর পরিপন্থী নয়।

يُكْفَرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ — গোপনে দান করার সাথেই গোনাহর কাফফারা সম্পর্কযুক্ত নয়— শুধু এ বিষয়ে সতর্ক করার জন্য গোপনীয়তার পার্শ্বে একে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ গোপনে দান করার মধ্যে যদি তুমি কোন বাহ্যিক উপকার না দেখ, তবে বিষণ্ণ হওয়া উচিত নয়। কেননা, তোমার গোনাহ আল্লাহ মাফ করবেন। এটা তোমার বিরূপ উপকার।

لَيْسَ عَلَيْكَ هَذَا هُمٌ... وَأَنْتُمْ لَا تَظْلُمُونَ — এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, দান-খয়রাতে আসলে তোমাদের নিয়তও থাকে নিজেদেরই উপকার লাভ করা এবং বাস্তবেও এর দ্বারা বিশেষভাবে তোমাদেরই উপকার হবে। এমনতাবস্থায় দান-খয়রাত করলে তা শুধু মুসলমানকেই দেবে—কাফিরকে দেবে না, এ বিশেষ পথে এ উপকার লাভ করতে চাও কেন? এটি অতিরিক্ত বিষয়। এর প্রতি লক্ষ্য করা উচিত নয়।

এখানে আরও বুঝে নেওয়া দরকার যে, এ সদকা অর্থ নফল সদকা, যা বিশ্বী কাফিরকেও দেওয়া জায়েয। এখানে সদকা বলতে ফরয সদকা বোঝান হয়নি। ফরয সদকা মুসলমান ছাড়া কাউকে দেওয়া জায়েয নয় —(মায়হারী)

মাস'আলা : দারুল-হরবের কাফিরদেরকে কোন প্রকার দান-খয়রাত দেওয়া জায়েয নয়।

মাস'আলা : বিশ্বী কাফির অর্থাৎ যে দারুল-হরবের নয়, তাকে শুধু যাকাত ও গুশর দান করা জায়েয নয়। অন্য সব ওয়াজিব ও নফল সদকা দান করা জায়েয। আলোচ্য আয়াতে যাকাত অন্তর্ভুক্ত নয়।

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُخْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

এখানে ফকীর বলতে ঐ সকল লোককে বোঝানো হয়েছে, যারা ধর্মীয় কাজে নিয়োজিত থাকার কারণে জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে অন্য কোন কাজ করতে পারে না।

يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ — এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, কোন ফকীরকে যদি মূল্যবান পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখা যায়, তবে এ কারণে তাকে ধনী মনে করা হবে না; বরং ফকীরই বলা হবে। এরূপ ব্যক্তিকে যাকাত দান করাও দূরন্ত হবে।

—(কুরতুবী)

تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ —এতে বোঝা যায় যে, লক্ষণাদি দেখে বিচার করা অশুদ্ধ নয়। কাজেই যদি এমন কোন বেওয়ারিশ মৃতদেহ পাওয়া যায়, যার দেহে পৈতা আছে এবং সে খতনাকৃতও নয়, তবে তাকে মুসলমানদের গোরস্থানে দাফন করা যাবে না। —(কুরতুবী)

لَا يَسْتَلُونَ النَّاسَ الْحَافًا —এ আয়াত থেকে বাহ্যত জানা যায় যে, তারা পথ আগলিয়ে সওয়াল করে না। কিন্তু পথ না আগলিয়েও সওয়াল করে না —এরূপ বোঝা যায় না। কোন কোন তফসীরকার তা-ই বলেছেন। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ তফসীরকারদের মতে এর অর্থ এই যে, তারা মোটেই সওয়াল করে না—
لأنهم متعففون عن المسئلة عفة —এ সপ্তম আয়াতে ঐ সকল লোকের কারণ, তারা সওয়াল করা থেকে নিজেকে পুরোপুরি নিরাপদ দূরত্বে রাখে। —(কুরতুবী)

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ —এ সপ্তম আয়াতে ঐ সকল লোকের বিরাট প্রতিদান ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা বর্ণিত হয়েছে, যারা আল্লাহর পথে ব্যয়ে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তারা রাতে-দিনে, প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে, সবসময় ও সর্বাবস্থায় আল্লাহর পথে ব্যয় করতে থাকে। এ প্রসঙ্গে আরও বলা হয়েছে যে, দান-খরচাতের জন্য কোন সময় নির্দিষ্ট নেই, দিবারাত্রিরও কোন প্রভেদ নেই। এমনভাবে গোপন ও প্রকাশ্যে উভয় প্রকারে আল্লাহর পথে ব্যয় করলে সওয়াব পাওয়া যায়। তবে শর্ত এই যে, খাঁটি নিয়তে দান করতে হবে। নাম-যশের নিয়ত থাকলে চলবে না। প্রকাশ্যে ব্যয় করার কোন প্রয়োজন দেখা না দেওয়া পর্যন্তই গোপনে দান করার শ্রেষ্ঠত্ব সীমাবদ্ধ। যেখানে এরূপ প্রয়োজন দেখা দেয়, সেখানে প্রকাশ্যে দান করাই শ্রেয়।

ইবনে-আসাকের-এর বরাত দিয়ে রুহুল-মা'আরীতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) একবার দশ হাজার দিরহাম দিনে, দশ হাজার দিরহাম রাতে, দশ হাজার দিরহাম গোপনে ও দশ হাজার দিরহাম প্রকাশ্যে—এভাবে মোট চল্লিশ হাজার দিরহাম আল্লাহর পথে ব্যয় করেন। কোন কোন তফসীরকার হযরত আবু বকর (রা)-এর এ ঘটনাকে আয়াতের শানে-নুযুল হিসাবে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য এ আয়াতে শানে-নুযুল সম্পর্কে আরও বিভিন্ন উক্তি রয়েছে।

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَاتَّبَعَهَا فَلَهُ مَاسَلَفٌ ۖ وَأَمْرٌ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۚ

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٩٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَلَا خَوْفٌ
 عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٩٦﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا
 مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٩٧﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا
 بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِن تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رِعْوَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۖ
 لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٩٨﴾ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن
 تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٩٩﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ
 فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٣٠٠﴾

(২৭৫) যারা সুদ খায়, তারা কিয়ামতে দণ্ডায়মান হবে, যেভাবে দণ্ডায়মান হয় এই ব্যক্তি, যাকে শয়তান আছর করে মোহাবিষ্ট করে দেয়। তাদের এ অবস্থার কারণ এই যে, তারা বলেছে : ক্রয়-বিক্রয়ও তো সুদ নেওয়ারই মত ! অথচ আল্লাহ তা'আলা ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। অতঃপর যার কাছে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, পূর্বে যা হয়ে গেছে, তা তার। তার ব্যাপার আল্লাহর উপর নির্ভরশীল। আর যারা পুনরায় সুদ নেয়, তারাই দোষখে যাবে। তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। (২৭৬) আল্লাহ তা'আলা সুদকে নিষিদ্ধ করেন এবং দান-খয়রাতকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ পছন্দ করেন না কোন অবিশ্বাসী পাণীকে। (২৭৭) নিচর যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, সংকাজ করেছে, নামায প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং যাকাত দান করেছে, তাদের জন্য তাদের পুরস্কার তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে। তাদের কোন শঙ্কা নেই এবং তারা দূর্ভিক্ষ হবে না। (২৭৮) হে ইমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা ইমানদার হয়ে থাকো। (২৭৯) অতঃপর যদি তোমরা পরিত্যাগ না কর, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও। কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর, তবে তোমরা নিজের মূলধন পেয়ে যাবে। তোমরা কারও প্রতি অত্যাচার করো না এবং কেউ তোমাদের প্রতি অত্যাচার করবে না। (২৮০) যদি খাতক অভাবগ্রস্ত হয়, তবে তাকে সম্মলতা আসা পর্যন্ত সময় দেওয়া উচিত। আর যদি কমা করে দাও, তবে তা খুবই উত্তম, যদি তোমরা উপলব্ধি কর। (২৮১) এই দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে !

অতঃপর প্রত্যেকেই তার কর্মের ফল পুরোপুরি পাবে এবং তাদের প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হবে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যারা সুদ খায় (অর্থাৎ গ্রহণ করে), তারা (কিয়ামতের দিন কবর থেকে) দণ্ডায়মান হবে না, কিন্তু যেভাবে দণ্ডায়মান হয় ঐ ব্যক্তি, যাকে শয়তান আছর করে মোহাবিষ্ট করে দেয় (অর্থাৎ হতবুদ্ধি মাতালের মত দণ্ডায়মান হবে)। এ শাস্তির কারণ এই যে, এরা (অর্থাৎ সুদখোরেরা সুদের বৈধতা প্রমাণ করার জন্য) বলেছিল : ক্রয়-বিক্রয়ও তো সুদের মত (কেননা, এতেও মুনাফা অর্জন উদ্দেশ্য হয়ে থাকে)। ক্রয়-বিক্রয় অবশ্যই বৈধ। কাজেই অনুরূপ যে সুদ, তাও বৈধ হওয়া উচিত। অথচ (উভয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট ব্যবধান রয়েছে। কেননা) আল্লাহ তা'আলা (যিনি বিধি-বিধানের মালিক) ক্রয়-বিক্রয়কে বৈধ করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন ; (এর বেশি ব্যবধান আর কি হতে পারে ?) অতঃপর যার কাছে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে (এ সম্পর্কে) উপদেশ এসেছে এবং সে (এই সুদখোরী কুফরী বাক্য অর্থাৎ সুদকে বৈধ বলা থেকে) বিরত হয়েছে (এবং তাকে হারাম মনে করে সুদ গ্রহণ পরিত্যাগ করেছে, তার জন্য রয়েছে সুসংবাদ)। তবে যা কিছু (এ নির্দেশ নাযিলের) পূর্বে (নেওয়া) হয়ে গেছে, তা তার (অর্থাৎ বাহ্যিক শরীয়তে তার এ তওবা কবুল হয়েছে এবং নেওয়া অর্থের মালিক সে-ই) এবং তার (অভ্যন্তরীণ) ব্যাপার (অর্থাৎ সে মনেপ্রাণে বিরত হয়েছে, না কপটতা করে তওবা করেছে, তা) আল্লাহর উপর নির্ভরশীল। (খাটি মনে তওবা করে থাকলে তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে, নতুবা না করার মতই হবে। তার প্রতি কুধারণা গোষণ করার অধিকার তোমাদের নেই)। এবং যারা (উল্লিখিত উপদেশ শুনেও এ উক্তি ও কর্মের দিকে) পুনরায় ফিরে আসে, তবে (তাদের এ কাজ স্বয়ং কবীরা গোনাহ তথা মহাপাপ হওয়ার কারণে) তারা দোযখে যাবে (এবং তাদের এ উক্তি কুফরী হওয়ার কারণে) তারা তথায় (দোযখে) চিরকাল অবস্থান করবে। (সুদ গ্রহণে আপাত দৃষ্টিতে টাকা-পয়সা বৃদ্ধি পেতে দেখা গেলেও পরিণামে) আল্লাহ তা'আলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করে দেন। (কখনও ইহকালেই সব ধ্বংস হয়ে যায়, নতুবা পরকালে ধ্বংস হওয়া তো সুনিশ্চিত। কেননা, সেখানে এ কারণে শাস্তি প্রদান করা হবে। এর বিপরীতে দান-খয়রাতে আপাত দৃষ্টিতে অর্থ হ্রাস পায় মনে হলেও পরিণামে) আল্লাহ তা'আলা দানকে বর্ধিত করেন। (কখনও ইহকালেই বৃদ্ধি করেন, নতুবা পরকালে বৃদ্ধি পাওয়া তো সুনিশ্চিত। কেননা, সেখানে এ কারণে অনেক সওয়াব পাওয়া যাবে; যেমন পূর্বোল্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে)। আর আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন না (বরং অপছন্দ করেন,) কোন অবিশ্বাসীকে, (যে উপরোক্ত বাক্যের মত কুফরী বাক্য উচ্চারণ করে এবং এমনভাবে পছন্দ করেন না) কোন পাপীকে (যে উল্লিখিত কাজ অর্থাৎ সুদের অনুরূপ কবীরা গোনাহ করে)।

নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, সংকাজ করেছে, (বিশেষত) নামায কয়েম করেছে এবং যাকাত দান করেছে, তাদের জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে সওয়াব রয়েছে এবং (পরকালে) তাদের কোন বিপদাশঙ্কা হবে না এবং তারা (কোন উদ্দেশ্য পণ্ড হওয়ার কারণে) দুঃখিতও হবে না।

হে ঈমানদারগণ ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যেসব বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক। (কেননা, আল্লাহর আনুগত্য করাই ঈমানের

দাবি) অতঃপর যদি তোমরা (একে কার্যে পরিণত) না কর, তবে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের বিজ্ঞপ্তি শুনে নাও (অর্থাৎ তোমাদের বিরুদ্ধে এ কারণে জিহাদ ঘোষণা করা হবে) এবং যদি তোমরা তওবা করে নাও, তবে তোমাদের মূলধন (ফেরত) পেয়ে যাবে। (এ আইনের পর) তোমরা কারও প্রতি অত্যাচার করতে পারবে না, তোমাদের প্রতিও অত্যাচার করা হবে না। (অর্থাৎ তোমরা মূলধনও ফেরত পাবে না বা দিবে না, তা হবে না) এবং যদি (ঋণগ্রহীতা) অভাবগ্রস্ত হয় (এবং এ কারণে নির্দিষ্ট মেয়াদে ঋণ পরিশোধ করতে না পারে,) তবে (তাকে) সময় দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে, সচ্ছলতা না আসা পর্যন্ত। (অর্থাৎ যখন সে পরিশোধ করতে সক্ষম হবে সে সময় পর্যন্ত) এবং (সম্পূর্ণভাবে) ক্ষমা করে দেওয়াই তোমাদের জন্য আরও উত্তম, যদি তোমরা (এ সওয়াব ও বিনিময় সম্পর্কে) জ্ঞানবান হও।

(হে মুসলমানগণ,) ঐ দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা আল্লাহর কাছে হাযিরার জন্য প্রত্যাবর্তিত হবে। অতঃপর প্রত্যেকেই তার কৃতকর্ম (অর্থাৎ কৃতকর্মের ফল) পুরোপুরি পাবে এবং তাদের প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হবে না (অতএব হাযিরার জন্য তোমরা স্বীয় কার্যকলাপ ঠিক রাখ এবং কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ করো না)।

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে 'রিবা' অর্থাৎ সুদের অবৈধতা ও তার বিধি-বিধান সম্পর্কিত বর্ণনা শুরু হয়েছে। এ প্রশ্নটি কয়েক দিক দিয়েই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে সুদের কারণে কোরআন ও সুন্নাহর কঠোর শাস্তির কথা বলা হয়েছে। অপরদিকে সুদ বর্তমান বিশ্বের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। সুদের কবল থেকে মুক্তিলাভ করার পথে যেসব অসুবিধা ও জটিলতা বিদ্যমান, সেগুলোর তালিকা সুদীর্ঘ। তাই বিষয়টি কয়েক দিক দিয়েই আলোচনা সাপেক্ষ।

প্রথমে এ ব্যাপারে কোরআনী আয়াতের বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও সহীহ হাদীসসমূহের বক্তব্য সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে কোরআন ও হাদীসের পরিভাষায় সুদের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে হবে এবং দেখতে হবে সুদ কোন্ কোন্ ব্যবসায়-বাণিজ্যে পরিব্যাপ্ত, এর অবৈধতা কোন্ রহস্য ও উপযোগিতার উপর ভিত্তিশীল এবং এতে কি ধরনের অনিষ্ট বিদ্যমান?

সুদের দ্বিতীয় দিক হচ্ছে যৌক্তিক ও অর্থনৈতিক। অর্থাৎ বাস্তবিকই কি সুদ বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নতির নিশ্চয়তা দিতে পেরেছে? একে উপেক্ষা করলে এর অবশ্যজ্ঞাবী পরিণতি হিসাবে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও সাধারণ অর্থনীতির প্রাচীর কি ধসে যাবে, না গোটা ব্যাপারটাই শুধু আল্লাহ ও পরকালে অবিশ্বাসী মস্তিষ্কসমূহের উদ্ভট ফসল? নতুবা সুদ ছাড়াও সকল অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হতে পারে—শুধু সমস্যার সমাধানই নয়; বরং বিশ্বের অর্থনৈতিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা সুদ বর্জনের উপরই নির্ভরশীল, সুদই বিশ্বের অর্থনৈতিক অশান্তি ও অস্থিরতার মূল ও প্রধান কারণ?

দ্বিতীয়ত, এই আলোচনাটি একটি অর্থনৈতিক বিষয়। এর আওতায় অনেকগুলো মৌলিক ও আনুশঙ্গিক সুদীর্ঘ আলোচনা রয়েছে। কোরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে এসব আলোচনাও কম দীর্ঘ নয়।

আলোচ্য ছয়টি আয়াতে সুদের অবৈধতা ও বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। প্রথম আয়াতের প্রথম বাক্যে সুদখোরদের মন্দ পরিণতি এবং হাশরের ময়দানে তাদের লাঞ্ছনা ও ভ্রষ্টতার বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। বলা হয়েছে, যারা সুদ খায়, তারা দগ্ধায়মান হয় না; কিন্তু সেই ব্যক্তির মত,

যাকে কোন শয়তান-জ্বিন আছর করে দিশেহারা করে দেয়। হাদীসে বলা হয়েছে : দজায়মান হওয়ার অর্থ হাশরের ময়দানে কবর থেকে উঠা। সুদখোর যখন কবর থেকে উঠবে, তখন ঐ পাগল বা উন্মাদের মত উঠবে, যাকে কোন শয়তান-জ্বিন দিশেহারা করে দেয়।

এ বাক্য থেকে জানা গেল যে, জ্বিন ও শয়তানের আছরের ফলে মানুষ অজ্ঞান কিংবা উন্মাদ হতে পারে। অভিজ্ঞ লোকদের উপর্যুপরি অভিজ্ঞতাও এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়। হাকীম ইবনে কাইয়্যাম জুযী (র) লিখেছেন : চিকিৎসাবিদ ও দার্শনিকগণও স্বীকার করেন যে, মৃগীরোগ, মূর্ছারোগ কিংবা পাগলামি বিভিন্ন কারণে হতে পারে। মাঝে মাঝে জ্বিন ও শয়তানের আছরও এর কারণ হয়ে থাকে। যারা বিষয়টি স্বীকার করে, তাদের কাছে বাস্তবিক অসম্ভাব্যতা ছাড়া অন্য কোন প্রমাণ বর্তমান নেই।

আয়াতে দ্বিতীয় প্রাধান্যযোগ্য বিষয় এই যে, সুদখোররা হাশরে উন্মাদ অবস্থায় উন্মিত হবে—কোরআন পাক সোজ্জামুজ্জি একথা বলেনি, বরং পাগলামি ও অজ্ঞানতার বিশেষ একটি প্রকার উল্লেখ করেছে। অর্থাৎ শয়তান আছর করে দিশেহারা করে দিলে যেভাবে উঠে, সেভাবে উঠবে। এতে সম্ভবত ইঙ্গিত রয়েছে যে, অজ্ঞান ও পাগল ব্যক্তি মাঝে মাঝে যেমন চুপচাপ পড়ে থাকে তাদের অবস্থা তেমন হবে না ; তারা শয়তান কর্তৃক মাতাল করা লোকদের মত প্রলাপোক্তি ও অন্যান্য পাগলসুলভ কাণ্ড-কীর্তি দ্বারা পরিচিত হবে।

সম্ভবত এদিকেও ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, রোগবশত অজ্ঞান কিংবা পাগল হওয়ার পর চেতনাশক্তি সম্পূর্ণ লোপ পায়। এরূপ ব্যক্তিই কষ্ট কিংবা শাস্তি অনুভব করতে পারে না। সুদখোরদের অবস্থা এরূপ হবে না। তারা ভূতে-ধরা লোকের মত কষ্ট ও শাস্তি পুরোপুরিই অনুভব করবে।

এখন দেখতে হবে যে, অপরাধ ও শাস্তির মধ্যে যে মিল থাকা দরকার, তা এখানে আছে কিনা। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে যে শাস্তি কোন ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায়কে কোন অপরাধের কারণে দেওয়া হয়, তার সাথে অপরাধের অবশ্যই মিল থাকে। হাশরে সুদখোরদেরকে মাতাল অবস্থায় উন্মিত করার মধ্যে সম্ভবত এ বিষয়ের অভিব্যক্তি রয়েছে যে, সুদখোর টাকা-পয়সার লালসায় এমন বিভোর হয়ে পড়ে যে, কোন দরিদ্রের প্রতি তার মনে সামান্য দয়ারও উদ্রেক হয় না এবং লজ্জা-শরম তাকে বাধা দিতে পারে না। সে প্রকৃতপক্ষে জীবদ্দশায় অজ্ঞান ছিল। তাই হাশরেও তাকে এ অবস্থায় উঠানো হবে। অথবা এ শাস্তি দেওয়ার কারণ এই যে, সে যেহেতু দুনিয়াতে স্বীয় নির্বুদ্ধিতাকে বুদ্ধির আবরণে প্রকাশ করেছে এবং ক্রয়-বিক্রয়কে সুদের অনুরূপ আখ্যা দিয়েছে, তাই তাকে নির্বোধ করে উঠানো হবে।

এখানে আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, আয়াতে সুদ খাওয়ার কথা বলা হয়েছে। অথচ এর অর্থ হচ্ছে সুদ গ্রহণ করা ও সুদ ব্যবহার করা খাওয়ার জন্য ব্যবহার করুক কিংবা পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘর-বাড়ি অথবা আসবাবপত্র নির্মাণে ব্যবহার করুক। কিন্তু বিষয়টি 'খাওয়া' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার কারণ এই যে, বস্তু খেয়ে ফেলা হয়, তা আর ফেরত দেওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। অন্য রকম ব্যবহারে ফেরত দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই পুরোপুরি আত্মসাৎ করার কথা বোঝাতে গিয়ে 'খেয়ে ফেলা' শব্দ দ্বারা বোঝান হয়। শুধু আরবী ভাষা নয়, অধিকাংশ ভাষার সাধারণ বাকপদ্ধতিও তা-ই।

এরপর দ্বিতীয় বাক্যে সুদখোরদের এ শাস্তির কারণ বর্ণিত হয়েছে। তারা দু'টি অপরাধ করেছে : এক, সুদের মাধ্যমে হারাম খেয়েছে। দুই, সুদকে হালাল মনে করেছে এবং যারা

একে হারাম বললে, তাদের উত্তরে বলেছে : “ক্রয়-বিক্রয়ও তো সুদেরই অনুরূপ। সুদের মাধ্যমে যেমন মুনাফা অর্জিত হয়, তেমনি ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যেও মুনাফাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। অতএব, সুদ হারাম হলে ক্রয়-বিক্রয়ও তো হারাম হওয়া উচিত।” অথচ কেউ বলে না যে, ক্রয়-বিক্রয় হারাম। এক্ষেত্রে বাহ্যত তাদের বলা উচিত ছিল যে, সুদও তো ক্রয়-বিক্রয়ের মতই। ক্রয়-বিক্রয় যখন হালাল তখন সুদও হালাল হওয়া উচিত। কিন্তু তারা বর্ণনাভঙ্গি পালটিয়ে যারা সুদকে হারাম বলতো, তাদের প্রতি এক প্রকার উপহাস করেছে যে, তোমরা সুদকে হারাম বললে ক্রয়-বিক্রয়কেও হারাম বল।

তৃতীয় বাক্যে আল্লাহ তা'আলা তাদের এ উক্তির জওয়াবে বলেছেন যে, এরা ক্রয়-বিক্রয়কে সুদের অনুরূপ ও সমতুল্য বলেছে, অথচ আল্লাহর নির্দেশের ফলে এতদুভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান। কারণ, আল্লাহ তা'আলা একটিকে হালাল এবং অপরটিকে হারাম করে দিয়েছেন। এমতাবস্থায় উভয়টি কেমন করে সমতুল্য হতে পারে?

এর জওয়াবে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, সুদখোরদের আপত্তি ছিল যুক্তিগত। অর্থাৎ মুনাফা উপার্জনই যখন উভয় লেনদেনের লক্ষ্য, তখন হারাম-হালালের ব্যাপারে উভয়টি একই রকম হওয়া উচিত। আল্লাহ তা'আলা তাদের যুক্তিনির্ভর আপত্তির জওয়াব যুক্তিগতভাবে পার্থক্য বর্ণনার মাধ্যমে দেননি; বরং বিজ্ঞজ্ঞানোচিত ভঙ্গিতে জওয়াব দিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলাই সব কিছুর একমাত্র অধিপতি এবং বস্তুর লাভ-ক্ষতি ও ভাল-মন্দ সম্পর্কে তিনি পূর্ণ জ্ঞান রাখেন। তিনি যখন একটিকে হালাল ও অপরটিকে হারাম করেছেন, তখন এতেই বুঝে নেওয়া যায় যে, তিনি যে বস্তুকে হারাম করেছেন, তার মধ্যে অবশ্যই কোন অনিষ্ট, ক্ষতি বা অপবিত্রতা রয়েছে—সাধারণ মানুষ তা অনুভব করুক বা না-ই করুক। কেননা, সমগ্র বিশ্ব-ব্যবস্থার পূর্ণ স্বরূপ ও লাভ-ক্ষতি পুরোপুরিভাবে একমাত্র ঐ মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞই জানতে পারেন যার জ্ঞান থেকে পৃথিবীর কণা পরিমাণ বস্তুও লুক্কায়িত নয়। বিশ্বের ব্যক্তিবর্ণ ও সম্প্রদায়সমূহ নিজ নিজ লাভ-ক্ষতি জানতে পারলেও সমগ্র বিশ্বের লাভ-লোকসান পুরোপুরিভাবে জানতে পারে না। কোন কোন বস্তু কোন ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায়ের পক্ষে লাভজনক হয় কিছু গোটা জাতি কিংবা গোটা দেশের জন্য তাতে ক্ষতি নিহিত থাকে।

এরপর তৃতীয় বাক্যে বলা হয়েছে যে, সুদ হারাম হওয়ার পূর্বে যে ব্যক্তি সুদের অর্থ অর্জন করেছিল, সুদ হারাম হওয়ার পর সে যদি ভবিষ্যতের জন্য তওবা করে নেয় এবং সুদ থেকে বিরত থাকে, তবে পূর্বকার সঞ্চিত অর্থ শরীয়তের নির্দেশ অনুযায়ী তারই অধিকারভুক্ত হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে, সে সর্বাস্তকরণেই বিরত রয়েছে কি কপটতা সহকারে তওবা করেছে—তার এ অভ্যন্তরীণ ব্যাপারটি আল্লাহর উপর নির্ভরশীল থাকবে।

মনেপ্রাণে তওবা করে থাকলে আল্লাহর কাছে তা উপকারী হবে, অন্যথায় তা তওবা না করারই মত। তার প্রতি সাধারণ লোকদের খারাপ ধারণা পোষণ করা উচিত নয়। যে উপদেশ শুনেও উপরোক্ত উক্তি ও কার্যে পুনরায় লিপ্ত হয়, তার এ কার্যে (সুদ গ্রহণ করা) গোনাহ হওয়ার কারণে সে দোযখে যাবে এবং তার এ উক্তিতে (অর্থাৎ সুদ ক্রয়-বিক্রয়েরই মত হালাল) কুফর হওয়ার কারণে সে চিরকাল দোযখে অবস্থান করবে।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা সুদকে নিষিদ্ধ করেন এবং দান-খয়রাতকে বর্ধিত করেন। এখানে একটি বিশেষ সামঞ্জস্যের কারণে সুদের সাথে দান-খয়রাতের উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ সুদ ও খয়রাত উভয়ের স্বরূপ যেমন পরস্পরবিরোধী, উভয়ের পরিণামও

জেন্নি পরস্পরবিরোধী। আর সাধারণত যারা এসব কাজ করে, তাদের উদ্দেশ্য এবং নিয়তও পরস্পরবিরোধী হয়ে থাকে।

স্বল্পের বিরোধ এই যে, সদকা ও খয়রাতে কোনরূপ বিনিময় ছাড়াই নিজ অর্থ-সম্পদ অপরকে দেওয়া হয় এবং সুদে কোনরূপ বিনিময় ছাড়াই অপরের অর্থ-সম্পদ নিয়ে নেওয়া হয়। এ দু'টি কাজ যারা করে, তাদের নিয়ত ও উদ্দেশ্য পরস্পরবিরোধী হওয়ার কারণ এই যে, খয়রাতকারী ব্যক্তি শুধু আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও পরকালীন সওয়াবের জন্য স্বীয় অর্থ-সম্পদ হ্রাস কিংবা নিঃশেষ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। পক্ষান্তরে সুদ গ্রহণকারী ব্যক্তি তার বর্তমান অর্থ-সম্পদকে অবৈধভাবে বৃদ্ধি করার উদ্যোগ বাসনা পোষণ করে থাকে। পরিণতির পরস্পর বিরোধিতা কোরআন পাকের আলোচ্য আয়াত থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বলা হয়েছে : আল্লাহ তা'আলা সুদ দ্বারা অর্জিত ধন-সম্পদ কিংবা তার বরকত মিটিয়ে দেন এবং খয়রাতকারীর ধন-সম্পদ কিংবা তার বরকত বাড়িয়ে দেন। সারকথা এই যে, যারা ধন-সম্পদের লোভ করে না, সম্পদ হ্রাসে সম্মত হওয়া সত্ত্বেও তাদের ধন-সম্পদ কিংবা ধন-সম্পদের ফলাফল, বরকত ও উপকারিতা বেড়ে যায়।

এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, আয়াতে সুদকে মেটানো আর দান-খয়রাতকে বর্ধিত করার উদ্দেশ্য কি? কোন কোন তফসীরকার বলেন, এ মেটানো ও বাড়ানো পরকালের সাথে সম্পর্কযুক্ত। সুদখোরের ধন-সম্পদ পরকালে তার কোনই কাজে আসবে না; বরং তা তার বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। পক্ষান্তরে দান-খয়রাতকারীদের ধন-সম্পদ পরকালে তাদের জন্য চিরস্থায়ী নেয়ামত ও শান্তিলাভের উপায়-উপকরণ হবে। এ ব্যাখ্যা সুস্পষ্ট। এতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। সাধারণ তফসীরকারগণ বলেন : সুদকে মেটানো এবং দান-খয়রাতকে বাড়ানো পরকালে তো হবেই, কিন্তু এর কিছু কিছু লক্ষণ দুনিয়াতেও প্রত্যক্ষ করা যায়।

যে সম্পদের সাথে সুদ মিশ্রিত হয়ে যায়, অধিকাংশ সময় সেগুলো তো ধ্বংস হয়েই, অধিকন্তু আগে যা ছিল, তাও সাথে নিয়ে যায়। সুদ ও জুয়ার ক্ষেত্রে প্রায় সময়ই এরূপ ঘটনা সংঘটিত হতে দেখা যায়। অজস্র পুঁজির মালিক কোটিপতি দেখতে দেখতে দেউলিয়া ও ফকীরে পরিণত হয়। সুদবিহীন ব্যবসায়-বাণিজ্যেও লাভ-লোকসানের সম্ভাবনা থাকে এবং অনেক ব্যবসায়ী ব্যবসাতে ক্ষতিগ্রস্তও হয়; কিন্তু গতকাল যে কোটিপতি ছিল, আজ সে পথের ভিখারী, এমন ক্ষতি শুধু সুদ ও জুয়ার ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। লোক সমাজে অসংখ্য বর্ণনা বিবৃতি এ ব্যাপারে সুবিদিত যে, সুদের মাল তাৎক্ষণিকভাবে যতই প্রবৃদ্ধি লাভ করুক, তা সাধারণত স্থায়ী হয় না। সম্ভান-সন্ততি ও বংশধররা তা ভোগ করতে পারে না। প্রায়ই কোন-না-কোন বিপর্যয়ের মুখে তা ধ্বংস হয়ে যায়। হযরত মা'মার (র) বলেন : আমি বুযুর্গদের মুখে শুনেছি, চল্লিশ বছর যেতে না যেতেই সুদখোরের ধন-সম্পদে ভাটা আরম্ভ হয়ে যায়।

যদি বাহ্যিক দৃষ্টিতে ধন-সম্পদের ধ্বংস দেখা নাও যায়, তবুও তার উপকারিতা, বরকত ও ফলাফল থেকে বঞ্চনা নিশ্চিত ও অবশ্যজারী। কেননা এটা সুস্পষ্ট যে, স্বর্ণ-রৌপ্য স্বয়ং উদ্দেশ্যও নয় এবং উপকারীও নয়। স্বর্ণ-রৌপ্য দ্বারা কারও ক্ষুধাতৃষ্ণা মেটে না, কিংবা শীত গ্রীষ্ম থেকে আত্মরক্ষার জন্য তা গায়ে জড়ানো কিংবা বিছানোও যায় না। তদুপরি এর উপার্জন ও সংরক্ষণে হাজারো কষ্ট স্বীকার করতে হয়। একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির মতে এত সব কষ্ট স্বীকার করার কারণ এছাড়া অন্য কিছু নয় যে, স্বর্ণ-রৌপ্য এমন কতগুলো বস্তু অর্জন করার

উপায় যার সাহায্যে মানুষের জীবন সুখী ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ হয় এবং সে আরাম ও সম্মানজনক জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়। মানুষ নিজে যে আরাম ও সম্মান অর্জন করেছে, তার সম্মান-সম্মতিও তা ভোগ করুক, এ বাসনা মানুষের স্বভাবজাত।

এগুলোই হচ্ছে ধন-সম্পদের উপকারিতা ও ফলাফল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা ভুল হবে না যে, যে ব্যক্তি এসব উপকারিতা ও ফলাফল লাভ করতে সক্ষম হয়, তার ধন-সম্পদ একদিক দিয়ে বেড়ে যায়; যদিও চর্মচক্ষে তা কম বলে মনে হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এসব উপকারিতা ও ফলাফল কম অর্জন করে, তার ধন-সম্পদ একদিক দিয়ে হ্রাস পায়; যদিও চর্মচক্ষে তা অধিক মনে হয়ে থাকে।

একথা উপলব্ধি করে নেওয়ার পর এবার সুদের কারবারে দান-খয়রাতের ব্যাপারটি পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। আপনি প্রত্যক্ষভাবে বুঝতে পারবেন যে, সুদখোরের ধন-সম্পদ যদিও ক্রমবর্ধিমু দেখা যায়, কিন্তু এ বর্ধিমুতা পাণ্ডুরোগীর দেহ ফুলে মোটা হয়ে যাওয়ারই মত। ফুলে যাওয়ার ফলে যে বর্ধিমুতা আসে তাও দেহেরই বৃদ্ধি, কিন্তু কোন সমঝদার মানুষই এ বর্ধিমুতাকে পছন্দ করতে পারে না। কেননা, সে জানে যে, এ বর্ধিমুতা মৃত্যুরই বার্তাবহ। এমনভাবে সুদখোরের ধন-সম্পদ যতই ক্রমবর্ধমান দেখা যাক না কেন, সে এর উপকারিতা ও ফলাফল অর্থাৎ আরাম ও সম্মান থেকে সর্বদাই বঞ্চিত থাকে।

এখানে হয়ত কারও মনে সন্দেহ দেখা দিতে পারে যে, আজকাল তো সুদখোরদেরই আধিপত্য বেশি। আরাম ও সম্মান তো দেখা যায় তাদেরই করায়ত্ত। দেখা যায়, তারাই প্রাসাদোপম বাড়ি-ঘরের মালিক। আরাম-আয়েশ ও ভোগ বিলাসের যাবতীয় সামগ্রীও তাদেরই হাতের মুঠোয়। পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং বসবাসের প্রয়োজনীয় বস্তু প্রয়োজনান্তরিত আসবাবপত্রেরও তাদের অধাভব নেই। নকর, চাকর এবং শান-শওকতের যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম তাদেরই কাছে বিদ্যমান। কিন্তু চিন্তা করলে প্রত্যেকেই বুঝতে পারবে যে, আরামের সাজ-সরঞ্জাম তো কারখানায় নির্মিত এবং তা বাজারেও বিক্রয় হয়। স্বর্ণ-রৌপ্যের বিনিময়ে তা অর্জনও করা যায়। কিন্তু যার নাম আরাম ও শান্তি, তা কোন কারখানায় নির্মিত হয় না এবং বাজারেও বিক্রয় হয় না। তা এমন একটি রহমত যা সরাসরি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই আসে। অনেক সময় বিস্তার সরঞ্জাম সত্ত্বেও তা অর্জিত হয় না। একটি নিদ্রা-সুখের কথাই ধরুন। এর জন্য মনোরম বাসগৃহ নির্মাণ করা যায়, সুম্মম আলো-বাতাসের ব্যবস্থা করা যায়, আসবাবপত্র সুদৃশ্য ও মনোহরী করা যায় এবং ইচ্ছামত নরম বিছানা ও খাট যোগাড় করা যায়। কিন্তু এতসব সাজ-সরঞ্জাম যোগাড় হলেই কি নিদ্রা অবশ্যম্ভাবী? আপনার হয়তো এ অভিজ্ঞতা নেই কিন্তু হাজারো মানুষ এ প্রশ্নের উত্তরে 'না' বলবে—যাদের কোন বিপত্তির কারণে নিদ্রা আসে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত সম্পদশালী সভ্য দেশ সম্পর্কিত কোন কোন প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, সেখানে শতকরা পঁচাত্তর জন-মানুষ ঘুমের বটিকা ব্যবহার না করে ঘুমোতেই পারে না এবং মাঝে মাঝে বটিকাও তাদের ঘুম আনয়নে ব্যর্থ হয়ে যায়। ঘুমের সাজ-সরঞ্জাম আপনি বাজার থেকে কিনে আনতে পারেন। কিন্তু ঘুম কোন বাজার থেকে কোন মূল্যেই কিনে আনতে পারেন না। অন্যান্য আরাম এবং সুখের অবস্থাও তাই।

বিষয়টি বুঝে নেওয়ার পর সুদখোরদের অবস্থা পর্যালোচনা করুন। আপনি তাদের কাছে সবকিছু পাবেন কিন্তু আরাম ও সুখ পাবেন না। তার এক কোটিকে দেড় কোটি এবং দেড়

কোটিকে দু'কোটি করার চিন্তায় তাদেরকে এমন বিভোর দেখা যাবে যে, খাওয়া-পরা এবং বিবি-বাচ্চাদের প্রতি লক্ষ্য করারও সময় নেই। কয়েকটি মিল-করখানা চলছে, ভিনদেশ থেকে জাহাজ আসে—এসব নানাবিধ চিন্তার জাল বোনার মধ্যেই তাদের সকাল থেকে বিকাল এবং বিকাল থেকে সকাল হয়ে যায়। আফসোস, এ জ্ঞান-পাগলরা সুখের সাজ-সরঞ্জামকেই সুখ মনে করে নিয়েছে এবং প্রকৃতপক্ষে তারা সুখ থেকে অনেক দূরে পড়ে রয়েছে।

এ হচ্ছে তাদের আরাম ও সুখের অবস্থা। এখন এদের সম্মানের অবস্থাটিও দেখে নিন। বলা বাহুল্য, সুদখোররা কঠোরপ্রাণ ও নির্দয়। দরিদ্রদের দারিদ্র্য এবং স্বল্প পুঁজিওয়ালাদের পুঁজির স্বল্পতার সুযোগ গ্রহণ করাই তাদের পেশা। দরিদ্রদের রক্ত চুষে তারা তাদের নিজেদের উদর স্ফীত করে তোলে। তাই জনগণের অন্তরে তাদের প্রতি ইয্যত ও সন্ত্রম থাকা অসম্ভব। নিজ দেশের মহাজন-ব্যবসায়ী এবং দুনিয়াজোড়া ছড়িয়ে থাকা ইহুদীদের ইতিহাস পাঠ করুন। তাদের সিন্দুক স্বর্ণ-রৌপ্য দ্বারা যতই পরিপূর্ণ হোক না কেন, জগতের কোন কোণে এবং মানবগোষ্ঠীর কোন স্তরেই তাদের সম্মান নেই। বরং তাদের এ কর্মের অবশ্যজ্ঞাবী পরিণতি এই যে, দরিদ্র ও নিঃস্বলোকদের অন্তরে তাদের সম্পর্কে প্রতিহিংসা ও ঘৃণাপূর্ণ ঘৃণারই সৃষ্টি হয়। বর্তমান বিশ্বের সকল দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও যুদ্ধ-বিগ্রহ এ হিংসা ও ঘৃণারই বহিঃপ্রকাশ। শ্রম ও পুঁজির মধ্যকার সংগ্রামই বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক মতবাদের জন্ম দিয়েছে। কম্যুনিজমের ধ্বংসাত্মক তৎপরতা এ হিংসা ও ঘৃণারই ফল। ফলে সমগ্র বিশ্ব মারামারি, কাটাকাটি ও যুদ্ধ-বিগ্রহের জাহান্নামে পরিণত হয়েছে। এ হচ্ছে তাদের সুখ ও সম্মানের অবস্থা। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, সুদের ধন-সম্পদ সুদখোরের ভবিষ্যত বংশধরদের জীবনকেও কখনও সুখময় করে না। হয় তারা ধ্বংস হয়ে যায়, না হয় এর অমঙ্গলে তারাও ধন-সম্পদের সত্যিকার ফলাফল ভোগে বঞ্চিত হয়।

ইউরোপীয় সুদখোরদের দৃষ্টান্ত থেকে সম্ভবত কেউ ধোঁকা খেতে পারে যে, তারা তো সবাই সুখী ও সমৃদ্ধিশালী। তাদের বংশধররাও সমৃদ্ধিশালী হচ্ছে। কিন্তু প্রথমত, তাদের সমৃদ্ধির সংক্ষিপ্ত চিত্র এইমাত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। দ্বিতীয়ত তাদের অবস্থা হচ্ছে এরূপ : মনে করুন, কোন আদমখোর অন্যান্য মানুষের রক্ত চুষে নিজ দেহের লালন-পালন করে এবং এ জাতীয় কতিপয় আদমখোর কোন এক মহল্লায় বসতি স্থাপন করেছে। আপনি কাউকে এ মহল্লায় নিয়ে গিয়ে তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করান। দেখা যাবে, তারা সবাই সুস্থ, সবল ও প্রফুল্ল। কিন্তু একজন মানবতার মঙ্গলকামী জ্ঞানী ব্যক্তি শুধু এ মহল্লাই দেখবে না। সে এদের বিপরীতে এসব বস্তিও দেখবে, যাদের রক্ত চুষে তাদেরকে অর্ধমৃত করে দেওয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি আদমখোরদের মহল্লা এবং এসব বস্তির প্রতি লক্ষ্য করবে, সে কখনও মহল্লাবাসীদেরকে মোটাভাজা দেখে তাদের প্রতি প্রশ্রয়শীল হতে পারবে না এবং সামগ্রিক দিক দিয়ে এদের কর্মকে মানব জাতির উন্নতির উপায়ও বলতে পারবে না; বরং একে মানবতার বিপর্যয় ও ধ্বংস বলে আখ্যায়িত করতে বাধ্য হবে।

এর বিপরীত দান-খয়রাতকারীদেরকে দেখুন। তাদের কখনও ধন-সম্পদের পিছনে দিশেহারা হয়ে ঘুরতে দেখবেন না। সুখের সাজ-সরঞ্জাম যদিও তাদের কম, কিন্তু সাজ-সরঞ্জাম ওয়ালাদের চাইতে শান্তি, স্বস্তি এবং মানবিক স্নেহ তারা অনেকগুণ বেশি ভোগ করে থাকেন। বলা বাহুল্য, এটাই প্রকৃত সুখ। দুনিয়াতে প্রত্যেকেই তাদেরকে সম্মান ও ভক্তির চোখে দেখে থাকে।

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ — মোটকথা, এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং দান-খয়রাতকে বর্ধিত করেন। এ উক্তি পরকালের দিক দিয়ে তো সম্পূর্ণ পরিষ্কারই ; সত্যোপলব্ধির সামান্য চেষ্টা করলে দুনিয়ার দিক দিয়েও সুস্পষ্ট। হযর (সা)-এর এ উক্তির উদ্দেশ্যও তাই :

ان الربوا وان كثر فان عاقبته تصير الى قل

অর্থাৎ সুদ যদিও বৃদ্ধি পায় কিন্তু এর শেষ পরিণতি হচ্ছে স্বল্পতা — (মসনদে-আহমদ, ইবনে মাজাহ)

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ — অর্থাৎ “আল্লাহ তা'আলা কোন কাকির-গোনাহ্গারকে পছন্দ করেন না।” এতে ইশারা করা হয়েছে যে, যারা সুদকে হারামই মনে করে না, তারা কুফরে লিপ্ত এবং যারা হারাম মনে করা সত্ত্বেও কার্যত সুদ খায়, তারা গোনাহ্গার, পাগাচারী।

তৃতীয় আয়াতে নামায ও যাকাতের নির্দেশের প্রতি অনুগত সংকর্মশীল মু'মিনদের বিরাট পুরস্কার ও পরকালীন সুখ-শান্তি বর্ণিত হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতে সুদখোরদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি এবং লাঞ্ছনার কথা উল্লিখিত হয়েছিল। তাই কোরআন পাকের সাধারণ রীতি অনুযায়ী এর সাথে সাথে ঈমানদার সংকর্মী তথা নামায ও যাকাত আদায়কারীদের সওয়াব ও পরকালীন মর্তবা উল্লেখ করে বলা হয়েছে :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ .

চতুর্থ অর্থাৎ এই আয়াতের সারমর্ম হলো, সুদের নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হওয়ার পর সুদের যেসব বকেয়া অর্থ কারও কাছে প্রাপ্য ছিল, এ আয়াতে সেগুলোর লেনদেনও হারাম করা হয়েছে।

এর ব্যাখ্যা এই যে, সুদের অবৈধতা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আরবে ব্যাপকভাবে সুদী কারবারের প্রচলন ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে এর নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হলে মুসলমানরা যথারীতি সুদের কাজ-কারবার পরিত্যাগ করেন। কিন্তু কিছু সংখ্যক লোকের বকেয়া সুদের দাবি তখনো অন্যদের উপর অবশিষ্ট ছিল। বনী সাকীফ ও বনী মখযুমের মধ্যে পরস্পর সুদের কারবার বহাল ছিল এবং বনী সাকীফের কিছু সুদের দাবি তখনও পর্যন্ত বনী মখযুমের উপর অবশিষ্ট ছিল। বনী মখযুম মুসলমান হওয়ার পর সুদের টাকা পরিশোধ করাকে অবৈধ মনে করতে থাকে। আবার এদিকে বনী সাকীফ তাদের প্রাপ্য সুদ দাবি করতে থাকে। কারণ, তারা মুসলমান ছিল না, কিন্তু মুসলমানদের সাথে শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। বনী মখযুমের বক্তব্য ছিল এই যে, ইসলাম গ্রহণ করার পর আমরা যে হালাল উপার্জন করছি, তা সুদ পরিশোধে ব্যয় করবো না।

এ মতবিরোধের ঘটনাস্থল ছিল মক্কা মুকাররমা। তখন বিজিত হয়ে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পক্ষ থেকে মক্কার শাসক ছিলেন হযরত মু'আয (রা)। অন্য রেওয়াজে মতে ইতাব ইবনে উসায়দ (রা)। তিনি নির্দেশ লাভের উদ্দেশ্যে ঘটনার বিবরণ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট লিপিবদ্ধ করে পাঠালেন। এরই প্রেক্ষিতে কোরআন পাকের আলোচ্য এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

এর সারমর্ম এই যে, ইসলাম গ্রহণ করার পর সুদের পূর্ববর্তী সব কাজ-কারবার অবিলম্বে মওকুফ করে দিতে হবে। অতীত সুদও গ্রহণ না করে শুধু মূলধন আদায় করতে হবে।

এই ইসলামী আইন কার্যকর হলে মুসলমানরা তো তা মানতে বাধ্য ছিলই, যেসব অমুসলিম গোত্র মুসলমানদের সাথে শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে ইসলামী আইন কবুল করে নিয়েছিল, তারাও এই আইন মেনে নিতে বাধ্য হলো। কিন্তু এতদসত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সা) যখন বিদায়-হজ্জের ভাষণে এ আইন ঘোষণা করলেন, তখন একথাও প্রকাশ করলেন যে, এ আইন ব্যক্তি বিশেষ, সম্প্রদায় বিশেষ কিংবা মুসলমানদের আর্থিক বার্ষিক প্রতি লক্ষ্য করে নয়; বরং সমগ্র মানব সমাজের উন্নতি ও কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখেই জারি করা হয়েছে। তাই আমি সর্বপ্রথম অ-মুসলমানদের কাছে মুসলমানদের প্রাণ্য বকেয়া সুদের বিরাট অংক মওকুফ করে দিচ্ছি। এখন তাদেরও নিজ নিজ বকেয়া সুদের অংক ছেড়ে দিতে আপত্তি থাকা উচিত নয়। তিনি এ ভাষণে বলেন :

الا ان كل ربلوا كان في الجاهلية موضوع عنكم كله لكم رؤس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون واول ربلوا موضوع ربا العباس بن عبد المطلب كله.

অর্থাৎ জাহিলিয়ত যুগে সুদের যেসব লেনদেন হয়েছে, সবগুলোর সুদ ছেড়ে দেওয়া হলো। এখন এতদ্যেকই মূলধন পাবে। সুদের অতিরিক্ত অংক পাবে না। তোমরা সুদ আদায় করে আর কারও উপর জুলুম করতে পারবে না এবং কেউ মূলধন পরিশোধ করতে অস্বীকার করে তোমাদের উপর জুলুম করতে পারবে না। সর্বপ্রথম যে সুদ ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, তা ছিল আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের প্রাণ্য সুদ। এ সুদের বিরাট অংক অমুসলিমদের কাছে প্রাণ্য ছিল। কোরআন পাকের আলোচ্য আয়াতে এ ঘটনার দিকে ইঙ্গিত এবং বকেয়া সুদ ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

মুসলমানদেরকে সন্মোদন করে **اتَّقُوا اللَّهَ** (আল্লাহকে ভয় কর) আদেশ দ্বারা আয়াতটি শুরু করা হয়েছে। এরপর আসল বিষয়ের নির্দেশ বর্ণনা করা হয়েছে। এ বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমেই কোরআন পাক সমগ্র বিশ্বের অন্য সকল বিধানের তুলনায় এক অনন্য স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী। মানুষের পক্ষে পালন করা কঠিন মনে হয়—যখনই এক্ষণে কোন আইন কোরআন পাকে বর্ণনা করা হয়েছে, তখনই আগে পরে আল্লাহর সামনে হাযিরা, হিসাব-নিকাশ এবং পরকালের শাস্তি অথবা সওয়াবের কথা উল্লেখ করে মুসলমানদের অন্তর ও মন-মানসকে তা পালন করার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে এবং এরপর নির্দেশ শুনানো হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও অতীত সুদের অংক ছেড়ে দেওয়া মানবমনের পক্ষে কঠিন হতে পারত। তাই আগে **اتَّقُوا اللَّهَ** বলে এরপর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে : **ذُرُّوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا** অর্থাৎ বকেয়া সুদ ছেড়ে দাও। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : **ان كنتم مؤمنين** অর্থাৎ যদি তোমরা ইমানদার হয়ে থাক। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহর নির্দেশ মান্য করা এবং বিরুদ্ধাচরণ না করাই ইমানের পরিচায়ক। নির্দেশটি পালন কষ্টসাধ্য ছিল বলেই নির্দেশের পূর্বে **اتَّقُوا اللَّهَ** এবং নির্দেশের পরে **ان كنتم مؤمنين** যুক্ত করা হয়েছে।

এরপর পঞ্চম আয়াতে এ নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণকারীদেরকে কঠোর শাস্তির কথা শুনানো হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা যদি সুদ না ছাড়, তবে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও। কুফর ছাড়া অন্য কোন বৃহত্তম পোনাহের কারণে কোরআন পাকে

এতবড় শাস্তির কথা আর উচ্চারিত হয়নি। এ আয়াতের শেষে বলা হয়েছে :

وَأَنْ تَبْتِمَ فَلَئِمَ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.

অর্থাৎ যদি তোমরা তওবা করে ভবিষ্যতের জন্য বকেয়া সুদ ছেড়ে দিতে কৃতসংকল্প হও, তবে তোমরা আসল মূলধন ফেরত পেয়ে যাবে। মূলধনের অতিরিক্ত আদায় করে তোমরা কারও উপর জুলুম করতে পার না এবং কেউ মূলধন হ্রাস করে কিংবা পরিশোধে বিলম্ব করে তোমাদের উপরও জুলুম করতে পারবে না। আয়াতে আসল মূলধন দেওয়াকে তওবার সাথে শর্তযুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ যদি তোমরা তওবা কর এবং ভবিষ্যতে সুদ ছেড়ে দিতে কৃতসংকল্প হও, তবেই তোমরা আসল মূলধন পাবে।

এ থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, সুদ ছেড়ে দেওয়ার সংকল্প করে তওবা না করলে মূলধনও পাবে না। এ মাস'আলার বিবরণ এই যে, যদি মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও সুদকে হারামই মনে না করে, পরন্তু আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক সুদ ছেড়ে দেওয়ার জন্য তওবা না করে, তবে এ ব্যক্তি ইসলাম থেকে খারিজ, ধর্মত্যাগী। ধর্মত্যাগীর ধন-সম্পদ তার মালিকানায় থাকে না। মুসলমান অবস্থায় সে যা উপার্জন করে, তা সরকারী ধনাগারে জমা হয়। তাই সুদ ছেড়ে দেওয়ার জন্য তওবা না করা যদি হালাল মনে করার কারণে হয়, তবে আসল মূলধনও সে ফেরত পাবে না। পক্ষান্তরে যদি হারাম মনে করেও কার্যত সুদ থেকে বিরত না হয় এবং দল গঠন করে ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে, তবে সে বিদ্রোহী। বিদ্রোহীরও সকল সহায়-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে সরকারী ধনাগারে জমা করা হয়। যখন সে তওবা করে তখন আবার সহায়-সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করা হয়। বস্তুত এ জাতীয় সুদ দিকগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করার জন্যই শর্তের আকারে বলা হয়েছে : **وَأَنْ تَبْتِمَ فَلَئِمَ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ**—অর্থাৎ যদি তওবা না কর, তবে তোমাদের মূলধনও বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে।

এরপর ষষ্ঠ আয়াতে সুদখোরীর মানবতা বিরোধী কাণ্ডকীর্তির বিপরীতে পূত-পবিত্র চরিত্র এবং দরিদ্র ও নিঃস্বদের প্রতি কৃপামূলক ব্যবহার শিক্ষা দিয়ে বলা হয়েছে :

وَأَنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ.

—অর্থাৎ তোমার খাতক যদি রিক্তহস্ত হয় —ঋণ পরিশোধে সক্ষম না হয়, তবে শরীয়তের নির্দেশ এই যে, তাকে স্বাচ্ছন্দ্যশীল হওয়া পর্যন্ত সময় দেওয়া বিধেয়। যদি তাকে ঋণ থেকেই রেহাই দিয়ে দাও, তবে তা তোমার জন্য আরও উত্তম।

সুদখোরদের অভ্যাস এই যে, খাতক নির্দিষ্ট সময়ে ঋণ পরিশোধে সক্ষম না হলে সুদের অংক আসলের সাথে যোগ করে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের কারবার চালায় এবং সুদের হারও আগের চাইতে বাড়িয়ে দেয়।

এখানে শ্রেষ্ঠতম বিচারপতি আল্লাহ তা'আলা আইন প্রণয়ন করে দিয়েছেন যে, কোন খাতক বাস্তবিকই নিঃস্ব হলে এবং ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম হলে তাকে অতিষ্ঠ করা জায়েয নয় ; বরং তাকে সক্ষম হওয়া পর্যন্ত সময় দেওয়া উচিত। সাথে সাথে এ ব্যাপারেও উৎসাহিত করেছেন যে, যদি এ গরীবকে ক্ষমা করে দাও তবে তা তোমাদের জন্য অধিক উত্তম।

এখানে ক্ষমা করাকে কোরআন পাক সদকা শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, এ ক্ষমা প্রদর্শন তোমাদের জন্য সদকা হয়ে যাবে এবং বিরাট সওয়াবের কারণ হবে।

এছাড়া আরও বলেছেন : ক্ষমা করা তোমাদের জন্য উত্তম। অথচ বাহ্যতঃ এতে তাদের ক্ষতি। কারণ, সুদ তো ছেড়েই দেওয়া হয়েছিল, এখন মূলধনও গেল। কিন্তু কোরআন পাক একে উত্তম বলেছেন এর কারণ বিবিধ : এক. এটা যে উত্তম, তা এ দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের পর চোখের সামনে এসে যাবে। তখন এ সামান্য অর্থের বিনিময়ে জান্নাতের চিরস্থায়ী নিয়ামত অর্জিত হবে। দুই. এতে সম্ভবত ইঙ্গিত রয়েছে যে, দুনিয়াতেও এ কার্যের কল্যাণকারিতা প্রত্যক্ষ করা যাবে। অর্থাৎ তোমাদের ধন-সম্পদে বরকত হবে। বরকতের স্বরূপ এই যে, অল্প ধন-সম্পদ দ্বারা অধিক কাজ সাধিত হবে। এর জন্য ধন-সম্পদের পরিমাণ ও সংখ্যা বেড়ে যাওয়া জরুরী নয়। চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা এই যে, খয়রাতকারীদের ধন-সম্পদে অপরিসীম বরকত হয়। তাদের অল্প ধন-সম্পদ দ্বারা এত অধিকতর কাজ সাধিত হয় যে, হারাম মালের অধিকারীদের বিপুল পরিমাণ অর্থকড়ি দ্বারা তত কাজ সাধিত হয় না।

বরকতহীন ধন-সম্পদের অবস্থা এই যে, যে উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হয়, তা অর্জিত হয় না কিংবা উদ্দেশ্য নয়—এমন কাজেই তা অধিক ব্যয়িত হয়ে যায়। যেমন, ঔষধপত্র, চিকিৎসা এবং ডাক্তারের দর্শনী ইত্যাদি। এসব কাজে ধনীদিগের বিস্তর অর্থ ব্যয় হয়ে যায়। গরীবদের এগুলোর দরকার খুব কমই হয়ে থাকে। প্রথমত, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সুস্থতার নেয়ামত দান করেন। ফলে চিকিৎসায় অর্থ ব্যয় করার বড় একটা প্রয়োজনই তাদের জন্য দেখা দেয় না। দ্বিতীয়ত, অসুস্থ হলেও মাঝুলী খরচেই তাদের জন্য সুস্থতা অর্জিত হয়ে যায়। এ হিসাবে নিঃস্ব খাতককে কর্তৃক মারফ করে দেওয়া বাহ্যত অলাভজনক দেখা গেলেও কোরআনের এ শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে এ একটি উপকারী ও লাভজনক কাজ।

নিঃস্ব খাতকের সাথে নম্রতার শিক্ষাসম্বলিত সহীহ হাদীসসমূহের কতিপয় বাক্য তুলুন :
 তিবরানীর এক হাদীসে আছে—যেদিন কোন ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া মাথা গুঁজবার কোন ছায়া পাবে না, সেদিন যে ব্যক্তি স্বীয় মস্তকের উপর আল্লাহর রহমতের ছায়া কামনা করে, তার উচিত নিঃস্ব খাতকের সাথে নম্র ব্যবহার করা কিংবা তাকে মারফ করে দেওয়া।

সহীহ মুসলিমেও এ বিষয়ের হাদীস রয়েছে। মসনদে আহমদের এক হাদীসে আছে—যে ব্যক্তি কোন নিঃস্ব দেনাদারকে সময় দেবে, সে প্রত্যহ দেনা পরিমাণ অর্থ সদকা করার সওয়াব পাবে। দেনার মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বে সময় দেওয়ার জন্য হবে এ হিসাব। যখন দেনার মেয়াদ পূর্ণ হয়ে যায় এবং দেনাদার দেনা পরিশোধ করতে সক্ষম না হয়, তখন সময় দিলে প্রত্যহ ষিগুণ পরিমাণ অর্থ সদকা করার সওয়াব পাবে।

এক হাদীসে আছে—যে ব্যক্তি চায় যে, তার দোয়া কবুল হোক কিংবা বিপদ দূর হোক, তার উচিত নিঃস্ব দেনাদারকে সময় দেওয়া।

এরপর শেষ আয়াতে পুনরায় কেয়ামতের ভয়, হাশরের হিসাব-নিকাশ এবং সওয়াব ও আযাব উল্লেখ করে সুদ সংক্রান্ত এ আয়াত সমাপ্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে :

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ .

অর্থাৎ—এ দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে হাযিরার জন্য আনীত হবে। অতঃপর প্রত্যেকেই নিজ নিজ কৃতকর্মের পুরোপুরি প্রতিদান পাবে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : অবতরণের দিক দিয়ে এটি সর্বশেষ আয়াত। এরপর কোন আয়াত অবতীর্ণ হয়নি। এর একত্রিশ দিন পর ছয় (সা) ওফাত পান। কোন কোন রেওয়ায়েতে নয় দিন পর হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর ওফাতের কথা বর্ণিত আছে।

এ পর্যন্ত সুদের বিধি-বিধান সম্পর্কিত সূরা বাকারার আয়াতসমূহের তফসীর বর্ণিত হলো। সুদের অবৈধতা ও নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে কোরআন পাকে সূরা বাকারায় সাত আয়াত, সূরা আল-ইমরানে এক আয়াত এবং সূরা নিসায় দু'টি আয়াত বর্ণিত হয়েছে। সূরা ক্রমেও একটি আয়াত আছে, যার তফসীল মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ একেও সুদের অর্থে ধরেছেন এবং কেউ কেউ অন্যবিধ ব্যাখ্যাও প্রদান করেছেন। এভাবে কোরআন পাকের দশটি আয়াতে সুদের বিধি-বিধান উল্লিখিত হয়েছে।

সুদের পূর্ণ স্বরূপ বর্ণনা করার পূর্বে সূরা আল-ইমরান, সূরা নিসা এবং সূরা ক্রমে উল্লিখিত অবশিষ্ট আয়াতসমূহের অনুবাদ এবং ব্যাখ্যাও এ স্থলে করে দেওয়া সমীচীন মনে হয়। তাতে সবগুলো আয়াতই একত্র হওয়ার ফলে সুদের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হবে।

সূরা আল-ইমরানের ১৩শ রক্ষু ১৩০তম আয়াতটি এই :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

অর্থাৎ—“হে ইমানদারগণ, তোমরা সুদ খেয়ো না দ্বিগুণ, চতুর্গুণ এবং আল্লাহকে ভয় কর। আশা করা যায় যে, তোমরা সফল হবে।”

এ আয়াত অবতরণের একটি বিশেষ প্রেক্ষাপট রয়েছে। জাহিলিয়ত আমলের আরবে সুদ গ্রহণের সাধারণ রীতি ছিল এই যে, একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য সুদের উপর বাকি দেওয়া হতো। মেয়াদ এসে গেলে দেনাদার যদি দেনা শোধ করতে অক্ষম হতো, তবে সুদের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়ার শর্তে তাকে আরও সময় দেওয়া হতো। এমনভাবে দ্বিতীয় মেয়াদেও যদি দেনা শোধ করতে অক্ষম হতো, তবে সুদের পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দেওয়া হতো। সাধারণ তফসীর গ্রন্থসমূহে এবং বিশেষভাবে ‘সুবাবুনুকূল’ গ্রন্থে মুজাহিদের রেওয়ামতেক্রমে এ বিষয় উল্লিখিত আছে।

জাহিলিয়ত যুগের সে সর্বনাশ প্রথা বিলোপ করার জন্যই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। এ কারণেই আয়াতে **أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً** (অর্থাৎ কয়েকগুণ অতিরিক্ত) বলে তাদের প্রচলিত পদ্ধতির নিন্দা এবং অপরের চরম সর্বনাশ সাধন করে স্বার্থ উদ্ধার করার ঘৃণ্য মানসিকতা সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে একে হারাম করা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, কয়েকগুণ অতিরিক্ত না হলে সুদ হারাম হবে না। কেননা, সূরা বাকারার ও নিসায় যে কোন ধরনের সুদের অবৈধতা পরিষ্কার বর্ণিত হয়েছে; কয়েকগুণ বেশি হোক বা না হোক। এর দৃষ্টান্ত যেমন কোরআনের স্থানে স্থানে বলা হয়েছে : **وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا** :

অর্থাৎ—আমার আয়াতের বিনিময়ে অল্প মূল্য গ্রহণ করো না। এতে ‘অল্প মূল্য’ বলার কারণ এই যে, খোদায়ী আয়াতের বিনিময়ে যদি সত্ত্বাজ্ঞাও গ্রহণ করা হয়, তবে অল্প মূল্যই হবে। এর অর্থ এই নয় যে, কোরআনের আয়াতের বিনিময়ে অল্প মূল্য গ্রহণ করা তো হারাম,

বেশি মূল্য হারাম নয়। এমনভাবে এ আয়াতে **أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً** শব্দটি তাদের লজ্জাকর পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তা করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। এটি অবৈধতার শর্ত নয়।

সুদের প্রচলিত পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তা করলে একথাও বলা যায় যে, সুদের অভ্যাস গড়ে উঠলে সুদ শুধু সুদই থাকে না, বরং অপরিহার্যভাবে দ্বিগুণ চতুর্গুণ হয়ে ক্রমবর্ধিত অস্তিত্ব পেয়ে যায়। কারণ, সুদের যে অংক সুদখোরের মালের অন্তর্ভুক্ত হয়, সে অভিরিক্ত অংকটিও পুনবার সুদেই খাটানো হয়। ফলে সুদ কয়েকগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে এ নিয়ম অব্যাহত থাকলে সুদের অংক **أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً** অর্থাৎ কয়েকগুণেরও কয়েকগুণ হয়ে যায়। এমনভাবে প্রত্যেক সুদ পরিমাণে দ্বিগুণ চতুর্গুণই হয়।

সুদ সম্পর্কে সূরা নিসার দু'টি আয়াত এই :

فَيُظْلَمُ مَنْ الذِّينَ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ
مَّيِّبَاتٍ اللّٰهُ كَثِيرًا وَأَخْذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا .

অর্থ—“ইহুদীদের এসব বড় বড় অপরাধের কারণে আমি অনেক পবিত্র বস্তু—যা তাদের জন্য হালাল ছিল—তাদের উপর হারাম করে দিয়েছি এবং তা এ কারণে যে, তারা অনেক মানুষের সুগুণ শ্রান্তির পথে অস্ত্রায় হয়ে যেত এবং তা এ কারণে যে, তারা সুদ গ্রহণ করতো। অথচ তাদেরকে সুদ গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছিল এবং এ কারণে যে, তারা মানুষের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করতো। আমি তাদের মধ্যে যারা কফির, তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তৈরি করে রেখেছি।”

এ দু'আয়াত থেকে জানা গেল যে, মুসা (আ)-এর শরীয়তেও সুদ হারাম ছিল। ইহুদীরা যখন এর বিরুদ্ধাচরণ করে, তখন দুনিয়াতেও তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হয় অর্থাৎ তারা জাগতিক লালসার বশবর্তী হয়ে হারাম খেতে শুরু করলে আল্লাহ তা'আলা কতক পবিত্র বস্তুও তাদের জন্য হারাম করে দেন।

সূরা রুমের ৪র্থ রুকূর ৩৯তম আয়াতে আছে :

وَمَا أُتَيْتُمْ مِنْ رَبِّا لَّيْرَبُّوْا فِىْ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا
أُتَيْتُمْ مِنْ زَكٰوةٍ تَرْبُدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ .

অর্থ—“যে বস্তু তোমরা মানুষের ধন-সম্পদে পৌছে বেড়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে দাও, তা আল্লাহর কাছে বাড়ে না এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় যাকাত দিলে যাকাত প্রদানকারী আল্লাহর কাছে তা বাড়িয়ে নেয়।”

কোন কোন তক্ষসীরকার ‘রিবা’ শব্দ এবং বেড়ে যাওয়ার অর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে এ আয়াতকে সুদের অর্থে ধরে নিয়েছেন। তাঁরা এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন : সুদ গ্রহণে যদিও বাহ্যত ধন-সম্পদের বৃদ্ধি দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা বৃদ্ধি নয়। উদাহরণত কারও দেহ ফুলে গেলে বাহ্যত তা দেহের বৃদ্ধি বলে মনে হলেও কোন বৃদ্ধিমানই একে পুষ্টি ও বৃদ্ধি মনে করে আনন্দিত হয় না। বরং একে ধ্বংসের পূর্বাভাসই মনে করে। এর বিপরীতে যাকাত ও সদকা দেওয়ার মধ্যে যদিও বাহ্যত ধন-সম্পদ হ্রাস পায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হ্রাস

নয়, বরং ধন-সম্পদের প্রবৃদ্ধির কারণ। উদাহরণতঃ কেউ কেউ পেটের দূষিত রক্ত বের করার জন্য জ্বালাপ ব্যবহার করে কিংবা শিঙ্গা লাগিয়ে দূষিত রক্ত বের করে নেয়। তার ফলে বাহ্যত সে ব্যক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং দেহে ভীষণ ভীষণ অসুস্থতা হয়। কিন্তু অভিজ্ঞজনের দৃষ্টিতে এ অসুস্থতা তার বল ও শক্তিরই অগ্রদূত।

কোন কোন তফসীরবিদ এ আয়াতকে সুদ নিষেধাজ্ঞার অর্থে ধরেন নি। তাঁদের মতে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি দ্বীয়া ধন-সম্পদ অপরকে আন্তরিকতা ও সদুদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে নয়, বরং প্রতিদানে আরও বেশি পাওয়ার নিয়তে দেয়, তা বাহ্যত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলেও আল্লাহর কাছে তা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। উদাহরণতঃ অনেক সমাজে বিবাহ উপলক্ষে নিমন্ত্রিতদের পক্ষ থেকে বর-কনেকে টাকা-পয়সা ও আসবাবপত্র দেওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে। এগুলো উপটৌকন হিসাবে নয়, বরং প্রতিদান গ্রহণের উদ্দেশ্যেই দেওয়া হয়। এ দান যেহেতু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নয়, বরং নিজ বার্থে হয়ে থাকে, তাই আয়াতে বলা হয়েছে যে, এভাবে ধন-সম্পদ বাহ্যত ক্রমবর্ধমান হতে থাকলেও আল্লাহর কাছে তা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। হ্যাঁ, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য যে সব যাকাত ও সদকা দেওয়া হয়, তাতে বাহ্যত ধন-সম্পদ হ্রাস পেলেও আল্লাহর কাছে তা দ্বিগুণ-চতুর্গুণ হয়ে যায়।

এ তফসীর অনুযায়ী উল্লিখিত আয়াতের বিষয়বস্তু — **وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ** আয়াতের বিষয়বস্তুর অনুরূপ হয়ে যায়। এতে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সর্বাধিকার করে বলা হয়েছে : আপনি প্রতিদানে অধিক ধন-সম্পদ অর্জন করার নিয়তে কারও প্রতি অনুগ্রহ করবেন না।

সূরা রুমের আলোচ্য আয়াতে বাহ্যত দ্বিতীয় ব্যাখ্যাই অগ্রগণ্য মনে হয়। প্রথম কারণ এই যে, সূরা রুম মক্কায় অবতীর্ণ। অবশ্য, এতে যদিও প্রত্যেকটি আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হওয়া জরুরী নয়; কিন্তু অন্য প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত মক্কায় অবতীর্ণ হওয়ার প্রবল ধারণা অবশ্যই জন্মে। আয়াতটি যদি মক্কায় অবতীর্ণ হয়ে থাকে, তবে একে সুদ-নিষেধাজ্ঞার অর্থে ধরে নেওয়া যায় না। কেননা, সুদের নিষেধাজ্ঞা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, এ আয়াতের পূর্বে উল্লিখিত বিষয়বস্তু দ্বারাও দ্বিতীয় ব্যাখ্যার অগ্রগণ্যতা বোঝা যায়। পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে :

فَإِذَا الْقُرْبَىٰ حَقُّهُ وَالْمِسْكِينُ وَابْنُ السَّبِيلِ— ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ—

অর্থাৎ—“আত্মীয়-স্বজনকে তার প্রাপ্য দিয়ে দাও এবং মিসকীন ও মুসাফিরকেও। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে, এটা তাদের জন্য উত্তম।”

এ আয়াতে শর্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়তে ব্যয় করা হলেই আত্মীয়-স্বজন, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য ব্যয় করা সওয়াবের কাজ হবে। অতএব, এর পরবর্তী আয়াতে এ শর্তের ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে, প্রতিদানে বেশি পাওয়ার নিয়তে যদি কাউকে ধন-সম্পদ দেওয়া হয়, তবে তা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দেওয়া হলো না। কাজেই এর সওয়াব পাওয়া যাবে না।

মোটকথা, সুদের অবৈধতার প্রেক্ষে এ আয়াতটিকে বাদ দিলেও পূর্বোল্লিখিত আরও অনেক আয়াত বর্তমান রয়েছে। তন্মধ্যে সূরা আলে-ইমরানের এক আয়াতে দ্বিগুণ-চতুর্গুণ সুদের

অবৈধতা বর্ণিত হয়েছে এবং অবশিষ্ট সব আয়াতে সর্বাবস্থায় সুদের অবৈধতা ব্যক্ত হয়েছে। এ বিবরণ থেকে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সুদ দ্বিগুণ-চতুর্গুণ হোক বা চক্রবৃদ্ধি হোক কিংবা একতরফা হোক সবই হারাম এবং হারামও এমন কঠোর যে, এর বিরুদ্ধাচরণ করলে আত্মাহু ও তাঁর রসুলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শোনান হয়েছে।

রিবা'র আরও কিছু ব্যাখ্যা

আজকাল সুদ ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ কারণে কোরআন ও সুন্নাহতে যখন এর অবৈধতা ও নিষেধাজ্ঞা দৃষ্টিগোচর হয় এবং এর স্বরূপ বোঝা ও বোঝান হয়, তখন সাধারণ মন-মানস এর অবৈধতা মেনে নিতে ইতস্তত করে এবং নানা রকম বাহানা সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হয়। তাই আলোচনাটিকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে এর প্রত্যেকটি দিক সম্পর্কে পৃথকভাবে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। বিষয়টির গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য করেই এখানে এ সম্পর্কিত একটা ধারাবাহিক আলোচনার সূত্রপাত করা হচ্ছে।

প্রথম : কোরআন ও সুন্নাহতে 'রিবা'র স্বরূপ কি এবং এর প্রকার কি কি ?

দ্বিতীয় : রিবার অবৈধতা ও নিষেধাজ্ঞার রহস্য ও উপযোগিতা কি ?

তৃতীয় : সুদ বা 'রিবা' যতই মন্দ হোক না কেন, এটি বর্তমান বিশ্বের অর্থনীতি ও বাণিজ্য নীতির প্রধান ভিত্তিতে পরিণত হয়েছে। যদি কোরআনী নির্দেশ অনুযায়ী একে পরিত্যাগ করা হয়, তবে ব্যাংক ও বাণিজ্যনীতি কিভাবে চালু থাকবে ?

'রিবা' শব্দের ব্যাখ্যা : একটি বিভ্রান্তিকর ঘটনা ও উদ্ভ্রম : 'রিবা' আরবী ভাষার একটি বহুল প্রচলিত শব্দ। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নবুয়ত প্রাপ্তি এবং কোরআন অবতরণের পূর্বে জাহিলিয়ত যুগের আরবেও এ শব্দটি প্রচলিত ছিল। শুধু প্রচলিতই নয়, বরং রিবার লেনদেনও তখনকার সমাজে ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেছিল। সুতরাং সূরা নিসার আয়াত থেকে আরও জানা যায় যে, 'রিবা' শব্দ এবং এর লেনদেন তওরাতের আমলেও সুবিদিত ছিল এবং তওরাতেও একে হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছিল।

যে শব্দ প্রাচীনকাল থেকেই আরবে ও নিকটবর্তী দেশসমূহে সুবিদিত রয়েছে, যার লেনদেনেরও প্রচলন রয়েছে এবং যার অবৈধতা ও নিষেধাজ্ঞা বর্ণনা করার সাথে কোরআন পাক বলে যে, মুসা (আ)-এর উদ্ঘাটনের জন্যও সুদ বা 'রিবা' হারাম করা হয়েছিল, তখন এটা জানা কথা যে, সেই শব্দের স্বরূপ এমন ধরনের কোন অস্পষ্ট বিষয় হতে পারে না যে, তাকে বুঝতে গিয়ে অহেতুক জটিলতা দেখা দেবে।

এ কারণেই অষ্টম হিজরীতে যখন সুদ বা 'রিবা'র অবৈধতা সম্পর্কে সূরা বাকারার আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়, তখন কোথাও বর্ণিত হয়নি যে, সাহাবায়ে-কিরাম 'রিবা' শব্দের স্বরূপ বোঝার ব্যাপারে কোনরূপ সন্দ্বিগততার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং মহানবী (সা)-এর কাছে থেকে অন্যান্য ব্যাপারের মত রিবার স্বরূপ সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। বরং দেখা গেছে যে, মদ্যপানের অবৈধতা অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে যেমন সাহাবায়ে কিরাম তা বাস্তবায়নে তৎপর হয়েছিলেন, তেমনি রিবার অবৈধতার বিধান নাযিল হওয়ার সাথে সাথেই তাঁরা রিবার যাবতীয় লেনদেনও বন্ধ করে দিয়েছিলেন। অতীতকালের কাজ-কারবারে মুসলমানদের যেসব সুদ অ-মুসলমানদের কাছে প্রাপ্য ছিল, মুসলমানরা তাও ছেড়ে দেন। অ-মুসলমানদের যেসব মুসলমানদের কাছে সুদ প্রাপ্য ছিল, নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হওয়ার পর মুসলমানরা তা পরিশোধে

অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। এ মাস'আলা মক্কার প্রশাসকের আদালতে উপস্থিত হলে তিনি মহানবী (সা)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন। এর ফয়সালা সূরা বাকারার সংশ্লিষ্ট আয়াতে আত্মাহুত তরফ থেকেই অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ অতীতকালের বকেয়া সুদের লেন-দেনও অবৈধ বলে ঘোষণা করে দেওয়া হয়।

এতে অ-মুসলমানদের পক্ষ থেকে এরূপ অভিযোগ উত্থাপনের অবকাশ ছিল যে, ইসলামী শরীয়তের একটি নির্দেশের কারণে তাদের এত বিপুল পরিমাণ অর্থ কেন মারা যাবে? এ অভিযোগ নিরসনের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) বিদায়-হজ্জের ভাষণে ঘোষণা করেন যে, এ নির্দেশের আওতাধীন শুধু অ-মুসলমানরাই নয়—মুসলমানরাও। উভয়ের ক্ষেত্রেই এ নির্দেশ সমভাবে প্রযোজ্য। সেমতে সর্বপ্রথম মহানবী (সা)-এর চাচা হযরত আব্বাস (রা)-এর বিরাট অংকের সুদ ছেড়ে দেওয়া হয়।

মোটকথা, রিবা নিষিদ্ধ হওয়ার সময় 'রিবা' শব্দের ব্যাপারে কোন অস্পষ্টতা ছিল না—সকলের কাছেই তার প্রকৃত অর্থ সুবিদিত ছিল। আরবরা যাকে রিবা বলতো এবং যার লেন-দেন করতো, কোরআন তাকেই হারাম করেছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) এ বিধানকে শুধু নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতেই নয়—দেশের আইন হিসাবেও জারি করেন। তবে এমন কতকগুলো প্রকারকেও তিনি রিবাব অন্তর্ভুক্ত করে দেন, যেগুলোকে সাধারণভাবে রিবা মনে করা হতো না। এসব প্রকার নির্ধারণের ব্যাপারেই হযরত ফারুক-আযম (রা)-এর মনে ষটকা দেখা দিয়েছিল এবং এগুলোর ব্যাপারেই মুজতাহিদ ইমামগণ মতভেদ পোষণ করেছেন। নতুবা আরবরা যাকে রিবা বলতো, সেই আসল রিবা সম্পর্কে কারও কোন সন্দেহ ছিল না এবং কেউ এ নিয়ে কোন মতভেদও ব্যক্ত করেন নি।

এবার আরবে প্রচলিত 'রিবা' সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। তফসীরবিদ ইবনে জারীর মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন : জাহিলিয়ত আমলে প্রচলিত ও কোরআনে নিষিদ্ধ 'রিবা' হলো কাউকে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ঋণ দিয়ে মূলধনের অতিরিক্ত নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করা। আরবরা তাই করতো এবং নির্দিষ্ট মেয়াদে ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে সুদ বাড়িয়ে দেওয়ার শর্তে মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়া হতো। হযরত কাতাদাহ এবং অন্যান্য তফসীরবিদ থেকেও এ কথাই বর্ণিত হয়েছে। —(তফসীরে ইবনে-জারীর, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬২)

স্পেনের খ্যাতনামা তফসীরবিদ আবু হাইয়ান গারনাতী রচিত 'তফসীরে-বাহুরে মুহীত-এ'ও জাহিলিয়ত আমলে প্রচলিত রিবাব সংজ্ঞা ও প্রকৃতি এরূপই বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ তারা অর্থ লগ্নি করে মুনাফা গ্রহণ করতো এবং ঋণের মেয়াদ যতই বেড়ে যেতো, ততই সুদ বাড়িয়ে দেওয়া হতো। এরাই বলতো যে, ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে মুনাফা নেওয়া যেমন জায়েয, তেমনি অর্থ ঋণ দিয়ে মুনাফা নেওয়াও তদ্রূপ জায়েয হওয়া উচিত। কোরআন পাক একে হারাম করেছে এবং ক্রয়-বিক্রয় ও রিবাব মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেছে।

এ বিষয়বস্তুই তফসীর ইবনে কাসীর, তফসীরে কবীর ও রুহুল-মা'আনী প্রভৃতি বিশিষ্ট তফসীর গ্রন্থে নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েতের মাধ্যমে বর্ণিত রয়েছে।

ইবনে-আরাবী আহকামুল-কোরআনে বলেছেন :

الرِّبَا فِي اللِّغَةِ الرِّبَاوَةِ وَالْمُرَادُ بِهِ فِي الْآيَةِ كُلُّ زِيَادَةٍ لَا يُقَابَلُهَا
عَوَضٌ - (ص ১০১ ج ২) -

—অর্থাৎ অভিধানে ‘রিবা’ শব্দের অর্থ অতিরিক্ত। আয়াতে রিবা বলতে প্রত্যেক এমন অতিরিক্ত পরিমাণকে বোঝান হয়েছে যার বিপরীতে কোন বিনিময় নেই। —(আহকামুল-কোরআন : ২য় খণ্ড, ১০১ পৃঃ)

ইমাম রাযী স্বীয় তফসীরে বলেন : ‘রিবা’ দু’রকম—ক্রয়-বিক্রয়ের রিবা ও ঋণের রিবা। জাহিলিয়াত যুগের আরবে দ্বিতীয় প্রকার রিবাই প্রচলিত ও সুবিদিত ছিল। তারা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য কাউকে অর্থ প্রদান করতো এবং প্রতি মাসে তার মুনাফা আদায় করতো। নির্দিষ্ট মেয়াদে আদায় না হলে সুদের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়ার শর্তে মেয়াদও বাড়িয়ে দিত। জাহিলিয়াত যুগের সেই রিবাই কোরআন হারাম করেছে।

ইমাম জাসসাস ‘আহকামুল-কোরআন’-এ রিবার অর্থ বর্ণনা করে বলেন :

هو القرض المشروط فيه الاجل وزيادة مال على المستقرض-

অর্থাৎ—এ এমন ঋণ, যা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য এ শর্তে দেওয়া হয় যে, খাতক তাকে মূলধন থেকে কিছু বেশি পরিমাণ অর্থ দেবে।

হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) রিবার সংজ্ঞা বর্ণনা করে বলেন : كل قرض نفعاً فهو ربا

অর্থাৎ—যে ঋণ কোন মুনাফা টানে, তা-ই রিবা। —(জামে’ সগীর)

মোটকথা, কাউকে ঋণ দিয়ে তার মাধ্যমে মুনাফা গ্রহণ করাই সুদ বা রিবা। জাহিলিয়াত আমলে তা-ই প্রচলিত ও সুবিদিত ছিল। কোরআন পাকের উল্লিখিত আয়াত একে সুস্পষ্টভাবে হারাম করেছে। এসব আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে সাহাবায়ে-কিরাম এ কারবার পরিত্যাগ করেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) আইনগত বিধি-বিধানের একে প্রয়োগ করেন। এতে কোনরূপ অস্পষ্টতা বা দ্ব্যর্থতা ছিল না এবং এ ব্যাপারে কেউ সন্দেহভারও সম্বাহীন হয়নি।

তবে নবী করীম (সা) কয়েক রকম ক্রয়-বিক্রয়কেও রিবার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আরম্ভরা এগুলোকে রিবা মনে করতো না। উদাহরণত তিনি ছয়টি বস্তু সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছেন যে, এগুলো অদল-বদল করতে হলে সমান সমান এবং হাতে হওয়া দরকার। কম-বেশি কিংবা বাকি হলে তাও রিবা হবে। এ ছয়টি বস্তু হচ্ছে সোনা, রূপা, গম, যব, খেজুর ও আড়ুর।

আরবে কাজ-করিবারের কয়েকটি প্রকার ‘মুযাবানা’ ও ‘মুহাকাল্লা’ নামে প্রচলিত ছিল। সুদের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) এগুলোকেও সুদের অন্তর্ভুক্ত করে দেন। —(ইবনে-কাসীর)

এতে প্রণিধানযোগ্য বিষয় ছিল এই যে, বিশেষ করে উপরোক্ত ছয়টি বস্তুর মধ্যেই সুদ সীমাবদ্ধ, না এগুলো ছাড়া আরও কিছু বস্তু এ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত হবে? ইয়রত ফারুকে আযম (রা) এ সব প্রশ্নের সম্বাহীন হয়েই নিম্নোক্ত উক্তি করেছিলেন :

ان آية الربوا من آخر ما نزل من القرآن وان النبي صلى الله عليه وسلم قبض قبل ان يبين لنا فدعوا الربوا والريبة * (احكام القرآن

১. বৃক্ষহিত ফলকে বৃক্ষ থেকে আহরিত ফলের বিনিময়ে অনুমান করে বিক্রয় করাকে ‘মুযাবানা’ বলা হয় এবং ক্ষেত অকর্ষিত খাদ্যশস্য : যথা—গম, বুট ইত্যাদিকে তকনা পরিষ্কার করা খাদ্য যথা : গম, বুট ইত্যাদির বিনিময়ে অনুমান করে বিক্রয় করাকে ‘মুহাকাল্লা’ বলা হয়। যেহেতু অনুমানে কম-বেশি হওয়ার আশংকা থাকে তাই এগুলো নিষিদ্ধ হয়েছে।

جصاص، ص ۵۵۷، وتفسير ابن كثير بحواله ابن ماجه ص ۲۲۸ ج (۱)۔

অর্থাৎ—সুদের আয়াত হচ্ছে কোরআন পাকের সর্বশেষ আয়াতসমূহের অন্যতম। এর পূর্ণ বিবরণ দান করার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ (সা) দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। তাই এখন সতর্ক পদক্ষেপ জরুরী। সুদ তো অবশ্যই বর্জন করতে হবে, তদুপরি যেসব ব্যাপারে সুদের সন্দেহও হয়, সেগুলোও পরিহার করা উচিত। —(আহ্কামুল-কোরআন, জাসাস, ইবনে-কাসীর)

ফারুক আযম (রা)-এর উদ্দেশ্য ক্রয়-বিক্রয়ের এসব প্রকারকেও রিবার অন্তর্ভুক্তিকরণ ছিল, যেগুলোকে জাহিলিয়ত যুগের আরবে সুদ মনে করা হতো না। রাসূলুল্লাহ (সা) এগুলোকে সুদের অন্তর্ভুক্ত করে হারাম করেছিলেন। আসল 'রিবা' বা সুদ যা সমগ্র আরবে সুবিদিত ছিল, সাহাবায়ে কিরাম যা ত্যাগ করেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) যে সম্পর্কে আইন জারি করে বিদায়-হজ্জের ভাষণে ঘোষণা করেছিলেন, সে সুদ সম্পর্কে ফারুক আযমের মনে কোনরূপ খটকা বা সন্দেহ দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা ছিল, এরূপ চিন্তাও করা যায় না। কিন্তু সুদের যেসব প্রকার সম্পর্কে তিনি সন্দিগ্ধ ছিলেন, সেগুলোর ব্যাপারে তিনি সমাধান প্রদান করেন যে, যেসব ব্যাপারে সুদের সন্দেহ হয়, সেগুলোকেও পরিত্যাগ করতে হবে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আজকাল কিছু সংখ্যক লোক, যারা পাশ্চাত্যের বাহ্যিক জাঁকজমক, ধনাঢ্যতা এবং বর্তমান বাণিজ্যনীতি ইত্যাদিতে সুদের প্রাধান্য বিস্তারের মোহে মোহমগ্ন, তারা ফারুক আযমের উপরোক্ত উক্তির ব্যাখ্যা এই বের করেছে যে, রিবার অর্থই অস্পষ্ট ও অব্যক্ত ছিল। কাজেই এতে গবেষণার অবকাশ রয়েছে। তাদের এ অভিমত যে ভ্রান্ত, তার যথেষ্ট প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। 'আহ্কামুল-কোরআন'-এ ইবনে আরাবী এ শ্রেণীর লোকের কঠোর সমালোচনা করেছেন, যারা ফারুক আযমের উপরোক্ত উক্তির ভিত্তিতে সুদের আয়াতকে অস্পষ্ট বলে অভিহিত করতে চেয়েছে। তিনি বলেন :

ان من زعم ان هذه الاية مجملة فلم يفهم مقاطع الشريعة فان الله تعالى ارسل رسوله الى قوم هو منهم بلغتهم وأزل عليه كتابه تيسيرا منه بلسانه ولسانهم-والربا في اللغة الرباوة والمراد به في الاية كل زيادة لايقابلها عوض-

অর্থাৎ—যারা রিবার আয়াতকে অস্পষ্ট বলেছে, তারা শরীয়তের অকাটা বিষয়সমূহ বুঝতে সক্ষম হয়নি। কেননা, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূলকে একটি মানবগোষ্ঠীর নিকট প্রেরণ করেছেন এবং তাদেরই ভাষায় প্রেরণ করেছেন। স্বীয় গ্রন্থ সহজ করার জন্য তাদেরই ভাষায় তা অবতারণ করেছেন। তাদের ভাষায় 'রিবা' শব্দের অর্থ অতিরিক্ত। আয়াতে ঐ অতিরিক্তটুকুকে বোঝানো হয়েছে, যার বিপরীতে কোন সম্পদ নেই বরং মেয়াদ আছে।

ইমাম রাযী তফসীরে কবীরে বলেন, রিবা দু'রকম : (এক) বাকি বিক্রয়ের রিবা এবং (দুই) নগদ ক্রয়-বিক্রয়ে বেশি নেওয়ার রিবা। প্রথম প্রকার জাহিলিয়ত যুগে প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত ছিল। সে যুগের লোকেরা এরূপ লেনদেন করতো। দ্বিতীয় প্রকার রিবা সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, অমুক অমুক বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়ে কম-বেশি করা রিবার অন্তর্ভুক্ত।

আহ্কামুল-কোরআন জাসাসে বলা হয়েছে : রিবা দু'রকম—একটি ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে এবং অপরটি ক্রয়-বিক্রয় ছাড়া। দ্বিতীয় প্রকারই ছিল জাহিলিয়ত যুগের রিবা। এর সংজ্ঞা এই

যে, যে ঋণে মেয়াদের হিসাবে কোন মুনাফা নেওয়া হয়, তা-ই রিবা। ইবনে-কুশদ 'বিদায়াতুল-মুজতাহিদ' গ্রন্থে তা-ই লিখেছেন। তিনি এ রিবার অবৈধতা কোরআন, সুন্নাহ ও ইজমার দ্বারা প্রমাণ করেছেন।

ইমাম ভোয়াহাভী 'শরহে মা'আনিউল-আসার' গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন : কোরআনে উল্লিখিত 'রিবা' দ্বারা পরিষ্কার ও সুস্পষ্টভাবে সেই রিবাকেই বোঝান হয়েছে, যা ঋণের উপর নেওয়া হতো। জাহিলিয়ত যুগেও একেই রিবা বলা হতো। এরপর রাসূল (সা)-এর বর্ণনা ও তাঁর সুন্নত থেকে অন্য প্রকার রিবার বিষয় জানা যায়, যা বিশেষ প্রকার ক্রয়-বিক্রয়ের কম-বেশি করা কিংবা বাকি দেওয়ার পরিবর্তে নেওয়া হয়। এ রিবা হারাম হওয়া সম্পর্কেও অনেক সুপ্রসিদ্ধ হাদীস বর্ণিত আছে। কিন্তু এ প্রকার রিবার বিস্তারিত বিবরণ না থাকার কারণে এতে কোন কোন সাহাবীর মনে খটকা দেখা দেয় এবং ফিকহবিদরা পরস্পরে মতভেদ করেন। (২৩২ পৃঃ, ২য় খণ্ড)

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র) 'হজ্জাতুল্লাহিল-বালিগাহ' গ্রন্থে বলেন : "এক প্রকার হচ্ছে সরাসরি ও প্রকৃত সুদ এবং অন্য এক প্রকার প্রকৃত বা প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ ও নির্দেশগত। সত্যিকার সুদ ঋণ দিয়ে বেশি নেওয়াকে বলা হয় এবং নির্দেশগত সুদ বলে হাদীসে বর্ণিত সুদকে বোঝান হয় অর্থাৎ কিছু সংখ্যক বিশেষ বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়ে বেশি নেওয়া। এক হাদীসে বলা হয়েছে : **لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِئَةِ** অর্থাৎ রিবা বা সুদ শুধু বাকি দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এর অর্থও তা-ই যে, সত্যিকার ও আসল সুদ, যাকে সাধারণভাবে সুদ মনে করা ও বলা হয়, তা বাকি দিয়ে মুনাফা নেওয়াকেই বলা হয়। এছাড়া যত প্রকার সুদ এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে, সবগুলো নির্দেশগত সুদের অন্তর্ভুক্ত।

এ বর্ণনা থেকে কয়েকটি বিষয় ফুটে উঠেছে : প্রথমত, কোরআন অবতরণের পূর্বে রিবা একটি সুপরিচিত বিষয় ছিল। ঋণের ওপর মেয়াদের হিসাব বেশি নেওয়াকে রিবা বলা হতো।

দ্বিতীয়ত, কোরআনে রিবার নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে সাহাবায়ে কিরাম তা বর্জন করেন। এর অর্থ বোঝা ও বোঝানোর ব্যাপারে কারও মনে কোনরূপ খটকা বা সন্দেহ দেখা দেয়নি।

তৃতীয়ত, রাসূলুল্লাহ (সা) ছয়টি বস্তু সম্পর্কে বলেছেন যে, এগুলোর পারস্পরিক ক্রয়-বিক্রয়ের সমান হওয়া শর্ত। কম-বেশি হলে এবং বাকি দিলে রিবা হয়ে যাবে। এ ছয় বস্তু হলো সোনা, রূপা, গম, যব, খেজুর ও আড়ুর। এ আইনের অধীনেই আরবে প্রচলিত 'মুযাবানা' ও 'মুহাকাল্লা' ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয়কেও হারাম করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এ বক্তব্যের মাঝে বৃষ্টিবার ও চিন্তা-ভাবনার বিষয় ছিল এই যে, এ নির্দেশ বর্ণিত ছয়টি বস্তুর সাথেই সীমাবদ্ধ থাকবে, না অন্যান্য বস্তুতেও বিস্তার লাভ করবে? যদি তাই করে, তবে তা কোন বিধি অনুসারে? এ বিধির ব্যাপারে ফিকহবিদগণ চিন্তা-ভাবনা ও ইজতিহাদ করে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। যেহেতু এ বিধি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক বর্ণিত হয়নি, তাই হযরত ফারুকে আযম (রা) আফসোস করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেই এর কোন বিধি বর্ণনা করে দিলে কোনরূপ সন্দেহ বাকি থাকতো না। এরপর তিনি বলেছেন যে, যেখানে সুদের সন্দেহও হয়, সেখান থেকেও বেঁচে থাকা উচিত।

চতুর্থত, জ্ঞানা গেল যে, আরবে পরিচিত সুদই ছিল আসল ও সত্যিকার 'রিবা' এবং একে ফিকহবিদগণ 'রিবাল-কোরআন' বা 'রিবাল-কর্জ' নামে অভিহিত করেছেন অর্থাৎ ঋণের উপর মেয়াদের হিসাবে মুনাফা নেওয়া। হাদীসে বর্ণিত দ্বিতীয় প্রকার সুদ প্রথম প্রকারের সুদের সাথে যুক্ত এবং একই নির্দেশের আওতাভুক্ত। মুজতাহিদগণের মধ্যে যত মতভেদ হয়েছে, সব দ্বিতীয় প্রকার সুদের মধ্যেই হয়েছে। প্রথম প্রকার সুদ অর্থাৎ রিবাল-কোরআন যে হারাম, এ-বদলপারে উম্মাতে-মুহাম্মদীর মধ্যে কখনো কোন মতভেদ হয়নি।

আজকাল যে সুদকে প্রচলিত অর্থনীতির প্রধান স্তম্ভ মনে করা হয় এবং যে সুদের প্রশ্নটি এখানে আলোচনাধীন, সে সুদের অবৈধতা কোরআনের সাতটি আয়াত, চল্লিশটিরও বেশি হাদীস এবং ইজমা দ্বারা প্রমাণিত।

দ্বিতীয় প্রকার সুদ, যা ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে হয়, আজকাল এর ব্যাপক প্রচলন নেই। কাজেই এ নিয়ে আলোচনা করারও তেমন প্রয়োজন নেই।

এ পর্যন্ত কোরআন ও সুন্নাহতে সুদের বরূপ কি, তা পরিষ্কার হয়ে গেছে। সুদ সংক্রান্ত আলোচনায় এটিই ছিল প্রথম বিষয়বস্তু।

সুদ নিষিদ্ধকরণের তাৎপর্য ও উপযোগিতা : এরপর দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় এই যে, সুদের অবৈধতা ও নিষেধাজ্ঞা কোন্ রহস্য ও উপযোগিতার উপর নির্ভরশীল, এতে কি কি আত্মিক অথবা অর্থনৈতিক অপকারিতা রয়েছে, যে কারণে ইসলাম একে এত বড় গোনাহ সাব্যস্ত করেছে ?

এ প্রসঙ্গে প্রথমে বুঝে নেওয়া দরকার যে, জগতের কোন স্ট্র বস্তু ও তার কাজ-কারবারই এমন নেই যে, যাতে কোন-না-কোন বৈশিষ্ট্য বা উপকারিতা নেই। সাপ, বিলু, বাঘ, সিংহ এমনকি সংখিমার মত মারাত্মক বিষের মধ্যেও মানুষের হাজারো উপকারিতা নিহিত রয়েছে।

চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, ঘুম ইত্যাদির মধ্যেও কোন-না-কোন উপকার খুঁজে বের করা কঠিন নয়। কিন্তু প্রত্যেক ধর্ম ও জাতির চিন্তাশীল শ্রেণীর মধ্যে দেখা যায়, যে জিনিসের মধ্যে উপকার বেশি এবং ক্ষতি কম, তাকে উপকারী ও উত্তম মনে করা হয়। পক্ষান্তরে যেসব জিনিসের অনিষ্ট ও অপকারিতা বেশি এবং উপকারিতা কম, সেগুলোকে ক্ষতিকর ও অপ্রয়োজনীয় মনে করা হয়। কোরআন পাকও সুদ ও জুয়াকে হারাম করার সময় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, এগুলোর মধ্যে গোনাহ ও মানুষের উপকার দুই-ই রয়েছে, কিন্তু গোনাহর পরিমাণ উপকারের তুলনায় অনেক বেশি। তাই এগুলোকে উত্তম ও উপকারী বলা যায় না, বরং ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক মনে করে এগুলো থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য।

'রিবা' অর্থাৎ সুদের অবস্থাও তদ্রূপ। এতে সুদখোরের সাময়িক উপকার অবশ্যই দেখা যায়। কিন্তু এর জাগতিক ও পারলৌকিক মন্দ পরিণাম এ উপকারের তুলনায় অত্যন্ত জঘন্য।

প্রত্যেক বস্তুর উপকার-অপকার ও লাভ-ক্ষতি তুলনা করার ক্ষেত্রে প্রত্যেক বুদ্ধিমানের কাছে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় হয়ে থাকে যে, যদি কোন বস্তুর উপকার অস্থায়ী ও সাময়িক হয় এবং অপকার দীর্ঘস্থায়ী কিংবা চিরস্থায়ী হয়, তবে একে কোন বুদ্ধিমান উপকারী বস্তুসমূহের ডালিকায় গণ্য করতে পারে না। এমনভাবে যদি কোন বস্তুর উপকার ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয় এবং ক্ষতি সমগ্র জাতির ঘাড়ে চাপে, তবে একেও কোন সচেতন মানুষ উপকারী বলাতে পারে না। চুরি ও ডাকাতিতে চোর ও ডাকাতির উপকার অনস্বীকার্য। কিন্তু তা সমগ্র জাতির জন্য

ক্ষতিকর এবং তাদের শান্তি ও স্বস্তি বিনষ্টকারী। তাই কোন মানুষই চুরি-ডাকাডিকি ভাল বলে না।

এ ভূমিকার পর সুদের প্রতি লক্ষ্য করব। সামান্য চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে, এতে সুদধোরেণের সাময়িক ও অস্থায়ী উপকারের তুলনায় তার আর্থিক ও নৈতিক ক্ষতি এত তীব্র যে, সুদ গ্রহণে অভ্যস্ত ব্যক্তি মানবতার গতির ভিতরে থাকতে পারে না। তার সাময়িক উপকারটিও শুধু তার নিজস্ব ও ব্যক্তিগত উপকার। কিন্তু এর ফলে গোটা জাতিগত-বিরূপ ক্ষতি ও অর্থনৈতিক অচলাবস্থার শিকারে পরিণত হতে হয়। কিন্তু জগতের অবস্থা বিচিত্র বটে। এখানে কোন কষ্ট একবার প্রচলিত হয়ে গেলে তার যাবতীয় অনিষ্টকারিতা যেন দৃষ্টি থেকে উৎকৃষ্ট হয়ে যায় এবং শুধু তার উপকারিতাই লক্ষ্যপথে থেকে যায়—জ যতই নিকটী ও ক্ষণস্থায়ী হোক না কেন। এর ক্ষতি ও অনিষ্টের প্রতি অধিকাংশ লোকই দৃষ্টিপাত করে না; —যদিও তা অত্যন্ত তীব্র ও ব্যাপক হয়।

প্রথা ও প্রচলন মানব মনের জন্য একটি সূক্ষ্ম বিষক্রিয়া, যা মানুষকে অচেতন করে দেয়। অনেক কম ব্যক্তিই প্রথা ও প্রচলন সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে একথা বুঝতে চেষ্টা করে যে, এতে উপকার কতটুকু আর ক্ষতিই বা কতটুকু? বরং কারও সতর্ক করার দরুন যদি ক্ষতিগুলো কারও দৃষ্টিতে ধরাও পড়ে, তবুও প্রথা ও প্রচলনের অনুবর্তিতা তাকে সঠিক পথে আসতে দেয় না।

বর্তমান যুগে সুদ মহামারীর আকার ধারণ করেছে। সমগ্র বিশ্ব এর রাহুগ্রাসে পতিত। এটি মানব স্বভাবের ক্রটিকে বিকৃত করে দিয়েছে। ফলে মানুষ ভিত্তিকে মিষ্ট মনে করতে শুরু করেছে এবং যে বিষয়টি সমগ্র মানবতার জন্য অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কারণ, তাকেই তাদের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান ভাবতে শুরু করেছে। আজ কোন চিন্তাবিদ এর বিপক্ষে আওয়াজ তুললে তাকে অপরিণামদর্শী অবাস্তব চিন্তাধারার লোক বলেই অভিহিত করা হয়।

কিন্তু যে চিকিৎসক কোন দেশে ব্যাপকাকারে মহামারী ছড়িয়ে পড়তে এবং চিকিৎসা ব্যর্থ হতে দেখে মানুষকে বোঝাতে চেষ্টা করে যে, এ রোগ রোগই নয়; বরং সুস্থতা ও সাক্ষাৎ আরাম, সে প্রকৃত অর্থে চিকিৎসকই নয়; বরং মানবতার সাক্ষাৎ শত্রু। পারদর্শী চিকিৎসকের কাজ এ সময়েও এ ছাড়া অন্য কিছুই নয় যে, সে মানুষকে এ রোগ ও তার ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে অবহিত করবে এবং প্রতিকারের পন্থা বলতে থাকবে।

আবিয়া আলাইহিসু সালাম মানব চরিত্র সংশোধনের দায়িত্ব নিয়ে আগমন করেছেন। তাঁদের কথা কেউ শুনবে কি না—তাঁরা এর পরওয়া করেননি। তাঁরা যদি মানুষের শোনার ও মান্য করার অপেক্ষা করতেন, তবে সারা বিশ্ব কুফর ও শিরকে পরিপূর্ণ থাকতো। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আব্দাহর পক্ষ থেকে প্রচারকার্যে আদিষ্ট হয়েছিলেন, তখন কলেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর মান্যকারী কে ছিল?

সুদকে যদিও বর্তমান অর্থনীতির মেরুদণ্ড মনে করা হচ্ছে, কিন্তু বাস্তব সত্য আজও কোন কোন পাশ্চাত্য দেশীয় পণ্ডিত স্বীকার করছেন। তাঁদের মতে সুদ অর্থনীতির মেরুদণ্ড নয়; বরং মেরুদণ্ডে সৃষ্ট এমন একটা দৃষ্ট কত, যা অহরহ তাকে খেঁয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আজকালকার অনেক বিচক্ষণ লোকও কোন সময় প্রথা ও প্রচলনের সংকীর্ণ গতি অতিক্রম করে এদিকে লক্ষ্য করেন না যে, সুদের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি

কি : দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতাও এসব বিচক্ষণের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করে না যে, সুদের অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতিতে সাধারণ মানুষ এবং গোটা জাতি দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক অচলাবস্থার শিকার হয়ে যায়। দরিদ্র আরও দরিদ্র হতে থাকে এবং গুটিকতক পুঁজিপতি জাতির অর্থ দ্বারা উপকৃত হয়ে বরং বলা উচিত যে, জাতির রক্ত শোষণ করে স্ফীত হতে থাকে। আশ্চর্যের বিষয়, যখন এসব বুদ্ধিজীবীর সামনে এ সত্যটি ভুলে ধরা হয়, তখন তারা একে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য আমাদেরকে পাপাত্যের অর্থনীতির ক্ষেত্রে সুদের উপকারিতা প্রত্যক্ষ করতে উপদেশ দেন এবং দেখাতে চান যে, তারা সুদভিত্তিক অর্থনীতির কল্যাণেই এমন সমৃদ্ধি অর্জন করেছে। কিন্তু এর দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কোন নরখাদক সম্প্রদায় তাদের এ অভ্যাসের উপকারিতা দেখানোর জন্য আপনাকে নরখাদকদের মহল্লায় নিয়ে গেল এবং দেখাল যে, এরা কেমন মোটা-তাজা, সবল ও সুস্থ। এরপর সে প্রমাণ করে যে, এদের অভ্যাস-আচরণই অনুসরণীয় ও উত্তম আচরণ।

কিন্তু কোন সম্প্রদায় লোকের সাথে এ ব্যক্তির মোকাবিলা হলে সে কবাবে : দুমি এ নরখাদকদের ক্রিয়াকর্মের বরকত এদের মহল্লায় নয়—অন্য মহল্লায় গিয়ে দেখ সেখানে দেখবে, শত শত, হাজার হাজার নরকংকাল পড়ে রয়েছে। এদের রক্ত ও মাংস খেয়ে খেয়ে এ হিংস্রা লালিত-পালিত হয়েছে। ইসলাম ও ইসলামী শরীয়াত কখনও এরূপ কার্যকে উপকারী বলে মেনে নিতে পারে না, যার ফলে সমগ্র মানব সমাজ বিপর্যয়ের শিকার হয় এবং কিছুসংখ্যক লোক ও তাদের তল্লাবাহকরা সমৃদ্ধি অর্জন করতে থাকে।

সুদের অর্থনৈতিক অনিষ্টকারিতা : সুদের ফলে গুটিকতক লোকের উপকার এবং সমগ্র মানব সম্প্রদায়ের ক্ষতি হয়—এ ছাড়া সুদের মধ্যে যদি অন্য কোন দোষ নাও থাকতো তবে এ দোষটিই সুদ নিষিদ্ধ ও ঘৃণিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। অথচ এতে এ ছাড়া আরও অর্থনৈতিক অনিষ্ট এবং আর্থিক বিপর্যয় বিদ্যমান রয়েছে।

সুদের মাধ্যমে সমগ্র জাতির বিপর্যয় ঘটিয়ে বিশেষ একটি শ্রেণীর উপকার কিভাবে হয়, প্রথমে তাই দেখা যাক। সুদের মহাজনী ও অধুনালুপ্ত পদ্ধতি এমন বিশী ছিল যে, বৃহত্তম মানব সমাজের ক্ষতি ও বিশেষ ব্যক্তিবর্গের উপকারের বিষয়টি যে কোন স্থূল-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেও বোঝা কঠিন ছিল না। কিন্তু আজকালকার নতুন প্রেক্ষাপটে যেভাবে মদকে মেশিনে পরিশোধিত করে, ডাকাতির নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করে এবং ব্যভিচার ও নির্লজ্জতার নতুন নতুন কৌশল বের করে এ সবলোকেই সভ্যতার খোলস পরিণে দিয়েছে—যাতে এদের অভ্যস্তরূপ অনিষ্ট বাহ্যদর্শীদের দৃষ্টিগোচর না হয়, তেমনিভাবে সুদের জন্য ব্যক্তিগত গদির পরিবর্তে যৌথ কোম্পানী গঠন করেছে—যাকে ব্যাংক বলা হয়। এখন জগৎবাসীর চোখে ধূলি দেওয়ার জন্য বলা হয় যে, সুদের এ আধুনিক পদ্ধতি দ্বারা সমগ্র জাতির উপকার হয়। কেননা, যে জনগণ নিজ টাকা দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য করতে জানে না কিংবা স্বল্প পুঁজির কারণে করতে পারে না, তাদের সবার টাকা-পয়সা ব্যাংকে জমা হয়ে প্রত্যেকেই অল্প হলেও কিছু না কিছু মুনাফা পেয়ে যায়। বড় বড় ব্যবসায়ীরাও ব্যাংক থেকে সুদের উপর ঋণ নিয়ে বড় ব্যবসা করে উপকৃত হওয়ার সুযোগ পায়। এভাবে সুদ বর্তমানে একটি কল্যাণকর বস্তুতে পরিণত হয়েছে এবং গোটা জাতি এর দ্বারা উপকার পাচ্ছে।

কিন্তু ইনসানের দৃষ্টিতে দেখলে এটি একটি প্রভাবশালী বৈ কিছুই নয়। মদের দুর্গন্ধময় সোফানকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্টেটে এবং পতিতাবৃত্তির আড্ডাগুলোকে সিনেমা ও নৈশ ক্লাবে রূপান্তরিত করে, বিষকে প্রতিষেধক এবং ক্ষতিকরকে উপকারীরূপে দেখাবার প্রয়াসে এ প্রভাবশালীকে কাজে লাগানো হয়েছে। চক্ষুস্থান ব্যক্তিদের সামনে যেমন একথা দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, চরিত্রবিধ্বংসী অপরাধসমূহকে আধুনিক পোশাক পরিয়ে দেওয়ার ফলে যেমন এসব অপরাধের ব্যাপকতা পূর্বের চাইতে বেড়েই গেছে, তেমনি সুদখোয়ীর এ নতুন ধর্ম — শতকরা কয়েক টাকা সুদ জনগণের পকেটে পুরে দিয়ে একদিকে তাদেরকে এ জঘন্য অপরাধে শরীক করেছে এবং অপরদিকে নিজেদের জন্য এ অপরাধের অসীম ক্ষেত্র প্রস্তুত করে নিয়েছে।

কে না জানে যে, জনগণ সেভিংস ব্যাংক ও পোস্ট অফিস থেকে যে শতকরা কয়েক টাকা সুদ পায়, তদ্বারা কিছুতেই জীবিকা নির্বাহ করতে পারে না। তাই তারা ভরখ-প্রোষণের জন্য কোন মজুরি কিংবা চাকুরী খুঁজতে বাধ্য। ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে প্রথমত তাদের দৃষ্টি যায় না। যদি কেউ এদিকে মনোনিবেশও করে তবে পোটা জাতির পুঁজি ব্যাংকে জমা হয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে যে আকার ধারণ করেছে, তাতে কোন স্বল্প পুঁজির অধিকারীর পক্ষে ব্যবসায়ে প্রবেশ করা স্বপ্ন-বিলাসের পর্যায়েই থেকে যায়। কেননা, যে ব্যবসায়ীর বাজারে প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে এবং বড় কারবার আছে, ব্যাংক তাকেই বড় পুঁজি ঋণ দিতে পারে। দশ লক্ষের মালিক এক কোটি ঋণ পেতে পারে। সে তার ব্যক্তিগত টাকার তুলনায় দশগুণ বেশি টাকার ব্যবসা চালাতে পারে। পক্ষান্তরে স্বল্প পুঁজির অধিকারী ব্যক্তির কোন প্রভাব-প্রতিপত্তি থাকে না এবং ব্যাংকও তাকে বিশ্বাস করে না যে, পুঁজির দশগুণ বেশি দিয়ে দেবে। এক লাখ দুইয়ের কথা, তার এক হাজার পাওয়াই কঠিন। মনে করুন, কেউ এক লাখ টাকা ব্যাংকের পুঁজি খাটিয়ে দশ লাখ টাকার ব্যবসা করে। যদি তার শতকরা এক টাকা মুনাফা হয়, তবে তার নিজস্ব এক লাখ টাকায় যেন শতকরা দশ টাকা মুনাফা হলো। পক্ষান্তরে যদি কোন ব্যক্তি শুধু ব্যক্তিগত টাকা দ্বারা এক লাখ টাকার ব্যবসা করে, তবে এক লাখের মুনাফা শতকরা এক টাকাই হবে। এ মুনাফা তার প্রয়োজনীয় খরচাদির জন্যও হয়ত যথেষ্ট নয়। এদিকে বাজারে বড় পুঁজিপতি যে দর ও রেয়াতসহ কাঁচামাল পায়, ছোট পুঁজিপতি তা পায় না। ফলে স্বল্প পুঁজিওয়ালা পছন্দ ও মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। যদি তার কপাল মন্দ হয় এবং সেও কোন বড় ব্যবসায়ে প্রবেশ করে, তবে বৃহৎ পুঁজিপতিরা তাকে অনধিকার প্রবেশকারী মনে করে নিজের ক্ষতি স্বীকার করেও বাজার এমন পর্যায়ে নিয়ে আসে যে, ক্ষুদ্র পুঁজিপতিরা আসল ও মুনাফা উভয়ই খুঁইয়ে বসে। ফলে বৃহৎ পুঁজিপতিদের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

জাতির প্রতি এটা কত বড় অবিচার যে, গোটা জাতি প্রকৃত ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে শুধু বৃহৎ পুঁজিপতিদের হাতের দিকে তাকিয়ে থাকবে! তারা বংশিশ হিসেবে যতটুকু ইচ্ছা তাদেরকে মুনাফা দেবে।

এর চাইতেও বড় দ্বিতীয় আর একটি ক্ষতির কবলে সারাদেশ পতিত হয়ে আছে। তা এই যে, উপরোক্ত অবস্থায় বৃহৎ পুঁজিপতিরাই দ্রব্যমূল্য নির্ধারণের অধিকারী হয়ে যায়। তারা উচ্চতর মূল্যে বিক্রয় করে স্বীয় গাঁট মজবুত করে নেয় এবং জাতির গাঁট খালি করে দেয়। তারা মূল্য বৃদ্ধি করার জন্য যখন ইচ্ছা মাল বিক্রি বন্ধ করে দেয়। যদি গোটা জাতির পুঁজি ব্যাংকের মাধ্যমে টেনে এসব স্বার্থপরদের শালন-পালন না করা হতো এবং সবাই ব্যক্তিগত

পূজি দ্বারা ব্যবসা করতে বাধ্য হতো, তবে ক্ষুদ্র পূজিপতিরা এ বিপদের সম্মুখীন হতো না এবং এসব স্বার্থপর হিংস্রাও গোটা ব্যবসা-বাণিজ্যের কর্তৃক ধর হয়ে বসতে পারতো না। ক্ষুদ্র পূজিপতিদের ব্যবসায়ের মুনাফা জমকালো হলে অন্যরাও সাহস করত এবং ব্যবসা-স্বনিজ্য ব্যাপক হয়ে যেত। এতে করে প্রত্যেকের পক্ষেই কিছু কিছু লোক নিয়োগ করার সুযোগ হতো। এতে অনেক বেকার সমস্যারও সমাধান হতো এবং বাণিজ্যিক মুনাফাও ব্যাপক হয়ে পড়ত। এছাড়া দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতেও এর নিশ্চিত প্রভাব পড়ত। কেননা, পারস্পরিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই ব্যবসায়ীরা কম মুনাফা অর্জনে সক্ষম হয়। এ প্রতারণামূলক কর্মপদ্ধতি গোটা জাতিকে মারাত্মক রোগে আক্রান্ত করে দিয়েছে এবং তাদের চিন্তাধারাকেও বিকৃত করে দিয়েছে। ফলে তারা এ রোগকেই সুস্থতা মনে করে বসেছে।

ব্যাংকের সুদ দ্বারা জাতির তৃতীয় অর্থনৈতিক ক্ষতিও লক্ষ্যীয়। যার পূজি দশ হাজার এবং সে ব্যাংক থেকে সুদের উপর কর্তৃত্ব নিয়ে এক লাখের ব্যবসা করে, যদি কোথাও তার পূজি ডুবে যায় এবং ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে সে দেউলিয়া হয়ে যায়, তবে চিন্তা করুন, ক্ষতির শতকরা দশ ভাগ তার নিজস্ব এবং অবশিষ্ট শতকরা নব্বই ভাগই গোটা জাতির হয়েছে, যাদের পূজি ব্যাংক থেকে নিয়ে সে ব্যবসা করেছিল। যদি ব্যাংক নিজেই দেউলিয়ার ক্ষতি বহন করে, তবে ব্যাংক তো জাতিরই পকেট। পরিণামে এ ক্ষতি জাতিরই হবে। এর সারমর্ম হলো এই যে, যতক্ষণ মুনাফা হচ্ছিল, ততক্ষণ সে একা ছিল মুনাফার মালিক, তাতে জাতির কোন অংশ ছিল না এবং যেই ক্ষতি হলো, তখন শতকরা নব্বই ভাগ ক্ষতি জাতির ঘাড়ে চেপে বসলো।

সুদের আরও একটি অর্থনৈতিক ক্ষতি এই যে, সুদখোর যখন অবক্ষয়ে পড়ে, তখন তার পুনরায় মাথা তোলায় যোগ্যতা থাকে না। কেননা, ক্ষতি বরদাশত করার মত পূজি যে তার ছিলই না। ক্ষতির সময় তার উপর দ্বিগুণ বিপদ চাপে। একে তো নিজের মুনাফা ও পূজি গেল, তদুপরি ব্যাংকের ঋণও চেপে বসল। এ ঋণ পরিশোধের কোন উপায় তার কাছে নেই। সুদহীন ব্যবসায়ে যদি কোন সময় সমগ্র পূজিও বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে এর দ্বারা মানুষ ফকীর হয় না—ঋণী হয়।

১৯৫৪ সালে পাকিস্তানে তুলা ব্যবসায়ে কোরআনের ভাষায় 'মুহাক' তথা অবক্ষয়ের বিপদ দেখা দেয়। সরকার কোটি কোটি টাকার ক্ষতি স্বীকার করে ব্যবসায়ীদেরকে সামাল দেন। কিন্তু কেউ এ ব্যাপারে চিন্তা করেনি যে, এটা ছিল সুদের অন্তর্ভুক্ত পরিণতি। তুলা ব্যবসায়ীরা এ কারবারের অধিকাংশ পূজি ব্যাংকের ঋণ থেকে বিনিয়োগ করেছিল। নিজস্ব পূজি ছিল নামে মাত্র। আল্লাহর মর্জিতে তুলার বাজারে এমন মন্দা দেখা দেয় যে, দর ১২৫ থেকে ১০ টাকায় নেমে আসে। ব্যবসায়ীরা ব্যাংকের ঋণ পূর্ণ করার জন্য টাকা ফেরত দেওয়ারও যোগ্য ছিল না। তারা বাধ্য হয়ে তুলার বাজার বন্ধ করে দিল। সরকার ১০ এর পরিবর্তে ৯০ টাকা দরে মাল কিনে নিল এবং কোটি কোটি টাকা ক্ষতি স্বীকার করে ব্যবসায়ীদেরকে দেউলিয়াত্বের কবল থেকে উদ্ধার করে নিল। সরকারের টাকা কার ছিল? দরিদ্র জনগণেরই। মোটকথা, ব্যাংকসমূহের কারবারের পরিস্কার ফল এই যে, জনগণের পূজি দ্বারা গুটিকতক লোক মুনাফা উপার্জন করে এবং ক্ষতি হয়ে গেলে তা জনগণের ঘাড়েরই চাপে।

আত্মসেবা ও জাতি হত্যার আরও একটি অপরীক্ষণ

সুদের মাধ্যমে সমগ্র জাতির সর্বনাশ সাধন করে কতিপয় ব্যক্তির আত্মসেবার সংকীর্ণ চিত্র পেশ করা হলো। এর সাথে আরও একটি প্রতারণা লক্ষ্যীয়। সুদখোররা যখন অভিজ্ঞতা দ্বারা

বুঝতে পারল যে, কোরআনের উক্তি **يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا** অক্ষরে অক্ষরে সত্য অর্থাৎ আলের অবক্ষয় আসা অবশ্যজারী, যার ফলে দেউলিয়া হতে হয়, তখন এসব অবক্ষয়ের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য তারা দু'টি সহযোগী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললো। একটি বীমা, অপরটি 'স্টক-এক্সচেঞ্জ'। কেননা, ব্যবসায়ে ক্ষতি হওয়ার দু'টি কারণ হতে পারে। একটি দৈব-দুর্বিপাক যথা, জাহাজ ডুবে যাওয়া, অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে যাওয়া ইত্যাদি এবং অপরটি পণ্যদ্রব্যের দাম ক্রয়-মূল্যের নিচে নেমে আসা। বিনিয়োগকৃত পুঁজি যেহেতু মিজব নয়—জাতির যৌথ সম্পদ, তাই উভয় অবস্থাতে ব্যবসায়ীদের ক্ষতি কম এবং জাতির বেশি হয়। কিন্তু তারা এ অল্প ক্ষতির বোকাও জাতির ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার জন্য একদিকে বীমা কোম্পানী খুলেছে যাতে ব্যাংকের মত সমগ্র জাতির পুঁজি নিয়োজিত থাকে। দৈব-দুর্বিপাকে সুদখোরদের ক্ষতি হয়ে গেলে, বীমার মাধ্যমে সমগ্র জাতির যৌথ পুঁজি থেকে তাকে উদ্ধার করে নেওয়া হয়।

জনগণ মনে করে, বীমা কোম্পানীগুলো আল্লাহর রহমত, ডুবন্ত ব্যক্তির আশ্রয়স্থল। কিন্তু এদের স্বরূপ দেখলে ও বুঝলে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এখানেও প্রতারণা ছাড়া কিছুই নেই। আকস্মিক দুর্ঘটনার সময় সাহায্যের লোভ দেখিয়ে জাতির পুঁজি সঞ্চয় করা হয়, কিন্তু এর মোটা অংকের টাকা দ্বারা বৃহৎ ব্যবসায়ীরাই উপকৃত হয়। তারা মাঝে-মাঝে নিজেই বীর ক্ষয়প্রাপ্ত মোটরে অগ্নিসংযোগ করে কিংবা কোন কিছুর সাথে থাকা লাগিয়ে ধ্বংস করে দেয় এবং বীমা কোম্পানী থেকে টাকা আদায় করে নতুন মোটর ক্রয় করে। শতকরা দু'-একজন গরীব হয়তো আকস্মিক মৃত্যুর কারণে কিছু টাকা পেয়ে যায়।

অপরদিকে দর কমে যাওয়ার বিপদ থেকে আত্মরক্ষার জন্য তারা স্টক-এক্সচেঞ্জের বাজার গরম করেছে। এ বিশেষ প্রকার ছুরা দ্বারা গোটা জাতিকে প্রভাবান্বিত করা হয়েছে, যাতে মূল্য হ্রাসের কারণে যে ক্ষতির আশংকা রয়েছে, তাও জাতির ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া যায়।

এ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে, ব্যাংকের সুদ ও ঋণজ্যা গোটা মানব সমাজের দারিদ্র্য ও আর্থিক দুরবস্থার কারণ। হ্যাঁ, শুটিকতেক ধনীর ধন-সম্পদ এর দৌলতে আরও বেড়ে যায়। জাতির ধ্বংস এবং শুটিকতেক লোকের উন্নতিই এর ফলশ্রুতি। এ বিরাট অনিষ্ট সাধারণ সরকারসমূহের দৃষ্টি এড়াননি। এর প্রতিকারার্থে তারা বৃহৎ পুঁজিপতিদের আয়করের হার বৃদ্ধি করে দিয়েছে। এমনকি, সর্বশেষ হার টাকায় সাড়ে পনের আনা করা হয়েছে, যাতে পুঁজি তাদের হাত থেকে স্থানান্তরিত হয়ে আবার জাতীয় তহবিলে পৌঁছে যায়।

কিন্তু সবাই জানেন যে, এ আইনের ফলেই সাধারণভাবে মিল-কারখানার হিসাবে জালিয়াতি হচ্ছে এবং সরকারের কাছ থেকে প্রকৃত তথ্য ও হিসাবাদি গোপন করার উদ্দেশ্যে অনেক পুঁজি গুপ্তধনের আকারে স্থানান্তরিত হচ্ছে।

মোটকথা, ধন-সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়ে কয়েক ব্যক্তির হাতে আবদ্ধ হওয়া যে দেশের অর্থনীতির জন্য সমূহ ক্ষতির কারণ, এ সম্পর্কে সবাই পরিত্রাণে আছেন। এ কারণেই আয়করের হার বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, এ কর্মপন্থাও রোগ নিরাময়ে ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। রোগের আসল কারণ নির্ণয়ে ব্যর্থতাই এর বড় কারণ। কাজেই এ প্রতিকার খেন **دَرْبِهِ بَسْتُ وَدُشْمَنِ اَنْدَرِ خَانِه بُوَد** অর্থাৎ শত্রুকে ভিতরে রেখেই গৃহের দরজা এঁটে দেওয়ার মত হয়ে গেছে।

ধন-সম্পদ বৃহৎ পুঁজিপতিদের হাতে পুঞ্জীভূত হওয়ার কারণ শুধু সুদের ব্যবসায় এবং জাতীয় সম্পদ দ্বারা একটা বিশেষ শ্রেণীর অন্যায়ে মুনাফাধারী। যতদিন পর্যন্ত ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সুদের কারবার বন্ধ করা না হয়, এবং নিজ নিজ পুঁজি দ্বারা ব্যবসা করার নীতি প্রচলিত না করা হয়, ততদিন এ রোগের প্রতিকার অসম্ভব।

একটি সন্দেহ ও তার উত্তর : এ স্থানে প্রশ্ন উদ্ভূত হতে পারে যে, ব্যাংকের মাধ্যমে পোটা জাতির পুঁজি সঞ্চিত হয়ে কিছু-না-কিছু উপকার তো জনগণেরও হয়েছে যদিও তা খুব কম। অবশ্য এটা সত্য যে, বৃহৎ পুঁজিপতিরা এর দ্বারা বেশি উপকৃত হয়েছে। তবে হ্যাঁ, যদি ব্যাংকে সম্পদ সঞ্চিত করার রীতি বন্ধ করে দেওয়া হয়, তাহলে এর ফল আগেকার যুগের মতই হবে অর্থাৎ জনগণের সম্পদ শুধুমাত্র ও গুণ্ডাভাণ্ডারের আকারে ভুগতে চলে যাবে। এতে না জনগণের উপকার হবে, না অন্য কারো।

এর উত্তর এই যে, ইসলাম সুদ হারাম করে যেমন সমগ্র জাতির সম্পদ বিশেষ বিশেষ পুঁজিপতির হাতে আবদ্ধ হওয়ার দরজা বন্ধ করে দিয়েছে, তেমনি পুঁজি-করের আকারে যাকাত আরোপ করে প্রত্যেক ধনীকে সম্পদ ছাবর অবস্থায় না রেখে ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত রাখতে বাধ্য করেছে। কেননা, পুঁজি-করের আকারে যাকাত আরোপিত হওয়ার কারণে যদি কোন ব্যক্তি টাকা-পয়সা অথবা সোনা-রূপা মাটির নিচে পুতে রাখে, তবে প্রতি বছর চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত কেতে যেতে তার মূল নিঃশেষ হয়ে যাবে। কাজেই প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই পুঁজিকে ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত করে তদ্বারা নিজে উপকৃত হতে, অপরের উপকার করতে এবং মুনাফা থেকেই যাকাত আদায় করতে বাধ্য হবে।

যাকাত একদিক দিয়ে ব্যবসায়ের উন্নতির নিশ্চয়তা দেয় : এ থেকে আরও জানা যেল যে, যাকাত প্রদানের মধ্যে যেমন জাতির অক্ষম শ্রেণীর সাহায্য করার মত বিরাট উপকার নিহিত রয়েছে, তেমনি মুসলমানদের অর্থনৈতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্যও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে এটি একটি চমৎকার প্রক্রিয়া। কেননা, প্রত্যেকেই যখন দেখবে যে, নগদ পুঁজি আবদ্ধ রাখার ফলে মুনাফা তো দূরের কথা, বছরান্তে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে যাচ্ছে, তখন অবশ্যই সে এ পুঁজি কোন ব্যবসায়ে নিয়োজিত করার জন্য সচেষ্ট হবে। হারাম সুদ থেকে বাঁচার জন্য ব্যবসায়ের আকার-প্রকৃতি এরূপ হবে না যে, লাখো মানুষের পুঁজি দ্বারা শুধু এক ব্যক্তিই ব্যবসা করবে, বরং প্রত্যেকেই নিজে বিনিয়োগের চিন্তা করবে। বৃহৎ পুঁজিপতিরাও যখন নিজ পুঁজি দ্বারা ব্যবসা করবে, তখন ক্ষুদ্র পুঁজিপতিরা ব্যবসা ক্ষেত্রে ঐসব অসুবিধার সম্মুখীন হবে না যা ব্যাংক থেকে সুদের টাকা নিয়ে ব্যবসা করলে দেখা দেয়। এভাবে দেশের আনাচে-কানাচে প্রত্যন্ত এলাকাতেও ব্যবসা এবং বিভিন্নমুখী বিনিয়োগ প্রচেষ্টা ছড়িয়ে পড়বে এবং এর ফলে সর্বশ্রেণীর মানুষ উপকৃত হবে।

সুদের আর্থিক ক্ষতি : এ পর্যন্ত সুদের অর্থনৈতিক ক্ষয়সংকরিতা বর্ণিত হলো। এবার সুদের কারবার মানুষের চারিত্রিক ও আর্থিক অবস্থার উপর কিরূপ অত্যন্ত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাক।

১. মানবচরিত্রের সর্বপ্রধান গুণ হচ্ছে আত্মত্যাগ ও দানশীলতা অর্থাৎ নিজে কষ্ট করে হলেও অপরকে সুখী করার প্রেরণা। সুদের ব্যবসায়ের অবশ্যজীবী ফলশ্রুতিতে এ প্রেরণা লোপ

পায়। সুদখোর ব্যক্তি অপরের উপকার করা তো দূরের কথা, অপরকে নিজ চেঁচায় ও নিজ পুজি দ্বারা তার সমতুল্য হতে দেখলে তাও সহ্য করতে পারে না।

২. সুদখোরেরা কোন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি দয়ার্দ্ৰ হওয়ার পরিবর্তে তার বিপদের সুযোগে অবৈধ মুনাফা লাভের চেঁচায় মত্ত থাকে।

৩. সুদ খাওয়ার ফলে অর্থলালসা বেড়ে যায়। সে এতে এমন মত্ত হয়ে পড়ে যে, ভাল-মন্দেও পরিচয় থাকে না এবং সুদের অত্যন্ত পরিণামের প্রতি সে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে পড়ে।

সুদ ছাড়া কি কোন ব্যবসা চলতে পারে না? সুদের স্বরূপ এবং এর জাগতিক ও ধর্মীয় অনিষ্টকারিতা বিস্তারিতভাবেই বর্ণিত হয়েছে। এখন তৃতীয় আলোচ্য বিষয় হলো এই যে, অর্থনৈতিক ও আর্থিক অনিষ্টকারিতা এবং কোরআন ও সুন্নাহতে এ সম্পর্কিত কঠোর নিষেধাজ্ঞা জানা গেল। কিন্তু বর্তমান যুগে সুদই হচ্ছে কাজ-কারবারের প্রধান অবলম্বন। সারা বিশ্বের ব্যবসা-বাণিজ্য সুদের উপরই চলছে। এ থেকে মুক্তি লাভের উপায় কি? বর্তমান যুগে ব্যাংকের সাথে সম্পর্ক বর্জন করার অর্থ ব্যবসায়ের তল্লিতল্লা গুটানো।

এবার জওয়াব এই যে, কোন রোগ যখন ব্যাপক হয়ে মহামারীর আকার ধারণ করে, তখন তার চিকিৎসা কঠিন অবশ্যই হয়; কিন্তু শিকল কখনো হয় না। নিষ্ঠার সাথে যে কোন সংশোধন প্রচেষ্টাই পরিণামে সফল হয়। তবে অজ্ঞান্যে ধৈর্য, দৃঢ়তা এবং সাহসিকতা অবশ্যই প্রয়োজন। কোরআন পাকেই আদ্বাহ তা'আলা বলেন: مَا جَفَلَ عَلَيْنَا فِي الدِّينِ مَنْ : حَرَجٌ অর্থ—আদ্বাহ তা'আলা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের কোনরূপ সংকীর্ণতায় ফেলেন নি। তাই সুদ থেকে বেঁচে থাকার জন্য এমন কোন কার্যকর ও ফলপ্রসূ পথ অবশ্যই রয়েছে, যাতে অর্থনৈতিক ক্ষতিও নেই, অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যের দ্বারও রুদ্ধ হয় না এবং সুদ থেকে মুক্তিও পাওয়া যায়।

এ ব্যাপারে প্রথম কথা এই যে, ব্যাংকিং ব্যবস্থার বর্তমান পদ্ধতি দেখে বাহ্য দৃষ্টিতে মনে করা হয় যে, সুদের উপরই ব্যাংক নির্ভরশীল; সুদ ছাড়া ব্যাংক চলতে পারে না। কিন্তু এ ধারণা নিশ্চিতরূপে ভিত্তিহীন নয়। সুদ ছাড়াও ব্যাংক ব্যবস্থা এমনভাবে ফলপ্রসূ ও কার্যকরী ভূমিকা সহকারেই কয়েম থাকতে পারে; শুধু তাই নয় বরং আরও উত্তম উপকারী ভূমিকা নিয়েই তা প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে। তবে এর জন্য কিছুসংখ্যক শরীয়ত-বিশেষজ্ঞ ও কিছুসংখ্যক ব্যাংক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রয়োজন। তাঁরা নতুনভাবে এর পদ্ধতি নির্ধারণ করলে সাফল্য দূরে নয়। শরীয়তের নিয়মানুযায়ী ব্যাংক পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে ইনশাআল্লাহ সমগ্র বিশ্বরাসী প্রত্যক্ষ করবে যে, এতে জাতির কিরূপ মঙ্গল সাধিত হয়। ব্যাংক ব্যবসা পরিচালনা করার পদ্ধতি ও নীতি ব্যাখ্যা করার স্থান এটা নয়, তাই এ সম্পর্কে আলোচনা সংক্ষিপ্ত করতে হচ্ছে।

কিছু বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে সুদের প্রয়োজন দেখা দেয়। ব্যাংকের বর্তমান পদ্ধতি পরিবর্তন করে এর ব্যবস্থা করা যায়। সুদের দ্বিতীয় প্রয়োজন অসহায় দরিদ্র লোকদের সাময়িক অভাব পূরণ করা। এর চমৎকার প্রতিকার ইসলামেই পূর্ব থেকে যাকাত ও ওয়াজির সদকার আকারে

১. বেশ কিছু দিন পূর্বে কয়েকজন আলোচকের পরামর্শক্রমে আমি সুদবিহীন ব্যাংক-ব্যবস্থা সম্পর্কিত একটা পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তুত করে দিয়েছিলাম। কোন কোন ব্যাংক-বিশেষজ্ঞ একে বর্তমান যুগে বাস্তবায়নযোগ্য বলেও স্বীকার করেছিলেন এবং কেউ কেউ একে গুরু করার জন্য উদ্যোগী ভূমিকাও গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত সাধারণ ব্যবসায়ীদের আনুতুল্য এবং সরকারী মন্ত্রণার অভাবে চালু হতে পারেনি।

বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু ধর্ম ও ধর্মীয় জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞতা ও উদাসীনতা আজকাল যাকাত ব্যবস্থাকেও পঙ্গু করে দিয়েছে। অসংখ্য মুসলমান নাযাযের মত যাকাতের ধারে-কাছেও যায় না। যারা যাকাত দেয়, তাদের মধ্যে অনেক বৃহৎ পুঁজিপতি হিসাব করে পূর্ণ যাকাতও প্রদান করে না। যারা সম্পূর্ণ যাকাত প্রদান করে, তারা শুধু যাকাত পকেট থেকে বের করতেই জানে। অথচ আক্ব্যাহ্ তা'আলা শুধু যাকাত পকেট থেকে বের করারই নির্দেশ দেননি—তা আদায় করারও নির্দেশ দিয়েছেন। প্রদত্ত যাকাত যথার্থ হকদারকে পৌঁছিয়ে তার অধিকারভুক্ত করে দিলেই যাকাত আদায় করা শুদ্ধ হতে পারে। সুতরাং চিন্তা করার বিষয় হচ্ছে—এমন মুসলমান কয়জন আছে, যারা যথার্থ হকদার খুঁজে তাদের কাছে যাকাত পৌঁছিয়ে দিতে ফত্বাবান। মুসলমান জাতি যতই গরীব-হোক, যাদের উপর যাকাত ফরয, তারা প্রত্যেকেই যদি পুরোপুরি যাকাত প্রদান করে এবং বিত্তহীন পন্থার স্বীয় অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে, তবে কর্ত্তের তাগিদে সুদের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন কোন মুসলমানেরই থাকতে পারে না। যদি শরীয়তের বিধি অনুযায়ী ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হয়ে যায়, এর অধীনে বাস্তবতামূলক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মুসলমানদের ধন-সম্পদের ক্ষমতায় এতে জমা-হক্ক তবের বাস্তবতামূলক থেকে প্রত্যেক অভাবগ্রস্তেরই অভাব পূরণ করা সম্ভব। বেশি টাকার প্রয়োজন হলে সুদবিহীন কর্ত্তও প্রদান করা যেতে পারে। এভাবে বেকার ও কর্মহীনদের ছোট ছোট দোকান করে দিয়ে কিংবা কোন শিল্পকর্মে নিয়োগ করেও কাজে লাগানো যায়। জনৈক ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞ ঠিকই বলেছেন যে, মুসলমানরা যাকাত-ব্যবস্থার অনুবর্তী হয়ে গেলে তাদের মধ্যে কোন নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্ত লোক দেখা যাবে না।

স্রেটকথা, বর্তমান যুগে সুদকে মহামারী আকারে প্রসার লাভ করতে দেখে এক্ষণ মনে করা ঠিক নয় যে, সুদের ব্যবসা বর্জন করা অর্থনৈতিক আত্মহত্যার নামান্তর এবং এ যুগের লোক সুদের ব্যবসায়ের ব্যাপারে ক্ষমার্ক।

হ্যাঁ, এটা অবশ্য ঠিক যে, যতদিন সমগ্র জাতি কিংবা উল্লেখযোগ্য দল কিংবা কোন ইসলামী সরকার পূর্ণ মনোযোগ সহকারে এ কাজে সংকল্পবদ্ধ না হয়, ততদিন দু'চার-দশজনের পক্ষে সুদ বর্জন করা কঠিন, কিন্তু ক্ষমার্ক তবুও বলা যায় না।

আমাদের এ বক্তব্যের উদ্দেশ্য দু'টি : প্রথমত, মুসলমানদের বিভিন্ন দল ও সরকারসমূহকে এদিকে আকৃষ্ট করা। কেননা, তারা ই এ কাজ যথার্থভাবে করতে পারে এবং তাদের উদ্যোগ শুধু মুসলমানদেরকেই নয়, সারা বিশ্বকেই সুদের অভিশাপ থেকে মুক্তি দিতে পারে।

দ্বিতীয়ত, কমপক্ষে সবার জ্ঞান বিস্তারিত হোক এবং তারা রোগকে সত্যিকারভাবেই রোগ মনে করুক। কেননা, হারামকে হালাল মনে করা দ্বিতীয় গোনাহ। এটা সুদের গোনাহর চাইতেও বড় ও মারাত্মক। তারা কমপক্ষে এ গোনাহে লিপ্ত না হোক। গোনাহে কিছু-না-কিছু বাহ্যিক উপকারও আছে। কিন্তু যেটা জ্ঞানগত ও বিশ্বাসগত গোনাহ অর্থাৎ হারামকে হালাল প্রমাণিত করার চেষ্টা করা, এটা প্রথম গোনাহর চাইতেও মারাত্মক এবং নিরর্থক। কেননা সুদকে হারাম মনে করা এবং স্বীয় গোনাহ স্বীকার করার মধ্যে কোন আর্থিক ক্ষতিও হয় না। এবং এর ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যও বন্ধ হয়ে যায় না। হ্যাঁ, অপরাধ স্বীকার করার ফল এটা অবশ্যই যে, কোন সময় তওবা করার তওফীক হলে সুদ থেকে আত্মরক্ষার উপায় চিন্তা করা যাবে।

এ উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতেই উপসংহারে কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত করছি। এগুলো সুদ সম্পর্কিত আলোচ্য আয়াতসমূহেরই বর্ণনা। উদ্দেশ্য, গোনাহ যে গোনাহ —এ অনুভূতি জাগ্রত হোক, এ থেকে বেঁচে থাকার চিন্তা হোক, কমপক্ষে হারামকে হালাল করে এক গোনাহকে দুই গোনাহ না করুক। বড় বড় নেককার ও দীনদার মুসলমান রাত্রিবেলায় তাহাজ্জুদ ও মিকিরে অভিযাহিত করে। সকাল বেলায় যখন তারা দোকানে কিংবা কারখানায় পৌঁছে, তখন এ কল্পনাও তাদের মনে জাগে না যে, তারা সুদ ও জুরার কাজ-কারবারে লিপ্ত হয়ে কিছু খোঁসাই করে চলছে।

সুদ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাণী

১. রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন : সাতটি মারাত্মক বিষয় থেকে বেঁচে থাক। সাহাবায়ে-কিরাম জিজ্ঞেস করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা) ! সেগুলো কি ? তিনি বললেন : (১) আল্লাহ তা'আলার সাথে (ইবাদতে কিংবা বিশেষ বিশেষ গুণাবলীতে) অন্য কাউকে অংশীদার করা, (২) যাদু করা, (৩) কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা, (৪) সুদ খাওয়া, (৫) এতীমের মাল খাওয়া, (৬) জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা এবং (৭) কোন সতী-সাক্ষী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করা ! —(বুখারী, মুসলিম)

২. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : আমি আজ রাতে দেখেছি দু'ব্যক্তি আমাকে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত নিয়ে গেছে। এরপর আমরা সামনে অগ্রসর হলে একটি রক্তের নদী দেখলাম। নদীর মধ্যে এক ব্যক্তি দগ্ধায়মান। অপর এক ব্যক্তি নদীর কিনারে দগ্ধায়মান। নদীস্থিত ব্যক্তি যখন নদী থেকে উপরে উঠতে চায়, তখন কিনারের ব্যক্তি তার মুখে পাথর নিক্ষেপ করে। পাথরের আঘাত খেয়ে সে আবার পূর্বের জায়গায় চলে যায়। অতঃপর সে আবার তীরে ওঠার চেষ্টা করে। কিনারের ব্যক্তি আবার তার সাথে একই ব্যবহার করে। মহানবী (সা) বলেন : আমি স্বীয় সঙ্গীদ্বয়কে জিজ্ঞেস করলাম : আমি এ কি ব্যাপার দেখছি ? তারা বলল, রক্তের নদীতে বন্দী ব্যক্তি সুদখোর। সে স্বীয় কার্যের শাস্তি ভোগ করছে। —(বুখারী)

৩. রাসূলুল্লাহ (সা) সুদগ্রহীতা ও সুদদাতা—উভয়ের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। কোন কোন রেওয়াজেতে আছে, সাক্ষাদাতা এবং দলীল লেখকের প্রতিও তিনি অভিসম্পাত করেছেন।

সহীহ মুসলিমের রেওয়াজেতে বলা হয়েছে : এরা সবাই গোনাহে সমান অংশীদার। কোন কোন রেওয়াজেতে আছে, সাক্ষাদাতা ও দলীল লেখকের প্রতি অভিসম্পাত তখন যখন তারা জানে যে, এটা সুদের ব্যবসা।

৪. রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন : চার ব্যক্তি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, তাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন না এবং জান্নাতের নেয়ামতের স্বাদ গ্রহণ করতে দেবেন না। এ চার ব্যক্তি হলো : (১) মদ্যপানে অভ্যস্ত ব্যক্তি, (২) সুদখোর, (৩) অন্যায়ভাবে এতীমের মাল ভক্ষণকারী এবং (৪) পিতামাতার অবাধ্যতাকারী। —(মুত্তাদরাক-হাকেম)

৫. নবী করীম (সা) বলেন, এক দিরহাম সুদ খাওয়া সত্তর বার ব্যভিচার করার চাইতে বড় গোনাহ। কোন কোন রেওয়াজেতে আছে, হারাম মাল দ্বারা যে মাংস গঠিত হয়, তার জন্য আশুনাই যোগ্য। এরই সাথে কোন কোন রেওয়াজেতে আছে, কোন মুসলমানের মানহানি করা সুদের চাইতেও কঠোর গোনাহ। —(মসনদে আহমদ, তিবরানী)

৬. ব্যবহারযোগ্য হওয়ার পূর্বে ফল বিক্রয় করতে রাসূলুল্লাহ (সা) নিষেধ করেছেন। তিনি আরও বলেছেন : কোন জনপদে যখন ব্যতিচার ও সুদের ব্যবসায় প্রসার লাভ করে, তখন সে জনপদ যেন আল্লাহর শান্তিকে আমন্ত্রণ জানায়। —(মুত্তাদরাক-হাকেম)

৭. রাসূলে করীম (সা) বলেন : যখন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে সুদের লেনদেন প্রচলিত হয়ে যায়, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ক্রমবর্ধমান উর্ধ্বগতি ঘটান এবং যখন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘুৰ ব্যাপক হয়ে যায়, তখন তাদের উপর শত্রুর ভয় ও প্রাধান্য ছায়াপাত করে। —(মসনদে আহমদ)

৮. রাসূলে করীম (সা) বলেন : মিরাজের রাতে যখন আমরা সত্তম আকাশে গৌললাম, তখন আমি উপরে বহু শু বিদ্যুৎ দেখলাম। এরপর আমরা এমন এক সম্প্রদায়ের কাছ দিয়ে গেলাম, যাদের পেট একেকটি ঘরের ন্যায় ফোলা ও বিস্তৃত ছিল। তাদের উদর সর্প দ্বারা ভর্তি ছিল। সর্পগুলো বাইরে থেকেই দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। আমি জিবরাঈল (আ)-কে জিজ্ঞেস করলাম : এরা কারা? তিনি বললেন : এরা সুদখোর। —(মসনদে আহমদ)

৯. রাসূলুল্লাহ (সা) আওফা ইবনে মালেক (রা)-কে বললেন, যেসব গোনাহ মাক্ক করা হয় না, সেগুলো থেকে বেঁচে থাক। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে যুদ্ধলব্ধ মাল চুরি করা ও অপরটি সুদ খাওয়া। —(তিবরানী)

১০. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : যে ব্যক্তিকে তুমি কর্জ দিয়েছ, তার হাদিয়াও গ্রহণ করো না। সে কর্জের বিনিময়ে হাদিয়া দিতে পারে ; এমনভাবেই তা সুদ হবে। এ কারণে তার হাদিয়া গ্রহণ করার ব্যাপারেও সাবধান হওয়া উচিত।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ
فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخُسْ مِنْهُ
شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ
يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ
فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ
أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ
إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ

ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ
 تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
 جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهَدُوا إِذَا بَايَعْتُمْ وَلَا يَضَارَّ كَاتِبٌ
 وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٥٧﴾ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ
 تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَصَابَكُمْ بَعْضُ الْفَيْدِ الَّذِي
 أُوتِئْنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ
 آثَمُ قَلْبًا ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥٨﴾

(২৮২) হে মু'মিনগণ ! যখন তোমাদের কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণের আদান-প্রদান কর, তখন তা লিপিবদ্ধ করে নাও এবং তোমাদের মধ্যে কোন লেখক ন্যায়সঙ্গতভাবে তা লিখে দেবে ! লেখক লিখতে অস্বীকার করবে না। আল্লাহ তাকে যেমন শিক্ষা দিয়েছেন, তাকে উচিত তা লিখে দেওয়া। এবং ঋণ গ্রহীতা যেন লেখার বিষয় বলে দেয় এবং সে যেন স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করে এবং লেখার মধ্যে বিন্দুমাত্রও বেশকম না করে। অতঃপর ঋণগ্রহীতা যদি নিরোধ হয় কিংবা দুর্বল হয় অথবা নিজের লেখার বিবরণবল্ল বলে দিতে অক্ষম হয়, তবে তার অভিভাবক ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখাবে। দু'জন সাক্ষী কর তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে। যদি দু'জন পুরুষ না হয়, তবে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা। ঐ সাক্ষীদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর—যাতে একজন যদি ভুলে যায়, তবে একজন অন্যজনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। যখন ডাকা হয়, তখন সাক্ষীদের অস্বীকার করা উচিত নয়। তোমরা একে লিখতে অলসতা করো না, তা ছোট-হোক কিংবা বড়, নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। এ লিপিবদ্ধ করা আল্লাহর কাছে সুবিচারকে অধিক কার্যে রাখে, সাক্ষ্যকে অধিক অধিক সুস্থ রাখে এবং তোমাদের সম্বন্ধে পতিত না হওয়ার পক্ষে অধিক উপযুক্ত। কিন্তু যদি কারবার নগদ হয়, পরস্পরে হাতে হাতে আদান-প্রদান কর তবে তা না লিখলে তোমাদের প্রতি কোন অভিযোগ নেই। তোমরা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় সাক্ষী রাখ। কোন লেখক ও সাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত না করা হোক। যদি তোমরা এতদূর কর তবে তা তোমাদের পক্ষে পাপের বিষয়। আল্লাহকে ভয় কর। তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দেন। আল্লাহ সব কিছু জানেন।

(২৮৩) আর তোমরা যদি প্রবাসে থাক এবং কোন লেখক না পাও, তবে বন্ধকী বস্তু হস্তগত রাখা উচিত। যদি একে অন্যকে বিশ্বাস করে, তবে যাকে বিশ্বাস করা হয়, তার উচিত অন্যের প্রাপ্য পরিশোধ করা এবং স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করা। তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না। যে কেউ তা গোপন করবে, তার অন্তর পাপপূর্ণ হবে। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে খুব জ্ঞাত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে ইমানদারগণ। যখন তোমরা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণের আদান-প্রদান করবে (মূল্য বাফি থাকুক কিংবা যে বস্তু ক্রয় করবে, তা হাতে পাওয়ার আগে অগ্রিম মূল্য পরিশোধ করার অবস্থায়) তখন তা (অর্থাৎ ঋণ আদান-প্রদানের দলীল-দস্তাবেজ) লিপিবদ্ধ করে নাও এবং তোমাদের (পরস্পর) মধ্যে (যে) কোন লেখক (হোক, সে) ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখবে (অর্থাৎ কারও খাতির করে বিষয়বস্তুর মধ্যে হেরফের করবে না) এবং লেখক লিখতে অস্বীকারও করবে না যেমন আল্লাহ তাকে (লেখা) শিক্ষা দান করেছেন তার উচিত লিখে দেওয়া এবং (লেখককে) ঐ ব্যক্তি (বলে দেবে এবং) লেখাবে যার দায়িত্বে ঋণ ওয়াজিব থাকবে। (কেননা, দলীল-দস্তাবেজের সারকথা ধারের স্বীকারোক্তি। কার্জেই যার দায়িত্বে ধার, তার স্বীকারোক্তিই জরুরী)। আর (লেখানোর সময়) সে যেন স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করে এবং এর (ঋণের) মধ্যে বলতে গিয়ে যেন কণামাত্রও ত্রুটি না করে। অতঃপর যার দায়িত্বে ঋণ, সে যদি দুর্বলবুদ্ধি (অর্থাৎ নির্বোধ কিংবা পাগল) হয় অথবা দুর্বল দেহ (অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বয়স্ক কিংবা অক্ষম বৃদ্ধ) হয় অথবা (অন্য কোন কারণে) নিজে স্বর্ণলা কন্নার (ও লেখানোর) শক্তি না রাখে (উদাহরণতঃ সে মূক —লেখক তার ইশারা-ইঙ্গিত বুঝে না অথবা সে ভিন্ন দেশের অধিবাসী এবং ভিন্নভাষী—লেখক তার ভাষা বুঝে না), তবে (এমতাক্ষর) তার অভিভাবক ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখিয়ে দেবে এবং তোমাদের পুরুষের মধ্য থেকে দু'জন সাক্ষী (-ও) করে নেবে। (শরীয়ত মতে দাবি প্রমাণের আসল ভিত্তিই হচ্ছে সাক্ষী।) দলীল-দস্তাবেজ এ জাতীয় ব্যাপারে ধর্তব্য নয়। স্বরণ রাখার সুবিধার্থে দলীল লেখা হবে। কেননা, লিখিত বিষয় দেখে ও শুনে স্বভাবতই পূর্ণ ঘটনা মনে পড়ে যায়। যেমন, কোরআনেই সত্বর তা বর্ণিত হবে : (অতঃপর যদি দু'জন পুরুষ সাক্ষী পাওয়া না যায়, তবে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা সাক্ষী নিযুক্ত হবে,) ঐ সাক্ষীদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমরা (নির্ভরযোগ্য হওয়ার কারণে) পছন্দ কর (এবং একজন পুরুষের স্থলে দু'জন মহিলা এ কারণে প্রস্তাব করা হয়েছে) যাতে দু'জন মহিলার মধ্যে কোন একজনও (সাক্ষ্যের কোন অংশ মনে করতে-কিংবা বর্ণনা করতে) ভুলে গেলে একজন অন্যজমকে স্বরণ করিয়ে দেয় (এবং স্বরণ করানোর পর সাক্ষ্যের বিষয়বস্তু পূর্ণ হয়ে যায়।) এবং যখন (সাক্ষী হওয়ার জন্য) ডাকা হয়, তখন সাক্ষীদেরও অস্বীকার না করা উচিত। (কারণ, প্রভাবে স্বীয় ভাইয়ের সাহায্য হয়) এবং তোমরা এ (ঋণ)-কে (বারবার) লিখতে বিরক্তিরোধ করো না, তা (ঋণের ব্যাপারে) ছোট হোক কিংবা বড় হোক। এ লিপিবদ্ধ করা আল্লাহর কাছে সুবিচারকে অধিক কায়েম রাখে এবং সাক্ষ্যকে সুস্থ রাখে এবং (লেনদেন সম্পর্কে) তোমাদের সন্দেহে পতিত না হওয়ার পক্ষে অধিক উপযুক্ত। (তাই লিপিবদ্ধ করাই ভাল) কিন্তু যদি তোমরা নিজেদের মধ্যে কোন নগদ লেনদেন কর, তবে তা লিখে-তোমাদের

উপর কোন অভিযোগ (ও ক্ষতি) নেই এবং (এতেও এতটুকু অবশ্যই করবে যে, এরূপ) ক্রয়-বিক্রয়ের সময় সাক্ষী রাখ (সম্ভবত আগামীকাল কোন ব্যাপার হয়ে যাবে। উদাহরণত বিক্রোতা বলতে পারে যে, সে মূল্যই পায়নি কিংবা এ বস্তু সে বিক্রয়ই করেনি। অথবা ক্রোতা বলতে পারে যে, সে বিক্রীত বস্তু ফেরতদানের ক্ষমতাও নিয়েছিল কিংবা এখন পর্যন্ত বিক্রীত বস্তু পুরোপুরি তার হস্তগত হয়নি) এবং (আমি পূর্বে যেমন লেখক ও সাক্ষীকে লেখা ও সাক্ষ্যদানে অস্বীকার করতে নিষেধ করেছি, তেমনিভাবে তোমাদেরকেও জোরের সাথে বলছি যে, তোমাদের পক্ষ থেকে) কোন লেখক ও সাক্ষীকে কষ্ট না দেওয়া উচিত। (উদাহরণত নিজের কোন উপকারের জন্য ছাদের উপকারে বিঘ্ন সৃষ্টি করা) আত্মাহুকে ভয় কর (যেসব কাজ করতে তিনি নিষেধ করেছেন, তা করো না) এবং আত্মাহু তা'আলা (অর্থাৎ তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ এই যে,) তোমাদেরকে (প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান) শিক্ষাদান করে এবং আত্মাহু সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী। (তিনি অনুগত ও অবাধ্যকেও জানেন—প্রত্যেককে উপযুক্ত প্রতিদান দেবেন)। এবং যদি তোমরা (খণের লেনদেন করার সময়) প্রবাসে থাক এবং (দলীল-দস্তাবেজ লেখার জন্য সেখানে) কোন লেখক না পাও, তখন (স্বস্তিলাভের উপায়) বন্ধকী বস্তু, যা (দেনাদারের পক্ষ থেকে) ঋণদাতার অধিকারে দিয়ে দেওয়া হবে এবং যদি (এ সময়ও) একে অন্যকে বিশ্বাস করে (এবং অন্যকে বন্ধক রাখার প্রয়োজন মনে না করে,) তবে যাকে বিশ্বাস করা হয় (অর্থাৎ দেনাদার) তার উচিত অন্যের প্রাপ্য (পুরোপুরি) পরিশোধ করা এবং স্বীয় পালনকর্তা আত্মাহুকে ভয় করা (এবং তার প্রাপ্য আত্মসাৎ না করা) এবং তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না এবং যে কেউ তা গোপন করবে, তার অন্তর পাপপূর্ণ হবে এবং তোমরা যা কর, আত্মাহু সে সম্পর্কে খুব পরিজ্ঞাত (অতএব, কেউ গোপন করলে আত্মাহু তা'আলার তা জানা থাকবে। তিনি শাস্তি দেবেন।)

আনুযায়িক জ্ঞাতব্য বিষয়

ধার-কর্জের ক্ষেত্রে দলীল লেখার নির্দেশ এবং সংশ্লিষ্ট বিধি : আলোচ্য আয়াতসমূহে লেনদেন সম্পর্কিত আইনের জরুরী মূলনীতি ব্যক্ত হয়েছে। এক কথায় এটাকে চুক্তিনামা বলা যেতে পারে। এরপর সাক্ষ্য-বিধির বিশেষ ধারা উল্লিখিত হয়েছে।

আজকাল লেখালেখির যুগ। লেখাই মুখের কথার স্থলাভিষিক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু আপনি চৌদ্দশত বছর পূর্বের দিকে তাকিয়ে দেখুন। তখন দুনিয়ার সব কাজ-কারবার ও ব্যবসা-বাণিজ্য মুখে মুখেই চলতো। লেখালেখি এবং দলীল-দস্তাবেজের প্রথা-প্রচলন ছিল না। সর্বপ্রথম কোরআন পাক এদিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছে :

إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ .

অর্থ—“তোমরা যখন পরস্পরের নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ধার-কর্জের কারবার কর, তখন তা লিখে নাও।”

এতে প্রথম নীতি এই ব্যক্ত হয়েছে যে, ধার-কর্জের লেনদেনে দলীল-দস্তাবেজ লিপিবদ্ধ করা উচিত—যাতে ভুল-ভ্রান্তি অথবা কোন পক্ষ থেকে অস্বীকৃতির কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে তখন কাজে লাগে।

দ্বিতীয় মাস'আলা বর্ণিত হয়েছে যে, ধার-কর্জের ব্যাপারে মেয়াদ অবশ্যই নির্দিষ্ট করতে হবে। অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য ধার-কর্জের লেনদেন জায়েয নয়। কেননা, এতে কলহ-বিবাদের

তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (১ম খণ্ড) — ৮১

দ্বার উন্মুক্ত হয় ! এ কারণেই ফিকহবিদগণ বলেছেন : মেয়াদও এমন নির্দিষ্ট করতে হবে, যাতে কোনরূপ অস্পষ্টতা না থাকে। মাস এবং দিন-তারিখসহ নির্দিষ্ট করতে হবে। কোনরূপ অস্পষ্ট মেয়াদ, যেমন ধান কাটার সময় নির্ধারিত করা যাবে না। কেননা, আবহাওয়ার পরিবর্তনে ধান কাটার সময় আগে-পিছে হয়ে যেতে পারে। যেহেতু সে যুগে লেখার ব্যাপক প্রচলন ছিল না এবং আজও ব্যাপক প্রচলনের পর পৃথিবীর অধিকাংশ লোক লেখা জানে না, তাই আশংকা ছিল যে, লেখক কিসের স্থলে কি লিখে ফেলবে। ফলে কারও ক্ষতি এবং কসরও লাভ হয়ে যাবে। এ আশংকার কারণেই অতঃপর বলা হয়েছে :

وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ — অর্থাৎ এটা জরুরী যে, তোমাদের মধ্যে কোন লেখক ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখবে।

এতে একদিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, লেখক কোন একপক্ষের লোক হতে পারবে না; বরং নিরপেক্ষ হতে হবে — যাতে কারও মনে সন্দেহ বা খটকা না থাকে। অপরদিকে লেখককে ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যের ক্ষণস্থায়ী উপকার করে নিজের চিরস্থায়ী ক্ষতি করা তার পক্ষে উচিত হবে না। এরপর লেখককে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে এ লেখার বিদ্যা দান করেছেন। এর কৃতজ্ঞতা এই যে, সে লিখতে অস্বীকার করবে না।

এরপর দলীল কোন পক্ষ থেকে লিখতে হবে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে :

وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ — অর্থাৎ যার দায়িত্বে দেনা, সে লেখাবে। উদাহরণত এক ব্যক্তি সওদা কিনে মূল্য বাকি রাখলো। এখানে যার দায়িত্বে দেনা হচ্ছে, সে দলীলের বিষয়বস্তু লেখাবে। কেননা, এটা হবে তার পক্ষ থেকে স্বীকৃতি বা অস্বীকার পত্র। লেখানোর মধ্যেও কমবেশির আশংকা থাকতে পারে। তাই বলা হয়েছে :

وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا — অর্থাৎ সে তার পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করবে এবং দেনা বিন্দুমাত্রও কম লেখাবে না। লেনদেনের ব্যাপারে দেনাদার ব্যক্তি কখনও নির্বোধ অথবা অক্ষম, বৃদ্ধ, অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক, মুক অথবা অন্য ভাষাভাষী হতে পারে। এ কারণে দলীলের বিষয়বস্তু বলে দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। তাই অতঃপর বলা হয়েছে : এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে তার পক্ষ থেকে তার কোন অভিভাবক লেখাবে। পাগল ও নাবালগের তো অভিভাবক থাকেই। তাদের সব কাজ-কারবার অভিভাবক দ্বারাই সম্পন্ন হয়। মুক এবং অন্য ভাষাভাষীর অভিভাবকও এ কাজ করতে পারে। যদি তারা কাউকে উকিল নিযুক্ত করে, তাতেও চলবে। এ স্থলে কোরআন পাকের 'ওলী' শব্দটি উভয় অর্থেই বোঝায়।

সাক্ষ্য-বিধির কতিপয় জরুরী মূলনীতি : এ পর্যন্ত লেনদেনে দলীল লেখা ও লেখানোর জরুরী মূলনীতি ব্যক্ত হয়েছে। অতঃপর বলা হয়েছে যে, দলীলের লেখাকেই যথেষ্ট মনে করবে না ; বরং এতে সাক্ষীও রাখবে—যাতে কোন সময় পারস্পরিক কলহ দেখা দিলে আদালতে সাক্ষীদের সাক্ষ্য দ্বারা ফয়সালা হতে পারে। এ কারণেই ফিকহবিদগণ বলেছেন যে, লেখা শরীয়তসম্মত প্রমাণ নয়, তাই লেখার সমর্থনে শরীয়তসম্মত সাক্ষ্য বিদ্যমান না থাকলে শুধু লেখার উপর ভিত্তি করে ফয়সালা করা যায় না। আজকালকার সাধারণ আদালতসমূহেও এ

রীতিই প্রচলিত রয়েছে। লেখার মৌখিক সত্যায়ন ও তৎসমর্থনে সাক্ষ্য ব্যতীত কোন ফয়সালা করা হয় না।

সাক্ষী সংখ্যা : এরপর সাক্ষ্য-বিধির কতিপয় জরুরী নীতি বর্ণনা করা হয়েছে। উদাহরণত (১) সাক্ষী দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা হওয়া জরুরী। একা একজন পুরুষ অথবা শুধু দু'জন মহিলা সাধারণ লেনদেনের সাক্ষ্যের জন্য যথেষ্ট নয়।

সাক্ষীদের শর্তাবলী : (২) সাক্ষীকে মুসলমান হতে হবে **مِنْ رِّجَالِكُمْ** শব্দে এদিকেই নির্দেশ করা হয়েছে। (৩) সাক্ষীকে নির্ভরযোগ্য 'আদিল' হতে হবে, যার কথার উপর আস্থা রাখা যায়। ফাসেক ও ফাজের (অর্থাৎ পাপাচারী) হলে চলবে না। **مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ** বাক্যে এ নির্দেশ রয়েছে।

শরীয়তসম্মত ওযর ব্যতীত সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করা গোনাহ : নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যখন কোন ব্যাপারে কাউকে সাক্ষী করার জন্য ডাকা হয়, তখন সে যেন আসতে অস্বীকার না করে। কেননা, সাক্ষ্যই হচ্ছে সত্য প্রতিষ্ঠিত করার এবং বিবাদ মেটানোর উপায় ও পন্থা। কাজেই একে জরুরী জাতীয় কাজ মনে করে কষ্ট স্বীকার করবে। এরপর আবার লেনদেনের দলীল লিপিবদ্ধ করার উপর জোর দিয়ে বলা হয়েছে : লেনদেন ছোট হোক কিংবা বড় হোক —সবই লিপিবদ্ধ করা দরকার। এ ব্যাপারে বিরক্তিবোধ করা উচিত নয়। কেননা, লেনদেন লিপিবদ্ধ করা সত্য প্রতিষ্ঠিত রাখতে, নির্ভুল সাক্ষ্য দিতে এবং সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকতে চমৎকাররূপে সহায়তা করে। হ্যাঁ, যদি নগদ লেনদেন হয় —বাকি না হয়, তবে তা লিপিবদ্ধ না করলেও ক্ষতি নেই। তবে এ ব্যাপারেও কমপক্ষে সাক্ষী রাখা বাঞ্ছনীয়। কেননা, উভয় পক্ষের মধ্যে কোন সময় মতবিরোধ দেখা দিতে পারে। উদাহরণত বিক্রেতা মূল্য প্রাপ্তি অস্বীকার করতে পারে কিংবা ক্রেতা বলতে পারে যে, সে ক্রীতবস্তু বুঝে পায়নি। এ মতবিরোধ মীমাংসার ক্ষেত্রে সাক্ষ্য কাজে লাগবে।

সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার মূলনীতি : আয়াতের শুরুতে লেখকদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন লিখতে ও সাক্ষী হতে অস্বীকার না করে। এমতাবস্থায় তাদেরকে হয়তো মানুষ বিরক্ত করে তুলতে পারতো। তাই আয়াতের শেষ ভাগে বলা হয়েছে :

وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ —অর্থাৎ কোন লেখক বা সাক্ষীকে যেন ক্ষতিগ্রস্ত না করা হয়। অর্থাৎ নিজের উপকারের জন্য যেন তাদের বিব্রত না করা হয়। এরপর বলা হয়েছে : **وَأَنْ تَفْعَلُوا فَاِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ** —অর্থাৎ তোমরা যদি লেখক বা সাক্ষীকে বিব্রত কর, তবে এতে তোমাদের গোনাহ হবে।

এতে বোঝা গেল যে, লেখক কিংবা সাক্ষীকে বিব্রত বা ক্ষতিগ্রস্ত করা হারাম। এ কারিশমাই ফকীহগণ বলেন : লেখক যদি লেখার পারিশ্রমিক দাবি করে কিংবা সাক্ষী যাতায়াত খরচ চায়, তবে এটা তাদের ন্যায্য অধিকার। তা না দেওয়াও তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিব্রত করার শামিল এবং অবৈধ। ইসলাম বিচার ব্যবস্থায় যেমন সাক্ষীকে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করেছে এবং সাক্ষ্য গোপন করাকে কঠোর অপরাধ সাব্যস্ত করেছে, তেমনি এ ব্যবস্থাও করেছে, যাতে কেউ সাক্ষ্য দেওয়া থেকে গা বাঁচাতে বাধ্য না হয়। এ দিমুখী সতর্কতার ফলেই প্রত্যেক মামলায় সত্যবাদী ও নিঃস্বার্থ সাক্ষী পাওয়া যেত এবং নিষ্পত্তি দ্রুত, সহজ ও ন্যায্যানুগ হতো। বর্তমান বিশ্ব এ কোরআনী নীতির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেছে। ফলে সমগ্র বিচার ব্যবস্থা ভুল হয়ে গেছে।

ঘটনার আসল ও সত্য সাক্ষী পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে গেছে। প্রত্যেকেই সাক্ষ্যদান থেকে গা বাঁচাতে বাধ্য হচ্ছে। কারণ এই যে, যার নাম সাক্ষীদের তালিকাভুক্ত হয়ে যায়, পুলিশী ও ফৌজদারী মোকদ্দমা হলে রোজই সময়ে-অসময়ে থানা পুলিশ তাদের ডেকে পাঠায়। মাঝে মাঝে কয়েক ঘণ্টা বসিয়ে রাখে। দেওয়ানী আদালতসমূহেও সাক্ষীর সাথে অপরাধীর মত ব্যবহার করা হয়। এরপর রোজ রোজ মোকদ্দমার হাজিরা পরিবর্তিত হয়। তারিখের পর তারিখ পড়ে। বেচারী সাক্ষী নিজ কাজ-কারবার, মজুরি কিংবা প্রয়োজনীয় কাজকর্ম ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়। অন্যথা হলে পরোয়ানা জারি করে শ্রেকতার করা হয়। তাই কোন ভদ্র ও ব্যস্ত মানুষ কোন মামলার সাক্ষী হওয়াকে আযাব বলে মনে করে এবং যথাসাধ্য এ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে বাধ্য হয়। তবে শুধু পেশাদার সাক্ষীই এসব ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। যাদের কাছে সত্য-মিথ্যার কোন পার্থক্য নেই। কোরআন পাক এ সম্পর্কিত মৌলিক প্রয়োজনাঙ্গি গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করে এসব অনিষ্টের দ্বার রুদ্ধ করে দিয়েছে। আয়াতের শেষ ভাগে বলা হয়েছে :

وَأْتُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ — অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নির্ভুল নীতি শিক্ষা দেন। এটা তাঁর অনুগ্রহ। আল্লাহ তা'আলা সর্ববিষয়ে পরিজ্ঞাত। এ আয়াতে অনেক বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন ফিকহবিদ এ আয়াত থেকে বিশটি গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলা বের করেছেন। কোরআন পাকের সাধারণ রীতি এই যে, আইন বর্ণনা করার আগে ও পরে আল্লাহ-ভীতি ও প্রতিদান দিবসের ভীতি স্মরণ করিয়ে মানুষের মনকে নির্দেশ পালনে উদ্বুদ্ধ করে। এই রীতি অনুযায়ী আলোচ্য আয়াত আল্লাহ-ভীতি দ্বারা শেষ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, আল্লাহর দৃষ্টিতে কোন কিছু গোপন নয়। তোমরা যদি কোন অবৈধ বাহানার মাধ্যমেও বিরুদ্ধাচরণ কর, তবুও আল্লাহকে ধোঁকা দিতে পারবে না।

দ্বিতীয় আয়াতে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্ণিত হয়েছে। প্রথমত ব্যাকির ব্যাপারে যদি কেউ বিশ্বস্ততার জন্য কোন বস্তু বন্ধকে নিতে চায়, তাও করতে পারে। কিন্তু এতে *مقبوضه* শব্দ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, বন্ধকী বস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়া তাঁর জন্য জায়েয নয়। সে শুধু ঋণ পরিশোধ হওয়া পর্যন্ত একে নিজের অধিকারে রাখবে। এর যাবতীয় মুনাফা আসল মালিকের প্রাপ্য।

দ্বিতীয়ত, যে ব্যক্তি কোন বিরোধ সম্পর্কে বিতর্ক জ্ঞান রাখে, সে সাক্ষ্য গোপন করতে পারবে না। যদি সে গোপন করে, তবে তার অন্তর গোনাহ্‌গার হবে। অন্তর গোনাহ্‌গার বলার কারণ এই যে, কেউ যেন একে শুধু মুখের গোনাহ্‌ মনে না করে। কেননা, অন্তর থেকেই প্রথমে ইচ্ছা সৃষ্টি হয়। তাই অন্তরের গোনাহ্‌ প্রথম।

لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوْا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوْهُ

يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿৬৪৪﴾

(২৮৪) যা কিছু আকাশসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু বহীনে আছে, সব আল্লাহরই। যদি তোমরা মনের কথা প্রকাশ কর কিংবা গোপন কর, আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে জ্ঞান হিসাব নেবেন। অতঃপর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দেবেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

তকসীরের সার-সংক্ষেপ

যা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যা কিছু জমিনের বুকে রয়েছে, সব (সৃষ্ট বস্তু) আল্লাহরই। (যেমন, স্বয়ং আসমান এবং জমিন তাঁরই। তিনি যখন মালিক, তখন স্বীয় মালিকানাধীন বস্তুসমূহের জন্য সর্বপ্রকার আইন রচনা করার অধিকার তাঁরই রয়েছে। এতে কারও কথা বলার অবকাশ নেই। উদাহরণস্বরূপ এক আইন এই যে,) তোমাদের অন্তরে যেসব (দ্রোহ বিশ্বাস, অশালীন চরিত্র কিংবা পাপ কাজের ইচ্ছা ও কৃতসংকল্প হওয়া সম্পর্কিত) বিষয় আছে, সেগুলোকে যদি তোমরা (মুখ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে) প্রকাশ কর (উদাহরণস্বরূপ মুখে কুকর্মী বাক্য উচ্চারণ কর কিংবা অহংকার, হিংসা ইত্যাদি প্রকাশ কর বা যে পাপ কাজ করার ইচ্ছা ছিল, তা করেই ফেল) অথবা (মনের মধ্যেই) গোপন রাখ, (উভয় অবস্থাতে) আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কাছ থেকে (অন্যান্য পাপ-কাজের মত সেগুলোর) হিসাব গ্রহণ করবেন। অনন্তর (হিসাব গ্রহণের পর কুফর ও শিরক ছাড়া) যাকে (ক্ষমা করার) ইচ্ছা, ক্ষমা করবেন এবং যাকে (শাস্তি দেওয়ার) ইচ্ছা, শাস্তি দেবেন। আর আল্লাহ সর্ববিষয়েই পরিপূর্ণ শক্তিমান।

আনুযায়িক জ্ঞাতব্য বিষয়

প্রথম আয়াতে সাক্ষ্য প্রকাশ করার নির্দেশ ও গোপন করার নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে সেই বিষয়বস্তুরই পরিশিষ্ট। এতে ইশিয়ার করা হয়েছে যে, সাক্ষ্য গোপন করা হারাম। তোমরা যদি ঘটনা জেনেও তা গোপন কর, তবে সর্বজ্ঞ ও সর্বজ্ঞানী আল্লাহ এর হিসাব গ্রহণ করবেন। এ ব্যাখ্যা হযরত ইবনে আব্বাস (রা), ইকরামা (রা), শা'বী (র) ও মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত আছে। —(কুরতুবী)

শাদ্দিক ব্যাপকতার দিক দিয়ে আয়াতটি ব্যাপক এবং যাবতীয় বিশ্বাস, ইবাদত ও সেনদেন এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এ আয়াতের তকসীর প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর প্রসিদ্ধ উক্তি তা-ই। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সকল সৃষ্টির যাবতীয় কাজকর্মের হিসাব গ্রহণ করবেন। যে কাজ করা হয়েছে এবং যে কাজের শুধু মনে মনে সংকল্প করা হয়েছে, সে সবগুলোরই হিসাব গ্রহণ করবেন। বুখারী ও মুসলিমে হযরত ইবনে উমর (রা)-এর ভাষ্যে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, কিয়ামতের দিন মু'মিনকে আল্লাহর নিকটবর্তী করা হবে এবং আল্লাহ তাকে এক এক করে সব গোনাহ স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করবেন : এ গোনাহটি কি তোমার জানা আছে? মু'মিন স্বীকার করবে। আল্লাহ তা'আলা বলবেন : আমি দুনিয়াতেও তোমার গোনাহ জনসমক্ষে প্রকাশ করিনি, আজও তা ক্ষমা করে দিলাম। অতঃপর নেক কাজের আমলনামা তার হাতে অর্পণ করা হবে। কিন্তু কাকির ও মুনাফিকদের পাপকাজসমূহ প্রকাশ্যে বর্ণনা করা হবে।

অন্য এক হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা বলবেন : আজকের দিনে গোপন বিষয়াদি পর্যালোচনা করা হবে এবং গোপন ভেদ প্রকাশ করা হবে। আমলনামা লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাগণ শুধু তোমাদের প্রকাশ্য গোনাহসমূহ লিপিবদ্ধ করেছে। আমি এমন

সব বিষয়ও জানি, যা ফেরেশতারা জানে না। এগুলো তারা ভোম্বাদের আমলনামায় লিপিবদ্ধ করেনি। এখন আমি বর্ণনা করছি এবং হিসাব নিচ্ছি। আমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করব এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেব। অতঃপর মু'মিনদেরকে ক্ষমা করা হবে এবং কাকিরদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। —(কুরত্ববী)

এখানে একটি প্রশ্ন জাগে। হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

أَنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا وَبِعَمَلُوا
بِهِ (قرطبي)

“আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের ঐসব বিষয় ক্ষমা করেছেন, যা তাদের মনের কল্পনায় সীমাবদ্ধ থাকে—মুখে ব্যক্ত করে না অথবা কার্যে পরিণত করে ন্দ।”

এতে বোঝা যায় যে, মনের ইচ্ছার জন্য কোনরূপ শাস্তি দেওয়া হবে না। ইমাম কুরত্ববী বলেন : এ হাদীসটি জাগতিক বিধি-বিধান সম্পর্কিত। ভাষ্যক, ত্রীতদাস মুক্তকরণ, কেনা-বেচা, দান ইত্যাদি শুধু মনে মনে ইচ্ছা করলেই হয় না, যে পর্যন্ত মুখে প্রকাশ কিংবা কার্যে পরিণত করা না হয়। আয়াতে যা বলা হয়েছে, তা পারলৌকিক বিধি-বিধান সম্পর্কিত। সুতরাং আয়াতের মর্মার্থ এবং হাদীসের মধ্যে বিরোধ দেখা যায় না।

এ প্রশ্নের জওয়াবে আলোচনা বলায় : যে হাদীসে অন্তরের গোপন বিষয় ক্ষমা করার কথা বলা হয়েছে, সে হাদীসের অর্থ হচ্ছে অনিচ্ছাকৃত কুচিন্তা ও কুধারণা। যেগুলো কোনরূপ ইচ্ছা ছাড়াই মনে জাগরিত হয়। অনেক সময় বিপরীত ইচ্ছা করলেও এগুলো মনে জাগ্রত হতে থাকে। এ উম্মতের এ জাতীয় অনিচ্ছাকৃত কুধারণা ও কুমন্ত্রণা আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করেছেন। পক্ষান্তরে আলোচ্য আয়াতে ঐ সব ইচ্ছা ও নিয়ত বোঝানো হয়েছে, যা মানুষ বৈশ্বায় অন্তরে পোষণ করে এবং তা কার্যে পরিণত করার চেষ্টাও করে। এরপর ঘটনাক্রমে কিছু বাধার সম্মুখীন হওয়ার কারণে কার্যে পরিণত করতে পারে না। কিয়ামতের দিন এ জাতীয় ইচ্ছা ও নিয়তের হিসাব নেওয়া হবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন; যেমন পূর্বোক্তিত বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে বলা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের ভাষায় ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত উভয় প্রকার ধারণা অন্তর্ভুক্ত। তাই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর সাহাবায়ে কিরাম অত্যধিক চিন্তাবিত হয়ে পড়েন। তাঁরা ভাবতে থাকেন যে, অনিচ্ছাকৃত কল্পনা ও কুচিন্তার জন্যও যদি পাকড়াও করা হয়, তবে কারো পক্ষে কি মুক্তি পাওয়া সম্ভব হবে ? তাঁরা এ ভাবনার কথা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আরম্ব করলেন। তিনি বললেন : যে নির্দেশ অবতীর্ণ হয়েছে, তা মেনে নিতে কৃতসংকল্প হও এবং বল : سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا অর্থাৎ আমরা নির্দেশ শুনলাম ও মেনে নিলাম। সাহাবায়ে-কিরাম তা-ই করলেন। এর পরিস্থিতিতে কোরআনের, لَا يَكُفُّ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسْعَهَا আয়াত অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কাউকে সামর্থ্যের বাহিরে কার্যভার অর্পণ করেন না।

এর সারমর্ম এই যে, অনিচ্ছাকৃত কুচিন্তার জন্য পাকড়াও করা হবে না। এরপর সাহাবায়ে কিরাম স্বস্তি লাভ করেন। এ হাদীসটি মুসলিম শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর রেওয়াতেক্রমে বর্ণিত রয়েছে। —(কুরত্ববী)

তফসীরে মায়হারীতে বলা হয়েছে : আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যেসব কাজ করায় কিংবা হারাম করা হয়েছে, তন্মধ্যে কিছু মানুষের বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

যেমন নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ এবং হুজি, জেনা ইত্যাদি। পক্ষান্তরে কিছু কাজ মানুষের অন্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেমন, ঈমান ও বিশ্বাসের যাবতীয় শাখা-প্রশাখা। কুফর ও শিরক সর্বাধিক হারাম ও অবৈধ। এগুলোও মানুষের অন্তরের সাথে সম্পর্ক। উত্তম চরিত্র; যথা—বিনয়, ধৈর্য, অল্পে তৃষ্টি, দানশীলতা ইত্যাদি। এমনিভাবে কুচরিত্র; যেমন—হিংস্রতা, শত্রুতা, দুনিয়া-প্রীতি, লোভ ইত্যাদি অকাটা হারাম বিষয়গুলোর সম্পর্কও মানুষের বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে নয়, বরং অন্তরের সাথে।

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতে যেমন বাহ্যিক কাজ-কর্মের হিসাব গ্রহণ করা হবে, তেমনিভাবে অভ্যন্তরীণ কাজ-কর্মেরও হিসাব নেওয়া হবে এবং ভুল-ত্রুটির কারণেও পাকড়াও করা হবে। আয়াতটি সূরা বাকারার শেষভাগে বর্ণনা করার মধ্যে বিরাট রহস্য লুক্কায়িত রয়েছে। কেননা, সূরা বাকারার কোরআন পাকের সর্বাপেক্ষা বড় ও গুরুত্বপূর্ণ সূরা। আল্লাহর বিধি-বিধানের বিরাট অংশ এতে বিস্তৃত হয়েছে। এ সূরার গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক ও আনুষঙ্গিক এবং ইহলৌকিক ও পারলৌকিক নির্দেশাবলী; যথা—নামায, রোযা, কিসাস, যাকাত, হজ্জ, জিহাদ, পবিত্রতা, তালাক, ইদত, খুলা, শিতক দুষ্পান করানো, মদ ও সুদের অবৈধতা, ঋণ, লেনদেনের বৈধ ও অবৈধ পন্থা ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ কারণেই হাদীসে এ সূরার নাম 'সেনামূল-কোরআন' অর্থাৎ 'কোরআনের সর্বোচ্চ অংশ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব বিধি-বিধান পালনের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে 'ইখলাস' বা আন্তরিক নিষ্ঠা। অর্থাৎ কোন কাজ করা কিংবা কোন কাজ থেকে বিরত থাকা ঠাট্টাভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই হতে হবে। এতে নাম-যশ অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্য শামিল থাকতে পারবে না।

'ইখলাস' বা অন্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত সব কাজ-কর্মের বিশুদ্ধতা এরই উপর নির্ভরশীল। তাই সূরার শেষে এ আয়াতের মাধ্যমে মানুষকে ইশিয়ার করা হয়েছে যে, ফরয কাজ করা এবং হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে মানুষের সামনে তো প্রভাবশালী আশ্রয় নিয়ে গা বাঁচানো যায়, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ ও সর্বজ্ঞানী। তাঁর দৃষ্টিতে কোন কিছু গোপন নয়। তাই যা কিছু করবে, এ প্রত্যয়ের সাথে করবে যে, সর্বজ্ঞ আল্লাহ তা'আলা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সব অবস্থাই লিপিবদ্ধ করছেন। কিয়ামতের দিন সবগুলোরই হিসাব দিতে হবে।

কোরআন পাক মানুষের মধ্যে এ অনুভূতিই সৃষ্টি করতে চায়। তাই প্রত্যেক বিধি-নিষেধের শুরুতে কিংবা শেষে আল্লাহুজীতি ও আখিরাতের চিন্তার মতো এমন একটা অনুভূতির সৃষ্টি করে দেয়, যা মানুষের অন্তরে অতন্ত্র প্রহরীর কাজ করতে থাকে। তাই মানুষ রাতের আঁধারে কিংবা নির্জনেও কোন নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করতে ভয় পায়।

أَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ
بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا تَفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ
وَقَالُوا سُبْحَانَ وَطَعْنَا فِي غُفْرَانِكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ۝ لَا يَكْفُفُ

اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ
 رَبَّنَا لَا تَأْخُذْنَا إِن تَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا
 أَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ
 لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا ۖ وَارْحَمْنَا ۖ إِنَّتَ مَوْلَانَا
 فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٧٥﴾

(২৮৫) রাসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে, যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানরাও। সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি, তাঁর কেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি এবং তাঁর পয়গম্বরগণের প্রতি। তারা বলে, আমরা তাঁর পয়গম্বরগণের মধ্যে কোন তারতম্য করি না। তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি। আমরা তোমার কমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা! তোমারই দিকে প্রত্যাভর্তন করতে হবে। (২৮৬) আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না, সে তা-ই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার উপর বর্তে যা সে করে। হে আমাদের পালনকর্তা! যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! এবং আমাদের উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছে। হে আমাদের প্রভো! এবং আমাদের দ্বারা ঐ বোঝা বহন করিও না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন কর। আমাদেরকে কমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের প্রভু। সুতরাং কাকির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

রাসূল (সা) বিশ্বাস রাখেন ঐসব বিষয় সম্পর্কে (অর্থাৎ বিষয়ের সত্যতা সম্পর্কে) যা তাঁর প্রভুর পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে (অর্থাৎ কোরআন) এবং (অন্য) মু'মিনরাও (এ বিশ্বাস রাখে। অতঃপর কোন কোন বিষয়ে বিশ্বাস রাখলে কোরআনে বিশ্বাস রাখা বলা হবে, এর বিবরণ দান করা হয়েছে) সবাই (রাসূল ও অন্য মু'মিনগণও) বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি (যে, তিনি বিদ্যমান আছেন; তিনি এক এবং সত্তা ও গুণাবলীতে সম্পূর্ণ।) এবং তাঁর কেরেশতাদের প্রতি এবং তাঁর আঙ্গহানী গ্রন্থসমূহের প্রতি এবং তাঁর পয়গম্বরগণের প্রতি (যে, তাঁরা পয়গম্বর এবং সত্যবাদী। পয়গম্বরগণের প্রতি বিশ্বাস রাখা এভাবে যে, তারা বলে,) আমরা তাঁর পয়গম্বরগণের মধ্যে কারও সাথে (বিশ্বাস রাখার ব্যাপারে) পার্থক্য করি না (যে, কাউকে পয়গম্বর মনে করবো এবং কাউকে মনে করবো না) তারা সবাই বলে যে, আমরা

(আপনার নির্দেশ) শুনেছি এবং (এগুলো) সানন্দে মেনে নিয়েছি। আরহা আপনাদের জন্য কামনা করি যে, আপনি আমাদের পালনকর্তা এবং আপনারই দিকে (আমাদের সমগ্রাইকে) প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (অর্থাৎ আমি পূর্বের আয়াতে বলেছি যে, অন্তরে গোপন বিশ্বাসনিষ্ঠ হিসাব গ্রহণ করা হবে; এর অর্থ অনিচ্ছাকৃত বিষয়াদি নয়; বরং শুধু ইচ্ছাধীন বিষয়াদি। কেননা,) আত্মাহুত তা'আলা কাউকে (শরীরতের বিধি-বিধানের) দায়িত্ব ন্যস্ত করেন না (কুখ্যাৎ এসব বিধি-বিধানকে ওয়াজিব কিংবা হারাম করেন না) কিন্তু যা তার সাধ্যের (ও কবজার) মধ্যে থাকে। সে সওয়াবও তারই পায়, যা সে ইচ্ছাকৃতভাবে করে এবং সে শাস্তিও তারই পাবে, যা সে চেষ্টা করে (এবং যা সাধ্যের বাইরে, সে বিষয়ের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়নি। যে বিষয়ের সাথে-ইচ্ছার সম্পর্ক নাই, তার জন্য সওয়াব ও শাস্তি কিছুই হবে না। কু-চিন্তা সাধ্যের বাইরে। তাই তার অন্তরে জাগরিত হওয়াকে হারাম এবং জাগরিত হতে না দেওয়াকে ওয়াজিব করেন নি।)। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে দারী করবেন না; যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি। হে আমাদের প্রভো! এবং (আমরা আরও প্রার্থনা জানাই যে,) আমাদের উপর (দায়িত্ব পালনের) এমন কোন গুরুত্ব (ইহকালে কিংবা পরকালে) অর্পণ করবেন না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই এবং আমাদেরকে কমা করুন এবং আমাদেরকে মার্জনা করুন এবং আমাদের প্রতি দয়া করুন। আপনিই আমাদের অভিভাবক। অতএব, কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে জরী করুন।

আনুখরিক ছাত্তব্য বিষয়

বর্ণিত আয়াতবয়ের বিশেষ ফযীলত : আলোচ্য আয়াত দু'টি সূরা বাকারার শেষ আয়াত। সহীহ হাদীসসমূহে এ আয়াত দু'টির বিশেষ ফযীলতের কথা বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : কেউ রাতে বেলায় এ আয়াত দু'টি পাঠ করলে তা তার জন্য যথেষ্ট।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা—রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : আত্মাহুত তা'আলা এ দু'টি আয়াত আত্মাতের ভাঙার থেকে অবতীর্ণ করেছেন। জগৎ সৃষ্টির দুই হাজার বছর পূর্বে পরম দয়ালু আত্মাহুত তা'আলা বহুতে তা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এশার নামাযের পর এ দু'টি আয়াত পাঠ করলে তা তাহাজ্জুদ নামাযের দুলাভিষিক্ত হয়ে যায়। মুক্তাদারাক হাকেম ও বায়হাকীর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : আত্মাহুত তা'আলা এ দু'টি আয়াত দ্বারা সূরা বাকারাহ সমাপ্ত করেছেন। আরশের শিরোনাম বিশেষ ভাঙার থেকে এ দু'টি আয়াত আমাকে দান করা হয়েছে। তোমরা বিশেষভাবে এ দু'টি আয়াত শিখা কর এবং নিজেদের প্রীত্যোক্ত ও সন্তান-সন্ততিকে শিক্ষা দাও।

এ কারণেই হযরত ফারুকে আযম ও আলী মুর্তজা (রা) বলেন, আমাদের মতে যার সামান্যও বুদ্ধিজ্ঞান আছে, সে এ দু'টি আয়াত পাঠ করা ব্যতীত নিদ্রা যাবে না। এ আয়াতবয়ের অর্থগত বৈশিষ্ট্য অনেক। তন্মধ্যে একটি উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য এই যে, সূরা বাকারার অধিকাংশ বিধি-বিধান সংক্ষেপে ও বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত হয়েছে। যথা বিশ্বাস, ইবাদত, লেনদেন, চরিত্র সামাজিকতা ইত্যাদি। সর্বশেষ এ আয়াতবয়ের প্রথম আয়াতে অসুপ্ত মু'মিনদের প্রার্থনা করা হয়েছে, যারা আত্মাহুত তা'আলার বাবতীয় বিধান শিরোধার্য করে নিয়েছে এবং বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগী হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে একটি প্রশ্নের জওয়াব দেওয়া হয়েছে, যা এ আয়াতবয়ের পূর্ববর্তী আয়াতে সাহাবারে কিরামের মনে দেখা গিয়েছিল। প্রশ্নটি ছিল এই—বখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো :

—وَأَنْ تَذُبُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تَتَّقُوا يَهْدِيكُمْ بِهِ اللَّهُ— অর্থাৎ 'তোমাদের অন্তরে যা আছে; প্রকাশ কর কিংবা গোপন কর সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নেবেন। আয়াতের আসল উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তোমরা বেঈমান যেসব কাজ করবে; আল্লাহ্ তা'আলা তার হিসাব নেবেন। অনিচ্ছাকৃত কুচিন্তা ও ক্রটি বিচ্যুতি এর অন্তর্ভুক্তই ছিল না। কিন্তু আয়াতের তাহা বাহ্যত ব্যাপক ছিল। এতে বোঝা যেত যে, অনিচ্ছাকৃত খারাপারও হিসাব নেওয়া হবে। এ আয়াত শুনে সাহাবায়ে কিরাম অস্থির হয়ে গেলেন এবং রসূল (সা)-এর কাছে আরম্ভ করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! এতদিন আমরা মনে করতাম যে, আমাদের ইচ্ছাকৃত কাজেরই হিসাব হবে। মনে যেসব অনিচ্ছাকৃত কলনা আসে, সেগুলোর হিসাব হবে না। কিন্তু এ আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, প্রতিটি কলনারও হিসাব হবে। এতে তো শান্তির কবল থেকে মুক্তি পাওয়া সাংঘাতিক কঠিন মনে হয়। মহানবী (সা) আয়াতের সঠিক উদ্দেশ্য জ্ঞানতেন, কিন্তু উক্ত আয়াতে ব্যবহৃত শব্দের ব্যাপকতার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি নিজের পক্ষ থেকে কিছু বলা সমীচীন মনে করলেন না, বরং ওহীর অপেক্ষায় রইলেন। তিনি সাহাবায়ে কিরামকে আপাতত আদেশ দিলেন যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যে নির্দেশ আসে, তা সহজ হোক কিংবা কঠিন—মু'মিনের কাজ তো মেনে নেওয়া। এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও শিধা করা উচিত নয়। আল্লাহ্ তা'আলার প্রত্যেক আদেশ শুনে তোমাদের একথা বলা উচিত :

—سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ وَالْيَكِ الْمَصِيرُ— অর্থাৎ 'হে আমাদের পালনকর্তা ! আমরা আপনার নির্দেশ শুনেছি এবং মেনে নিয়েছি। হে আমাদের প্রভো ! যদি নির্দেশ পালনে আমাদের কোন ক্রটি বা ভুল হয়ে থাকে, তবে তা ক্ষমা করুন। কেননা, আমাদের সবাইকে আপনারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।"

সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশ মত কাজ করলেন ; যদিও তাঁদের মনে এ ঘটনা ছিল যে, অনিচ্ছাকৃত কলনা ও কুচিন্তা থেকে বেঁচে থাকা খুবই কঠিন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা এ দু'টি আয়াত নাবিল করেন। প্রথম আয়াতে মুসলমানদের প্রশংসা করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় আয়াতে ঐ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে, যে আয়াত সম্পর্কে সাহাবায়ে-কিরামের মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। প্রথম আয়াতটি হচ্ছে :

أَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ - لَا تَفَرُّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَالْيَكِ الْمَصِيرُ .

অর্থাৎ রাসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ বিষয়ের প্রতি, যা তাঁর কাছে তাঁর প্রভুর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। এতে মহানবী (সা)-এর প্রশংসা করা হয়েছে এবং তাঁর নাম উল্লেখ করার পরিবর্তে 'রসূল' শব্দ ব্যবহার করে তাঁর সম্মান ও মহত্ত্ব কুটিরে তোলা হয়েছে। এরপর বলেছেন : وَالْمُؤْمِنُونَ অর্থাৎ রাসূল (সা)-এর যেমন তাঁর প্রতি অবতীর্ণ ওহীর প্রতি বিশ্বাস আছে তেমনি সাধারণ মু'মিনদেরও রয়েছে। এতে প্রথমে পূর্ণ বাক্যে রাসূল (সা)-এর বিশ্বাস বর্ণিত হয়েছে, এরপর মু'মিনদের বিশ্বাস পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বর্ণনাস্থিতিতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যদিও আসল বিশ্বাসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও সকল মুসলমান অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু

বিশ্বাসের স্তরে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিশ্বাস প্রকৃতক ভ্রাম ও শ্রবণের ভিত্তিতে এবং অন্য মুসলমানগণের বিশ্বাস 'অদৃশ্য বিশ্বাস' এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখার ভিত্তিতে।

এরপর মহানবী (সা) ও অন্য মু'মিনদের অস্তিত্ব ও সংশ্লিষ্ট ইমামের পূর্ণ বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে যে, এ ইমান হচ্ছে আত্মাহ তা'আলার অস্তিত্বের প্রতি, পূর্ণতার দাবতীর ওপে তাঁর ওণাবিত হওয়ার প্রতি, কেরেশতাদের অস্তিত্বের প্রতি এবং আত্মাহ তা'আলার হাদ্বাহবী ও পরগধরগণের সকলেরই সভ্য হওয়ার প্রতি।

এরপর বলা হয়েছে যে, এ উহতের মু'মিনগণ পূর্ববর্তী উহতগণের মত আত্মাহ তা'আলার পরগধরগণের মধ্যে প্রভেদ করবে না যে, কাউকে পরগধর মানবে এবং কাউকে মানবে না। যেমন, ইহুদীরা হযরত মুসা (আ)-কে এবং খৃষ্টানরা হযরত ইসা (আ)-কে পরগধর মানে, কিন্তু শেষ নবী (সা)-কে পরগধর মানে না। এ উহতের প্রশংসা করে বলা হয়েছে যে, আত্মাহ তা'আলার কোন পরগধরকে অস্বীকার করে না। এরপর সাহাবায়ে কিরামের প্রশংসা করা হয়েছে। কারণ, তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নির্দেশ অনুযায়ী মুখে এ বাক্য বলেছিলেন :

سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে একটি বিশেষ ভিত্তিতে এ সলোহের নিয়ম করা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী আয়াত থেকে দেখা দেওয়ার সভাবনা ছিল যে, অন্তরের পোষন ধারণার জন্য দাবী করা হলে আযাব থেকে কিন্নে বাঁচা যাবে। বলা হয়েছে لَا يَكُفُّ إِلَهَ نَفْسًا إِلَّا وُسْعُهَا —অর্থাৎ আত্মাহ তা'আলা কাউকে তাঁর সাধের বাইরে কাজের আদেশ দেন না। কাজেই অনিচ্ছাকৃতভাবে যেসব কলমা ও কুচিন্তা অন্তরে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, এরপর রেগেচলা কারে পরিণত করা না হয়, সেসব আত্মাহ তা'আলার কাছে মাক। যেসব কাজ ইচ্ছা করে করা হয়, শুধু সেগুলোরই হিসাব হবে।

এর বিস্তারিত বর্ণনা এই যে, মানুষের যেসব কাজকর্ম হাত, পা, চক্ষু, শ্রুণ ইত্যাদির সাথে সম্পর্কযুক্ত, সেগুলোকে 'বাহ্যিক কাজকর্ম' বলা হয়। এগুলো দু'প্রকার : এক, ইচ্ছাধীন —যা ইচ্ছা করে করা হয়, যেমন ইচ্ছা করে কথা বলা, ইচ্ছা করে কাউকে গ্রহণ করা ইত্যাদি। দুই, অনিচ্ছাধীন, যা ইচ্ছা ছাড়াই ঘটে যায়। যেমন, এক কথা বলতে গিয়ে অন্য কথা বলে ফেলা অথবা কাঁপুনি রোগে অনিচ্ছাকৃতভাবে হাত নড়ে যাওয়ার কারণে কারও ভবি হুয়ে যাওয়া। এখানে লক্ষণীয়, বিশেষভাবে ইচ্ছাধীন কাজ-কর্মেরই হিসাব-নিকাশ, প্রতিদান ও শাস্তি হবে—অনিচ্ছাকৃত কাজের আদেশ মানুষকে দেওয়া হয়নি এবং সেজন্য সেওয়ার বা জাজব হবে না।

এমনিভাবে যেসব কাজকর্ম মানুষের অন্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত, সেগুলোও দু'প্রকার। এক, ইচ্ছাধীন। যেমন, ইচ্ছা করে অন্তরের কুফর ও শিরকের বিশ্বাস পোষণ করা কিংবা জেনে-বুঝে ইচ্ছা সহকারে নিজেকে বড় মনে করা অর্থাৎ অহংকার করা কিংবা মদ্যপানে কৃতসংকল্প হওয়া। দুই, অনিচ্ছাধীন। যেমন, ইচ্ছা ব্যতিরেকেই মনে কুধারণা আসা। এ ক্ষেত্রেও হিসাব-নিকাশ, প্রতিদান ও শাস্তি শুধু ইচ্ছাধীন কাজের জন্যই হবে—অনিচ্ছাধীন কাজের জন্য নয়।

কোরআনে বর্ণিত এ ব্যাখ্যার ফলে সাহাবায়ে কিরামের মানসিক উত্তেজ দূর হয়ে যায়। আয়াতের শেষে এই বিষয়বস্তুটি আরও ফুটিয়ে তোলার জন্য বলা হয়েছে : لَهَا مَا كَسَبَتْ

وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ—অর্থাৎ মানুষ সওয়াবও সে কাজের জন্যই পাবে, যা বেষ্কার করে এবং শাস্তিও সে কাজের জন্যই পাবে যা বেষ্কার করে।

এখানে সন্দেহ দেখা যায় যে, মাঝে মাঝে ইচ্ছা ছাড়াও মানুষের সওয়াব অথবা আদ্যাব হয়, যে ব্যক্তি কোন সং কাজ করে—যা দেখে অন্যরাও এ সংকাজে উদ্বুদ্ধ হয়, স্বতদিন পর্যন্ত স্নানোরা এ সং কাজ করতে থাকবে, ততদিন এর সওয়াব প্রথম ব্যক্তিও পেতে থাকবে। এমনভাবে, যে ব্যক্তি কোন পাপ কাজ প্রবর্তন করে, ভবিষ্যতে বড় লোক এ পাপ কাজে লিপ্ত হবে, তাদের সমান পাপ প্রথম প্রচলনকারী ব্যক্তিরও হতে থাকবে। হাদীস দ্বারা আরও প্রমাণিত আছে যে, কেউ যদি নিজের সওয়াব অন্যকে দিতে চায়, তবে অন্য ব্যক্তি এ সওয়াব পায়। অতএব, বোঝা গেল যে, ইচ্ছা ছাড়াও মানুষের সওয়াব কিংবা আদ্যাব হয়।

এ সন্দেহ নিরসনকল্পে বলা যায় যে, প্রথমাবস্থায় প্রত্যেকভাবে ঐ কাজের সওয়াব কিংবা আদ্যাব হবে, যা ইচ্ছাকৃতভাবে করে। অতএব, পরোক্ষভাবে এমন কোন কাজের সওয়াব কিংবা আদ্যাব হওয়া এর পরিপন্থী নয়, যা ইচ্ছাকৃতভাবে করেনি। উপরোক্ত দুইটাসমূহে একথা সুস্পষ্ট যে, প্রত্যেকভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সওয়াব কিংবা আদ্যাব হয়নি, বরং অন্যের মধ্যস্থতায় হয়েছে। এছাড়া মধ্যস্থতার মধ্যে তার কার্য ও ইচ্ছার প্রভাব অবশ্যই রয়েছে। কেননা, যে ব্যক্তি কারও উদ্ভাবিত ভাল কিংবা মন্দ পথ অবলম্বন করে তার মধ্যে প্রথম ইচ্ছাকৃত কাজের প্রভাব থাকে; যদিও প্রথম ব্যক্তি এ প্রভাবের ইচ্ছা করেনি। এমনভাবে কেউ কোন ব্যক্তিকে সওয়াব তখনই পৌছায়, যখন সে তার প্রতি কোন অনুগ্রহ করে থাকে। এ হিসাবে অপরের কাজের সওয়াব এবং আদ্যাবও প্রকৃষ্টপক্ষে নিজের কাজেরই সওয়াব ও আদ্যাব।

উপসংহারে কোরআন পাক মুসলমানদেরকে একটি বিশেষ দোয়া শিক্ষা দিয়েছে। এতে ভুল-ত্রুটিবশত কোন কাজ হয়ে যাওয়ার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলা হয়েছে: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نُسِينَا أَوْ نَخْطَا —“হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে দায়ী করো না যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি।” এরপর বলা হয়েছে:

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِمْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ

অর্থাৎ—“হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের উপর ভারী ও কঠিন কাজের বোঝা অর্পণ করো না, যেমত আমাদের পূর্ববর্তী লোকদের (বনী ইসরাঈলদের) উপর অর্পণ করেছিল এবং আমাদের উপর এমন করব কাজ আরোপ করো না, যা সম্পাদনের শক্তি আমাদের নেই।”

এর অর্থ সেরব কঠিন কাজ-কর্ম, যা বনী ইসরাঈলদের উপর আরোপিত ছিল। যেমন, নাপাক বস্ত্র ধৌত করলে পাক হতো না, বরং নাপাক অংশ কেটে ফেলতে হতো কিংবা পুড়িয়ে ফেলতে হতো এবং নিজেকে হত্যা করা ব্যতীত তাদের তওবা কবুল হতো না। কিংবা অর্থ এই যে, দুনিয়াতে আমাদের উপর আদ্যাব নাযিল করো না; যেমন বনী ইসরাঈলের কু-কর্মের জন্য আদ্যাব নাযিল করেছ। এসব দোয়া যে আদ্যাহ তা'আলা কবুল করেছেন, তা রাসূলদ্বারা (সা)-এর মাধ্যমে প্রকাশও করেছেন।

وَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَوَّلُهُ وَآخِرُهُ وَظَاهَرُهُ وَبَاطِنُهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৩

সূরা আলে ইমরান ১০-২০ আয়াত

আয়োজনে



মাউন ফাউন্ডেশন

www.maunfoundation.org

আপনি মহান দাতা। (বিশেষ রহমত এই যে, আমরা যেন সোজাপথে কায়েম থাকি)। হে আমাদের পালনকর্তা! (আমরা বক্রতা থেকে আত্মরক্ষার এবং সংপথে কায়েম থাকার এই দোয়া জাগতিক স্বার্থের বশবর্তী হয়ে করি না, বরং পরকালের মুক্তির জন্য করি। কারণ, আমাদের বিশ্বাস এই যে,) নিশ্চিতই আপনি মানবমণ্ডলীকে (হাশরের ময়দানে) একত্র করবেন ঐ দিনে, যাতে (অর্থাৎ যার আগমন সম্পর্কে) বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। (অর্থাৎ কিয়ামতের দিনে। সন্দেহ না থাকার কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলা ঐ দিনের আগমনের ওয়াদা করেছেন। আর) নিশ্চিতই আল্লাহ ওয়াদার খেলাফ করেন না। (তাই কিয়ামতের আগমন অবশ্যজ্ঞাবী। আমরা তজ্জন্য চিন্তিত)।

আনুষঙ্গিক স্ফাতব্য বিষয়

প্রথমে আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, পথ-প্রদর্শন ও পথভ্রষ্টতা আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। আল্লাহ যাকে পথ-প্রদর্শন করতে চান, তার অন্তরকে সংকাজের দিকে আকৃষ্ট করে দেন। আর যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান, তার অন্তরকে সোজাপথ থেকে বিচ্যুত করে দেন।

রাসূল (সা) বলেন : এমন কোন অন্তর নেই, যা আল্লাহ তা'আলার দুই অঙ্গুলীর মাঝখানে নয়। তিনি যতক্ষণ ইচ্ছা করেন, তাকে সংপথে কায়েম রাখেন এবং যখন ইচ্ছা করেন, সংপথ থেকে বিচ্যুত করে দেন।

তিনি যথেষ্ট ক্ষমতাশীল। যা ইচ্ছা তাই করেন। কাজেই যারা ধর্মের পথে কায়েম থাকতে চায়, তারা সর্বদাই আল্লাহর নিকট অধিকতর দৃঢ়চিন্তা প্রদানের জন্য দোয়া করে। হুম্বর (সা) সর্বদাই অনুরূপ দোয়া করতেন। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিম্নরূপ একটি দোয়া বর্ণিত হয়েছে : **يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك** অর্থাৎ হে অন্তর আবর্তনকারী। আমাদের অন্তরকে তোমার দীনের ওপর দৃঢ় রাখ। (মায়হারী, ২য় খণ্ড)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ

شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ① **كَذَٰبِ الْفِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ**

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَآخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۚ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ②

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَعْيٌ وَمَا يُسْعِفُونَ ۖ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۖ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ③

(১০) যারা কুফরী করে, তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহর সামনে কখনও কাজে আসবে না। আর তারাই হচ্ছে দোষখের ইচ্ছন। (১১) ফেরআউনের সম্প্রদায় এবং তাদের পূর্ববর্তীদের দ্বারা অনুযায়ীই তারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। কলে তাদের পাণের কারণে আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করেছেন আর আল্লাহর আযাব

অতি কঠিন। (১২) কাফিরদেরকে বলে দাও, খুব শিগগিরই তোমরা পরাভূত হয়ে মোঘখের দিকে হাঁকিয়ে নীত হবে—সেটা কতই না নিকট অবস্থানস্থল!

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চিতই যারা কুফরী করে, আল্লাহর সামনে তাদের অর্থ-সম্পদ ও সম্ভান-সম্পত্তি বিন্দু পরিমাণেও কাজে আসবে না। এরূপ লোকেরা জাহান্নামের ইন্ধন হবে। (তাদের ব্যাপারটি এরূপ,) যে রূপ ব্যাপার ছিল ফেরাউন গোষ্ঠী এবং তাদের পূর্ববর্তী (কাফিরদের) (সে ব্যাপার ছিল এই যে) তারা আমার নিদর্শনাবলীকে (অর্থাৎ সংবাদ ও বিধি-বিধানকে) মিথ্যা বলেছিল। আল্লাহ তা'আলা তাদের পাপের কারণে তাদের পাকড়াও করেন। (আল্লাহ তা'আলার পাকড়াও বড় কঠোর। কারণ তাঁর অবস্থা এই যে) তিনি কঠোর শাস্তিদাতা। (যারা আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলেছে, তাদেরও তেমনি শাস্তি হবে)। আপনি কাফিরদের (আরও) বলে দিন : (তোমরা মনে করবে না যে, শুধু পরকালেই এ পাকড়াও হবে। বরং ইহকাল ও পরকাল উভয়কালেই হবে। সেমতে ইহকালে) অতি সত্বর তোমাদের (মুসলমানদের হাতে) পরাজিত করা হবে এবং (পরকালে) জাহান্নামের দিকে একত্র করে নেওয়া হবে। জাহান্নাম খুবই মন্দ ঠিকানা।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَوْغَبُونَ —এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, কাফিররা পরাজিত ও পরাভূত হবে। এতে কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, আমরা জগতের সব কাফিরকে পরাভূত দেখি না, এর কারণ কি? উত্তর—এই যে, আয়াতে সারা জগতের কাফির বোঝানো হয় নি, বরং তখনকার মুশরিক ও ইহুদী জাতিকে বোঝানো হয়েছে। সেমতে মুশরিকদেরকে হত্যা ও বন্দী করার মাধ্যমে এবং ইহুদীদেরকে হত্যা, বন্দী, জিমিয়া কর আরোপ এবং নির্বাসনের মাধ্যমে পরাজিত করা হয়েছিল।

فَذَكَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِتْنَتِي النَّصْرَةَ تَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَخْرَى
كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِّثْلَهُمْ رَأَى الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ
يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ٥٠

(১৩) নিশ্চয়ই দুটি দলের মোকাবিলার মধ্যে তোমাদের জন্য নিদর্শন ছিল। একটি দল আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করে। আর অপর দল ছিল কাফিরদের, এরা বচকে তাদেরকে দিগুণ দেখছিল। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা নিজের সাহায্যের দ্বারা শক্তি দান করেন। এরই মধ্যে শিক্ষণীয় রয়েছে দুটি সম্প্রদায়ের জন্য।

বোণসূত্র : পূর্ববর্তী আয়াতে কাফিরদের পরাজিত হওয়ার সংবাদ দেওয়া হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে প্রমাণ হিসেবে এর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিচয় তোমাদের (প্রমাণের) জন্য বড় নমুনা রয়েছে দুই দলের (ঘটনার) মধ্যে, যারা পরস্পর (বদর যুদ্ধে) একে অন্যের মুখোমুখি হয়েছিল। একদল (অর্থাৎ মুসলমান) আল্লাহর পথে লড়াই করছিল এবং অন্য দল ছিল কাফির। (কাফিরদের সংখ্যা এত বেশি ছিল যে,) কাফিররা নিজ (দল)-কে মুসলমানদের চেয়ে কয়েক গুণ (বেশি) দেখছিল। (দেখাও ধারণা-কল্পনায় দেখা নয়, বরং) চাক্ষুষ দেখা (যার বাস্তবতা সম্পর্কে কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু কাফিরদের সংখ্যা এত বেশি হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের জয়ী করেন। আসলে জয়-পরাজয় আল্লাহর হাতেই)। আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ সাহায্য দ্বারা যাকে ইচ্ছা শক্তিদান করেন। (অতএব) নিঃসন্দেহে এতে (অর্থাৎ এ ঘটনায়) চক্ষুস্থানদের জন্য বড় সাবধানবাণী (ও দৃষ্টান্ত) রয়েছে।

আনুমানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতে বদর যুদ্ধের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এ যুদ্ধে কাফিরদের সংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার। তাদের কাছে সাতশত উট ও একশত অশ্ব ছিল। অপরপক্ষে মুসলমান যোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল তিন শতের কিছু বেশি। তাদের কাছে সর্বমোট সত্তরটি উট, দু'টি অশ্ব, ছয়টি লৌহবর্ম এবং আটটি তরবারি ছিল। মজার ব্যাপার ছিল এই যে, 'প্রত্যেক দলের দৃষ্টিতেই প্রতিপক্ষ দলের সংখ্যা নিজেদের চেয়ে দ্বিগুণ প্রতিভাত হচ্ছিল। এর ফলে মুসলমানদের আধিক্য কল্পনা করে কাফিরদের অন্তর উপর্যুপরি শংকিত হচ্ছিল এবং মুসলমানগণও নিজেদের অপেক্ষা প্রতিপক্ষের সংখ্যা দ্বিগুণ দেখে আল্লাহ্ তা'আলার দিকে অধিকতর মনোনিবেশ করছিলেন। তাঁরা পূর্ণ ভরসা ও দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর ওয়াদা *إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ* (যদি তোমাদের মধ্যে একশত ধৈর্যশীল যোদ্ধা থাকে, তবে তারা দুইশতের বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে)-এর ওপর আস্থা রেখে আল্লাহর সাহায্যের আশা করছিলেন। কাফিরদের প্রকৃত সংখ্যা ছিল তিনগুণ। তা যদি মুসলমানদের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়ে যেতো, তবে তাঁদের মনে ভয়ভীতি সঞ্চার হওয়ার আশংকা ছিল। উভয়পক্ষের দৃষ্টিতে প্রতিপক্ষের সংখ্যা দ্বিগুণ মনে হওয়ায় অবস্থাটা ছিল সাধারণ। অবশ্য কোন কোন অবস্থায় উভয় দলই প্রতিপক্ষকে কম দেখেছিল। সূরা আনফালে এ সম্পর্কে বর্ণনা আসবে।

মোটকথা, মক্কায় প্রদত্ত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী একটি স্বল্প সংখ্যক ও নিরস্ত্র দলকে বিরাট বাহিনীর বিপক্ষে জয়ী করা চক্ষুস্থান ব্যক্তিদের জন্য বিরাট শিক্ষণীয় ঘটনা। (স্মরণীয়ভাবে আল্লামাহ উসমানী)

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ

ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنُ الْمَآبِ ﴿٥٨﴾ قُلْ أُوْنِبْتُكُمْ
 بِخَيْرٍ مِّنْ ذَٰلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
 خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ
 بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿٥٩﴾ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا آتِنَا أَمْثًا فَاغْفِرْ لَنَا
 ذُنُوبَنَا وَتَنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٦٠﴾ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَنِتَّةِينَ وَ
 الْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴿٦١﴾

(১৪) মানবকুলকে মোহগ্রস্ত করেছে নারী, সম্ভান-সন্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদিপশুরাজি এবং ক্ষেত-খামারের মত আকর্ষণীয় বস্তুসামগ্রী। এ সবই হচ্ছে পার্শ্ববর্তী জীবনের ভোগ্য বস্তু। আল্লাহর নিকটই হলো উত্তম আশ্রয়। (১৫) বলুন, আমি কি তোমাদেরকে এসবের চাইতেও উত্তম বিষয়ের সম্ভান বলবো? যারা পরহিযগার, আল্লাহর নিকট তাদের জন্যে রয়েছে বেহেশত, যার তলদেশে প্রবল প্রবাহিত—তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। আর রয়েছে পরিচ্ছন্ন সঙ্গীগণ এবং আল্লাহর সন্ততি। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি সুদৃষ্টি রাখেন। (১৬) যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা ইমান এনেছি, কাজেই আমাদের গোনাহ ক্ষমা করে দাও আর আমাদেরকে দোষের আযাব থেকে রক্ষা কর। (১৭) তারা ধৈর্যধারণকারী, সত্যবাদী, নির্দেশ সম্পাদনকারী, সংগে ব্যয়কারী এবং শেষরাত্রে ক্ষমা প্রার্থনাকারী।

যোগসূত্র : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কান্না ও মুশরিকদের বিরুদ্ধাচরণ এবং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের বর্ণনা ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে ইসলাম ও ইমানের বিরোধিতাই যে যাবতীয় অসৎ কর্মের মূল কারণ, তাই বর্ণনা করা হয়েছে। আর এর উৎস হচ্ছে দুনিয়ার মহক্বত। কেউ যশ ও অর্থের লোভে সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করে, কেউ কুপ্রবৃত্তির কারণে এবং কেউ পৈতৃক প্রথার প্রতি অন্ধ আবেগ পোষণের কারণে সত্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে। এসবের সারমর্ম হচ্ছে দুনিয়ার মহক্বত।

তকসীরের সার-সংক্ষেপ

প্রিয় বন্ধুর ভালবাসা (অনেক) মানুষের মনে তীব্র আকর্ষণ সৃষ্টি করে। (উদাহরণত) রমণী, সম্ভান-সন্ততি, পুঞ্জীভূত স্বর্ণ ও রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব, (অথবা অন্যান্য পালিত) পশু ও শস্যক্ষেত্র।

(কিন্তু) এগুলো সব পার্থিব জীবনের ব্যবহারিক বস্তু। পরিণামের সৌন্দর্য (অর্থাৎ সুন্দর বস্তু) তো আল্লাহর কাছেই আছে (যা মৃত্যুর পর কাজে আসবে। পরবর্তী আয়াতে তা বর্ণিত হয়েছে)। আপনি (তাদের) বলে দিন, আমি কি তোমাদের এমন জিনিস বলে দেব, যা (বহুগুণে) উত্তম (উল্লিখিত) এসব বস্তু থেকে? (তবে শোন,) যারা আল্লাহকে ভয় করে, তাদের জন্য তাদের (প্রকৃত) প্রভুর কাছে এমন বাগান (অর্থাৎ বেহেশত) রয়েছে, যার তলদেশে ঝরনা প্রবাহিত হয়। এতে (বেহেশতে) তারা চিরকাল বসবাস করবে, আর (তাদের জন্য) এমন সঙ্গিনী রয়েছে, যারা (সর্বপ্রকারে) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, আর (তাদের জন্য) রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি। আল্লাহ তা'আলা ভালোভাবে দেখেন বান্দাকে (অর্থাৎ বান্দার অবস্থাকে)। তাই যারা ভয় করে, তাদের এসব নিয়ামত দেবেন। পরবর্তী আয়াতে তাদের কিছু গুণ উল্লেখ করা হচ্ছে। তারা এমন লোক যারা বলে : হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। অতএব, আমাদের সমস্ত গোনাহ মাফ কর এবং দোষের শাস্তি থেকে আমাদের রক্ষা কর। (তারা) ধৈর্যশীল, সত্যপ্ৰসন্ন, বিনয়, (সৎকাজে) অর্থ ব্যয়কারী এবং শেষরাতে (জাগ্রত হয়ে) ক্ষমা প্রার্থনাকারী।

আনুষঙ্গিক ভ্রাতব্য বিষয়

দুনিয়ার মহব্বত : হাদীসে বলা হয়েছে *حب الدنيا رأس كل خطيئة* (দুনিয়ার মহব্বত সব অনিষ্টের মূল)। প্রথম আয়াতে দুনিয়ার কয়েকটি প্রধান কাম্য বস্তুর নাম উল্লেখ করে বলা হয়েছে,—মানুষের দৃষ্টিতে এ সবের প্রতি আকর্ষণ স্বাভাবিক করে দেওয়া হয়েছে। তাই অনেক মানুষ এদের বাহ্যিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে পরকালকে ভুলে যায়। আয়াতে যেসব বস্তুর নাম উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো সাধারণভাবে মানুষের স্বাভাবিক কামনা-বাসনার লক্ষ্যস্থল। তন্মধ্যে সর্বপ্রথমে রমণী ও পরে সন্তান-সন্ততির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ দুনিয়াতে মানুষ যা কিছুই অর্জন করতে সচেষ্ট হয়, সবগুলোর মূল কারণ থাকে নারী অথবা সন্তান-সন্ততির প্রয়োজনে। এরপর উল্লেখ করা হয়েছে সোনা, রূপা, পালিত পশু ও শস্যক্ষেতের কথা। কারণ এগুলো দ্বিতীয় পর্যায়ে মানুষের কাক্ষিত ও প্রিয় বস্তু।

আলোচ্য আয়াতের সারমর্ম এই যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষের মনে এসব বস্তুর প্রতি স্বভাবগতভাবেই আকর্ষণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এতে অনেক রহস্য নিহিত রয়েছে। একটি এই যে, এসব বস্তুর প্রতি মানুষের স্বভাবগত আকর্ষণ বা মোহ না থাকলে জগতের সমুদয় শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠতো না। মাথার ঘাম পায়ে কেলে শস্যক্ষেতে কাজ করতে অথবা মজুরি ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে পরিশ্রম করতে অথবা ব্যবসায়ে অর্থ ও কার্যিক শ্রম ব্যয় করতে কেউ প্রস্তুত হতো না। মানব-স্বভাবে এসব বস্তুর প্রতি প্রকৃতিগত আকর্ষণ সৃষ্টি করার মধ্যেই জগতের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব নির্ভরশীল করে দেওয়া হয়েছে। ফলে মানুষ স্বতঃপ্রসূত হয়েই এসব বস্তুর উৎপাদন ও সরবরাহ অব্যাহত রাখার চিন্তায় ব্যাপ্ত থাকে। ভোরবেলায় ঘুম থেকে ওঠার পর শ্রমিক কিছু পয়সা উপার্জনের চিন্তায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। ধনী ব্যক্তি কিছু পয়সা খরচ করে শ্রমিক যোগাড় করার চিন্তায় বের হয়। ব্যবসায়ী উৎকৃষ্টতর পণ্যদ্রব্য সুন্দরভাবে সাজিয়ে

গ্রাহকের অপেক্ষায় বসে থাকে—যাতে কিছু পয়সা উপার্জন করা যায়। এদিকে গ্রাহক অনেক কষ্টার্জিত পয়সা নিয়ে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র কেনাকাটার উদ্দেশ্যে বাজারে পৌঁছে। চিন্তা করলে দেখা যায়, এসব প্রিয়বস্তুর ভালবাসাই সবাইকে আপন আপন গৃহ থেকে বের করে আনে এবং এ ভালবাসাই দুনিয়াজোড়া সভ্যতা ও সংস্কৃতির সৃষ্টি ও পরিচালনা-ব্যবস্থাকে মজবুত ও দৃঢ় একটা নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে।

দ্বিতীয় রহস্য এই যে, জাগতিক নিয়ামতের প্রতি মানুষের মনে আকর্ষণ ও ভালবাসা না থাকলে পারলৌকিক নিয়ামতের স্বাদ জানা যেতো না এবং তৎপ্রতি আকর্ষণও হতো না। এমনভাবে সৎকর্ম করে জান্নাত অর্জন করার এবং অসৎকর্ম থেকে বিরত হয়ে দোষখ থেকে আত্মরক্ষা করার প্রয়োজনও কেউ অনুভব করতো না।

এখানে অধিকতর প্রাধিকানযোগ্য হলো তৃতীয় রহস্যটি অর্থাৎ এসব বস্তুর ভালবাসা স্বভাবগতভাবে মানুষের অন্তরে সৃষ্টি করে তাদের পরীক্ষা নেওয়া হয়ে থাকে যে, কে ঐশ্বর্যের আকর্ষণে মশগুল হয়ে পরকালকে ভুলে যায় এবং কে এ সবের আসল স্বরূপ ও ধ্বংসশীল হওয়ার বিষয় অবগত হয়ে শুধু যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু অর্জনে সফেট হয় ও পরকালীন কল্যাণ আহরণের লক্ষ্যে তার সূচাঙ্ক ব্যবহার করে। কোরআন মজীদের অন্য এক আয়াতে এ রহস্যটিই বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে :

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

অর্থাৎ আমি পৃথিবীর সমুদয় বস্তুকে পৃথিবীর সৌন্দর্যরূপে সৃষ্টি করেছি—যাতে মানুষের পরীক্ষা নিতে পারি যে, কে তাদের মধ্যে উত্তম কর্ম সম্পাদন করে।

এ আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, জগতের মোহনীয় বস্তুগুলোকে মানুষের দৃষ্টিতে সুশোভিত করে দেওয়াও আল্লাহ তা'আলারই কাজ। এর রহস্য অনেক। কিন্তু কোন কোন আয়াতে সুশোভিত করে দেওয়া শয়তানের কাজ বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। উদাহরণত **زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ**—অর্থাৎ শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কাজকর্মকে সুশোভিত করে দিয়েছে। এসব আয়াতের অর্থ এমন বস্তুকে সুশোভিত করা, যা শরীয়ত ও বিবেকের দৃষ্টিতে মন্দ অথবা সীমাবদ্ধিত লোভনীয় করার কারণে মন্দ। নতুবা শরীয়ত অনুমোদিত বিষয়কে সুশোভিত করা মন্দ নয়, বরং এতে অনেক উপকারও নিহিত আছে। এ কারণেই কোন কোন আয়াতে এই সুশোভিত করাকে পরিকারভাবে আল্লাহর কাজ বলা হয়েছে।

মোট কথা এই যে, জগতের সুস্বাদু ও মোহনীয় বস্তুগুলোকে আল্লাহ তা'আলা কৃপাবশত মানুষের দৃষ্টিতে সুশোভিত করে তৎপ্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এর অনেকগুলো রহস্যের মধ্যে অন্যতম রহস্য, মানুষের পরীক্ষা নেওয়া। বাহ্যিক কাম্য-বস্তু ও তার ক্ষণস্থায়ী স্বাদে মশগুল হওয়ার পর মানুষ কিরূপ কাজ করে আল্লাহ তা'আলা তা দেখতে চান। এসব বস্তু লাভ করার পর যদি মানুষ স্রষ্টা ও স্বালিক আল্লাহকে স্মরণ করে এবং এগুলোকে তাঁর স্বারৈফত ও মহক্বত লাভের উপায় হিসাবে ব্যবহার করে, তবে বলা যায় যে, সে দুনিয়াতেও উপকৃত হয়েছে এবং পরকালেও সফলকাম হবে। জগতের লোভনীয় বস্তু তার পথের কাঁটা

হওয়ার পরিবর্তে তার পথপ্রদর্শক এবং সহায়ক হয়েছে। পক্ষান্তরে এসব বস্তু লাভ করার পর যদি মানুষ এগুলোর মধ্যেই আপাদমস্তক নিমজ্জিত হয়ে স্রষ্টাকে, পরকালে তাঁর সম্মুখে উপস্থিতিকে এবং হিসাব-নিকাশকে ভুলে যায়, তবে বলতে হবে যে, এসব বস্তুই তার পারলৌকিক জীবনের ধ্বংস ও অনন্তকাল শাস্তি ভোগের কারণ হয়েছে। গভীর দৃষ্টিতে দেখলে জগতেও এসব বস্তু তার শাস্তির কারণ ছিল। এ ধরনের মানুষ সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে :

فَلَا تَعْجَبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا.

অর্থাৎ আপনি কাফিরদের অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেখে বিস্ময়াবিষ্ট হবেন না। কারণ অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেওয়াতে এসব অবাধ্যদের কোন উপকার হয়নি। বরং এসব অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আখিরাতে তো তাদের শাস্তির কারণ হবেই, দুনিয়াতেও দিবা-রাত্রির চিন্তা ও ব্যস্ততার কারণে এগুলো এক ধরনের শাস্তি বৈ আর কিছু নয়।

মোট কথা, আল্লাহ তা'আলা যেসব বস্তুকে মানুষের দৃষ্টিতে সুশোভিত করে দিয়েছেন, শরীয়ত অনুযায়ী সেগুলো পরিমিত উপার্জন করলে এবং যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু সঞ্চয় করলে ইহকাল ও পরকালের কামিয়ারী হাসিল হবে। পক্ষান্তরে অবৈধ পন্থায় সেগুলো ব্যবহার করলে অথবা বৈধ পন্থায় হলেও সেগুলোতে মাত্রাতিরিক্ত নিমজ্জিত হয়ে পরকাল বিন্ধত হয়ে গেলে ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়বে। মুওলানা রুমী এ বিষয়টির একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন :

آب اندر زیر کشتی پستی است - آب در کشتی هلاک کشتی است

অর্থাৎ “দুনিয়ার সাজ-সরঞ্জাম পানির মত এবং এতে মানুষের অন্তর একটি নৌকার মত। পানি যতক্ষণ নৌকার নিচে ও আশেপাশে থাকে, ততক্ষণ তা নৌকার জন্য উপকারী ও সহায়ক। পক্ষান্তরে পানি যদি নৌকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, তবে তাই নৌকাডুবি ও ধ্বংসের কারণ হয়ে যায়।”

এমনিভাবে দুনিয়ার অর্থ-সম্পদ যতক্ষণ মানুষের অন্তরে প্রাধান্য বিস্তার না করে, ততক্ষণ তা মানুষের ইহকাল ও পরকালের জন্য উপকারী ও সহায়ক। পক্ষান্তরে অর্থ-সম্পদ যদি মানুষের অন্তরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, তবেই তার অন্তরের মৃত্যু ঘটে। এ কারণেই আলোচ্য আয়াতে কয়েকটি বিশেষ লোভনীয় বস্তুর কথা উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে :

ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَإِ.

অর্থাৎ এসব বস্তু হচ্ছে পার্থিব জীবনে ব্যবহার করার জন্য ; মন বসাবার জন্য নয়। আর আল্লাহর কাছে রয়েছে উত্তম ঠিকানা। অর্থাৎ যেখানে চিরকাল থাকতে হবে এবং যার নিয়ামত ধ্বংস হবে না ; হ্রাসও পাবে না।

পরবর্তী আয়াতে এ সম্পর্কিত আরও ব্যাখ্যা দান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

قُلْ أَوْ نَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ ۖ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ .

এতে ছয় (সা)-কে সন্তোষন করে বলা হয়েছে : যারা দুনিয়ার অসম্পূর্ণ ও ধ্বংসশীল নিয়ামতে মগ্ন হয়ে পড়েছে, আপনি তাদের বলে দিন যে, আমি তোমাদের আরও উৎকৃষ্টতর নিয়ামতের সন্ধান বলে দিচ্ছি। যারা আল্লাহকে ভয় করে এবং যারা আল্লাহর অনুগত, তারাই এ নিয়ামত পাবে। সে নিয়ামত হচ্ছে সবুজ বৃক্ষলতাপূর্ণ বেহেশত, যার তলদেশ দিয়ে নির্ঝরিতী প্রবাহিত হবে। তাতে থাকবে সকল প্রকার আবিলতামুক্ত পরিচ্ছন্ন সঙ্গিনীগণ এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি।

পূর্ববর্তী আয়াতে দুনিয়ার ছয়টি প্রধান নিয়ামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। অর্থাৎ রমণীকুল, সন্তান-সন্ততি, সোনা ও রূপার ভাণ্ডার, উৎকৃষ্ট অশ্ব, পালিত জন্তু ও শস্যক্ষেত। এদের বিপরীতে পরকালের নিয়ামতরাজির মধ্যে বাহ্যত তিনটি বর্ণিত হয়েছে। প্রথম—জান্নাতের সবুজ বাগ-বাগিচা ; দ্বিতীয়—পরিচ্ছন্ন সঙ্গিনীগণ এবং তৃতীয়—আল্লাহর সন্তুষ্টি। অবশিষ্টগুলির মধ্যে সন্তান-সন্ততি উল্লেখ না করার কারণ এই যে, দুনিয়াতে দুই কারণে মানুষ সন্তান-সন্ততিকে ভালবাসে। প্রথমত, সন্তান-সন্ততি পিতার কাজকর্মে সাহায্য করে। দ্বিতীয়ত, মৃত্যুর পর সন্তান-সন্ততি দ্বারা পিতার নামটুকু থেকে যায়। কিন্তু পরকালে কারও সাহায্যের প্রয়োজন নেই এবং মৃত্যুও নেই যে, কোন অভিভাবক অথবা উত্তরাধিকারীর প্রয়োজন হবে। এছাড়া দুনিয়াতে যার সন্তান-সন্ততি আছে, সে জান্নাতে তাদেরকে পাবে। পক্ষান্তরে দুনিয়ায় যার সন্তান নেই, প্রথমত জান্নাতে তার মনে সন্তানের বাসনাই হবে না। আর কারও মনে বাসনা জাগ্রত হলে আল্লাহ তাকে তাও দান করবেন। তিরমিযীর এক হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : কোন জান্নাতীর মনে সন্তানের বাসনা জাগ্রত হলে সন্তানের গর্ভাবস্থা, জন্মগ্রহণ ও বয়োপ্রাপ্তি মুহূর্তের মধ্যেই সম্পন্ন হয়ে যাবে এবং তার মনের বাসনা পূর্ণ করা যাবে।

এমনিভাবে জান্নাতে সোনা-রূপার উল্লেখ করা হয়নি। কারণ এই যে, দুনিয়াতে সোনা-রূপার বিনিময়ে দুনিয়ার আসবাবপত্র ক্রয় করা হয় এবং প্রয়োজনীয় সব কিছু এর মাধ্যমেই যোগাড় করা যায়। কিন্তু পরকালে ক্রয়-বিক্রয়েরও প্রয়োজন হবে না এবং কোন কিছুর বিনিময়ও দিতে হবে না। বরং জান্নাতীর মন যখন যা চাইবে, তৎক্ষণাৎ তা সরবরাহ করা হবে। এছাড়া জান্নাতে সোনা-রূপার কোন অভাব নেই। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, জান্নাতে কোন কোন প্রাসাদের এক ইট সোনার ও এক ইট রূপার হবে। মোটকথা, পরকালের হিসাবে সোনা-রূপাকে কোন উল্লেখযোগ্য বস্তুই মনে করা হয়নি।

এমনিভাবে দুনিয়াতে ঘোড়ার কাজ হলো বাহন হয়ে পথের দূরত্ব অতিক্রম করা। জান্নাতে সফর ও যানবাহন প্রভৃতি কোন কিছুরই প্রয়োজন হবে না। সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, শুক্রবার দিন জান্নাতীদের আরোহণের জন্য উৎকৃষ্ট ঘোড়া সরবরাহ করা হবে। এগুলোতে সওয়ার হয়ে জান্নাতীরা আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের সাথে দেখা করতে যাবে।

মোট কথা, জান্নাতে ঘোড়ারও কোন উল্লেখযোগ্য গুরুত্ব নেই। এমনভাবে পালিত পশু কৃষিক্ষেত্রে কাজে আসে অথবা তা দুধ দান করে। জান্নাতে দুধ ইত্যাদি পশুর মাধ্যম ছাড়াই আলাহু তা'আলা দান করবেন।

কৃষিকাজের অবস্থাও তদ্রূপ। দুনিয়াতে বিভিন্ন শস্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে শস্যক্ষেত্রে পরিশ্রম করা হয়। জান্নাতে সকল প্রকার শস্য আপনা-আপনি সরবরাহ হবে। কাজেই সেখানে কৃষিকাজের প্রয়োজনই নেই। তবুও যদি কেউ কৃষিকাজকে ভালবাসে, তবে তার জন্য সে ব্যবস্থাও হয়ে যাবে। তিবরানীর এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, জান্নাতে এক ব্যক্তি কৃষিকাজের বাসনা প্রকাশ করবে। তাকে তৎক্ষণাৎ যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ করা হবে। অতঃপর শস্যের বপন, রোপণ, পাকা ও কর্তন কয়েক মিনিটের মধ্যে সম্পন্ন হয়ে যাবে। এসব কারণেই জান্নাতের নিয়ামতসমূহের মধ্যে শুধু জান্নাত ও জান্নাতের হরদের বর্ণনাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। কারণ জান্নাতীদের জন্য কোরআনে এ ওয়াদা রয়েছে যে, **وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ** অর্থাৎ “তারা যে বাসনাই প্রকাশ করবে, তাই পাবে।” এহেন ব্যাপক ঘোষণার পর বিশেষ কোন নিয়ামতের কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে কি? তা সত্ত্বেও কয়েকটি বিশেষ নিয়ামত উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো প্রত্যেক জান্নাতী চাওয়া ছাড়াই পাবে অর্থাৎ জান্নাতের সবুজ বাগ-বাগিচা, অপরূপ সুন্দরী রমণীকুল। এগুলোর পর আরও একটি সর্ববৃহৎ নিয়ামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সাধারণভাবে মানুষ এর কল্পনাও করে না। তা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার অশেষ সন্তুষ্টি। এরপর অসন্তুষ্টির কোন আশঙ্কা থাকবে না। হাদীসে বর্ণিত আছে, যখন জান্নাতিগণ জান্নাতে পৌঁছে আনন্দিত ও নিশ্চিত হয়ে যাবে এবং তাদের কোন আকাঙ্ক্ষাই অপূর্ণ থাকবে না, তখন আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তাদের সম্বোধন করে বলবেন : এখন তোমরা সন্তুষ্ট ও নিশ্চিত হয়েছ। আর কোন বস্তুর প্রয়োজন নেই তো? জান্নাতিগণ আরম্ভ করবে : হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি এত নিয়ামত দান করেছেন যে, এরপর আর কোন নিয়ামতের প্রয়োজনই থাকতে পারে না। আলাহু তা'আলা বলবেন : এখন আমি তোমাদের সব নিয়ামত থেকে উৎকৃষ্ট একটি নিয়ামত দিচ্ছি। তা এই যে, তোমরা সবাই আমার অশেষ সন্তুষ্টি লাভ করেছ। এখন অসন্তুষ্টির আর কোন আশঙ্কা নেই। কাজেই জান্নাতের নিয়ামতরাজি ছিনিয়ে নেওয়ার অথবা ভ্রাস করে দেওয়ারও কোন আশঙ্কা নেই।

এ দু'টি আয়াতের সারমর্মই হযর (সা) বলেছেন :

الدنيا ملعونة وملعون ما فيها الا ما ابتغى به وجه الله وفي رواية
الا ذكر الله وما والاها او عالماً او متعلماً.

দুনিয়া অভিশপ্ত এবং যা কিছু এতে আছে তাও অভিশপ্ত। তবে ঐসব বস্তু নয়, যদ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা হয়। এক রেওয়াজেতে আছে—তবে আল্লাহর যিকির এবং আল্লাহর পছন্দনীয় বস্তু অথবা আলিম কিংবা তালাবে ইল্ম এ অভিশাপের আওতাভুক্ত।

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِأَلْفِ سُطْرَةٍ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٥٦﴾ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْيًا بَيْنَهُمْ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٥٧﴾

(১৮) আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই ; ফেরেশতাগণ এবং ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানিগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (১৯) নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দীন একমাত্র ইসলাম। এবং তাদের প্রতি কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের নিকট প্রকৃত জ্ঞান আসার পরও, মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে শুধু পরস্পর বিতর্কের বশবর্তী হয়েছে। যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি কুক্ষী করে তাদের জানা উচিত যে, নিশ্চিতরূপে আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত দ্রুত।

যোগসূত্র : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তওহীদের বর্ণনা ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতেও একটি বিশেষ ভঙ্গিতে তওহীদের বিষয়ই বর্ণিত হয়েছে। প্রসঙ্গত তওহীদের ওপর তিনটি সাক্ষ্য উল্লেখ করা হয়েছে। এক—স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার সাক্ষ্য, দুই—ফেরেশতাগণের সাক্ষ্য ; এবং তিন—বিশেষ জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাক্ষ্য। আল্লাহ তা'আলার সাক্ষ্য রূপক অর্থে বুঝতে হবে অর্থাৎ আল্লাহর সত্তা, গুণাবলী এবং সমুদয় সৃষ্টি একত্ববাদের উজ্জ্বল নিদর্শন।

هر گيا هے كه از زمين رويد - وحده لاشريك له گوید

—মৃত্তিকা থেকে উৎপন্ন প্রতিটি তৃণও একত্ববাদ উচ্চারণ করে।

এছাড়া তাঁর পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল ও প্রজ্ঞাবলীও একত্ববাদের সাক্ষ্যদাতা। এসব বস্তু আল্লাহর পক্ষ থেকেই আগত। কাজেই স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই যেন সাক্ষ্য দেন যে, তাঁকে ছাড়া ইবাদতের যোগ্য আর কেউ নাই।

দ্বিতীয় সাক্ষ্য উল্লেখ করা হয়েছে ফেরেশতাগণের। ফেরেশতাগণ আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত এবং তাঁর সৃষ্টিগত সকল ক্রিয়াকর্মের কর্মী বাহিনী। তাঁরা সব কিছু জেনেওনে এবং চাক্ষুষ দেখে সাক্ষ্য দেন যে, আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য আর কেউ নেই।

তৃতীয় সাক্ষ্য বিশেষ জ্ঞানীদের। এ বিশেষ জ্ঞানী বলতে সব পয়গম্বর এবং মুসলমান আলিম শ্রেণীকে বোঝানো হয়েছে। এ কারণেই ইমাম গায্বালী এবং আল্লামা ইবনে-কাসীর বলেন : এ আয়াতে আলিমদের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের সাক্ষ্যকে নিজের এবং ফেরেশতাগণের সাথে উল্লেখ করেছেন। এখানে বিশেষ জ্ঞানী বলতে সম্ভবত এসব

মনীষীকেও বোঝানো হয়েছে, যারা বিস্তৃত চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে অথবা সৃষ্ট জগত সম্পর্কে গভীর গবেষণার ফলে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সমর্থ হন যে, এ সৃষ্ট জগতের একজন সৃষ্টিকর্তা অবশ্যই রয়েছেন এবং তিনি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য আর কোন সত্তা নেই। যদি তাঁরা অন্যান্য শর্ত মার্কিম আলিম শ্রেণীভুক্ত নাও হন, তাতেও কিছু যায় আসে না।

দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহর কাছে একমাত্র ইসলাম ধর্মই গ্রহণযোগ্য হওয়া এবং এ ছাড়া অন্য কোন ধর্ম গ্রহণযোগ্য না হওয়ার বিষয় বর্ণনা করে একত্ববাদের বিষয়বস্তুকে পূর্ণতা দান করা হয়েছে। যারা এ বিষয়ের সাথে একমত নয়, তাদের অন্তত পরিণতির কথাও দ্বিতীয় আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আল্লাহ (খোদায়ী গ্রন্থসমূহে) এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তাঁর (পবিত্র) সত্তা ছাড়া ইবাদত পাওয়ার যোগ্য কেউ নেই। আর ফেরেশতাগণ (স্বীয় যিক্র ও প্রশংসা কীর্তনে এর সাক্ষ্য দিয়েছেন। কারণ তাদের যিক্র একত্ববাদের বিষয়বস্তুতে পরিপূর্ণ।) আর (অন্য) বিদ্বানগণ (স্বীয় বক্তৃতা ও রচনাবলীতে এর সাক্ষ্য দিয়েছেন)। ইলাহুও এমন যে, (প্রত্যেক বস্তুর) পরিমিত ব্যবস্থাপনা কায়ম রেখেছেন। (এরপর বলা হয় যে,) তিনি ছাড়া ইবাদত পাওয়ার যোগ্য কেউ নেই। তিনি পরাক্রমশালী, মহাবিজ্ঞ। নিশ্চিতই (সত্য ও গ্রহণযোগ্য) ধর্ম আল্লাহর কাছে একমাত্র ইসলাম। (এ ধর্ম সত্য হওয়ার ব্যাপারে মুসলমানদের সাথে) আহলে-কিতাবরা যে মতবিরোধ করেছে (যে, ইসলামকে তারা অসত্য ধর্ম বলেছে), তা তাদের কছে (ইসলামের) সত্যতার প্রমাণ পৌঁছে যাবার পর পরস্পর বিদ্বেষ এবং প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে অগ্রসর হওয়ার কারণে করেছে। (অর্থাৎ ইসলাম সত্যধর্ম হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের কোন কারণ নেই। বরং তাদের মধ্যে একে অন্যকে পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যাবার প্রবণতা আছে। ইসলাম গ্রহণ করলে, জনগণের উপর তাদের সরদারী নষ্ট হয়ে যাবে। তাই তারা ইসলাম গ্রহণ করেনি এবং উল্টা ইসলামকে অসত্য আখ্যা দিয়েছে।) যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধিবিধান অস্বীকার করে (যেমন তারা করেছে), নিশ্চিতই আল্লাহ অতিসত্ত্ব তার হিসাব নেবেন (এরূপ ব্যক্তির হিসাবের পরিণাম শাস্তিই হবে)।

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

..... **آيَةُ الْيَوْمِ** আয়াতের ফযীলত : এই আয়াতের একটি বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। ইমাম বগভী বলেন, সিরিয়া থেকে দুইজন বিশিষ্ট ইহুদী আলিম একবার মদীনায় আগমন করেন। মদীনার লোকালয় তথা আবাসিক এলাকা দেখে তারা মন্তব্য করেন যে, শেষ যমানার নবী যেসকল লোকালয়ে বসবাস করবেন বলে তওরাতে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, এটা ঠিক সেরূপ লোকালয় বলেই মনে হচ্ছে। এরপর তারা জ্ঞানতে পারেন যে, এখানে একজন মহান ব্যক্তি আছেন, যাকে সবাই নবী বলে আখ্যায়িত করে। তাঁরা হযরত নবী করীম (সা)-এর কাছে উপস্থিত হলেন। তাঁর প্রতি দৃষ্টি পড়তেই তওরাতে বর্ণিত আখেরী নবীর গুণাবলী তাঁদের

চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তাঁরা বললেন : আপনি কি মুহাম্মদ ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। আমি মুহাম্মদ এবং আমি আহমদ। তাঁরা আরও বললেন : আমরা আপনাকে একটি প্রশ্ন করবো। যদি আপনি সঠিক উত্তর দেন, তবে আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবো। হযরত নবী করীম (সা) বললেন : প্রশ্ন করুন। তাঁরা বললেন, আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কিত সর্ববৃহৎ সাক্ষ্য কোনটি ? এ প্রশ্নের উত্তরে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। হযরত নবী করীম (সা) আয়াতটি তিলাওয়াত করে তাঁদের তুলিয়ে দিলে তাঁরা তৎক্ষণাৎ মুসলমান হয়ে যান।

মসনদে-আহমদে উদ্ধৃত হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরাফাতের ময়দানে এ আয়াত পাঠ করার পর বললেন :

وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ يَا رَبِّ — অর্থাৎ পরওয়ারদিগার ! আমিও এর সাক্ষ্যদাতা।
(ইবনে কাসীর)

ইমাম আ'মশের রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, এ আয়াত পাঠ করার পর যে ব্যক্তি عَلَىٰ ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ — বলবে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন ফেরেশতাদের বলবেন : আমার এ বান্দা একটি অঙ্গীকার করেছে। আমি সবচাইতে বেশি অঙ্গীকার পূর্ণ করি। তাই আমার বান্দাকে জান্নাতে স্থান দাও।

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) বর্ণিত এক হাদীসে হযরত নবী করীম (সা) বলেন : قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ — আয়াতুল-কুরসী شهد الله আয়াত এবং شهد الله আয়াত এবং شهد الله আয়াত থেকে পরিচয় পাঠ করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার সব গুনাহ ক্ষমা করে দিয়ে তাকে জান্নাতে স্থান দিবেন। এ ছাড়া তিনি তার সন্তরটি প্রয়োজন মেটাবেন। তন্মধ্যে সর্বনিম্ন প্রয়োজন হবে মাগফিরাত। (রুহুল মা'আনী)

‘দীন’ ও ‘ইসলাম’ শব্দের ব্যাখ্যা : আরবী ভাষায় دین শব্দের একাধিক অর্থ বর্তমান। তন্মধ্যে এক অর্থ রীতি ও পদ্ধতি। কোরআনের পরিভাষায় دین ঐসব মূলনীতি ও বিধি-বিধানকে বলা হয়, যা হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত সব পয়গম্বরের মধ্যে সমভাবেই বিদ্যমান রয়েছে। ‘শরীয়ত’ অথবা ‘মিনহাজ’ শব্দটি পরবর্তী পরিভাষা। ‘মাযহাব’ শব্দটি দীনের বিভিন্ন শাখার বিধি-বিধান অর্থে ব্যবহৃত হয়, যা বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন উম্মতের মধ্যে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে। কোরআন বলে :

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا — অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য ঐ দীনই জারি করেছেন, যার নির্দেশ ইতিপূর্বে নূহ ও অন্যান্য পয়গম্বরকে দেওয়া হয়েছিল।

এতে বোঝা যায় যে, সব পয়গম্বরের দীনই এক ও অভিন্ন ছিল অর্থাৎ আল্লাহ্র সন্তান যাবতীয় পরাকাষ্ঠার অধিকারী হওয়া এবং সমুদয় দোষত্রুটি থেকে পবিত্র হওয়া এবং তাঁকে ছাড়া কেউ ইবাদতের যোগ্য না হওয়ার প্রতি মনেপ্রাণে বিশ্বাস স্থাপন করা ও মুখে স্বীকারোক্তি করা, কিয়ামত দিবস, হিসাব-নিকাশ, পুরস্কার ও শাস্তিদান এবং জান্নাত ও দোষখের প্রতি

অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা ও মুখে স্বীকারোক্তি করা, আত্মাহুত প্রেরিত প্রত্যেক নবী-রাসূল ও তাঁদের আনীত বিধি-বিধানের প্রতিও তেমনিভাবে ঈমান আনা।

'ইসলাম' শব্দের আসল অর্থ আত্মাহুতের নিকট আত্মসমর্পণ করা এবং তাঁর অনুগত হওয়া। এ অর্থের দিক দিয়ে প্রত্যেক পয়গম্বরের আমলে যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং তাঁদের আনীত বিধি-বিধানের আনুগত্য করেছে, তারা সবাই মুসলমান ও মুসলিম নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য ছিল এবং তাদের ধর্মও ছিল ইসলাম। এ অর্থের দিকে লক্ষ্য করেই হযরত নূহ (আ) বলেন : **وَأَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ** অর্থাৎ আমি 'মুসলিম' হওয়ার জন্য আদিষ্ট হয়েছি। —(সূরা ইউনুস)। এ কারণেই হযরত ইবরাহীম (আ) নিজেকে ও নিজ উম্মতকে 'উম্মতে মুসলিমা' বলেছিলেন :

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ لَكَ

হযরত ঈসা (আ)-এর সহচরগণ এ অর্থের প্রতি লক্ষ্য করেই সাক্ষ্য দিয়ে বলেছিল : **وَأَشْهَدُ بَأَنَّا مُسْلِمُونَ** —সাক্ষী থাকুন যে, আমরা মুসলিম! (আলে-ইমরান : ৫২)

সাধারণত ঐ দীন ও শরীয়তকেই 'ইসলাম' বলা হয়, যা নিয়ে সবার শেষে হযরত মুহাম্মদ (সা) আগমন করেছেন এবং যা বিগত সব শরীয়তকে রহিত করে দিয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত যে দীন ও শরীয়ত কায়েম থাকবে। এ অর্থের দিক দিয়ে 'ইসলাম' শব্দটি দীনে মুহাম্মদী ও উম্মতে-মুহাম্মদিয়ার এক বৈশিষ্ট্য পরিণত হয়ে যায়। সব হাদীস গ্রন্থে উল্লিখিত হাদীসে-জিবরাঈলে হযরত নবী করীম (সা) ইসলামের এ বিশেষ অর্থটিই বর্ণনা করেছেন। আলোচ্য আয়াতের 'ইসলাম' শব্দেও উপরোক্ত উভয় অর্থই নেওয়া যেতে পারে। প্রথম অর্থ নিলে আয়াতের ব্যাখ্যা হবে এরূপ : আত্মাহুত তা'আলার কাছে গ্রহণযোগ্য দীন একমাত্র ইসলাম ধর্ম অর্থাৎ নিজেকে আত্মাহুত অনুগত করা, প্রত্যেক যুগে আগত রাসূল ও তাঁদের আনীত বিধি-বিধানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তা পালন করা। এতে যদিও দীনে মুহাম্মদীর কোন বিশেষত্ব নেই, তথাপি সাধারণ নীতি অনুযায়ী মুহাম্মদ (সা)-এর আগমনের পর তাঁর প্রতি ও তাঁর আনীত বিধি-বিধানের প্রতি ঈমান আনা ও তা পালন করাও এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এর সারমর্ম এই হবে যে, নূহ (আ)-এর আমলে তাঁর আনীত ধর্মই ছিল গ্রহণযোগ্য। ইবরাহীম (আ)-এর আমলে তাঁর আনীত ধর্মই ছিল গ্রহণযোগ্য। মূসা (আ)-এর আমলে তওরাতের পাতা ও তার শিক্ষার আকারে যা এসেছিল, তাই ছিল গ্রহণযোগ্য ইসলাম। ঈসা (আ)-এর আমলে গ্রহণযোগ্য ইসলাম ইনজীল ও খৃষ্টীয় বাণীর রঙে রঞ্জিত হয়ে অবতীর্ণ হয়েছিল। সবার শেষে বাতামুল-আখিরা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আমলে কোরআন ও সুন্নাহ নির্দেশিত ধর্মবিধানই হবে গ্রহণযোগ্য ইসলাম।

মোট কথা এই যে, প্রত্যেক পয়গম্বরের আমলে তাঁর আনীত দীনই ছিল দীনে ইসলাম এবং আত্মাহুত কাছে গ্রহণযোগ্য। পরে এগুলো একের পর এক রহিত হয়েছে এবং পরিশেষে দীনে-মুহাম্মদীই 'ইসলাম' নামে অভিহিত হয়েছে, যা কিয়ামত পর্যন্ত কায়েম থাকবে। যদি ইসলামের দ্বিতীয় অর্থ নেওয়া হয় অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা)-এর আনীত ধর্ম, তবে আয়াতের অর্থ

হবে এই যে, এ যুগে মুহাম্মদ (সা)-এর শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যশীল ইসলামই একমাত্র গ্রহণযোগ্য। পূর্ববর্তী দীনগুলোকেও তাদের সময়ে ইসলাম বলা হলেও এখন তা রহিত হয়ে গেছে। অতএব, উভয় অবস্থাতে আয়াতের সার অর্থ একই দাঁড়ায়। অর্থাৎ প্রত্যেক পয়গম্বরের আমলে আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য ধর্ম ঐ ইসলাম, যা সেই পয়গম্বরের ওই ও শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সেটা ছাড়া অন্য কোন ধর্মই গ্রহণযোগ্য নয়—যদিও তা বিগত কালের রহিত ধর্মও হয়ে থাকে। পরবর্তী কালের জন্য তা আর ইসলাম নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য থাকে না। ইবরাহীম (আ)-এর কালে তাঁর ধর্ম ছিল ইসলাম, মূসা (আ)-এর যমানায় সেই ধর্মের যেসব বিধান রহিত হয়ে যায়, তা ইসলাম নয়। তেমনিভাবে ইসা (আ)-এর আমলে মূসা (আ)-এর শরীয়তের কোন বিধান রহিত হয়ে থাকলে তা তখন ইসলাম ছিল না। ঠিক এমনিভাবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আমলে পূর্ববর্তী শরীয়তের যেসব বিধান রহিত হয়েছে, তা এখন ইসলাম নয়। তাই কোরআনের সম্বোধিত উম্মতের সামনে ইসলামের যে কোন অর্থই নেওয়া হোক, সারমর্ম হবে এই যে, রাসূল (সা)-এর আবির্ভাবের পর কোরআন ও তাঁর শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ধর্মই ইসলাম নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য এবং এ ধর্মই আল্লাহ তা'আলার কাছে গ্রহণযোগ্য—অন্য কোন ধর্ম নয়। এ বিষয়বস্তুটি কোরআনের অসংখ্য আয়াতে বিভিন্ন শিরোনামে বিধৃত হয়েছে। এক আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে : **ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه**—অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম অবলম্বন করে, তা তার কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে না। এ ধর্মের অধীনে যেসব ক্রিয়াকর্ম করা হবে, তাও বরবাদ হবে।

ইসলামেই মুক্তি নিহিত : আজকাল ইসলামের উদারতার নামে কুফর ও ইসলামকে এক করার চেষ্টা করা হয় এবং বলা হয় যে, সংকর্ম সম্পাদন করলে ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী হলে যেকোন ধর্মাবলম্বীই মুক্তি পাবে। সে ইহুদী হোক, খৃষ্টান হোক অথবা মূর্তিপূজারীই হোক। আলোচ্য আয়াত এ উদ্ভট মতবাদের মূলোৎপাটন করে দিয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে এভাবে ইসলামের মূলনীতি বিধ্বস্ত করা হয়। কারণ এর সারমর্ম দাঁড়ায় এই যে, ইসলামের বাস্তব কোন ভিত্তি নেই। এটা একটা কাল্পনিক বিষয়, যা কুফরের পোশাকেও সুন্দর মানায়। কোরআন মজীদে অসংখ্য আয়াত পরিষ্কার বলে দিয়েছে যে, আলো ও অন্ধকার যেকোন এক হতে পারে না; তদ্রূপ অবাধ্যতা ও আনুগত্য উভয়টি আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় হতে পারে না। যে ব্যক্তি ইসলামের কোন একটি মূলনীতি অস্বীকার করে, সে নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিদ্বেষী ও পয়গম্বরের শত্রু ; প্রচলিত অর্থে সংকর্ম বা নেক আমল ও প্রথাগত চরিত্রে সে যতই সুন্দর দৃষ্টিগোচর হোক, তাতে কিছু আসে যায় না। সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের উপরই পরকালের মুক্তি নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি এ থেকে বঞ্চিত, তার কোন কর্ম ধর্তব্য নয়। কোরআনে এমন লোকদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে **فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ**—অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আমি তাদের কোন আমল ওজন করব না।

আলোচ্য আয়াতে ও তৎপূর্ববর্তী আয়াতসমূহে গ্রন্থধারীদের সনোধন করা হয়েছে। তাই তাদের নির্বুদ্ধিতা ও কুর্মে এভাবে বর্ণিত হচ্ছে :

وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ اَوْتُوا الْكِتَابَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا
بَيْنَهُمْ.

অর্থাৎ গ্রন্থধারীরা যে মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়ত ও ইসলাম সম্পর্কে বিরোধ সৃষ্টি করেছে, এর কারণ এই নয় যে, ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে তাদের মনে সন্দেহ-আছে ; তওরাত, ইনজীল ও অন্যান্য প্রামাণ্য গ্রন্থের মাধ্যমে ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে তাদের পুরোপুরি জ্ঞান রয়েছে, কিন্তু মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ ও ধনৈশ্বৰ্যের মোহ তাদেরকে বিরোধে লিপ্ত করেছে।

পরিশেষে বলা হয়েছে : وَمَنْ يَخْفَرُ بِاَيَاتِ اللَّهِ فَاِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ — অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে, আল্লাহ্ দ্রুত তার হিসাব গ্রহণ করবেন। মৃত্যুর পর প্রথমত কবর তথা বরযখ-জগতে পরকালের পথে প্রথম পরীক্ষা নেওয়া হবে। এরপর বিস্তারিত হিসাব-নিকাশ হবে কিয়ামতে। এ হিসাব-নিকাশের সময়ই সব বিরোধের স্বরূপ ফুটে উঠবে। মিথ্যাপন্থীরা তাদের স্বরূপ জানতে পারবে এবং শাস্তিও আরম্ভ হয়ে যাবে।

فَاِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۚ وَقُلْ لِلَّذِينَ
اَوْتُوا الْكِتَابَ وَالْاُمِّيَّيْنَ اَسْلَمْتُمْ ۚ فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدْ اهْتَدَوْا ۗ
وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ ۚ وَاللَّهُ بِصِرِّ الْعِبَادِ ۙ

(২০) যদি তারা তোমার সাথে বিতর্কে অবতীর্ণ হয় তবে বলে দাও, 'আমি এবং আমার অনুসরণকারিগণ আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ করেছি।' আর আহলে-কিতাবদের এবং নিরক্ষরদের বলে দাও যে, তোমরাও কি আত্মসমর্পণ করেছ? তখন যদি তারা আত্মসমর্পণ করে, তবে সরল পথ প্রাপ্ত হলো, আর যদি মুখ ঘুরিয়ে নেয়, তাহলে তোমার দায়িত্ব হলো শুধু পৌঁছিয়ে দেওয়া। আর আল্লাহর দৃষ্টিতে রয়েছে সকল বান্দা।

যোগসূত্র : সূরার প্রারম্ভে একত্ববাদ প্রমাণিত ও ত্রিত্ববাদ খণ্ডন করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে মুশরিক ও অবিশ্বাসী গ্রন্থধারীদের বাদানুবাদের জওয়াব দেওয়া হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(যখন প্রমাণিত হয়ে গেলো যে, ইসলাম সত্য ধর্ম) এর পরও যদি তারা আপনাদের সাথে (অনর্থক) বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হয়, তবে আপনি (উত্তরে) বলে দিন : (তোমরা স্বীকার কর বা না-ই কর) আমি আপন মুখমণ্ডল বিশেষভাবে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করেছি, যারা আমার অনুসারী, তারাও (স্বীয় মুখমণ্ডল আল্লাহর কাছে সমর্পণ করেছে। অর্থাৎ আমরা সবাই ইসলামে দীক্ষিত হয়ে গেছি। ইসলামে বিশ্বাসের দিক দিয়ে অন্তর আল্লাহর দিকেই নিবিষ্ট থাকে। কারণ

অন্যান্য ধর্মে কিছু কিছু শিরক দেখা দিয়েছিল। এ উত্তরের পর জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে) গ্রন্থধারী ও মুশরিকদের বলুন : তোমরাও ইসলামে দীক্ষিত হবে কি? যদি তারা ইসলামে দীক্ষিত হয়, তবে তারাও (সং) পথপ্রাপ্ত হবে। আর যদি তারা (এ থেকে যথারীতি) মুখ ফিরিয়ে রাখে, তবে (আপনি এ জন্যও চিন্তিত হবেন না। কারণ) আপনার দায়িত্ব শুধু (আল্লাহর বিধান) পৌঁছিয়ে দেওয়া। (পরে) আল্লাহ নিজেই স্বীয় বান্দাদের দেখে (ও বুঝে) নেবেন (আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না)।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بِغَيْرِ حَقٍّ
وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ ۖ فَبِشْرِهِمْ
بِعَذَابِ الْيَوْمِ ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ ۖ نَوْمًا لَهُمْ مِّنْ تَصْرِيحٍ ۝

(২১) যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে এবং পয়গম্বরগণকে হত্যা করে অন্যায়ভাবে, আর সেসব লোককে হত্যা করে যারা ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দেয়, তাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তির সংবাদ দিন। (২২) এরাই হলো সে লোক, যাদের সমগ্র আমল দুনিয়া ও আখিরাত—উভয় লোকেই বিনষ্ট হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে তাদের কোন সাহায্যকারীও নেই।

যোগসূত্র : সূরার প্রারম্ভে অধিকাংশই খৃষ্টানদের সম্বোধন করা হয়েছিল। এরপর পূর্ববর্তী আয়াতে আয়াতে খৃষ্টান ও ইহুদী উভয় সম্প্রদায়ই शामिल ছিল। এখন আলোচ্য আয়াতসমূহে ইহুদীদের কতিপয় বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হচ্ছে। ইবনে আবী হাতেমের রেওয়ায়েতক্রমে এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে স্বয়ং হযরত নবী করীম (সা) বলেন : বনী-ইসরাঈল একই সময়ে ৪৩ জন পয়গম্বরকে হত্যা করেছিল। এরপর এ দুষ্কর্মের জন্য ১৭০ জন ধার্মিক ব্যক্তি তাদের উপদেশ দিতে উদ্যোগী হলে তারা তাঁদেরও হত্যা করে। (বয়ানুল কোরআন, রুহুল মা'আনী)

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিচয়ই যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে (যেমন ইহুদীরা ইনজীল ও কোরআন অস্বীকার করে) এবং পয়গম্বরগণকে হত্যা করে (আর এ হত্যা তাদের ধারণায়ও) অন্যায়ভাবে আর এমন লোকদেরও হত্যা করে, যারা (কর্ম ও চরিত্রে) মিতাচার শিক্ষা দেয়, এরূপ লোকদের কষ্টদায়ক শাস্তির সংবাদ গুলিয়ে দিন। তারা এই লোক, যাদের (উপরোক্ত অপকর্মের কারণে)

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৩

সূরা আলে ইমরান ১৩০-১৪৩ আয়াত

আয়োজনে



মাউন ফাউন্ডেশন

www.maunfoundation.org

হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর ওয়াদা পাঁচ হাজারের আকারে পূর্ণ করা হয়েছে, না তিন হাজারের আকারে সে সম্পর্কে তফসীর ও ইতিহাসবিদগণের বিভিন্ন উক্তি বহুল-মা'আনী গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ—এখান থেকে আবাবো ওহদের ঘটনায় প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে। মাঝখানে সংক্ষেপে বদর যুদ্ধের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। এ আয়াত অবতরণের হেতু এই যে, ওহদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সম্মুখস্থ উপর ও নিচের চারটি দাঁতের মধ্য থেকে নিচের পাটির ডান দিকের একটি দাঁত শহীদ এবং মুখমণ্ডল আহত হয়ে পড়েছিল। এতে দুঃখিত হয়ে তিনি এ ব্যাক্যটি উচ্চারণ করেছিলেন : যারা নিজেদের পয়গম্বরের সাথে এমন দুর্ব্যবহার করে, তারা কেমন করে সাফল্য অর্জন করবে ? অথচ পয়গম্বর তাদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করেন। এরই প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। বুখারীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি কোন কোন কাকিরের জন্য বদদোয়াও করেছিলেন। এতে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। আয়াতে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ধৈর্য ও সহনশীলতার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

غَفُورٌ رَّحِيمٌ—পর্যন্ত। হে মুহাম্মদ ! কারও মুসলমান হওয়া ও কাকির থাকার ব্যাপারে আপনার নিজের কোন দখল নেই (জানার দখল হোক অথবা সামর্থ্যের)। এগুলো সবই আল্লাহর জ্ঞান ও অধিকারের আওতাভুক্ত। আপনার উচিত ধৈর্য ধারণ করা। আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি হয় (অনুগ্রহের) দৃষ্টি দান করবেন (অর্থাৎ মুসলমান হওয়ার তওফীক দেবেন। তখন আপনার ধৈর্য আনন্দে রূপান্তরিত হয়ে যাবে) না হয় তাদেরকে (দুনিয়াতে) কোন শাস্তি দেবেন। (তখন ধৈর্য মনের শান্তিতে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। দুনিয়াতে শাস্তি দান মাত্রও অন্যায় নয়।) কারণ, তারা বড়ই জুলুম করছে। (এখানে জুলুমের অর্থ কুফর ও শিরক। যেমন ان الشُّرْكَ لظُلْمٌ عَظِيمٌ আয়াতে শিরককে বড় জুলুম বলা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে এ বিষয় বক্তৃতি আরও জোরদার করা হয়েছে।) যা কিছু নভোমণ্ডলে ও যা কিছু ভূমণ্ডলে রয়েছে, সবই আল্লাহর মালিকানাধীন। তিনি যাকে ইচ্ছা কমা করেন। (অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণের শক্তি দেন। এতে সে কমান অধিকারী হয়)। এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন (অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণের সামর্থ্য হয় না। ফলে সে চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করে)। আল্লাহ অত্যন্ত ক্রমাশীল, পরম দয়ালু (কাজেই কমা করা আশ্চর্য নয়। কেননা, তাঁর দয়াই প্রবল)।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۝

(১৩০) হে ইমানদারগণ ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হায়ে সুদ খেয়ো না। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক যাতে তোমরা কল্যাণ অর্জন করতে পার। (১৩১) এবং তোমরা সে আগুন থেকে বেঁচে থাক, যা কাকিরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

তকসীরের সার-সংক্ষেপ

হে বিশ্বাসিগণ ! তোমরা সুদ খেয়ো না (অর্থাৎ গ্রহণ করো না, মূলধন থেকে) কয়েক গুণ বেশি (করে)। আল্লাহকে ভয় কর—আশা করা যায়, তোমরা সফলকাম হবে। (অর্থাৎ জান্নাত ভাগ্যে জুটবে এবং দোযখ থেকে পরিত্রাণ পাবে) এবং সেই আগুন থেকে বেঁচে থাক, যা (প্রকৃতপক্ষে) কাকিরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে (সুদ ইত্যাদি হারাম কার্য থেকে বেঁচে থাকাই আগুন থেকে বেঁচে থাকার উপায়)।

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতে مُضَاعَفًا কয়েক গুণ বেশি, অর্থাৎ চক্রবৃদ্ধি হায়ে সুদকে হারাম ও নিষিদ্ধ হওয়ার শর্ত হিসাবে উল্লেখ করা হয়নি। অন্যান্য আয়াতে অভ্যস্ত কঠোরভাবে সর্বাবস্থায় সুদ হারাম হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। সূরা বাকারায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। مُضَاعَفًا কে উল্লেখ করার মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, সুদ গ্রহণে অভ্যস্ত ব্যক্তি যদি চক্রবৃদ্ধি সুদ থেকে বেঁচেও থাকে, তবে সুদের উপার্জনকে যখন পুনরায় সুদে খাটাবে, তখন অবশ্যই দ্বিগুণের দ্বিগুণ হতে থাকবে—যদিও সুদখোরদের পরিভাষায় একে চক্রবৃদ্ধি সুদ বলা হবে না। সারকথা, সব সুদই পরিণামে দ্বিগুণের ওপর দ্বিগুণ সুদ হয়ে থাকে। সুতরাং আয়াতে সবরকম সুদকেই নিষিদ্ধ ও হারাম করা হয়েছে।

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٣١﴾ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ
مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٢﴾

(১৩২) আর তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ ও রাসূলের, যাতে তোমাদের উপর রহমত করা হয়। (১৩৩) তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমার দিকে এবং জান্নাতের দিকে ছুটে যাও যার সীমানা হচ্ছে আসমান ও যমীন, যা তৈরি করা হয়েছে পরহিযগারদের জন্য।

তকসীরের সার-সংক্ষেপ

তোমরা (সানন্দে) আল্লাহ ও (ভাঁর) রাসূলের আনুগত্য কর, আশা করা যায়, তোমরা করুণাপ্রাপ্ত হবে। (অর্থাৎ কিরামতে) তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমার দিকে এবং জান্নাতের দিকে ধাবিত হও ; (উদ্দেশ্য এই যে, এমন সংকল্প অবলম্বন কর, যার কারণে পালনকর্তা তোমাদের ক্ষমা করেন এবং তোমরা জান্নাত লাভ কর। জান্নাতটি এমন যে,) যার বিস্তৃতি নভোমণ্ডল ও

ভূমণ্ডলের মত (হা অবশ্য বেশিও হতে পারে। বাস্তবে বেশি বলেই প্রমাণিত)। এটা প্রত্নত করা হয়েছে পুরহিযগারদের জন্য।

আনুগত্যিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতে দুটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক, প্রথম আয়াতে আদ্বাহ্ তা'আলার আনুগত্যের সাথে রাসূলের আনুগত্যেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখানে প্রাণিধানযোগ্য যে, রাসূলের আনুগত্য যদি হুবহু আদ্বাহ্‌র এবং আদ্বাহ্‌র কিতাব কোরআনের আনুগত্য হয়ে থাকে, তবে একে পৃথকভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন কি? পক্ষান্তরে যদি এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকে, তবে তা কি?

দুই, আলোচ্য আয়াতে আদ্বাহ্ তা'আলা মকবুল ও নিষ্ঠাবান পুরহিযগার বান্দার গুণাবলী ও লক্ষণাদি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, আদ্বাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য শুধু মৌখিক দাবিকে বলা হয় না; বরং গুণাবলী ও লক্ষণাদির দ্বারাই আনুগত্যকারীর পরিচয় হয়।

রাসূলের আনুগত্যকে পৃথক করে বর্ণনা করার রহস্য : প্রথমোক্ত বিষয়টি প্রথম আয়াত : **أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ**-এ বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ আদ্বাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমাদের প্রতি করুণা করা হয়। এতে আদ্বাহ্‌র করুণা লাভের জন্য আদ্বাহ্ তা'আলার আনুগত্যকে যেমন অত্যাवশ্যকীয় ও অপরিহার্য করা হয়েছে, তেমনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আনুগত্যকেও জরুরী ও অপরিহার্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে। শুধু এ আয়াতেই নয়, বরং সমগ্র কোরআনে বার বার এর পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে এবং যেখানেই আদ্বাহ্‌র আনুগত্যের নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে, সেখানেই রাসূলের আনুগত্যকেও স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কোরআন পাকের এই উপর্যুপরি ও অব্যাহত বাণী ইসলাম ও ইমানের এ মূলনীতির প্রতিই অঙ্গুলি নির্দেশ করে যে, ইমানের প্রথম অংশ হচ্ছে আদ্বাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব, একত্ব ও আনুগত্য স্বীকার করা এবং দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে রাসূল-(সা)-এর প্রতি বিশ্বাস ও অনুগত্য করা।

এখানে লক্ষণীয় যে, কোরআনের আয়াত থেকে প্রকথাও প্রমাণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-সা কিছু বলেন, সবই আদ্বাহ্‌র নির্দেশে বলেন—নিজের পক্ষ থেকে বলেন না। এক আয়াতে আছে : **وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ** অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজ প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে কোন কথা বলেন না; বরং তাঁর সব কথাই আদ্বাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রত্যাদেশ হয়ে থাকে। সারমর্ম এই যে, রাসূলের আনুগত্য হুবহু আদ্বাহ্ তা'আলারই আনুগত্য—এ থেকে পৃথক কিছু নয়। সূরা নিসার ৭৯তম আয়াতে এ কথাই সরাসরি ব্যক্ত হয়েছে **مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ** অর্থাৎ যে রাসূলের আনুগত্য করে, সে আদ্বাহ্ তা'আলারই আনুগত্য করে।

অতএব প্রশ্ন হয় যে, তাই যদি হবে, তাহলে এ দুটি আনুগত্যকে সমগ্র কোরআনে চিরাচরিত রীতি হিসাবে পৃথক পৃথক বর্ণনা করার উপকারিতা কি?

এর তাৎপর্য এই যে, আদ্বাহ্ তা'আলা জগতের পথ প্রদর্শনের নিমিত্ত একটি গ্রন্থ এবং একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন। কোরআন পাকের আয়াতসমূহ মেজারে এবং যে ভঙ্গিতে

নামিল হয়েছে, ঠিক সেভাবেই মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বিষয়টি রাসুলের দায়িত্বে অর্পণ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, তিনি মানুষকে বাহ্যিক ও আত্মিক অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করবেন।

তৃতীয়ত, তিনি কোরআনের বিষয়বস্তু মানুষকে শিক্ষা দেবেন এবং এর উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করবেন। এ ছাড়া মানুষকে হিকমতের শিক্ষা দেবেন। এ বিষয়বস্তুটি কোরআন পাকের একাধিক আয়াতে প্রায় একই ভাষায় বর্ণিত হয়েছে :

يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

এতে বোঝা যায় যে, শুধু কোরআন মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই রাসুলের কর্তব্য নয় ; বরং কোরআন শিক্ষা দেওয়া এবং তার বিশ্লেষণ করাও তাঁরই দায়িত্ব। আর একথাও জ্ঞানা যায় যে, তাঁর সম্বোধিত ব্যক্তিগণ ছিলেন বিতর্ক ও প্রাজ্ঞতা ভাষায় অধিকারী আরব। তাদেরকে কোরআন শিক্ষা দানের অর্থ শুধু শব্দের আভিধানিক অর্থ বলে দেওয়া কিছুতেই নয়। কেননা, আভিধানিক অর্থ তাদের অজানা ছিল না। বরং এ শিক্ষাদান ও বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য এটাও হতে পারে যে, কোরআন পাক যেসব নির্দেশ সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করে, তিনি তাঁর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ এমন ওহীর মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছাবেন, যা কোরআনের ভাষায় নয়, বরং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অন্তরে জ্ঞাত করবেন। انْ مَّا الْاَوْحٰى يُوحٰى আয়াতে এ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। উদাহরণত কোরআন পাক অসংখ্য জায়গায় وَكُتِبَ عَلَيْكُمُ الذِّكْرُ (নামায কায়েম কর ও যাকাত দাও) বলে বক্তব্য শেষ করেছে। সাক্ষ্যের কিয়াম, রুকু ও সিজদা কোন কোন জায়গায় উল্লেখ করলেও জা'অস্পষ্ট। এগুলোর ধরন উল্লেখ করা হয়নি। আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে ক্ষেত্রেশতা জিবরাঈল (আ) বয়ং এসে রাসুলুল্লাহ (সা)-কে এসব আরকান বিস্তারিতভাবে হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি উক্তি ও কর্মের মাধ্যমে তা উন্নতের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

সাক্ষ্যের বিভিন্ন নেসাব, প্রত্যেক নেসাবে যাকাতের পরিমাণ নির্ধারণ, কোন মালে যাকাত ওয়াজিব, কোন মালে ওয়াজিব নয়, নেসাবের পরিমাণে কড়টুকু অংশ যাকাতমুক্ত—এসব বিবরণ রাসুলুল্লাহ (সা) নিজে দান করেছেন এবং করমান আকারে লিপিবদ্ধ করিয়ে সাহায্যে কিরামের হাতে নোপদ করেছেন।

কোরআন পাক এক আয়াতে নির্দেশ দিয়েছে :

لَا تَكُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ—তোমরা একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ

করো না।

এখন প্রচলিত কাজ-কারবার কেনা-বেচা ও ইজারার মধ্যে কোনটি অন্যায় ও অবিলম্বমূলক এবং কোনটিতে জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়—এসব বিবরণ রাসুলুল্লাহ (সা) ক্ষেত্রেশী নির্দেশে উন্নতকে বলে দিয়েছেন। শরীয়তের অন্য সব বিধি-বিধানের ক্ষেত্রেও এ কথা সমভাবে প্রযোজ্য।

ওহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা) প্রদত্ত এসব বিবরণ কোরআনে উল্লিখিত নেই। এমতাবস্থায় কোন অজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে এরূপ কোন ধোঁকা খাওয়া অবাস্তব নয় যে, এসব বিবরণ যেহেতু আল্লাহ প্রদত্ত নয়, তাই আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে এগুলো পালন করা জরুরী নয়। এ সম্ভাবনার ভিত্তিতেই আল্লাহ তা'আলা সমগ্র কোরআনে বারবার স্বীয় আনুগত্যের সাথে সাথে রাসূলের আনুগত্যকেও অত্যাৱশ্যকীয় ঘোষণা করেছেন। রাসূলের আনুগত্য বাস্তবে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য হলেও বাহ্যিক আকার ও বিশদ বিবরণের দিক দিয়ে কিছুটা স্বতন্ত্রও। তাই আল্লাহ তা'আলা বারবার জোরের সাথে বলে দিয়েছেন যে, রাসূল তোমাদের যা নির্দেশ দেন, তাও আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মনে করে পালন কর—কোরআনে তা পরিষ্কারভাবে উল্লিখিত থাকুক বা না থাকুক। এ প্রশ্নটি শুধু অজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে ধোঁকার কারণই নয়; বরং ইসলামের শত্রুদের জন্যও একটি হাতিয়ার ছিল। তারা এর দ্বারা ইসলামের মূলনীতিতে অনর্থ সৃষ্টি করে মুসলমানদের ইসলামের বিতর্ক পথ বিচ্যুত করতে পারতো। এ কারণে কোরআন পাক এ বিষয়বস্তুটি শুধু 'রাসূলের আনুগত্য' শব্দ দ্বারা ই ব্যক্ত করেনি; বরং বিভিন্ন ভঙ্গিতে উদ্ভেদের সামনে তুলে ধরেছে। উদাহরণত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কর্তব্যকর্মের মধ্যে গ্রন্থ শিক্ষাদানের সাথে হিকমত শিক্ষাদান যোগ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, গ্রন্থ ছাড়া আরও কিছু বিষয় তাঁর শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং তাও মুসলমানদের অবশ্য পালনীয় না 'হিকমত' শব্দ দ্বারা তাই ব্যক্ত করা হয়েছে। কোথাও বলা হয়েছে لَمَّا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ — অর্থাৎ রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে—তিনি অবতীর্ণ আয়াতসমূহের মর্ম, লক্ষ্য ও ব্যাখ্যা বর্ণনা করবেন।

কোথাও ইরশাদ হয়েছে : مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا — অর্থাৎ রাসূল তোমাদের যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যে বিষয়ে নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক। এসব ব্যবস্থাই এ জন্য করা হয়েছে, যাতে আগামীকাল কেউ এ কথা বলতে না পারে যে, আমরা শুধু কোরআনে বর্ণিত বিধি-বিধান পালন করতে আদিষ্ট হয়েছি। যা কোরআনে নেই, তা পালন করতে আমরা আদিষ্ট নই। রাসূলুল্লাহ (সা) সম্ভবত অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা বুঝে নিরেছিলেন যে, কোন এক যুগে এমন লোকও পন্নদা হবে যারা রাসূলের শিক্ষা থেকে গা বাঁচানোর জন্য দাবি করে বসবে যে, আমাদের জন্য আল্লাহর কিতাব কোরআনই যথেষ্ট। তাই এক হাদীসে তিনি পরিষ্কারভাবে একথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন :

لَا الْفَيْنِ احْدَكُم مُّتَكِنًا عَلَىٰ اَرْ يَكْتِه يَاتِيهِ الْاَمْرُ مِنْ اَمْرِي مِمَّا اَمَرْتُ بِهِ اَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لَا اَدْرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللّٰهِ اتَّبِعْنَاهُ۔

অর্থাৎ আমি যেন তোমাদের কাউকে না পাই যে, সে আরাম কদারায় পা এলিয়ে বসে আমার আদেশ ও নিষেধ সম্পর্কে এ কথা বলে বসে যে, আমরা এসব জানি না; আল্লাহর কিতাবই আমাদের জন্য যথেষ্ট। এতে যা পাওয়া যায় আমরা তাই পালন করবো। (তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, বায়হাকী, মুসনাদে আহমাদ)

মোট কথা, আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের সাথে বিভিন্ন জায়গায় বারবার রাসূলের আনুগত্যের উল্লেখ, বিভিন্ন ভঙ্গিতে রাসূল প্রদত্ত বিধি-বিধান পালনের নির্দেশ এগুলো সব একটিমাত্র

আশঙ্কার পরিপ্রেক্ষিতে করা হয়েছে। তা এই যে, যাতে কেউ হাদীসের ভাণ্ডারে রাসূলুল্লাহ (সা) বর্ণিত বিস্তারিত বিধি-বিধানকে কোরআন থেকে পৃথক এবং আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য থেকে ভিন্ন মনে করে অবীকার করে না বসে। প্রকৃতপক্ষে তা কোরআন থেকে পৃথক নয়।

گفته او گفته الله بود - گرچه از حلقوم عبد الله بود

তার উক্তি আল্লাহরই উক্তি—যদিও তা আল্লাহর বান্দার মুখ থেকে নিসৃত হয়।

দ্বিতীয় আয়াতে ক্ষমা ও জ্ঞানোত্তর দিকে প্রতিযোগিতামূলকভাবে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের পর এটি দ্বিতীয় নির্দেশ। এখানে ক্ষমার অর্থ এমন সৎকর্ম, যা আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা লাভ করার কারণ হয়। সাহাবী ও তাবেরীগণ বিভিন্নভাবে এর ব্যাখ্যা করেছেন; কিন্তু সারমর্ম সবগুলোরই এক। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত আলী (রা) বলেছেন, 'কর্তব্য পালন', হযরত ইবনে আব্বাস (রা) 'ইসলাম', আবুল আলিয়া 'হিজরত', আনাস ইবনে মালেক 'নামাযের প্রথম তাকবীর', সাঈদ ইবনে জুবায়ের 'ইবাদত পালন', যাহ্‌হাক 'জিহাদ' এবং ইকরামা 'তওবা' বলেছেন। এসব উক্তির সারকথা এই যে, ক্ষমা বলে এমন সৎকর্ম বোঝানো হয়েছে, যা আল্লাহর ক্ষমার কারণ হয়ে থাকে।

এখানে দুটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য : এক- এ আয়াতে ক্ষমা ও জ্ঞানোত্তর দিকে ধারিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অথচ অন্য এক আয়াতে لا تَتَّبِعُوا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِهِ يَخْضَعُكُمْ عَلَى بَعْضِ যা কাজের সৌলতে আল্লাহ একজনকে অন্যজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তা অর্জন করার বাসনা করো না; বলে অন্যের অর্জিত শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের বাসনা করতে নিষেধ করা হয়েছে।

উত্তর এই যে, শ্রেষ্ঠত্ব দু'প্রকার (এক) ঐ শ্রেষ্ঠত্ব, যা অর্জন করা মানুষের ইচ্ছা ও শক্তির বাইরে। এগুলোকে অনিচ্ছাধীন শ্রেষ্ঠত্ব বলা হয়। উদাহরণত স্বৈরাঙ্গ হওয়া; সুস্বী হওয়া, বুয়ূর্ণ পরিবারভুক্ত হওয়া ইত্যাদি। (দুই) ঐ শ্রেষ্ঠত্ব, যা মানুষ অধ্যবসায় ও চেষ্টার দ্বারা অর্জন করতে পারে। এগুলোকে ইচ্ছাধীন শ্রেষ্ঠত্ব বলা হয়। অনিচ্ছাধীন শ্রেষ্ঠত্বের ক্ষেত্রে অন্যের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের চেষ্টা এবং বাসনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, এ জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহ বীর হিকমত অনুযায়ী মানুষের মধ্যে বন্টন করেছেন। এতে কারও চেষ্টার কোন সম্ভাবনা নেই। সুতরাং যত চেষ্টা ও বাসনা করি হোক, এ জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হবে না। চেষ্টাকারীর মনে হিংসা ও শত্রুতার আগুন জ্বলা ছাড়া আর কোন ফায়দা হবে না। উদাহরণত এক ব্যক্তি কৃষিজম, সেখানি স্বৈরাঙ্গ হওয়ার বাসনা করতে থাকে, এতে লাভ কি? তবে যেসব শ্রেষ্ঠত্ব ইচ্ছাধীন, সেগুলোকে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে অর্জন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তা শুধু এক আয়াতে নয়, বহু আয়াতে এ নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। এক জায়গায় বলা হয়েছে : فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ : পুণ্যার্জনে একে অন্যকে পেছনে কেল এগিয়ে যাও। অন্য এই জায়গায় বলা হয়েছে :

وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ.

জানেক বুয়ূর্ণ বলেন : যদি কারও মধ্যে এমন কোন সৃষ্টিগত ও স্বভাবগত ক্রটি থাকে, যা দূর করা তার সাধ্যাতীত, তবে এ ক্রটি স্বীকার করে নিয়ে অন্যের হ্রণের দিকে না তাকিয়ে স্বীয়

কাজ করে যাওয়াই তার উচিত। কেননা, সে যদি নিজ ক্রটির জন্য অনুতাপ ও অন্যের গুণের জন্য হিংসা করতে থাকে, তবে যতটুকু কাজ করা সম্ভব ততটুকুও করতে পারবে না এবং একেবারে অর্থহীন হয়ে পড়বে।

এখানে প্রাধান্যযোগ্য দ্বিতীয় বিষয়টি এই যে, আল্লাহ তা'আলা আয়াতে ক্ষমাকে জান্নাতের পূর্বে উল্লেখ করে সম্ভবত এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন যে, জান্নাত লাভ করা আল্লাহর ক্ষমা ছাড়া সম্ভব নয়। কেননা, মানুষ যদি জীবনভর পুণ্য অর্জন করে এবং গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে, তবুও তার সমগ্র পুণ্যকর্ম জান্নাতের মূল্য হতে পারে না। জান্নাত লাভের পন্থা মাত্র একটি। তা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা ও অনুগ্রহ। রাসূলুল্লাহ (সা) ইসলাদ করেছেন :

سَدُّوْا قَارِبُوْا وَابْشُرُوْا فَانْه لَنْ يَدْخُلَ اَحَدُ الْجَنَّةِ عَمَلَهٗ قَالُوْا وَلَا اَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالْ وَلَا اَنَا اِلَّا اَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللّٰهُ بِرَحْمَتِهٖ—

—“সততা ও সত্য অবলম্বন কর। মধ্যবর্তী পথ অনুসরণ কর এবং আল্লাহর অনুগ্রহের সুসংবাদ লাভ কর। কারও কর্ম তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে না। শ্রোতারা বললো : আপনাকেও নয় কি ইয়া রাসূলুল্লাহ ! উত্তর হলো : আমার কর্ম আমাকেও জান্নাতে নেবে না। তবে আল্লাহ যদি বীর রহমত দ্বারা আমাকে আবৃত করে নেন।”

মোট কথা এই যে, আমাদের কর্ম জান্নাতের মূল্য নয়। তবে আল্লাহ তা'আলার রীতি এই যে, তিনি স্বীয় অনুগ্রহ এ বান্দাকেই দান করেন, যে সৎকর্ম করে। বরং সৎ কর্মের সামর্থ্য লাভ হওয়াই আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির লক্ষণ। অতএব, সৎ কর্ম সম্পাদনে ক্রটি করা উচিত নয়। আল্লাহর ক্ষমাই জান্নাতে প্রবেশের আসল কারণ হেতু এর প্রতি গুরুত্ব দানের উদ্দেশ্যে একে এককভাবে উল্লেখ না করে مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّكَ বলা হয়েছে। ‘প্রতিপালকত্ব’ বিশেষণ উল্লেখ করার উদ্দেশ্যে আরও কৃপা ও অনুগ্রহ প্রকাশ করা।

আয়াতে জান্নাত সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, প্রকৃত বিত্ত নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সমান। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের চাইতে অধিক বিত্ত জেন-বস্তু মানুষ কল্পনা করতে পারে না। এ কারণে জান্নাতের প্রশস্ততাকে বোঝাবার জন্য এদের সাথে তুলনা করে যেন বোঝানো হয়েছে যে, জান্নাত খুবই বিত্ত। প্রশস্ততায় তা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে নিজের মধ্যে ধরে নিতে পারে। এর প্রশস্ততাই যখন এমন, তখন দৈর্ঘ্য কতটুকু হবে, তা আল্লাহ্ হালুম। আয়াতের এ ব্যাখ্যা তখন হবে, যখন غَرْض শব্দের অর্থ طَوْل তথা দৈর্ঘ্যের বিপরীত নেওয়া হয়। কিন্তু যদি এর অর্থ হয় ‘মূল্য’ তবে আয়াতের অর্থ হবে যে, জান্নাত কোন সাধারণ বস্তু নয়— এর মূল্য সমগ্র নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল। সুতরাং এহেন মূল্যবান বস্তুর প্রতি ধাবিত হও।

তফসীরে কবীরে বলা হয়েছে :

قَالَ ابُو مُسْلِمٍ لَّنَ الْبَخْرُضُ هِنَا مَا يَعْزُضُ مِنَ الثَّمَنِ فِى مَقَابِلَةِ الْمَبِيعِ اِىْ ثَمْنَهَا لَوْ بِيَعْتَ كَثَمْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْمَبْرَادِ بِذَلِكَ عَظْمِ مَقْدَارِهَا وَجَلَالَةِ خَطَرِهَا وَاَنْهَا لَا يَسَاوِيهَا شَيْءٌ وَّانْ عَظْمِ.

—“আবু মুসলিম বলেন : আয়াতে عَرْض শব্দের অর্থ এই বস্তু যা বিক্রিত বস্তুর মোকাবিলায় মূল্য হিসাবে পেশ করা হয়। উদ্দেশ্য এই যে, যদি জান্নাতের মূল্য ধরা হয়, তবে সমগ্র

নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের সবকিছু হবে এর মূল্য। এতে করে জান্নাত যে বিশাল ও অমূল্য বিষয়, তা প্রকাশ করাই লক্ষ্য।”

জান্নাতের দ্বিতীয় বিশেষণে বলা হয়েছে : **اعْتَبِرُوا لِلْمُتَّقِينَ** অর্থাৎ জান্নাত মুসলিমদের জন্য নির্মিত হয়েছে। এতে বোঝা গেল যে, জান্নাত সৃষ্ট হয়ে গেছে। কোরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দ্বারা বোঝা যায় যে, জান্নাত সপ্তম আকাশের উপরে অবস্থিত এবং সপ্তম আকাশই তার যমীন।

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ٥٥ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ٥٦ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٥٧ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ٥٨ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ ۖ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ٥٩ هَٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ٦٠

(১৩৪) যারা সচ্ছলতায় ও অভাবের সময় ব্যয় করে, যারা নিজেদের রাগকে হজম করে আর মানুষের প্রতি ক্রমা প্রদর্শন করে, বহুত আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকেই ভালবাসেন। (১৩৫) তারা কখনও কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা নিজের জন্য কোন মন্দ কাজ করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্রমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ হাড়া আর কে পাপ ক্রমা করবেন? তারা নিজের কৃতকর্মের জন্য হঠকান্ধিতা প্রদর্শন করে না এবং জেনেওনে তাই করতে থাকে না। (১৩৬) তাদেরই জন্য প্রতিদান হলো তাদের পালনকর্তার ক্রমা ও জান্নাত, যার উলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে প্রস্রাব—যেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল। যারা কাজ করে তাদের জন্য কতই না চমৎকার প্রতিদান! (১৩৭) তোমাদের অতীত হয়েছে অনেক বিধানাবলী। তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ—যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তাদের পরিণতি কি হয়েছে। (১৩৮) এই হলো মানুষের জন্য বর্ণনা। আর যারা ভয় করে, তাদের জন্য উপদেশবাণী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যারা সচ্ছলতা ও অভাবের মধ্যে (সর্বাবস্থায় সৎ কাজে) ব্যয় করে, ক্রোধ সংবরণ করে এবং মানুষকে (ভুলত্রুটিতে) ক্ষমা করে, আল্লাহ্ এমন সৎকর্মশীলদের (যাদের মধ্যে এসব গুণ পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান তাদেরকে) ভালবাসেন। (উল্লিখিতদের দিক দিয়ে দ্বিতীয় স্তরের মুসলমান এমনও আছে) যারা (অন্যের প্রতি জুলুম হয়, এমন কোন) অশ্লীল কাজ করলে অথবা (কেনন গোনাহ্ করে ফেললে বিশেষভাবে) নিজের ক্ষতি করলে (তৎক্ষণাৎ) আল্লাহ্কে (অর্থাৎ তাঁর মহব্ব ও আযাবকে) স্মরণ করে, অতঃপর স্বীয় গোনাহ্‌র জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে (অর্থাৎ ক্ষমার নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী ক্ষমা প্রার্থনা করে। অন্যের ওপর জুলুম করে থাকলে তার কাছ থেকেও ক্ষমা নেয়। বিশেষভাবে নিজের সম্পর্কে গোনাহ্‌ হলে, এতে এর প্রয়োজন নেই। তবে উভয় অবস্থাতেই আল্লাহ্‌র কাছ থেকে ক্ষমা নিতে হবে)। আর আল্লাহ্‌ ছাড়া কে আছে যে গোনাহ্‌সমূহ ক্ষমা করবে? (হকদারদের ক্ষমা করা প্রকৃত ক্ষমা নয়। কারণ তারা শাস্তি থেকে বাঁচাবার অধিকার রাখে না। প্রকৃত ক্ষমা একেই বলা হয়) এবং তারা স্বীয় কর্মের জন্য হঠকারিতা করে না এবং তারা (এ সব বিষয়) জানেও (যে, আমরা অমুক গোনাহ্‌ করেছি, আমাদের অবশ্যই তওবা করতে হবে এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা ক্ষমাশীল। উদ্দেশ্য এই যে, তারা কর্মসমূহও সংশোধন করে নেয় এবং বিশ্বাসও ঠিক রাখে)। তাদের পুরস্কার পালনকর্তার পক্ষ থেকে ক্ষমা এবং (বেহেশতের) এমন উদ্যানসমূহ, যাদের (বৃক্ষ ও গৃহের) উল্লেখ দিয়ে বর্ণনা প্রবাহিত হবে। তারা তন্মধ্যে চিরকাল অবস্থান করবে। (পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে এ ক্ষমা ও জান্নাত অর্জনের নির্দেশ ছিল। মাঝখানে এর উপায় বর্ণিত হয়েছে এবং পরিশেষে তা দান করার ওয়াদা করা হয়েছে। এটা) কি চমৎকার প্রতিদান এসব কর্মীর! (কর্ম হচ্ছে ক্ষমা প্রার্থনা ও সুবিশ্বাস।) কর্মী প্রার্থনার ফলশ্রুতি আনুগত্য)। নিশ্চয় তোমাদের পূর্বে বিভিন্ন পন্থা (পন্থার লোক) অতিক্রান্ত হয়েছে, (তাদের মধ্যে মুসলমান ও কাফির সবাই ছিল এবং তাদের মধ্যে মতানৈক্য, সংঘর্ষ এবং যুদ্ধ হয়েছে। কিন্তু পরিণামে কাফিররাই ধ্বংস হয়েছে। তোমরা যদি তাদের ধ্বংসাবশেষ দেখতে চাও, তবে) তোমরা পৃথিবীতে বিচরণ কর, অতঃপর দেখে নাও যে, মিথ্যারোপকারীদের (অর্থাৎ কাফিরদের) পরিণাম কিরূপ হয়েছে? (অর্থাৎ তারা ধ্বংস ও বরবাদ হয়েছে। তাদের ধ্বংসাবশেষ তখন পর্যন্ত অবশিষ্ট ছিল। অন্যান্য আয়াতে বলা হয়েছে : فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ يَكُنْ يَبُوءُهُمْ خَاوِيَةٌ وَإِنَّهُمَا لِبِأَمَامٍ مُّجِيزٍ ইত্যাদি। এটা (উল্লিখিত বিধ্বংসকৃত) মানুষের জন্য যথেষ্ট বর্ণনা (এতে চিন্তা করলে তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে) এবং মুত্তাকীদের জন্য পথ-প্রদর্শক ও উপদেশ (অর্থাৎ তারা ই-হদায়েত ও উপদেশ গ্রহণ করে। (বহুত) অনুরূপ আমল করাই-হেদায়েত)।

আনুষঙ্গিক স্তোভব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ তা'আলা বিশ্বাসী মুত্তাকীদের বিশেষ গুণাবলী ও লক্ষণাদি বর্ণনা করেছেন। এসব গুণ ও লক্ষণের সাথে অনেক তাৎপর্য নিহিত। উদাহরণত কোরআন পাক স্থানে স্থানে সৎ লোকদের সংসর্গ ও তাদের শিক্ষা থেকে উপকৃত হওয়ার প্রতি জোর

দিয়েছে। কোথাও الَّذِينَ اتَّعَمْتُ عَلَيْهِمْ বলে দীনের সরল বিতরণ পথে যারা চলেছেন তাঁদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার প্রতি ইশারা করেছে এবং কোথাও الصُّدُقِينَ বলে তাদের সংসর্গের বিশেষ কার্যকারিতা নির্দেশ করেছে। জগতে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাল ও মন্দ—উভয় প্রকার লোকই রয়েছে। ভাল লোকদের পোশাকে মন্দরাও অনেক সময় তাদের স্থান দখল করে বসে। এ কারণে সং ও মুত্তাকীদের বিশেষ লক্ষণ ও গুণাবলীর বর্ণনা করে একথা বুঝিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল যে, মানুষ যেন দ্রাস্ত পথপ্রদর্শক ও নেতাদের কাছ থেকে দূরে সরে থাকে এবং সাদ্কা লোকদের লক্ষণ চিনে নিয়ে তাদের অনুসরণ করে। বিশ্বাসী মুত্তাকীদের গুণাবলী ও লক্ষণ বর্ণনা করার পর তাদের চিরস্থায়ী সাক্ষ্য ও জান্নাতের উচ্চ স্তর বিধৃত করে সং লোকদের সুসংবাদ এবং অসং লোকদের জন্য উপদেশ ও উৎসাহ প্রদানের পথ খোলা হয়েছে। উপসংহারে هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ বলে এদিকেই ইশারা করা হয়েছে। আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের যেসব গুণ ও লক্ষণ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে প্রাথমিক আয়াতসমূহে মানবীয় অধিকার ও পারস্পরিক জীবন-যাপন সম্পর্কিত গুণাবলী ব্যক্ত হয়েছে। পরবর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ও আনুগত্য সম্পর্কিত গুণাবলী উল্লিখিত হয়েছে। শব্দান্তরে প্রথমোক্ত গুণাবলীকে 'হুক্কুল ইবাদ' (বান্দার হক) এবং শেষোক্ত গুণাবলীকে 'হুক্কুল্লাহ' (আল্লাহর হক) বলা যেতে পারে।

উল্লিখিত আয়াতসমূহে মানবীয় অধিকার সম্পর্কিত গুণাবলী আগে এবং আল্লাহর অধিকার সম্পর্কিত গুণাবলীকে পরে উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আসলের দিক দিয়ে যদিও আল্লাহর অধিকার সব অধিকারের চাইতে অগ্রগণ্য, তবুও এতদুভয়ের মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য বিদ্যমান। তা এই যে, আল্লাহ তা'আলা বান্দার উপর স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন সত্য, কিন্তু এতে আল্লাহ তা'আলার নিজস্ব কোন লাভ বা স্বার্থ নেই এবং এসব অধিকারের প্রয়োজনও তাঁর নেই। বান্দা এসব হক আদায় না করলে আল্লাহ তা'আলার কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না। তাঁর সত্তা সবকিছুর উর্ধ্বে। তাঁর ইবাদত দ্বারা স্বয়ং ইবাদতকারীই উপকৃত। তদুপরি তিনি দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু এবং দাতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দাতাও বটে। তাঁর অধিকারে সর্বাধিক ক্রটিকারী ব্যক্তি যখনই স্বীয় কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তাঁর দিকে ধাবিত হয় এবং তওবা করে, তখনই তাঁর দয়া ও দানের দরবার থেকে এক নিমেষের মধ্যে তওবাকারীর সব গোনাহ মাফ হয়ে যেতে পারে। হুক্কুল ইবাদ কিন্তু এমন নয়। কেননা, বান্দা স্বীয় অধিকারের প্রতি মুখাপেক্ষী। তার প্রাপ্য অধিকার আদায় করা না হলে তার ভয়ানক ক্ষতি হয়। এ ক্ষতি মাফ করে দেওয়াও বান্দার পক্ষে সহজ নয়। এ কারণেই বান্দার অধিকার বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী।

এতদ্ব্যতীত পারস্পরিক অধিকার আদায়ের উপরই বিশ্বজগতের সঠিক ব্যবস্থাপনা ও মানব সমাজে সংশোধন সর্বতোভাবে নির্ভরশীল। এর সামান্য ক্রটিই যুদ্ধ-বিগ্রহ ও যোগাযোগের পথ খুলে দেয়। পক্ষান্তরে পারস্পরিক অধিকার আদায়ের মাধ্যমে উত্তম চরিত্র প্রদর্শন করতে পারলে শত্রুও মিত্রে পরিণত হয়ে পড়ে এবং শতাব্দীকালের যুদ্ধও শান্তি-সম্মতায় পরিবর্তিত

হয়ে যায়। এসব কারণেও মানবীয় অধিকার সম্পর্কিত গুণাবলীকে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে।
সর্বপ্রথম গুণ হচ্ছে :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ — অর্থাৎ মুক্তাকী তারাই, যারা আদ্বাহ তা'আলার পথে
বীয়া অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে অভ্যস্ত। সচ্ছলতা হোক কিংবা অভাব-অনটন হোক, সর্বাবস্থায়
তারা সাধ্যানুযায়ী ব্যয়কার্য অব্যাহত রাখে। বেশি হলে বেশি এবং কম হলে কমই ব্যয় করে।
এতে একদিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, দরিদ্র ও নিঃস্ব ব্যক্তিও আদ্বাহর পথে ব্যয় করতে
নিজেকে মুক্ত মনে করবে না এবং এ সৌভাগ্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখবে না। কেননা,
হাজার টাকা থেকে এক টাকা ব্যয় করার যে মর্তবা, আদ্বাহর কাছে হাজার পয়সার এক পয়সা
ব্যয় করারও একই মর্তবা। কার্যক্ষেত্রে হাজার টাকার মালিকের পক্ষে এক টাকা আদ্বাহর পথে
ব্যয় করা যেমন কঠিন নয়, তেমনি হাজার পয়সার মালিকের পক্ষে এক পয়সা ব্যয় করতেও
কোন কষ্ট হওয়ার কথা নয়।

অপর দিকে আয়াতে নির্দেশও রয়েছে যে, অভাব-অনটনেও সাধ্যানুযায়ী ব্যয়কার্য অব্যাহত
রাখলে আদ্বাহর পথে ব্যয় করার কল্যাণকর অভ্যাসটি বিনষ্ট হবে না। সম্ভবত এর বরকতেই
আদ্বাহ তা'আলা আর্থিক সচ্ছলতা ও স্বাচ্ছন্দ্য দান করতে পারেন।

আয়াতে তৃতীয় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে—তা এই যে, যে ব্যক্তি
বীয়া অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে অন্যের উপকার ও দরিদ্রদের সাহায্য করার অভ্যাস গড়ে তোলে,
সে কখনও অপরের অধিকার খর্ব করতে প্রবৃত্ত হবে না এবং অপরের সম্পদ সম্বন্ধে ব্যতিরেকে
হজম করে ফেলার ইচ্ছা করবে না। অতএব, প্রথমোক্ত এ গুণটির সারমর্ম হলো এই যে
বিশ্বাসী, আদ্বাহভীক এবং আদ্বাহর প্রিয় বান্দারা অপরের উপকার সাধনের চিন্তায় সদা ব্যাপৃত
থাকেন; তাঁরা সচ্ছলই হোন কিংবা অভাবম্বস্ত। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা একবার
মাত্র একটি আঙুরের দানা খয়রাত করেছিলেন। তখন তাঁর কাছে এ ছাড়া কিছুই ছিল না।
বর্ণিত আছে যে, জনৈক মনীষী একবার একটি পিয়াজ আদ্বাহর পথে ব্যয় করেছিলেন।
রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

انقوا النار ولو بشق تمرة - وردوا السائل ولو بظلف شاة

অর্থাৎ খেজুরের একটি টুকরা দিয়ে হলেও তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে আত্মরক্ষা কর
এবং ভিক্ষুককে খালি হাতে ফিরিয়ে দিও না, একটি ছাগলের খুর হলেও তাকে দান কর।

তফসীরে কবীরে ইমাম রাযী একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) এক
ভাষণ প্রসঙ্গে মুসলমানদের সদকা দানে উৎসাহ দান করলে যাদের কাছে স্বর্ণ-রৌপ্য ছিল,
তারা তা-ই দিয়ে দিল। জনৈক ব্যক্তি খেজুরের ছাল নিয়ে এল এবং বলল : আমার কাছে আর
খিছু নেই। অতঃপর তাই দান করা হলো। অপর এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ !
আমার কাছে দান করার মত কিছুই নেই। তবে আমি বীয়া সম্মানই দান করলাম। ভবিষ্যতে
কেউ আমাকে হাজার মন্দ বললেও আমি তার প্রতি অসন্তুষ্ট হব না।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শিক্ষা ও সাহায্যে কিরামের কার্যাবলী থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে,
আদ্বাহর পথে ব্যয় শুধু ধনী ও বিংশালীদের ভূমিকা নয়—দরিদ্র ও নিঃস্ব ব্যক্তিও এ গুণে

গণাঙ্কিত হতে পারে। নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী আল্লাহর পথে কিছু ব্যয় করে দরিদ্ররাও এ মহান গুণ অর্জন করতে চাইলে তাতে কোন বাধা নেই।

আল্লাহর পথে শুধু অর্থ ব্যয় করাই জরুরী নয় : আয়াতে আরও লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কোরআন **يَنْفَقُونَ** বলে ব্যয় করার কথা উল্লেখ করেছে, কিন্তু কি ব্যয় করবে, তার কোন উল্লেখ নেই। এ ব্যাপকতা থেকে বোঝা যায় যে, শুধু অর্থ-সম্পদই নয় বরং ব্যয় করার মত প্রত্যেক বস্তুই এর অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণত কেউ যদি তার সময় কিংবা শ্রম আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তাহলে তাও আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হবে। তফসীরে কবীর বর্ণিত উল্লিখিত হাদীসও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

সম্বলতা ও অভাব-অনটন উল্লেখ করার আরও একটি রহস্য : এ দু' অবস্থায়ই মানুষ আল্লাহকে ভুলে যায়। অর্থ-সম্পদের প্রাচুর্য হলে আরাম-আয়েশে ডুবে মানুষ আল্লাহকে বিস্মৃত হয়। অপরদিকে অভাব-অনটন থাকলে প্রায়ই সে চিন্তায় মগ্ন হয়ে আল্লাহর প্রতি গাফেল হয়ে পড়ে। আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহর প্রিয় বান্দারা আরাম-আয়েশেও আল্লাহকে ভুলে যায় না কিংবা বিপদাগদেও আল্লাহর প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে না। এ অর্থে কবি জাফর শাহ্ দেহলভীর নিম্নোক্ত পংক্তিটি চমৎকার বটে :

ظفر آدمی اسكونه جانیے گا خواہ ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا جسے
عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا۔

অতঃপর আল্লাহ-ভীরুদের দ্বিতীয় বিশেষ গুণ ও লক্ষণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, কেউ তাদের কষ্ট দিলে তারা তার প্রতি কিণ্ড ও উত্তেজিত হয় না এবং ক্রোধবশে প্রতিশোধও গ্রহণ করে না। শুধু তাই নয়, অতঃপর তারা মনেপ্রাণে ক্ষমাও করে দেয় এবং ক্ষমা করেই কান্তি হয় না—কষ্টদাতার প্রতি অনুগ্রহও করে। এ যেন এক গুণের ভেতরে তিন গুণ : স্বীয় ক্রোধ সংবরণ করা, কষ্টদাতাকে ক্ষমা করা, অতঃপর তার প্রতি অনুগ্রহ ও অনুকম্পা প্রদর্শন করা। আয়াতে এ তিনটি গুণই উল্লিখিত হয়েছে।

وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.

অর্থাৎ যারা ক্রোধ সংবরণ করে, অপরাধের প্রতি মার্জনা করে বস্তুত আল্লাহ অনুগ্রহকারীদের ভালবাসেন।

ইমাম বায়হাকী এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে হযরত আলী ইবনে হুসাইন রায়িআল্লাহ আনহুর একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা বর্ণনা করেছেন। হযরত আলী ইবনে হুসাইনের এক বান্দী একদিন তাঁকে ওয়ু করানোর সময় হঠাৎ পানির পাত্র হাত থেকে ফসকে গিয়ে হযরত আলী ইবনে হুসাইন (রা)-এর উপর পড়ে যায়। এতে তাঁর সব কাপড়-চোপড় ভিজ়ে যায়। এমতাবস্থায় রাগান্বিত হওয়াই স্বাভাবিক। বান্দী বিপদের আশংকা করে তৎক্ষণাৎ **الْكَاطِمِينَ الْغَيْظِ** আয়াতটি পাঠ করল। আয়াতটি শোনামাত্রই নবীবংশের বুয়ূর্গ হযরত আলী ইবনে হুসাইন (রা)-এর ক্রোধানল একেবারে নিভে গেল। তিনি নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। অতঃপর বান্দী দ্বিতীয় বাক্য **وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ** পাঠ করল। তখন তিনি বললেন : আমি তোকে মাফ করে দিলাম। বান্দীটি

ছিল অত্যন্ত চতুর। সে অতঃপর তৃতীয় বাক্যটিও শুনিতে দিল : **وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُخْسِنِينَ**। যাতে প্রকারান্তরে অনুগ্রহ ও সদ্যবহারের নির্দেশ রয়েছে। এ বাক্যটি শুনে হযরত আলী ইবনে হসাইন (রা) বললেন : যাও আমি তোমাকে আযাদ করে দিলাম। (রুহুল মা'আনী)

অপরের দোষত্রুটি মার্জনা করা মানব চরিত্রের একটি প্রধান গুণ। আখিরাতে এর প্রতিদানও অনেক বড়। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হবে, আল্লাহ তা'আলার কাছে কারও কোন পাওনা থাকলে দাঁড়িয়ে যাও। তখন ঐসব লোক উঠে দাঁড়াবে, যারা দুনিয়াতে অপরের অত্যাচার-উৎপীড়ন ক্ষমা করেছিল।

এক হাদীসে বলা হয়েছে :

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُشْرِفَ لَهُ الْبَنِيَانُ وَتُرْفَعَ لَهُ الدَّرَجَاتُ فَلْيَغْفِرْ عَنْ مَنْ ظَلَمَهُ وَيُعْطِ مَنْ حَرَمَهُ وَيَصِلْ مَنْ قَطَعَهُ-

অর্থাৎ “যে ব্যক্তি জান্নাতে তার সুউচ্চ প্রাসাদ এবং মর্যাদা কামনা করবে, তার উচিত যে অত্যাচার করে, তাকে ক্ষমা করা, যে তাকে কখনও কিছু দেয় না, তাকে বখশিশ ও উপঢৌকন দেয়া এবং যে তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে, তার সাথে মেলামেশা করে।”

কোরআন পাক অন্য এক আয়াতে আরও স্পষ্ট ভাষায় অন্যাযকারীদের প্রতি অনুগ্রহ করার মহান চরিত্র শিক্ষা দিয়েছে এবং বলেছে যে, এর বদৌলতে শত্রুও মিত্রে পরিণত হয়। বলা হয়েছে :

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ.

অর্থাৎ “মন্দকে অনুগ্রহের দ্বারা প্রতিরোধ কর। এরূপ করলে যার সাথে তোমার শত্রুতা, সে অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবে।”

আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এমনি উচ্চ পর্যায়ের চারিত্রিক শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি নির্দেশ ছিল :

صَلِّ مِنْ قَطْعِكَ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ وَاحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ

অর্থাৎ “যে আপনার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে, আপনি তার সাথে মেলামেশা রাখুন। যে আপনার প্রতি জুলুম করে, আপনি তাকে ক্ষমা করুন। যে আপনার সাথে মন্দ ব্যবহার করে, আপনি তার প্রতি অনুগ্রহ করুন।”

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শান তো অনেক উর্ধ্বে। তাঁর শিক্ষার বরকতে আল্লাহ তাঁর অনুসারী ভক্তদের মধ্যেও এ চরিত্র ও গুণাবলী সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। সাহাবী, তাবয়ীন ও পূর্ববর্তী মনীষিগণের ইতিহাস এ জাতীয় ঘটনায় ভরপুর।

ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-কে জনৈক ব্যক্তি প্রকাশ্যে গালিগালাজ করে। তিনি ক্রোধ সংবরণ করলেন এবং তাকে কিছুই বললেন না। ঘরে ফিরে আসার পর একটি খাঞ্চায় যথেষ্ট পরিমাণ রৌপ্য ও স্বর্ণ মুদ্রা রেখে তিনি সে ব্যক্তির বাড়িতে উপস্থিত হলেন। দরজার কড়া নাড়তেই লোকটি বের হয়ে এলো। তিনি স্বর্ণমুদ্রার খাঞ্চাটি তার সামনে এগিয়ে দিতে দিতে বললেন : আজ আপনি আমার প্রতি বড় অনুগ্রহ করেছেন। স্বীয় পুণ্য সব আমাকে দান

করেছেন। এ অনুগ্রহের প্রতিদানে এ উপটৌকন পেশ করছি, গ্রহণ করুন। লোকটির অন্তরে ইমাম সাহেবের এ ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল। সে চিরতরে তওবা করে ইমাম সাহেবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল। এরপর সে ইমাম সাহেবের সংসর্গে থেকে বিদ্যাশিক্ষা করতে লাগল এবং পরিশেষে তার শিষ্যদের মধ্যে একজন বড় আলিমের মর্যাদা লাভ করল।

অতঃপর আল্লাহর অধিকার সম্পর্কিত গুণাবলী বর্ণনা করে বলা হয়েছে, কখনও মানবিক দুর্বলতাবশত তাদের দ্বারা কোন গোনাহ হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ তারা আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করে, ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং ভবিষ্যতে এ গোনাহ থেকে বিরত থাকার কঠোর সংকল্প করে। বলা হয়েছে :

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا
لذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ
يَعْلَمُونَ.

এতে এক নির্দেশ এই যে, গোনাহে লিপ্ত হওয়া আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হওয়ার কারণ। এ কারণে গোনাহ হওয়া মাত্রই তৎক্ষণাৎ আল্লাহকে স্মরণ করা এবং যিকিরে মশগুল হওয়া উচিত।

দ্বিতীয় নির্দেশ এই যে, পাপ মার্জনার জন্য দুটি বিষয় জরুরী। এক, বিগত পাপের জন্য অনুতাপ করা এবং ক্ষমার জন্য দোয়া করা। দুই, ভবিষ্যতে এ পাপের ধারে-কাছে না যাওয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে কোরআন-নির্দেশিত মহান চরিত্র দান করুন। আল্লাহ্মা আমীন !!

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾

يَسْأَلُكُمْ قَوْمٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ۖ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ

نُذِرُهَا بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ

شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٥٦﴾ وَلِيُخَصَّ اللَّهُ الَّذِينَ

آمَنُوا وَيَسْحَقَ الْكَافِرِينَ ﴿٥٧﴾ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَكِنَّا

يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ ﴿٥٨﴾ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَسْتَوْنَ

الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُلْقَوْهُ ۖ فَقَدْ رَآيَ مَوْتَهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٥٩﴾

(১৩৯) আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মু'মিন হও, তবে তোমরাই জয়ী হবে। (১৪০) তোমরা যদি আহত হয়ে থাক তবে তারাও তো তোমরা আহত হয়েছে। আর এই দিনগুলোকে আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন ঘটিয়ে থাকি। এভাবে আল্লাহ্ জানতে চান—কারা ইমানদার, আর তিনি তোমাদের কিছু লোককে শহীদ হিসাবে গ্রহণ করতে চান। আর আল্লাহ্ অত্যাচারীদেরকে ভালবাসেন না। (১৪১) আর এ কারণে আল্লাহ্ ইমানদারদেরকে পাক-সাক করতে চান এবং কাফিরদেরকে ধ্বংস করে দিতে চান। (১৪২) তোমাদের কি ধারণা, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ আল্লাহ্ এখনও দেখেন নি তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্যশীল? (১৪৩) আর তোমরা তো মৃত্যু আসার আগেই মরণ কামনা করতে, কাজেই এখন তো তোমরা তা চোখের সামনে উপস্থিত দেখতে পাছ।

যোগসূত্র : আলোচ্য আয়াতসমূহে পুনরায় ওহদ যুদ্ধ সম্পর্কে মুসলমানদের সাল্লানা দেওয়া হচ্ছে যে, পরিণামে কাফিররাই পরাজিত ও পর্যুদন্ত হবে। এটাই আল্লাহ্ তা'আলার চিরাচরিত রীতি। যদিও তোমরা এখন নিজ দোষে পরাজিত হয়েছ; কিন্তু ইমানের দাবি মোতাবেক তাকওয়া-পরহিযগারীতে অটল থাকলে পরিশেষে কাফিররাই পরাজিত হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তোমরা (এখন পরাজিত হয়েছ, তাতে কি?) সাহস হারিয়ে না এবং দুঃখ করো না। অবশেষে তোমরাই জয়ী হবে—যদি তোমরা পুরোপুরি বিশ্বাসী হও (অর্থাৎ বিশ্বাসের দাবিতে অটল থাক)। যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে (যেমন ওহদে লেগেছে,) তবে (তাতে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। কারণ, এতে কতিপয় রহস্য রয়েছে। একটি এই যে,) সেই সম্প্রদায়েরও (অর্থাৎ তোমাদের প্রতিপক্ষ কাফিরদেরও) তদ্রূপ আঘাত লেগেছে। (বিগত বদর যুদ্ধে তারাও কতবিকৃত হয়েছিল। আর আমার নীতি হলো এই যে,) আমি এ-দিবসগুলোকে (অর্থাৎ জয়-পরাজয়ের দিনগুলোকে) মানুষের মধ্যে পরিক্রমণ করাই। (অর্থাৎ কখনও এক সম্প্রদায়কে বিজয়ী ও অপর সম্প্রদায়কে পরাজিত করে দেই এবং কখনও এর বিপরীত করে দেই। এ নীতি অনুযায়ীই তারা গত বছর পরাজিত হয়েছিল এবং এবার তোমরা পরাজিত হয়েছ। দ্বিতীয় রহস্য এই যে,) যাতে আল্লাহ্ জা'আলা বিশ্বাস স্থাপনকারীদের (প্রকাশ্যভাবে) জেনে নেন; (কেননা, বিপদের মধ্য দিয়েই বাঁচি লোকদের পরীক্ষা হয়। তৃতীয় রহস্য এই যে,) যাতে তোমাদের কিছু সংখ্যাকে শহীদ করে দেন। (অবশিষ্ট রহস্যগুলো পরে বর্ণিত হয়েছে। মাঝখানে 'প্রাসঙ্গিক বাক্য' হিসাবে বলা হচ্ছে যে,) আল্লাহ্ তা'আলা জুলুম (কুফর ও শিরক)-কারীদের ভালবাসেন না। (কাজেই মনে করো না যে, ভালবাসার পাত্র হওয়ার কারণে তাদের জয়ী করা হয়েছে। কখনই নয়। চতুর্থ রহস্য এই যে,) যাতে বিশ্বাসকারীদেরকে (গোনাহর) ময়লা থেকে পবিত্র করে দেন (কেননা, বিপদাপদ দ্বারা চরিত্র ও কাঙ্ক্ষকর্ম বিধৌত হয়ে যায়। পঞ্চম রহস্য এই যে,) যাতে কাফিরদের নিশিচু করে দেন। (কেননা, জয়লাভে সাহসী হয়ে তারা পুনরায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। এ ছাড়া মুসলমানদের প্রতি অত্যাচার-উৎপীড়নের কারণে

আল্লাহর গণ্য হবে পণ্ডিত হয়ে ধর্ম হবে)। শোন, তোমরা কি ধারণা করছ যে, তোমরা জান্নাতে (বিশেষভাবে) প্রবেশ করবে, অথচ আল্লাহ তা'আলা এখনও (প্রকাশ্যভাবে) তাদের দেখেন নি, যারা তোমাদের মধ্য থেকে (যেহেতুভাবে) জিহাদ করে এবং যারা জিহাদে ধৈর্য ধারণ করে? তোমরা তো মৃত্যুর সাথে সাক্ষাতের পূর্বে (শহীদ হয়ে) মরে যাবার (খুব) বাসনা কর্তে? অনন্তর (বাসনা অনুযায়ী) একে (অর্থাৎ মৃত্যুর কারণসমূহকে) খোলা চোখে দেখে নিয়েছ। (এখন মৃত্যুকে দেখে কেন পলায়ন করতে লাগলে? মৃত্যু কামনা কেন ভুলে গেলে?)

আনুমানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য সূরায় ওহদ যুদ্ধের ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এতে জানা গেছে যে, কতিপয় ক্রটি-বিচ্যুতির কারণে এ যুদ্ধে প্রথম পর্যায়ে জয়লাভ করার পর অবশেষে মুসলমানরা পরাজয় বরণ করে। সত্তরজন সাহাবী শহীদ হন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) আহত হন। কিন্তু এ সবের পর আল্লাহ তা'আলা যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেন এবং শত্রুরা পিছু হটে যায়।

এ সাময়িক বিপর্যয়ের কারণ ছিল তিনটি। এক. রাসূলুল্লাহ (সা) তীরন্দাজ বাহিনীর প্রতি যে নির্দেশ জারি করেছিলেন, পারস্পরিক মতভেদের কারণে তা শেষ পর্যন্ত প্রতিপালিত হয়নি। কেউ বলতো : আমাদের এখানেই অটল থাকা দরকার। অধিকাংশের মত ছিল, এখন এ জায়গায় অবস্থান করার কোন প্রয়োজন নেই। সবার সাথে মিলিত হয়ে শত্রুদের পরিত্যক্ত সামগ্রী আহরণ করা উচিত। দুই. খোদ নবী করীম (সা)-এর নিহত হওয়ার সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে মুসলমানদের মনে নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয়। কলেঙ্গবাই ভীত ও হতোদ্যম হয়ে পড়েন তিন মদীনা শহরে অবস্থান গ্রহণ করে শত্রুদের মোকাবিলা করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আদেশ পালনে যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল, সেটাই ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মুসলমানদের এ তিনটি বিচ্যুতির কারণেই তারা সাময়িক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন। এ সাময়িক পরাজয় অবশেষে বিজয়ের রূপ ধারণ করেছিল সত্য; কিন্তু মুসলিম যোদ্ধারা আঘাতে জর্জরিত ছিলেন। মুসলিম বীরদের মৃতদেহ ছিল চোখের সামনে। রাসূলুল্লাহ (সা)-কেও হতভাগ্যরা আহত করে দিয়েছিল। সর্বত্র ঘোর বিপদ ও নৈরাশ্য ছায়া বিস্তার করেছিল। মুসলিম মুজাহিদগণ স্বীয় ক্রটি-বিচ্যুতির জন্যও বেদনায় মুগ্ধ পড়েছিলেন। সার্বিক পরিস্থিতিতে দুটি বিষয় প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল। এক. অতীত ঘটনার জন্য দুঃখ ও বিবাদ। দুই. এ আশংকা যে, ভবিষ্যতের জন্য মুসলমানগণ যেন দুর্বল ও হতোদ্যম না হয়ে পড়ে এবং বিশ্ব-নেতৃত্বের দায়িত্বশীল এ জাতি অংকুরেই না মনোবল হারিয়ে ফেলে। এ দুটি ছিদ্রপথ বন্ধ করার জন্য কোরআন পাকের এ বাণী অবতীর্ণ হয় :

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

অর্থাৎ ভবিষ্যতের জন্য তোমরা দৌর্বল্য ও শৈথিল্যকে কাঁছে আসতে দিয়ো না। এবং অতীতের জন্যও বিষম ও বিষণ্ণ হয়ো না। যদি তোমরা ইমান ও বিশ্বাসের পথে সোজা হয়ে থাক এবং আল্লাহ তা'আলার ওয়াদার উপর ভরসা রেখে রাসূল (সা)-এর আনুগত্য ও আল্লাহর পথে জিহাদে অনটন থাক, তবে শত্রুশেষে তোমরাই জয়ী হবে।

উদ্দেশ্য এই যে, অতীতে যেসব ক্রটি-বিচ্যুতি হয়ে গেছে, তার জন্য দুঃখ ও শোক প্রকাশে সময় ও শক্তি নষ্ট না করে ভবিষ্যৎ সংশোধনের চিন্তা করা দরকার। ঈমান, বিশ্বাস ও রাসূলের আনুগত্য উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিশারী। এগুলো হাতছাড়া হতে দিয়ো না। পরিশেষে তোমরাই জয়ী হবে।

কোরআন পাকের এ বাণী ভগ্ন হৃদয়কে জুড়ে দিল এবং মৃতপ্রায় দেহে সঞ্জীবনীর কাজ করল। চিন্তা করুন আল্লাহ তা'আলা কিভাবে সাহাবায়ে কিরামের আত্মিক চেতনাকে সঞ্জীবিত করেছেন। তিনি চিরদিনের জন্য তাদের একটি মূলনীতি দিয়ে দিলেন যে, অতীত বিষয়াদি নিয়ে চিন্তা-ভাবনায় সময় নষ্ট না করে ভবিষ্যৎ শক্তি, প্রভাব ও সৃষ্টির উপকরণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। সাথে সাথে এ কথাও বলে দিলেন যে, বিজয় ও প্রাধান্য অর্জনের মূল সহায়ক একটিই। অর্থাৎ ঈমান ও তার দাবিসমূহ পূরণ করা। যুদ্ধের জন্য যেসব প্রস্তুতি নেওয়া হয়, সেগুলোও ঈমানের দাবির অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ সামরিক শক্তির দৃঢ়তা, সামরিক সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ এবং বাহ্যিক উপায়াদি দ্বারা সামর্থ্য অনুযায়ী সুসজ্জিত হওয়া। ওহদ যুদ্ধের ঘটনাবলী এসব বিষয়েরই সাক্ষ্য বহন করে।

এ আয়াতের পর ভিন্ন ভঙ্গিতে মুসলমানদের সাহুনা দিয়ে বলা হয়েছে : এ যুদ্ধে তোমরা আহত ও নিহত হয়েছ ঠিকই, কিন্তু তোমাদের প্রতিপক্ষও তো ইতিপূর্বে এ ধরনের দুর্ঘটনায় পতিত হয়েছে। ওহদে তোমাদের সম্ভরজন শহীদ ও অনেক আহত হয়েছে। এক বছর পূর্বে তাদেরও সম্ভরজন লোক জাহান্নামবাসী ও অনেক আহত হয়েছিল। বরং এ যুদ্ধের প্রথম পর্যায়েও তাদের অনেক সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছিল। তাই কোরআন বলে :

إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ

অর্থাৎ—“তোমাদের গায়ে ক্ষত লেগে থাকলে তাদের গায়েও ইতিপূর্বে এমনি ক্ষত লেগেছে ; আমি এ দিনগুলোকে পালাক্রমে পরিক্রমণ করাই। এতে অনেক রহস্য নিহিত আছে।”

আয়াতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতির প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে। তা এই যে, আল্লাহ তা'আলার চিরাচরিত রীতি হচ্ছে যে, তিনি কঠোরতা, নম্রতা, সুখ-দুঃখ, কষ্ট ও আরামের দিনগুলোকে মানুষের মধ্যে চক্রবৎ ঘুরিয়ে আনেন। যদি কোন কারণে কোন মিথ্যা শক্তি সাময়িকভাবে বিজয় ও সাকল্য অর্জন করে ফেলে, তবে তাতে সত্যপন্থীদের হতোদায় হয়ে পড়া সঙ্গত নয় এবং এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, এখন থেকে পরাজয়ই তাদের ভাগ্যলিপি হয়ে গেছে। বরং এ পরাজয়ের সঠিক কারণ খোঁজ করে তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। পরিণামে সত্যপন্থীরাই জয়যুক্ত হবে।

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ
أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبِهِ فَلَنْ يَضُرَّ

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৩

সূরা আশ্বিয়া ৭৬-৯৩ আয়াত

আয়োজনে



মাউন ফাউন্ডেশন

www.maunfoundation.org

বিরাট অপরাধ হওয়ার দিক দিয়ে এই একটিনাত্র অভ্যাসকেই خبائث বলা হয়ে থাকলে তাও অবান্তর নয়। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন : এ চাড়া অন্যান্য নোংরা অভ্যাসও যে তাদের মধ্যে ছিল, তাও রেওয়ায়েতসমূহে উল্লিখিত আছে। রুহুল মা'আনীর বরাত দিয়ে তফসীরের সার-সংক্ষেপে সেগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে। এ দিক দিয়ে সমষ্টিকে خبائث বলা বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। وَاللَّهُ أَعْلَمُ

وَنُوحًا إِذْ نَا دَىٰ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ٩٦ وَنَصْرُنَا مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمٌ سَوِءٌ فَأَعْرِضْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ٩٧

(৭৬) এবং স্বরণ করুন নূহকে ; যখন তিনি এর পূর্বে আহ্বান করেছিলেন, তখন আমি তাঁর দোয়া কবুল করেছিলাম, অতঃপর তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে মহাসংকট থেকে উদ্ধার করেছিলাম। (৭৭) এবং আমি তাকে ঐ সম্প্রদায়ের বিপক্ষে সাহায্য করেছিলাম, যারা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করেছিল। নিশ্চয়, তারা ছিল এক মন্দ সম্প্রদায়। অতঃপর আমি তাদের সবাইকে নিমজ্জিত করেছিলাম।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং নূহ (আ)-এর (কাহিনী) আলোচনা করুন, যখন এর (অর্থাৎ ইবরাহিমী আমলের) পূর্বে তিনি (আল্লাহর কাছে) দোয়া করেছিলেন (যে, কাকিরদের কাছ থেকে আমার প্রতিশোধ গ্রহণ করুন।) তখন আমি তাঁর দোয়া কবুল করেছিলাম, অতঃপর তাঁকে ও তাঁর অনুসারীদেরকে মহাসংকট থেকে উদ্ধার করেছিলাম। (এই সংকট কাকিরদের মিথ্যারোপ ও নানারূপ নির্যাতনের ফলে দেখা দিয়েছিল। উদ্ধার এভাবে করেছিলাম যে) আমি ঐ সম্প্রদায়ের কাছ থেকে তাঁর প্রতিশোধ নিয়েছিলাম, যারা আমার বিধানসমূহকে (যেগুলো নূহ আনয়ন করেছিলেন) মিথ্যা বলত নিশ্চয় তারা ছিল খুব মন্দ সম্প্রদায়। তাই আমি তাদের সবাইকে নিমজ্জিত করেছিলাম।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ — এর অর্থ ইবরাহিম ও লূত (আ)-এর পূর্বে হওয়া। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তাঁদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে নূহ (আ)-এর যে আহ্বানের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে, তার বিস্তারিত বর্ণনা সূরা নূহে আছে। তা এই যে, তিনি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বদদোয়া করে বলেছিলেন : رَبِّ لَا تَنْزِلْ عَلَيَّ الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ بَيِّنَاتًا অর্থাৎ হে পরওয়ারদিগার, পৃথিবীর বুকে কোন কাকির অধিবাসীকে থাকতে দিয়ো না। অন্যত্র আছে, নূহ (আ)-এর সম্প্রদায় যখন কোনরূপেই তাঁর উপদেশ মানল

না, তখন তিনি আল্লাহর দরবারে আরয় করলেন اِنِّى مَظْلُوْمٌ فَاتَّصِرْ অর্থাৎ আমি অপারক ও অক্ষম হয়ে গেছি। আপনিই তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করুন।

كرب عظم (মহা সংকট) বলে হয় সমগ্র জাতির বন্যায় নিমজ্জিত হওয়া বোঝানো হয়েছে, না হয় ঐ জাতির নির্যাতন বোঝানো হয়েছে, যা তারা বন্যার পূর্বে নূহ (আ) ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি চালাত।

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمْنَ فِي الْحَرْثِ اِذْ نَفَسَتْ فِيْهِ غَمَمٌ
الْقَوْمِ ۚ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شٰهِدِيْنَ ﴿٩٦﴾ فَفَقَّهْمُنٰهَا سُلَيْمٰنَ ۚ وَكُنَّا
اَتَيْنٰهُمُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ
وَكُنَّا فٰعِلِيْنَ ﴿٩٧﴾ وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِيُحْصَنَكُمْ
مِّنْ بَّاسِكُمْ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ شٰكِرُوْنَ ﴿٩٨﴾ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيْحَ
عَاصِفَةً تَجْرِيْ بِاَمْرِىْ اِلَى الْاَرْضِ الَّتِىْ بَرَكْنَا فِيْهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيْمِيْنَ ﴿٩٩﴾ وَمِنَ الشَّيْطٰنِ مَن يَّغْوِصُوْنَ لَهُ وَيَعْمَلُوْنَ
عَمَلًا دُوْنَ ذٰلِكَ ۚ وَكُنَّا لَهُمْ حٰفِظِيْنَ ﴿١٠٠﴾

(৭৮) এবং স্মরণ করুন দাউদ ও সুলায়মানকে, যখন তাঁরা শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে বিচার করছিলেন। তাতে রাত্রিকালে কিছু লোকের মেঘ ঢুকে পড়েছিল। তাদের বিচার আমার সম্মুখে ছিল। (৭৯) অতঃপর আমি সুলায়মানকে সেই ক্ষয়সালা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং আমি উভয়কে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দিয়েছিলাম। আমি পর্বত ও পক্ষীসমূহকে দাউদের অনুগত করে দিয়েছিলাম; তাঁরা আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করত। এই সমস্ত আমিই করেছিলাম। (৮০) আমি তাঁকে তোমাদের জন্য বর্ণ নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে তা যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করে। অতএব তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে? (৮১) এবং সুলায়মানের অধীন করে দিয়েছিলাম প্রবল বায়ুকে; তা তাঁর আদেশে প্রবাহিত হতো ঐ দেশের দিকে, যেখানে আমি কল্যাণ দান করেছি। আমি সব বিষয়েই সম্যক অবগত আছি। (৮২) এবং অধীন করেছি শয়তানদের কতককে, যারা তাঁর জন্য ডুবুরির কাজ করত এবং এ ছাড়া অন্য আরও অনেক কাজ করত। আমি তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখতাম।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং দাউদ ও সুলায়মান (আ)-কে স্মরণ করুন, যখন উভয়েই কোন শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে (যাতে শস্য কিংবা আছুর বৃক্ষ ছিল) বিচার করছিলেন। তাতে (ক্ষেত্রে) কিছু লোকের মেঘপাল রাত্রিকালে ঢুকে পড়েছিল (এবং ফসল খেয়ে ফেলেছিল)। এই ফয়সালা যা (মোকদ্দমা পেশকারী) লোকদের সম্পর্কে হয়েছিল, আমার সম্মুখে ছিল। অতঃপর সেই ফয়সালা (অর্থাৎ ফয়সালার সহজ পদ্ধতি) সুলায়মানকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং (এমনিতেই) আমি উভয়কে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করেছিলাম। [অর্থাৎ দাউদের ফয়সালাও শরীরতবিরোধী ছিল না। মোকদ্দমাটি ছিল এরূপঃ শস্যের যতটুকু ক্ষতি হয়েছিল, তারা মূল্য মেঘপালের মূল্যের সমান ছিল। দাউদ (আ) জরিমানায় ক্ষেতের মালিককে মেঘপাল দিয়েছিলেন। আইনের বিচার তাই ছিল। তাই সুলায়মান (আ) আপোসরফা হিসেবে উভয় পক্ষের রেয়াত করে প্রস্তাব দিলেন যে, কিছু দিনের জন্য মেঘপাল ক্ষেতের মালিকদেরকে দেওয়া হোক। তারা এদের দুধ ইত্যাদি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করবে এবং মেঘপালের মালিকদের শস্যক্ষেত্র দেওয়া হোক। তারা পানি সেচ ইত্যাদি দ্বারা ক্ষেতের যত্ন নেবে। যখন ক্ষেতের ফসল পূর্ববর্তী অবস্থায় পৌঁছে যাবে, তখন ক্ষেত ও মেঘপাল তাদের মালিকদের হাতে প্রত্যর্পণ করা হোক। এই আপোসরফা কার্যকর হওয়ার জন্য উভয় পক্ষের সম্মতি শর্ত। (দূররে মানসুর) এ থেকে জানা গেল যে, উভয় ফয়সালার মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই যে, একটি শুদ্ধ হলে অপরটি অশুদ্ধ হবে। তাই كُنَّا نُنَازِعُكَ وَنُعْطُكَ (যোণ করা হয়েছে) এবং এ পর্যন্ত দাউদ ও সুলায়মান (আ) উভয়ের ব্যাপক ও অভিন্ন মাহাত্ম্যের কথা বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর তাদের বিশেষ বিশেষ মর্যাদা ও অলৌকিকতার বর্ণনা হচ্ছে : আমি পর্বতসমূহকে দাউদের সাথে অধীন করে দিয়েছিলাম, (তাঁর তসবীহ পাঠের সাথে) তারা (ও) তসবীহ পাঠ করত এবং (এমনিভাবে) পক্ষীসমূহকেও ; (যেমন সূরা সাবায় রয়েছে يٰجِبَالُ اَوْبِيْ مَعَا وَالطَّيْرُ مَعَا) কেউ যেন এতে আশ্চর্যবোধ না করে। কেননা, এসব কাজের) আমিই ছিলাম কর্তা। (আমার মহান শক্তি-সামর্থ্য বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। এমতাবস্থায় এসব সুজিয়ায় আশ্চর্যের কি আছে ? আমি তাকে তোমাদের (উপকারের) জন্য বর্মনির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে তা (অর্থাৎ বর্ম) তোমাদেরকে (যুদ্ধে) একে অপরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। (এই বিরাট উপকারের দাবি এই যে, তোমরা কৃতজ্ঞ হও।) অতএব (এই নিয়ামতের) শোকর করবে (না) কি ? আমি সুলায়মানের অধীন করে দিয়েছিলাম প্রবল বায়ুকে, তা তাঁর আদেশে সেই দেশের দিকে প্রবাহিত হতো, যাতে আমি কল্যাণ রেখেছিলাম। [অর্থাৎ সিরিয়া দেশ। এটা তাঁর বাসস্থান ছিল। অর্থাৎ তাঁর সিরিয়া থেকে কোথাও যাওয়া এবং ফিরে আসা উভয়ই বায়ুর মাধ্যমে হতো। দূররে মনসুরে বর্ণিত রয়েছে যে, সুলায়মান (আ) পার্শ্বদবর্গসহ নিজ নিজ আসনে উপবেশন করতেন। এরপর বায়ুকে ডেকে আদেশ করতেন। বায়ু সবাইকে উঠিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যে এক এক মাসের দূরত্বে পৌঁছিয়ে দিত।] আমি সব বিষয়েই সম্যক অবগত আছি।

(সুলায়মানকে এসব বিষয়দানের রহস্য আমার জানা ছিল। তাই দান করেছিলাম।) শয়তানদের মধ্যে (অর্থাৎ জিনদের মধ্যে) কতক সুলায়মান (আ)-এর জন্য (সমুদ্রে) ডুবুরির কাজ করত (যাতে মোতি বের করে তাঁর কাছে আনে) এবং এ ছাড়া তারা অন্য আরও অনেক কাজ (সুলায়মানের জন্য) করত। (জিনরা খুবই অবাধ্য ও দুষ্ট ছিল; কিন্তু) আমিই তাদেরকে সামাল দিতাম (ফলে তারা টু শব্দটি পর্যন্ত করতে পারত না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

نَفَسَتْ فِيهِ غَمُّ الْقَوْمِ — অভিধানে نفس শব্দের অর্থ রাত্রিকালে শস্যক্ষেত্রে জন্তু ঢুকে পড়ে ক্ষতিসাধন করা।

فَفَهَّمْنَاهَا — فَفَهَّمْنَاهَا শব্দের সর্বনাম দ্বারা বাহ্যত মোকদ্দমা ও তার ফয়সালা বোঝা যায়। অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে যে ফয়সালা পছন্দনীয় ছিল, তিনি তা সুলায়মানকে বুঝিয়ে দিলেন। মোকদ্দমা ও ফয়সালার বিবরণ তফসীরের সার-সংক্ষেপ বর্ণিত হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, দাউদ (আ)-এর ফয়সালাও শরীয়তের আইনের দৃষ্টিতে ভ্রান্ত ছিল না; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সুলায়মান (আ)-কে যে ফয়সালা বুঝিয়ে দেন, তাতে উভয় পক্ষের রেয়াত ও উপকারিতা ছিল। তাই আল্লাহর কাছে তা পছন্দনীয় সাব্যস্ত হয়েছে। ইমাম বগভী হযরত ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ ও যুহরী থেকে এভাবে ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন : দুই ব্যক্তি হযরত দাউদ (আ)-এর কাছে উপস্থিত হয়। তাদের একজন ছিল ছাগপালের মালিক ও অপরজন শস্যক্ষেত্রের মালিক। শস্যক্ষেত্রের মালিক ছাগপালের মালিকের বিরুদ্ধে দাবি করল যে, তার ছাগপাল রাত্রিকালে আমার শস্যক্ষেত্রে চড়াও হয়ে সম্পূর্ণ ফসল বিনষ্ট করে দিয়েছে; কিছুই অবশিষ্ট রাখেনি। (সম্ভবত বিবাদী স্বীকার করে নিয়েছিল এবং ছাগপালের মূল্য ক্ষতিগ্রস্ত ফসলের মূল্যের সমান ছিল। তাই) হযরত দাউদ (আ) রায় দিলেন যে, ছাগপালের মালিক তার সমস্ত ছাগল শস্যক্ষেত্রের মালিককে অর্পণ করুক। (কেননা, ফিকাহর পরিভাষায় 'যাওয়াতুল কিয়াম' অর্থাৎ যেসব বস্তু মূল্যের মাধ্যমে আদান-প্রদান করা হয়, সেগুলো কেউ বিনষ্ট করলে তার জরিমানা মূল্যের হিসাবেই দেওয়া হয়। ছাগপালের মূল্য বিনষ্ট ফসলের মূল্যের সমান বিধায় বিধি মোতাবেক এই রায় দেওয়া হয়েছে।) বাদী ও বিবাদী উভয়ই হযরত দাউদের আদালত থেকে বের হয়ে আসলে (দরজায় তাঁর পুত্র) সুলায়মান (আ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি মোকদ্দমার রায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা তা শুনিয়ে দিল। হযরত সুলায়মান (আ) বললেন : আমি রায় দিলে তা ভিন্নরূপ হতো এবং উভয় পক্ষের জন্য উপকারী হতো। অতঃপর তিনি পিতা দাউদের কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে একথা জানালেন। হযরত দাউদ (আ) বললেন : এই রায় থেকে উত্তম এবং উভয়ের জন্য উপকারী রায়টা কি? সুলায়মান (আ) বললেন : আপনি ছাগপাল শস্যক্ষেত্রের মালিককে দিয়ে দিন। সে এগুলোর দুধ, পশম ইত্যাদি দ্বারা উপকার লাভ করুক এবং ক্ষেত্রে ছাগপালের মালিককে অর্পণ করুক। সে তাতে চাষাবাদ করে শস্য উৎপন্ন করবে। যখন শস্যক্ষেত্র ছাগপালের বিনষ্ট করার পূর্বের অবস্থায় পৌঁছে যায়, তখন শস্যক্ষেত্রের মালিককে এবং ছাগপাল ছাগলের মালিককে প্রত্যর্পণ করুক। হযরত দাউদ

(আ) এই রায় পছন্দ করে বললেন : বেশ এখন এই রায়ই কার্যকর হবে। অতঃপর তিনি উভয় পক্ষকে ডেকে দ্বিতীয় রায় কার্যকর করলেন।

রায় দানের পর কোন বিচারকের রায় ভঙ্গ ও পরিবর্তন করা যায় কি ? এখানে প্রশ্ন হয়, দাউদ (আ) যখন এক রায় দিয়েছিলেন, তখন সুলায়মান (আ)-এর কি তা ভঙ্গ করার অধিকার ছিল ? যদি হয়ত দাউদ (আ) নিজেই তাঁর রায় শুনে নিজের সাবেক রায় ভঙ্গ করে দ্বিতীয় রায় জারি করে থাকেন, তবে কোন বিচারকের এরূপ করার অধিকার আছে কিনা ? —অর্থাৎ রায় দেওয়ার পর নিজেই তা ভঙ্গ করা ও পরিবর্তন করা।

কুরতুবী এখানে এ ধরনের বিষয়াদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আলোচনার সারমর্ম এই যে, যদি কোন বিচারক শরীয়তের প্রমাণাদি ও সাধারণ মুসলিম আইনবিদদের মতামতের বিপক্ষে কোন রায় শুধু অনুমানের ভিত্তিতে দান করে, তবে সেই রায় সর্বসম্মতিক্রমে প্রত্যাখ্যাত ও বাতিল গণ্য হবে। অন্য বিচারকের পক্ষে এই রায়ের বিপরীত রায় দেওয়া শুধু জায়েযই নয় ; বরং ওয়াজিব এবং এই বিচারককে পদচ্যুত করা ওয়াজিব। কিন্তু যদি কোন বিচারকের রায় শরীয়তসম্মত ইজতিহাদের উপর ভিত্তিশীল এবং ইজতিহাদের মূলনীতির অধীন হয়, তবে অন্য বিচারকের পক্ষে এই রায় ভঙ্গ করা জায়েয নয়। কেননা, এই রীতি প্রবর্তিত হলে মহা অনর্থ দেখা দেবে, ইসলামী আইন ক্রীড়নকে পরিণত হবে এবং রোজই হালাল ও হারাম পরিবর্তিত হবে। তবে যদি রায়দানকারী বিচারক স্বয়ং ইজতিহাদের মূলনীতি অনুযায়ী রায়দান করার পর ইজতিহাদের দৃষ্টিকোণে দেখে যে, প্রথম রায় ও প্রথম ইজতিহাদে ভুল হয়ে গেছে, তবে তা পরিবর্তন করা জায়েয বরং উত্তম। হয়ত উমর ফারুক (রা) আবু মুসা আশআরীর নামে বিচার ও রায়দানের মূলনীতি সম্মিলিত একটি বিস্তারিত চিঠি লিখেছিলেন। তাতে পরিষ্কার উল্লেখ আছে যে, রায় দেয়ার পর ইজতিহাদ পরিবর্তিত হয়ে গেলে প্রথম রায় পরিবর্তন করা উচিত। এই চিঠি দারাকুতনী সনদসহ বর্ণনা করেছেন।—কুরতুবী সংক্ষেপিত) শামসুল আযিয়া সুরখসী মবসূতেও এই চিঠি বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন।

তফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন : হয়ত দাউদ (আ) ও হয়ত সুলায়মান (আ) উভয়ের রায় স্ব স্ব স্থানে বিদ্যমান। এর স্বরূপ এই যে, দাউদ (আ) (আ)-এর রায় ছিল বিধি মোতাবেক এবং সুলায়মান (আ) (আ) যা বলেছিলেন, তা প্রকৃতপক্ষে মোকদ্দমার রায় ছিল না ; বরং উভয় পক্ষের মধ্যে আপস করার একটি পন্থা। কোরআনে **وَالْمُلْحُ خَيْرٌ** (অর্থাৎ আপস করা উত্তম) বলা হয়েছে। তাই দ্বিতীয় পন্থাই আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় হয়েছে। —(মায়হারী)

হয়ত উমর ফারুক (রা) বিচারকদেরকে এই নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যে, যখন দুই পক্ষ মোকদ্দমা নিয়ে উপস্থিত হয়, তখন প্রথমে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে আপস-রফার চেষ্টা করতে হবে। যদি তা অসম্ভব হয়ে পড়ে, তবে শরীয়তের রায় জারি করতে হবে। তিনি এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন : বিচারকসুলভ আইনগত ফয়সালা যে ব্যক্তির বিপক্ষে যায়, সে সাময়িকভাবে দমে গেলেও উভয় পক্ষের মধ্যে প্রতিহিংসা ও শত্রুতার বীজ প্রতিষ্ঠা লাভ করে, যা দুই মুসলমানের মধ্যে না থাকা উচিত। পক্ষান্তরে আপস-রফার ফলে অন্তরগত ঘৃণা-বিদ্বেষও দূর হয়ে যায়। (—মুঈনুল হকাম)

মুজাহিদের এই উক্তি অনুযায়ী দাউদ (আ) (আ)-এর ব্যাপারটিতে রায় ভঙ্গ করা ও পরিবর্তন করা হয়নি ; বরং উভয় পক্ষকে রায় শোনানোর পর তাদের উপস্থিতিতেই আপোস-রফার একটি পন্থা উদ্ভাবিত হয়ে গেছে এবং উভয় পক্ষ তাতে সম্মত হয়ে গেছে।

দুই মুজতাহিত যদি দুইটি পরস্পর বিরোধী রায় দান করেন, তবে প্রত্যেকটি শুদ্ধ হবে, না কোন একটিকে ভ্রান্ত বলা হবে : এ স্থলে কুরতুবী বিস্তারিতভাবে এবং অন্যান্য তফসীরবিদ বিস্তারিত অথবা সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন যে, প্রত্যেক মুজতাহিদ সর্বদা সত্য রায়ই দান করে এবং দুইটি পরস্পরবিরোধী ইজতিহাদ হলে উভয়টিকে সত্য মনে করা হবে, না একটিকে ভ্রান্ত ও অশুদ্ধ সাবিত করা হবে ? এ ব্যাপারে প্রাচীনকাল থেকেই আলিমগণের উক্তি বিভিন্ন রূপ। আলোচ্য আয়াত থেকে উভয় দলই প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। যারা বলে, পরস্পরবিরোধী হলেও উভয় ইজতিহাদ সত্য, তাদের প্রমাণ আয়াতের শেষ বাক্য। এতে বলা হয়েছে : **وَكُلًّا تَبْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا** এতে হযরত দাউদ (আ) ও হযরত সুলায়মান (আ) উভয়কে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করার কথা বলা হয়েছে। হযরত দাউদ (আ) (আ)-এর প্রতি কোনরূপ অসম্মতি প্রকাশ করা হয়নি এবং একথাও বলা হয়নি যে, তিনি ভুল করেছেন। এতে জানা গেল যে, দাউদ (আ) (আ)-এর রায় সত্য ছিল এবং সুলায়মান (আ) (আ)-এর রায়ও। তবে সুলায়মান (আ) (আ)-এর রায়কে উভয় পক্ষের জন্যে অধিক উপযোগী হওয়ার কারণে অগ্রাধিকার দান করা হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা বলে, ইজতিহাদী মতভেদের স্থলে এক পক্ষ সত্য ও অপর পক্ষ ভ্রান্ত হয় তাদের প্রমাণ আয়াতের প্রথম বাক্য ; অর্থাৎ **فَفُتِحَتْ مَقَاسِي سُبْحَانَ** এতে বিশেষ করে হযরত সুলায়মান (আ) (আ) সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আমি তাকে সত্য রায় বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। এতে প্রমাণিত হয় যে, দাউদ (আ) (আ)-এর রায় সঠিক ছিল না। তবে তিনি ইজতিহাদের কারণে এ ব্যাপারে ক্ষমার ছিলেন এবং তাকে এ কারণে ধরপাকড় করা হয়নি। উসুলে ফিকাহর কিতাবাদিতে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে দেখে নেয়া যেতে পারে। এখানে শুধু এতটুকু বুঝে নেয়াই যথেষ্ট যে, হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যে ব্যক্তি ইজতিহাদের মাধ্যমে কোন ধর্মীয় নির্দেশ বর্ণনা করে, তার ইজতিহাদ বিশুদ্ধ হলে সে দুই সওয়াব পাবে—একটি ইজতিহাদ করার এবং অপরটি বিশুদ্ধ নির্দেশ পর্যন্ত পৌছার। পক্ষান্তরে যদি ইজতিহাদ নির্ভুল না হয় এবং সে ভুল করে বসে, তবে সে ইজতিহাদের শ্রম স্বীকার করার কারণে এক সওয়াব পাবে। নির্ভুল নির্দেশ পর্যন্ত পৌছার দ্বিতীয় সওয়াব সে পাবে না (অধিকাংশ প্রামাণ্য হাদীসগ্রন্থে এই হাদীসটি বর্ণিত রয়েছে)। এই হাদীস থেকে আলিমগণের উপরোক্ত মতভেদের স্বরূপও স্পষ্ট হয় যে, প্রকৃতপক্ষে এটা একটা শাদিক মতবিরোধের মতই। কেননা, উভয় পক্ষ সত্যপন্থী হওয়ার সারমর্ম এই যে, ভুলকারী মুজতাহিদ ও তার অনুসারীদের জন্যেও ইজতিহাদটি সত্য ও বিশুদ্ধ। এই ইজতিহাদ অনুযায়ী আমল করলে তারা মুক্তি পাবে, যদিও ইজতিহাদটি সত্যের দিক দিয়ে ভুলও হয়। এই ইজতিহাদ অনুযায়ী যারা আমল করবে, তাদের গুনাহ নেই। যারা বলেছেন যে, দুই ইজতিহাদের মধ্যে একটিই সত্য এবং অপরটি ভ্রান্ত, তাদের এ উক্তির সারমর্মও এর বেশি নয় যে, আল্লাহ তা'আলার আসল উদ্দেশ্য পর্যন্ত না পৌছার কারণে ভুলকারী মুজতাহিদ কম সওয়াব পাবে। ভুলকারী মুজতাহিদকে ভ্রমসনা

করা হবে অথবা তার অনুসারীরা গুনাহ্‌গার হবে-এরূপ উদ্দেশ্য এই মতাবলম্বীদেরও নেই। তফসীরে কুরতুবীতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বিজ্ঞ পাঠকবর্গ সেখানে দেখে নিতে পারেন।

কারও জন্তু অন্যের জ্ঞান অথবা মালের ক্ষতি সাধন করলে কি ফয়সালা হওয়া উচিত : হযরত দাউদ (আ) (আ)-এর ফয়সালা থেকে জানা যায় যে, জন্তুর মালিক ক্ষতিপূরণ দেবে ; যদি ঘটনা রাত্রিকালে হয়। কিন্তু এটা জরুরী নয় যে, দাউদ (আ) (আ)-এর শরীয়তের ফয়সালা আমাদের শরীয়তেও বহাল থাকবে। এ কারণেই এ বিষয়ে মুজতাহিদ ইমামগণ মতভেদ পোষণ করেন। ইমাম শাফেঈর মাযহাব এই যে, যদি রাত্রিকালে কারও জন্তু অপরের ক্ষেতে চড়াও হয়ে ক্ষতি সাধন করে, তবে জন্তুর মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। দিনের বেলায় এরূপ হলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। তাঁর প্রমাণ হযরত দাউদের ফয়সালাও হতে পারে। কিন্তু তিনি ইসলামী মূলনীতি অনুযায়ী একটি হাদীস থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। মুয়াত্তা ইমাম মালিক এ বর্ণিত আছে যে, বারা ইবনে আযেবের উম্মী এক ব্যক্তির বাগানে ঢুকে পড়ে বাগানের ক্ষতিসাধন করে। রাসুলুল্লাহ (সা) ফয়সালা দিলেন যে, রাত্রিবেলায় বাগান ও ক্ষেত্রে হিফাযত করা মালিকদের দায়িত্ব। হিফাযত সম্বন্ধে যদি রাত্রিবেলায় কারও জন্তু ক্ষতিসাধন করে, তবে জন্তুর মালিক ক্ষতিপূরণ দেবে। ইমাম আযম আবু হানীফা ও কুফার ফিকাহবিদগণ বলেন যে, যে সময় জন্তুর সাথে রাখাল অথবা হিফাযতকারী থাকে এবং তার গাফিলতির কারণে জন্তু কারও ক্ষেতের ক্ষতিসাধন করে, তখন জন্তুর মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, ব্যাপারটি রাতে হোক কিংবা দিনে। পক্ষান্তরে যদি জন্তুর সাথে মালিক অথবা হিফাযতকারী না থাকে, জন্তু স্বপ্ররোচিত হয়ে কারও ক্ষেতের ক্ষতিসাধন করে, তবে মালিক ক্ষতিপূরণ দেবে না, ব্যাপারটি দিনে হোক কিংবা রাতে। ইমাম আযমের প্রমাণ সে হাদীস, যা বুখারী, মুসলিম ও অন্য হাদীসবিদগণ বর্ণনা করেছেন যে, جرح لمجاء جبار, অর্থাৎ জন্তু কারও ক্ষতি করলে তা ধরপাকড়যোগ্য নয়। অর্থাৎ জন্তুর মালিক ক্ষতিপূরণ দেবে না (অন্যান্য প্রমাণদুটো এর জন্য মালিক অথবা রাখাল জন্তুর সঙ্গে না থাকা শর্ত)। এই হাদীসে দিবারাত্রির পার্থক্য ছাড়াই এই আইন বিধৃত হয়েছে যে, যদি জন্তুর মালিক ইচ্ছাকৃতভাবে কারও ক্ষেতে জন্তু ছেড়ে না দেয়, জন্তু নিজেই চলে যায়, তবে মালিককে ক্ষতিপূরণ বহণ করতে হবে না। বারা ইবনে আযেবের ঘটনা সে রেওয়াজেতে বর্ণিত হয়েছে, হানাফী ফিকাহবিদগণ তার সনদের সমালোচনা করে বলেছেন যে, বুখারী ও মুসলিমের উল্লিখিত হাদীসের মোকাবেলায় তা প্রমাণ হতে পারে না।

পর্বত ও পক্ষীকুলের তসবীহ : وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ হযরত দাউদ (আ) (আ)-কে আদ্বাহ তা'আলা বাহ্যিক গুণাবলীর মধ্যে সুমধুর কণ্ঠস্বরও দান করেছিলেন। তিনি যখন মন্দির পাঠ করতেন, তখন বিহঙ্গকুল শূন্যে থেকে যেত এবং তাঁর সাথে তসবীহ পাঠ করতে থাকত। এমনিভাবে পর্বত ও বৃক্ষ থেকেও তসবীহর আওয়াজ শোনা যেত। সুমধুর কণ্ঠস্বর ছিল একটি বাহ্যিক গুণ এবং পক্ষীকুল ও পর্বতসমূহের তসবীহ পাঠে শরীক হওয়া ছিল আদ্বাহর কুদরতের অধীন একটি মু'জিবা। মু'জিয়ার জন্যে পক্ষীকুল ও পর্বতসমূহের মধ্যে জীবন ও চেতনা থাকা জরুরী নয়। বরং প্রত্যেক

অচেতন বস্তুর মধ্যে মু'জিয়া হিসেবে চেতনা সৃষ্টি হতে পারে। এ ছাড়া প্রামাণ্য সত্য এই যে, পাহাড় ও পাথরসমূহের মধ্যেও তাদের উপযোগী জীবন ও চেতনা বিদ্যমান আছে। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে হযরত আবু মুসা আশআরী অত্যন্ত সুমধুর কণ্ঠস্বরের অধিকারী ছিলেন। একদিন তিনি যখন কোরআন তিলাওয়াতে রত ছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) সেখান দিয়ে গমন করেন। তিনি তাঁর তিলাওয়াত শোনার জন্য থেমে পড়েন এবং নিবিষ্ট মনে শুনতে থাকেন। এরপর তিনি বলেন : আল্লাহ তা'আলা তাঁকে হযরত দাউদ (আ)-এর সুমধুর কণ্ঠস্বরই দান করেছেন। আবু মুসা যখন জানতে পারলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর তিলাওয়াত শুনেছেন তখন আরম্ভ করলেন : আপনি শুনেছেন—একথা আমার জানা থাকলে আমি আরও সুন্দরভাবে তিলাওয়াত করার চেষ্টা করতাম। (ইবনে কাসীর)

এ থেকে জানা গেল যে, কোরআন তিলাওয়াতে সুন্দর স্বর ও চিত্তাকর্ষক উচ্চারণ এক পর্যায়ে কাম্য ও পছন্দনীয়। তবে আজকালকার কারীদের ন্যায় এতো বাড়াবাড়ি না হওয়া চাই। তাঁরা শ্রোতাদেরকে মুগ্ধ করার জন্যে শুধু আওয়াজ সুন্দর করারই চেষ্টা করে থাকেন। ফলে তিলাওয়াতের আসল উদ্দেশ্যই গায়েব হয়ে যায়।

বর্ম নির্মাণ পদ্ধতি দাউদ (আ)-কে আল্লাহর পক্ষ থেকে দান করা হয়েছিল : وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُؤْسٍ أَنْكُمُ—অল্প জাতীয় সামগ্রীর মধ্যে যেগুলো পরিধান করে অথবা গলায় লাগিয়ে ব্যবহার করা হয়, অভিধানের দিক দিয়ে তাকেই لَبُؤْس বলা হয়। এখানে লৌহবর্ম বোঝানো হয়েছে, যা যুদ্ধে হিফাযতের জন্য ব্যবহৃত হয়। অন্য এক আয়াতে আছে وَاللَّيْلِ وَالنَّجْمِ، অর্থাৎ আমি দাউদের জন্য লোহা নরম করে দিয়েছিলাম। এই নরম করার বিবিধ অর্থ হতে পারে। এক. তাঁর হাতের স্পর্শে লোহা আপনা-আপনি নরম হয়ে যেত, তিনি মোমের ন্যায় তাকে যেভাবে ইচ্ছা মোটা সুরু করতে পারতেন। দুই. আগুনে লাগিয়ে নরম করার কৌশল তাঁকে বলে দেয়া হয়েছিল, যা আজকাল লৌহ কারখানাসমূহে অনুসৃত হয়।

যে শিল্প দ্বারা সাধারণ লোকের উপকার হয়, তা কাম্য ও পরগণস্বরগণের কাজ : আলোচ্য আয়াতে বর্ম নির্মাণ শিল্প দাউদ (আ)-কে শিখানোর কথা উল্লেখ করার সাথে সাথে এর রহস্যও বলে দেওয়া হয়েছে যে, لَنْفَعَنَّكُمْ مِنْ تَلَوَاتِكُمْ، অর্থাৎ যাতে এই বর্ম তোমাদেরকে যুদ্ধে সুতীক্ষ্ণ তরবারির বিপদ থেকে হিফাযত করে। এই প্রয়োজন থেকে দীনদার হোক কিংবা দুনিয়াদার, কেউই মুক্ত নয়। তাই এই শিল্প শিক্ষা দেয়াকে আল্লাহ তা'আলা নিয়ামত আখ্যা দিয়েছেন। এ থেকে জানা গেল যে, যে শিল্পের মাধ্যমে মানুষের প্রয়োজন সম্পূর্ণ হয়, তা শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেয়া সওয়াবের কাজ, তবে জনসেবার নিয়ত থাকা এবং শুধু উপার্জন লক্ষ্য না হওয়া শর্ত। পরগণস্বরগণ বিভিন্ন প্রকার শিল্প কর্ম নিজেরা সম্পন্ন করেছেন বলে বর্ণিত আছে ; যেমন দাউদ (আ) থেকে শস্য বপন ও কর্তনের কাজ বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : যে শিল্পী জনসেবার নিয়তে শিল্পকর্ম করে, তার দৃষ্টান্ত মুসা জননীর মত। তিনি নিজের সন্তানকেই দুধ পান করিয়েছেন এবং লাভের মধ্যে ফিরাউনের পক্ষ থেকে পারিশ্রমিক পেয়েছেন। এমনিভাবে যে জনসেবার নিয়তে শিল্প কর্ম করে, সে জনসেবার সওয়াব তো পাবেই ; তদুপরি শিল্পকর্মের পার্থিব

উপকারও সে লাভ করবে। সূরা তোয়া-হায় মুসা (আ)-এর কাহিনীতে এই হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে।

সুলায়মান (আ)-এর জন্য বায়ুকে বশীভূত করা এবং এতদসংক্রান্ত মাসআলা : হযরত হাসান বসরী (র) থেকে বর্ণিত আছে, সামরিক ঘোড়া পরিদর্শনে লিগু হয়ে যখন সুলায়মান (আ) (আ)-এর আসরের নামায ফওত হয়ে যায়, তখন এই উদাসীনতার জন্য অনুতপ্ত হয়ে তিনি গাফিলতির মূল কারণ ঘোড়াসমূহকে অকর্মণ্য করে ছেড়ে দেন। আল্লাহ তা'আলার সজ্জাটি অর্জনের লক্ষ্যে তিনি এ কাজ করেছিলেন। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ঘোড়ার চাইতে উত্তম ও দ্রুতগামী সওয়ারী বায়ু দান করলেন। এই ঘটনার বিবরণ ও সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহের তফসীর সূরা সোয়াদে বর্ণিত হবে।

وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ وَاسْلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً এই বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্য -এর সাথে সংযুক্ত। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যেমন দাউদ (আ)-এর জন্য পর্বত ও পক্ষীকুলকে বশীভূত করে দিয়েছিলেন, যারা তাঁর আওয়াযের সাথে তসবীহ পাঠ করত, তেমনি সুলায়মান (আ) (আ)-এর জন্য বায়ুকে বশীভূত করে দিয়েছিলেন। বায়ুর কাঁধে সওয়ার হয়ে তিনি যথা ইচ্ছা দ্রুত ও সহজে পৌছে যেতেন। এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, দাউদ (আ)-এর বশীকরণের মধ্যে مع (সাথে) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যে, তাঁর সাথে পর্বত ও পক্ষীকুলকে বশীভূত করে দিয়েছিলাম এবং এখানে ج (জনা) অক্ষর ব্যবহার করে বলা হয়েছে যে, বায়ুকে সুলায়মানের জন্য বশীভূত করে দিয়েছিলাম। এতে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত আছে যে, উভয় বশীকরণের মধ্যে পার্থক্য আছে। দাউদ (আ) যখন তিলাওয়াত করতেন, তখন পর্বত ও পক্ষীকুল আপনা-আপনি তসবীহ পাঠ শুরু করত, তাঁর আদেশের জন্য অপেক্ষা করত না। পক্ষান্তরে সুলায়মান (আ) (আ)-এর জন্য বায়ুকে তাঁর আদেশের অধীন করে দেয়া হয়েছিল। তিনি যখন ইচ্ছা, যেদিকে ইচ্ছা বায়ুকে আদেশ করতেন, বায়ু তাঁকে সেখানে পৌছিয়ে দিত ; যেখানে নামতে চাইতেন, সেখানে নামিয়ে দিত এবং যখন ফিরে আসতে চাইতেন, ফিরিয়ে দিয়ে যেত। —(রুহুল মা'আনী, বায়যাজী)

তফসীরে ইবনে কাসীরে সুলায়মান (আ) (আ)-এর সিংহাসনের বাতাসে ভর করে চলার অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, সুলায়মান (আ) (আ) কাঠের একটি বিরাট ও বিস্তীর্ণ সিংহাসন নির্মাণ করেছিলেন। তিনি পারিষদবর্গ, সৈন্য-সামন্ত ও যুদ্ধাঙ্গসহ এই সিংহাসনে সওয়ার হয়ে বায়ুকে আদেশ দিতেন। বায়ু এই বিরাটকায় বিস্তৃত ও প্রশস্ত সিংহাসন তুলে নিয়ে যেখানে আদেশ হতো, সেখানে পৌছে নামিয়ে দিত। এই হাওয়াই সিংহাসন সকাল থেকে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত এক মাসের দূরত্ব এবং দ্বিপ্রহর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এক মাসের দূরত্ব অতিক্রম করত অর্থাৎ একদিনে দুই মাসের পথ এর সাহায্যে অতিক্রম করা যেত। ইবনে আবী হাতেম হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়র থেকে বর্ণনা করেন, সুলায়মান (আ) (আ)-এর এই সিংহাসনের উপর ছয় লক্ষ চেয়ার স্থাপন করা হতো। এগুলোতে সুলায়মান (আ) (আ)-এর সাথে ঈমানদার মানব এবং তাদের পেছনে ঈমানদার জিনরা উপবেশন করত। এরপর সমগ্র সিংহাসনের উপর ছায়া দান করার জন্যে পক্ষীকুলকে

আদেশ করা হতো, যাতে সূর্যের উত্তাপে কষ্ট না হয়। এরপর আদেশ অনুযায়ী বায়ু এই বিরাট সমাবেশকে যেখানে আদেশ হতো, পৌছিয়ে দিত। কোন কোন রেওয়াজেতে রয়েছে যে, এই সফরের সময় সমগ্র পথে সুলায়মান (আ) (আ) মাথা নত করে আল্লাহর যিকর ও শোকরে মগ্ন হতেন, ডান-বায়ে তাকাতে না এবং নিজ কর্মের মাধ্যমে বিনয় প্রকাশ করতেন। —(ইবনে কাসীর)

عَامِلَةٌ এর শাব্দিক অর্থ প্রবল বায়ু। কোরআন পাকের অন্য আয়াতে এই বায়ুর বিশেষণ رَجَاءُ বর্ণনা করা হয়েছে। এর অর্থ মৃদু বাতাস, যার দ্বারা ধূলা ওড়ে না এবং শূন্যে তরঙ্গ-সংঘাত সৃষ্টি হয় না। বাহ্যত এই দুইটি বিশেষণ পরস্পর বিরোধী। কিন্তু উভয়টির একত্র সমাবেশ এভাবে সম্ভবপর যে, এই বায়ু সত্তাগতভাবে প্রবল ও প্রবল ছিল। ফলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এক মাসের পথ অতিক্রম করত; কিন্তু আল্লাহর কুদরত তাকে এমন করে দিয়েছিল যে, প্রবাহিত হওয়ার সময় শূন্যে তরঙ্গসংঘাত সৃষ্টি হতো না। বর্ণিত রয়েছে যে, এই সিংহাসনের চলার পথে শূন্যে কোন পাখিরও কোনরূপ ক্ষতি হতো না।

সুলায়মান (আ)-এর জন্য জিন ও শয়তান বশীভূতকরণ : وَمِنَ الشَّيَاطِينِ وَمِنْ يُفُوسُونَ لَهُ : অর্থ আমি সুলায়মান (আ) (আ)-এর জন্য শয়তানদের মধ্যে এমন কিছু সংখ্যককে বশীভূত করে দিয়েছিলাম, যারা তাঁর জন্যে সমুদ্রে ডুব দিয়ে মণিমুক্তা সংগ্রহ করে আনত, এছাড়া অন্য কাজও করত ; যেমন অন্যান্য আয়াতে বলা হয়েছে : يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَغَارِبٍ وَمِنْ ثُلٍّ وَجَفْآنَ كَالْجَوَابِ অর্থ তারা সুলায়মান (আ) (আ)-এর জন্য বেদী, সুউচ্চ প্রাসাদ, মূর্তি ও চৌবাচ্চার ন্যায় পাথরের বড় বড় পেয়ালা তৈরি করত। সুলায়মান (আ) তাদের অধিক শ্রমের কাজেও নিয়োজিত করতেন এবং অভিনব শিল্পকাজও করাতেন এবং আমিই তাদের রক্ষক ছিলাম।

شَبَاطِينُ শয়তান হচ্ছে বুদ্ধি ও চেতনাবিশিষ্ট অগ্নিনির্মিত সৃষ্টি দেহ। মানুষের ন্যায় তারাও শরীয়তের বিধি-বিধান পালনে আদিষ্ট। এই জাতিকে বোঝাবার জন্য আসলে جن অথবা جنات শব্দ ব্যবহৃত হয়। তাদের মধ্যে যারা ঈমানদার নয়-কাফির, তাদেরকে শয়তান বলা হয়। বাহ্যত বোঝা যায় যে, মু'মিন ও কাফির নির্বিশেষে সব জিন সুলায়মান (আ)-এর বশীভূত ছিল; কিন্তু মু'মিনরা বশীভূতকরণ ছাড়াই সুলায়মান (আ)-এর নিদর্শনাবলী ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে পালন করত। তাদের ক্ষেত্রে বশীভূতকরণের কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। তাই বশীভূতকরণের অধীনে শুধু شَبَاطِينُ তথা কাফির জিনদের উল্লেখ করা হয়েছে। তারা কুফর ও অবাধ্যতা সত্ত্বেও জবরদস্তি সুলায়মান (আ)-এর আজ্ঞাধীন থাকত। সম্ভবত এ কারণেই আয়াতের শেষে যোগ করা হয়েছে যে, আমিই তাদেরকে সামলিয়ে রাখতাম। নতুন কাফির জিনদের তরফ থেকে ক্ষতির আশংকা সব সময় বিদ্যমান ছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার হিফাযতে তারা কোন ক্ষতি করতে পারত না।

একটি সূত্র তত্ত্ব : দাউদ (আ)-এর জন্য আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক শক্ত ও ঘন পদার্থকে বশীভূত করেছিলেন ; যথা পর্বত, লৌহ ইত্যাদি। সুলায়মান (আ)-এর জন্য

দেখাও যায় না, এমন সূক্ষ্ম বস্তুকে বশীভূত করেছেন ; যেমন বায়ু, জিন ইত্যাদি। এতে বোঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার শক্তিসামর্থ্য সবকিছুতেই পরিব্যাপ্ত।—(তফসীরে কবীর)

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ
الرَّحِيمِينَ ﴿٦٧﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضِرٍّ وَأَتَيْنَاهُ
أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِيدِينَ ﴿٦٨﴾

(৬৩) এবং স্বরণ করুন আইউবের কথা, যখন তিনি তাঁর পালনকর্তাকে আহ্বান করে বলেছিলেন : আমি দুঃখকষ্টে পতিত হয়েছি এবং আপনি দয়াবানদের চাইতেও সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান। (৬৪) অতঃপর আমি তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং তাঁর দুঃখকষ্ট দূর করে দিলাম এবং তাঁর পরিবারবর্গ কিরিয়ে দিলাম এবং তাদের সাথে তাদের সমপরিমাণ আরও দিলাম আমার পক্ষ থেকে কৃপাবশত এবং ইবাদতকারীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এই আইউব (আ)-এর কথা আলোচনা করুন, যখন সে (দুরাযোগ্য) রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর তাঁর পালনকর্তাকে আহ্বান করে বলল : আমি দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়েছি এবং আপনি দয়াবানদের চাইতেও অধিক দয়াবান (অতএব মেহেরবানী করে আমার কষ্ট দূর করে দিন)। অতঃপর আমি তার দোয়া কবুল করলাম এবং তার কষ্ট দূর করলাম এবং (তার অনুরোধ ছাড়াই) তার পরিবারবর্গ (অর্থাৎ যেসব সন্তান-সন্ততি নিষোজ হয়ে গিয়েছিল অথবা মৃত্যুবরণ করেছিল) কিরিয়ে দিলাম (তারা তার কাছে এসেছিল কিংবা সমপরিমাণ সন্তান-সন্ততি আরও জন্মগ্রহণ করেছিল) এবং তাদের সাথে (গণনায়) তাদের মত আরও দিলাম (অর্থাৎ পূর্বে যতজন ছিল, তাদের সমান আরও দিলাম, নিজের ঔরসজাত হোক কিংবা সন্তানের সন্তান হোক) আমার পক্ষ থেকে কৃপাবশত এবং ইবাদতকারীদের জন্য স্বরণীয় হয়ে থাকার জন্য।

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আইউব (আ)-এর কাহিনী : আইউব (আ)-এর কাহিনী সম্পর্কে অনেক দীর্ঘ ইসরাইলী রেওয়াজেত বিদ্যমান রয়েছে। তন্মধ্যে হাদীসবিদগণ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে নির্ভরযোগ্য মনে করেছেন, এমন রেওয়াজেতই এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে। কোরআন পাক থেকে শুধু এতটুকু জানা যায় যে, তিনি কোন দুর্যোগে রোগে আক্রান্ত হয়ে সর্ব্ব করে যান এবং অবশেষে আল্লাহর কাছে দোয়া করে রোগ থেকে মুক্তি পান। এই অসুস্থতার দিনগুলোতে তাঁর সন্তান-সন্ততি, বন্ধু-বান্ধব সব উধাও হয়ে গিয়েছিল মৃত্যুবরণ করে কিংবা অন্য মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)—২৭

কোন কারণে। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সুস্থতা দান করেন এবং সব সন্তান ফিরিয়ে দেন ; বরং তাদের তুলনায় আরও আধিক দান করেন। কাহিনীর অবশিষ্ট অংশের মধ্যে কিছু প্রামাণ্য হাদীসসমূহে এবং বেশির ভাগ ঐতিহাসিক রেওয়াজেতসমূহে বিদ্যমান রয়েছে। হাফেয ইবনে-কাসীর কাহিনীর বিবরণ এভাবে দিয়েছেন :

আল্লাহ তা'আলা আইউব (আ)-কে প্রথমদিকে অগাধ ধন-দৌলত, সহায়-সম্পত্তি, সুরম্য দালানকোঠা, যানবাহন, সন্তান-সন্ততি ও চাকর-নওকর দান করেছিলেন। এরপর তাঁকে পয়গম্বরসুলভ পরীক্ষায় ফেলা হয়। ফলে, এসব বস্তু তাঁর হাতছাড়া হয়ে যায় এবং দেহেও কুষ্ঠের ন্যায় এক প্রকার দুরারোগ্য ব্যাধি বাসা বাঁধে। জিহ্বা ও অন্তর ব্যতীত দেহের কোন অংশই এই ব্যাধি থেকে মুক্ত ছিল না। তিনি তদবস্থায়ই জিহ্বা ও অন্তরকে আল্লাহর শরণে মশগুল রাখতেন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। এই দুরারোগ্য ব্যাধির কারণে প্রিয়জন, বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশী তাঁকে আলাদা করে লোকালয়ের বাইরে একটি আবর্জনা নিক্ষেপের জায়গায় রেখে দেয়। কেউ তাঁর কাছে যেত না। শুধু তাঁর স্ত্রী তাঁর দেখাশোনা করতেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন ইউসুফ (আ)-এর কন্যা অথবা পৌত্রী। তাঁর নাম ছিল লাইয়্যা বিনতে মেশা ইবনে ইউসুফ (আ)। —(ইবনে-কাসীর) সহায়-সম্পত্তি ও অর্থকড়ি সব নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। স্ত্রী যেহেতু মজুরী করে তাঁর পানাহার ও প্রয়োজনীয় উপকরণাদি সংগ্রহ করতেন এবং তাঁর সেবা-যত্ন করতেন। আইউব (আ)-এর এই পরীক্ষা মোটেই আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল না। রাসূলে করীম (সা) বলেন : অর্থাৎ পয়গম্বরগণ সবচাইতে বেশি বিপদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন হন, তাঁদের পর অন্যান্য সংকর্মপরায়ণগণ পর্যায়ক্রমে বিপদের সম্মুখীন হন। এক রেওয়াজেতে রয়েছে : প্রত্যেক মানুষের পরীক্ষা তার ঈমানের দৃঢ়তার পরিমাণে হয়ে থাকে। ধর্মপরায়ণতায় যে যত বেশি মজবুত ; তার বিপদ ও পরীক্ষাও তত অধিক হয় (যাতে এই পরিমাণেই মর্তবা আল্লাহর কাছে উচ্চ হয়)। আল্লাহ তা'আলা আইউব (আ)-কে পয়গম্বরগণের মধ্যে ধর্মীয় দৃঢ়তা ও সবরের বিশিষ্ট স্তর দান করেছিলেন [যেমন দাউদ (আ)-কে শোকরের এমনি স্বাতন্ত্র্য দান করা হয়েছিল।] বিপদাপদ ও সংকটে সবর করার ক্ষেত্রে আইউব (আ) উপমেয় ছিলেন। ইয়াযীদ ইবনে মায়সারাহ বলেন : আল্লাহ যখন আইউব (আ)-কে অর্থকড়ি সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি জাগতিক নিয়ামত থেকে মুক্ত করে পরীক্ষা করেন, তখন তিনি মুক্ত মনে আল্লাহর শরণ ও ইবাদতে আরও বেশি আত্মনিয়োগ করেন এবং আল্লাহর কাছে আরম্ব করেন : হে আমার পালনকর্তা ! আমি তোমার শোকর আদায় করি এ কারণে যে, তুমি আমাকে সহায়-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততি দান করেছ। এদের মহব্বত আমার অন্তরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এরপর এ কারণেও শোকর আদায় করি যে, তুমি আমাকে এসব বস্তু থেকে মুক্তি দিয়েছ। এখন আমার ও তোমার মধ্যে কোন অন্তরায় অবশিষ্ট নেই।

উল্লিখিত রেওয়াজেত বর্ণনা করার পর হাফেয ইবনে-কাসীর লিখেছেন : এই কাহিনী সম্পর্কে ওহূব ইবনে মুনাঝেহ থেকে অনেক দীর্ঘ রেওয়াজেত বর্ণিত আছে। তবে রেওয়াজেতগুলো সুবিদিত নয়। তাই আমি সেগুলো উল্লেখ করলাম না।

আইউব (আ)-এর দোয়া সবরের পরিণতী নয় : হযরত আইউব (আ) সাংসারিক ধন-দৌলত ও সহায়-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে এমন এক শারীরিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হন যে, কেউ তাঁর কাছে আসতে সাহস করত না। তিনি লোকালয়ের বাইরে এক আবর্জনাময় স্থানে দীর্ঘ সাত বছর কয়েক মাস পড়ে থাকেন। কোন সময় হা-হতাশ, অস্থিরতা ও অভিযোগের কোন বাক্যও মুখে উচ্চারণ করেন নি। সতী সাক্ষী স্ত্রী লাইয়া একবার আরম্ভ করলেন যে, আপনার কষ্ট অনেক বেড়ে গেছে। এই কষ্ট দূর হওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দোয়া করুন। তিনি জওয়াব দিলেন : আমি সত্ত্বর বছর সুস্থ ও নিরোগ অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার অসংখ্য নিয়ামত ও দৌলতের মধ্যে দিনমতিপাত করেছি। এর বিপরীতে বিপদের সাত বছর অতিবাহিত করা কঠিন হবে কেন ? পয়গম্বরসুলত দৃঢ়তা, সহিষ্ণুতা ও সবরের ফলে তিনি দোয়া করারও হিম্মত করতেন না যে, কোথাও সবরের খেলাফ না হয়ে যায় (অথচ আল্লাহর কাছে দোয়া করা এবং নিজের অভাব ও দুঃখ কষ্ট পেশ করা বে-সবরীর অন্তর্ভুক্ত নয়)। অবশেষে এমন একটি কারণ ঘটে গেল, যা তাঁকে দোয়া করতে বাধ্য করল। বলা বাহুল্য, তাঁর এই দোয়া দোয়াই ছিল—বেসবরী ছিল না। আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন পাকে তাঁর সবরের স্বাক্ষর রেখে বলেছেন **وَجَدْنَاهُ صَابِرًا** (আমি তাকে সবরকারী পেয়েছি)। যে কারণে তিনি দোয়া করতে বাধ্য হন, সেই কারণে বর্ণনায় রেওয়াজেতসমূহে বিভিন্ন রূপ এবং দীর্ঘ কাহিনী রয়েছে। তাই সেগুলো পরিত্যাগ করা হলো।

ইবনে আবী হাতেম হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, আইউব (আ)-এর দোয়া কবুল হওয়ার পর তাঁকে আদেশ করা হলো : পায়ের গোড়ালি দ্বারা মাটিতে আঘাত করুন। মাটিতে পরিষ্কার পানির ঝরনা দেখা দেবে। এই পানি পান করুন এবং তা দ্বারা গোসল করুন। দেহের সমস্ত রোগ-ব্যাধি অন্তর্হিত হয়ে যাবে। হযরত আইউব (আ) তদ্রূপই করলেন। ঝরনার পানি দ্বারা গোসল করতেই ক্ষতজর্জরিত ও অস্থিচর্মসার দেহ নিমেষের মধ্যে রক্তমাংস ও কেশমণ্ডিত দেহে রূপান্তরিত হয়ে গেল। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর জন্যে জান্নাতের পোশাক প্রেরণ করলেন। তিনি জান্নাতী পোশাক পরিধান করে আবর্জনার স্থান থেকে একটু সরে গিয়ে এক পাশে বসে রইলেন। স্ত্রী নিত্যকার অভ্যাস অনুযায়ী তাঁর দেখাশোনা করতে আগমন করলেন ; কিন্তু তাঁকে তাঁর স্থানে না পেয়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন। এক পাশে উপবিষ্ট আইউব (আ)-কে চিনতে না পেরে তিনি তাঁকেই জিজ্ঞেস করলেন : আপনি জানেন কি, এখানে যে রোগাক্রান্ত লোকটি পড়ে থাকতেন, তিনি কোথায় গেলেন ? কুকুর ও ব্যাঘ্র কি তাকে খেয়ে ফেলেছে ? অতঃপর এ ব্যাপারে তিনি কিছুকণ তাঁর সাথে আলাপ করলেন। সবকিছু শুনে আইউব (আ) বললেন : আমিই আইউব। কিন্তু স্ত্রী তখনও তাঁকে চিনতে না পেরে বললেন : আপনি কি আমার সাথে পরিহাস করছেন : আইউব (আ) আবার বললেন : লক্ষ্য করে দেখ, আমিই আইউব। আল্লাহ্ তা'আলা আমার দোয়া কবুল করেছেন এবং নতুন স্বাস্থ্য দান করেছেন। হযরত ইবনে-আব্বাস বলেন : এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ধন-দৌলত

ফিরিয়ে দিলেন এবং সন্তান-সন্ততিও। শুধু তাই নয়, সন্তানদের সমসংখ্যক বাড়তি সন্তানও দান করলেন। —(ইবনে-কাসীর)

ইবনে মাসউদ (রা) বলেন : হযরত আইউব (আ)-এর সাত পুত্র ও সাত কন্যা ছিল। পরীক্ষার দিনগুলোতে তারা সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁকে সুস্থতা দান করলেন, তখন সন্তানদেরকেও পুনরায় জীবিত করে দেন এবং স্বীকৃত গর্ভে নতুন সন্তানও এই পরিমাণেই জন্মগ্রহণ করে। একেই কোরআনে **وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ** বাক্যে প্রকাশ করা হয়েছে। শা'বী বলেন : এই উক্তি আয়াতের বাহ্যিক অর্থের নিকটতম। —(কুরতুবী)

কেউ কেউ বলেন : পূর্বে যতজন সন্তান ছিল, নতুন সন্তান ততজনই লাভ করলেন এবং তাদের মত সন্তান বলে সন্তানের সন্তান বোঝানো হয়েছে। **وَاللَّهُ أَكْبَرُ**

وَأَسْعِلْ وَأَدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ ۝٧٥
وَأَدْخَلْنَهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِّنَ الصَّالِحِينَ ۝٧٦

(৮৫) এবং ইসমাইল, ইদরীস ও যুলকিফলের কথা স্মরণ করুন, তারা প্রত্যেকেই ছিলেন সবরকারী। (৮৬) আমি তাদেরকে আমার রহমতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। তারা ছিলেন সংকর্মপরায়ণ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং ইসমাইল, ইদরীস ও যুলকিফলের (কথা) স্মরণ করুন। তারা প্রত্যেকেই ছিলেন (শরীয়তগত ও সৃষ্টিগত বিধানাবলীতে) অটল। আমি তাঁদের (সবাই)-কে আমার (বিশেষ) রহমতের অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। নিশ্চয় তারা পূর্ণ সংকর্মপরায়ণ ছিলেন।

আনুমানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

যুলকিফল নবী ছিলেন, না ওলী? তাঁর বিস্ময়কর কাহিনী : আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে তিনজন মনীষীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে হযরত ইসমাইল ও ইদরীস যে নবী ও রাসূল ছিলেন, তা কোরআন পাকের অনেক আয়াত দ্বারা প্রমাণিত আছে। কোরআন পাকে তাঁদের কথা স্থানে স্থানে আলোচনাও করা হয়েছে। তৃতীয়জন হচ্ছেন যুলকিফল। ইবনে কাসীর বলেন : তাঁর নাম দু'জন পয়গম্বরের সাথে শামিল করে উল্লেখ করা থেকে বাহ্যত বুঝা যায় যে, তিনিও আল্লাহর নবী ছিলেন। কিন্তু কোন কোন রেওয়াজে থেকে জানা যায় যে, তিনি পয়গম্বরের কাভারভুক্ত ছিলেন না ; বরং একজন সংকর্মপরায়ণ ওলী ছিলেন। তফসীরবিদ ইবনে জারীর মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত ইয়ামা' (যিনি পয়গম্বর ছিলেন বলে কোরআনে উল্লেখ আছে) বার্বক্যে উপনীত হয়ে একজনকে তাঁর খলীফা নিযুক্ত করার ইচ্ছা করলেন, 'যে তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর পক্ষ থেকে পয়গম্বরের কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করতে পারে। এ উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর সব সাহাবীকে

একত্রিত করে বললেন : আমি আমার খলীফা নিযুক্ত করতে চাই। যার মধ্যে তিনটি শর্ত বিদ্যমান আছে তাকেই আমি খলীফা নিযুক্ত করব। শর্ত তিনটি এই : সদাসর্বদা রোযা রাখা, ইবাদতে রাত্রি জাগরণ করা এবং কোন সময় রাগাবিত না হওয়া। সমাবেশের মধ্য থেকে জনৈক অখ্যাত ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল। তাকে সবাই নিতান্ত সাধারণ লোক বলে মনে করত। সে বলল : আমি এই কাজের জন্য উপস্থিত আছি। হযরত ইয়াসা জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কি সদাসর্বদা রোযা রাখ, ইবাদতে রাত্রি জাগরণ কর এবং কোন সময় গোস্‌সা কর না? লোকটি বলল : নিঃসন্দেহে এই তিনটি আমল আমার মধ্যে আছে। হযরত ইয়াসা সম্ভবত তাঁর কথা বিশ্বাস করতে পারলেন না, তাই সেদিনকার মত তাকে ফিরিয়ে দিলেন। দ্বিতীয় দিন আবার সমাবেশকে লক্ষ্য করে একথা বললেন। উপস্থিত সবাই নিমুগ্ন রইল এবং পূর্বোক্ত ব্যক্তিই আবার দণ্ডায়মান হলো। তখন হযরত ইয়াসা তাকে খলীফা নিযুক্ত করার কথা ঘোষণা করলেন। যুলকিফল এই পদ লাভে সক্ষম হয়েছে দেখে শয়তান তার সাজপাঙ্গদেরকে বলল : যাও, কোনরূপ এই ব্যক্তি দ্বারা এমন কাজ করিয়ে নাও, যদ্বারা তার এই পদ বিলুপ্ত হয়ে যায়। সাজপাঙ্গরা অক্ষমতা প্রকাশ করে বলল : সে আমাদের বশে আসার পাত্র নয়। ইবলীস বলল : তাহলে কাজটি আমার হাতেই ছেড়ে দাও, আমি তাকে দেখে নেব। হযরত যুলকিফল স্বীকারোক্তি অনুযায়ী সারা দিন রোযা রাখতেন এবং সারারাত জাগ্রত থাকতেন। শুধু দ্বিপ্রহরে কিছুক্ষণ নিদ্রা যেতেন। শয়তান ঠিক দুপুরে নিদ্রার সময় উপস্থিত হলো এবং দরজার কড়া নাড়া দিল। তিনি জাগ্রত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন : কে ? উত্তর হলো : আমি একজন বৃদ্ধ মজলুম। তিনি দরজা খুলে দিলেন। আগন্তুক ভেতরে পৌঁছে দীর্ঘ কাহিনী বলতে শুরু করল যে, আমার সাথে আমার সম্প্রদায়ের বিবাদ আছে। তারা আমার উপর এই যুলুম করেছে, এই যুলুম করেছে। এভাবে দুপুরের নিদ্রার সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। যুলকিফল বললেন : আমি যখন বাইরে যাব, তখন এসো। আমি তোমার বিচার করে দেব।

যুলকিফল বাইরে এলেন এবং আদালত কক্ষে বসে লোকটির জন্য অপেক্ষা করলেন। কিন্তু সে আগমন করল না। পরের দিন যখন তিনি মুকাদ্দমার ফয়সালা করার জন্য আদালতে বসলেন, তখনও এই বৃদ্ধের জন্য অপেক্ষা করলেন ; কিন্তু তাকে দেখা গেল না। দুপুরে যখন নিদ্রার জন্য গৃহে গেলেন, তখন লোকটি এসে দরজা পিটাতে লাগল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে ? উত্তর হলো : আমি একজন বৃদ্ধ মজলুম। তিনি দরজা খুলে দিয়ে বললেন : আমি কি তোমাকে বলিনি যে, মজলিসে বসার সময় এসো। তুমি কালও আসনি, আজ সকাল থেকেও তোমার দেখা নেই। সে বলল : হুম্বুর, আমার শত্রু পক্ষ খুবই ধূর্ত প্রকৃতির। আপনাকে মজলিসে বসা দেখলে তারা আমার প্রাণ্য পরিশোধ করবে বলে স্বীকার করে নেয়। আপনি যখন মজলিস ত্যাগ করেন, তখন আবার অস্বীকার করে বসে। তিনি আবার বলে দিলেন যে, এখন যাও। আমি যখন মজলিসে বসি, তখন এসো। এই কথাবার্তার মধ্যে সেদিনকার দুপুরও গড়িয়ে গেল এবং নিদ্রা হলো না। তিনি বাইরে এসে মজলিসে বৃদ্ধের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। পরের দিনও দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন ; কিন্তু তার পাস্তা পাওয়া গেল না। তৃতীয় দিন দুপুর হলে তিনি নিদ্রায় ঢুলতে লাগলেন। গৃহে এসে পরিবারের লোকদেরকে বলে দিলেন যে, কেউ যেন কড়া

নাড়া না দেয়। বৃদ্ধ এদিনও আগমন করল এবং কড়া নাড়া দিতে চাইল। সবাই নিষেধ করলে সে খিড়কীর পথে ভেতরে ঢুকে পড়ল এবং দরজায় আঘাত করতে লাগল। যুলকিফল জাগ্রত হয়ে দেখলেন যে, ঘরের দরজা যথারীতি বন্ধ আছে এবং বৃদ্ধ ঘরের ভেতরে উপস্থিত আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তুমি ভেতরে ঢুকলে কিভাবে? তখন যুলকিফল চিনতে পারলেন যে, সে শয়তান ছাড়া কেউ নয়। তিনি বললেন : তাহলে তুমি আল্লাহর দূশমন ইবলীস। সে স্বীকার করে বলল : আপনি আমার সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছেন। কিছুতেই আমার জালে আবদ্ধ হন নি। এখন আমি আপনাকে কোনরূপ রাগান্বিত করার চেষ্টা করেছিলাম, যাতে ইয়াসা নবীর সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ হয়। এ উদ্দেশ্যেই আমি এসব কাণ্ড করেছি। এই ঘটনার কারণেই তাঁকে যুলকিফলের খেতাব দান করা হয়। 'যুলকিফল' শব্দের অর্থ অস্বীকার ও দায়িত্বপূর্ণকারী ব্যক্তি। হযরত যুলকিফল তাঁর অস্বীকার পূর্ণ করেছিলেন। —(ইবনে-কাসীর)

মুসনাদে আহমদে আরও একটি রেওয়ায়েত আছে ; কিন্তু তাতে যুলকিফলের পরিবর্তে আলকিফল নাম বর্ণিত হয়েছে। ইবনে-কাসীর এই রেওয়ায়েতে বর্ণনা করার পর বলেছেন, কিফল নামক এই ব্যক্তি অন্য কেউ হবে—আয়াতে বর্ণিত যুলকিফল নয়। রেওয়ায়েতটি এই :

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে-উমর বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুখে একটি হাদীস একবার দুইবার নয়, সাতবারেরও বেশি শুনেছি। তিনি বলেন : বনী-ইসরাইলের এক ব্যক্তির নাম ছিল কিফল। সে কোন গুনাহ থেকে বেঁচে থাকত না। একবার জনৈক মহিলা তার কাছে আগমন করলে সে ষাট দীনারের বিনিময়ে তাঁকে ব্যভিচারে সম্মত করে নিল। সে যখন কুকর্ম করতে উদ্যত হলো, তখন মহিলাটি কাঁপতে লাগল ও কান্না জুড়ে দিল। সে বলল : কাঁদছ কেন? আমি কি তোমার উপর কোন জোর-জবরদস্তি করছি? মহিলা বলল : না, জবরদস্তি কর নি; কিন্তু আমি এই পাপকর্ম গত জীবনে কোনদিন করিনি। এখন অভাব-অনটন আমাকে তা করতে বাধ্য করেছে। তাই সম্মত হয়েছিলাম। একথা শুনে কিফল তদবস্থায়ই মহিলার কাছ থেকে সরে দাঁড়াল এবং বলল : যাও, এই দীনারও তোমারই। এখন থেকে কিফল আর কোনদিন পাপ কাজ করবে না। ঘটনাক্রমে সেদিন রাতেই কিফল মারা গেল। সকালে তার দরজায় অদৃশ্য থেকে কে যেন এই বাক্য লিখে দিল : **غفر الله لكفل** অর্থাৎ আল্লাহ কিফলকে ক্ষমা করেছেন।

ইবনে-কাসীর এই রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে লিখেন : এই রেওয়ায়েতটি সিহাহু সিভায় নেই। এই সনদ অপরিচিত। যদি একে প্রামাণ্যও ধরে নেয়া হয়, তবে এতে কিফলের কথা বলা হয়েছে—যুলকিফলের নয়। মনে হয় সে অন্য কোন ব্যক্তি। **وَاللَّهُ أَعْلَمُ**

আলোচনার সারমর্ম এই যে, যুলকিফল হযরত ইয়াসা নবীর খলীফা ও সংকর্মপরায়ণ ওলী ছিলেন। সম্ভবত বিশেষ ও পছন্দনীয় আমলের কারণে আয়াতে পয়গম্বরগণের কাতারে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এটাও অবাস্তব নয় যে, প্রথমে তিনি ইয়াসা নবীর খলীফাই ছিলেন, পরে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নবুয়তের পদও দান করেছিলেন।

وَذَالتُونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى
 فِي الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۙ اِنِّى كُنْتُ مِنَ
 الظَّٰلِمِيْنَ ﴿٣٧﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ۚ وَكَذٰلِكَ
 نُنَجِّي الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٣٨﴾

(৮৭) এবং মাছওয়ালার কথা আলোচনা করুন ; যখন তিনি জুজু হয়ে চলে গিয়েছিলেন, অতঃপর মনে করেছিলেন যে, আমি তাকে ধৃত করতে পারব না। অতঃপর তিনি অন্ধকারের মধ্যে আহ্বান করলেন : তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি নির্দোষ আমি ওনাহগার। (৮৮) অতঃপর আমি তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং তাকে দুচ্চিভা থেকে মুক্তি দিলাম। আমি এমনভাবেই বিশ্বাসীদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি।

তক্ষসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং মাছওয়ালার (অর্থাৎ হযরত ইউনুস পয়গম্বরের) কথা আলোচনা করুন, যখন তিনি (বিশ্বাস স্থাপন না করার কারণে তাঁর সম্প্রদায়ের উপর থেকে আযাব টলে যাওয়ার পরও ফিরে আসেন নি এবং এই সফরের জন্য আমার আদেশের অপেক্ষা করেননি) এবং তিনি (নিজের ইজ্জতিহাদ দ্বারা) মনে করেছিলেন যে, আমি (এই চলে যাওয়ার ব্যাপারে) তাঁকে পাকড়াও করব না [অর্থাৎ এই পলায়নকে তিনি নিজের ইজ্জতিহাদ দ্বারা বৈধ মনে করেছিলেন, তাই ওহীর অপেক্ষা করেন নি ; কিন্তু যে পর্যন্ত আশা থাকে, সেই পর্যন্ত ওহীর অপেক্ষা করা পয়গম্বরণের জন্য সমীচীন। এই সমীচীন কাজ তরক করার কারণে তাঁকে বিপদগ্রস্ত করা হয়। সেমতে পশ্চিমধ্যে সমুদ্র পড়লে তিনি নৌকায় সওয়ার হন। নৌকা চলতে চলতে এক জায়গায় থেমে যায়। ইউনুস (আ)-এর বুঝতে বাকি রইল না যে, বিনা অনুমতিতে পলায়ন পছন্দ করা হয় নি। এ কারণেই নৌকা থেমে গেছে। তিনি নৌকার আরোহীদেরকে বললেন : আমাকে সমুদ্রে ফেলে দাও। তারা সম্মত হলো না। লটারী করা হলে তাতেও তাঁরই নাম বের হলো। অবশেষে তাঁকে সমুদ্রে ফেলে দেয়া হলো। আল্লাহর আদেশে একটি মাছ তাঁকে গিলে ফেলল। (দূরুরে মনসুর) অতঃপর তিনি জমাত অন্ধকারের মধ্যে আহ্বান করলেন : এক অন্ধকার ছিল মাছের পেটের, দ্বিতীয় সমুদ্রে পানির ; উভয় গভীর অন্ধকার অনেকগুলো অন্ধকারের সমতুল্য ছিল কিংবা তৃতীয় অন্ধকার ছিল রাত্রির। (দূরুরে মনসুর) তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই (এটা তওহীদ) ; তুমি (সব দোষ থেকে) পবিত্র, (এটা পবিত্রতা বর্ণনা) আমি নিশ্চয়ই দোষী। (এটা ক্ষমা প্রার্থনা। এর উদ্দেশ্য আমার ত্রুটি ক্ষম করে এই সংকট থেকে মুক্তি দাও।) অতঃপর

আমি তাঁর দোয়া কবুল করলাম এবং তাঁকে দৃষ্টিভা থেকে মুক্তি দিলাম। (এই কাহিনী সূরা সাফফাতে **فَنَبِّئْنَا الْعَرَّاءَ** আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি এমনিভাবে বিশ্বাসীদেরকে (দৃষ্টিভা থেকে) মুক্তি দিয়ে থাকি (যদি কিছুকাল চিন্তামগ্ন রাখা উপযোগী না হয়)।

আনুশঙ্গিক স্তোত্রব্য বিষয়

وَالَّذِينَ হযরত ইউনুস ইবনে মাস্তা (আ)-এর কাহিনী কোরআন পাকের সূরা ইউনুস, সূরা আযিয়া, সূরা সাফফাত ও সূরা নূরে বিবৃত হয়েছে। কোথাও তাঁর আসল নাম উল্লেখ করা হয়েছে, কোথাও 'যুননূন' এবং কোথাও 'সাহেবুল হত' উল্লেখ করা হয়েছে। 'নূন' ও 'হত' উভয় শব্দের অর্থ মাছ। কাজেই যুননূন ও সাহেবুল হতের অর্থ মাসওয়ালা। ইউনুস (আ)-কে কিছুদিন মাছের পেটে অবস্থান করতে হয়েছিল। এই আশ্চর্য ঘটনার পরিস্থিতিতেই তাঁকে যুননূনও বলা হয় এবং সাহেবুল হত শব্দের মাধ্যমেও ব্যক্ত করা হয়।

ইউনুস (আ)-এর কাহিনী : তফসীরে ইবনে কাসীরে আছে, ইউনুস (আ)-কে মুসেলের একটি জনপদ নায়নুয়ার অধিবাসীদের হিদায়েতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। তিনি তাদেরকে ঈমান ও সৎকর্মের দাওয়াত দেন। তারা অবাধ্যতা প্রদর্শন করে। ইউনুস (আ) তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে জনপদ ত্যাগ করেন। এতে তারা ভাবতে থাকে যে, এখন আযাব এসেই যাবে (কোন কোন রেওয়াজেও থেকে জানা যায় যে, আযাবের কিছু কিছু চিহ্নও ফুটে উঠেছিল)। অনতিবিলম্বে তারা শিরক ও কুফর থেকে তওবা করে নেয় এবং জনপদের সব আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা জহলের দিকে চলে যায়। তারা চতুষ্পদ জন্তু ও বাচ্চাদেরকেও সাথে নিয়ে যায় এবং বাচ্চাদেরকে তাদের কাছ থেকে আলাদা করে দেয়। এরপর সবাই কান্নাকাটি শুরু করে দেয় এবং কাকুতি মিনতি সহকারে আব্বাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতে থাকে। জন্তুদের বাচ্চারা মা'দের কাছ থেকে আলাদা করে দেওয়ার কারণে পৃথক শোরমোল করতে থাকে। আব্বাহ তা'আলা তাদের খাটি তওবা ও কাকুতি-মিনতি কবুল করে নেন এবং তাদের উপর থেকে আযাব হটিয়ে দেন। এ দিকে ইউনুস (আ) ভাবছিলেন যে, আযাব আসার ফলে তার সম্প্রদায় বোধ হয় ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু পরে যখন জানতে পারলেন যে, আদৌ আযাব আসেনি এবং তাঁর সম্প্রদায় সুস্থ ও নিরাপদে দিন ওজরান করছে, তখন তিনি চিন্তাবিহীন হলেন যে, এখন আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করা হবে। কোন কোন রেওয়াজেও আছে যে, তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে কেউ মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয়ে গেলে তাকে হত্যা করার প্রথা প্রচলিত ছিল। (মায়হারী) এর ফলে ইউনুস (আ)-এর প্রাণনাশেরও আশংকা দেখা দিল। তিনি সম্প্রদায়ের মধ্যে ফিরে আসার পরিবর্তে তিনদেশে হিজরত করার ইচ্ছায় সফর শুরু করলেন। পথিমধ্যে সামনে নদী পড়ল। তিনি একটি নৌকায় আরোহণ করলেন। ঘটনাক্রমে নৌকা আটকে গিয়ে ডুবে যাওয়ার উপক্রম হলো। মাঝিরা বলল যে, আরোহীদের মধ্যে একজনকে নদীতে ফেলে দিতে হবে। তাহলে অন্যরা ডুবে মরার কবল থেকে রক্ষা পাবে। এখন কাকে ফেলা হবে, এ নিয়ে আরোহীদের নামে

লটারি করা হলো। ঘটনাচক্রে এখানে ইউনুস (আ)-এর নাম বের হলো। (আরোহীরা বোধ হয় তাঁর মাহাত্ম্য সম্পর্কে অবগত ছিল, তাই) তারা তাঁকে নদীতে ফেলে দিতে অস্বীকৃত হলো। পুনরায় লটারি করা হলো। এবারও ইউনুস (আ)-এর নামই বের হলো। আরোহীরা তখনও দ্বিধাবোধ করলে তৃতীয়বার লটারি করা হলো। কিন্তু নাম ইউনুস (আ)-এরই বের হলো। এই লটারির কথা উল্লেখ প্রসঙ্গে কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে
 اَرْسَلْنَاكَ مِنْ النَّحْلِۚ فَمِنْ اَرْسَلْنَاكَ مِنْ النَّحْلِۚ اَرْسَلْنَاكَ مِنْ النَّحْلِۚ اَرْسَلْنَاكَ مِنْ النَّحْلِۚ
 তাতে বের হয়। তখন ইউনুস (আ) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং অনাবশ্যক কাপড় খুলে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এদিকে আল্লাহ তা'আলা সবুজ সাগরে এক মাছকে আদেশ দিলে সে সাগরের পানি চিরে দ্রুতগতিতে সেখানে পৌঁছে যায় (ইবনে মাসউদের উক্তি) এবং ইউনুস (আ)-কে উদরে পুরে নেয়। আল্লাহ তা'আলা মাছকে নির্দেশ দেন যে, ইউনুস (আ)-এর অস্থি-মাংসের যেন কোন ক্ষতি না হয়। সে তার খাদ্য নয় ; বরং তার উদর কয়েক দিনের জন্য তাঁর কয়েদখানা। (ইবনে কাসীর) কোরআনের বক্তব্য ও অন্যান্য বর্ণনা থেকে এতটুকু জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার পরিষ্কার নির্দেশ ছাড়াই ইউনুস (আ) তাঁর সম্প্রদায়কে ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। তাঁর এই কার্যক্রম আল্লাহ তা'আলা অপছন্দ করেন। ফলে তিনি রোষে পতিত হন এবং তাঁকে সমুদ্রে মাছের পেটে অবস্থান করতে হয়।

ইউনুস (আ) তাঁর সম্প্রদায়কে তিন দিনের মধ্যে আবাব আসার ভয় প্রদর্শন করেছিলেন। বাহ্যত এটা তাঁর নিজের মতে ছিল না ; বরং আল্লাহর ওহীর কারণে ছিল। পয়গম্বরদের সনাতন রীতি অনুযায়ী সম্প্রদায়কে পরিত্যাগ করে চলে যাওয়াটাও বাহ্যত আল্লাহর নির্দেশেই হয়ে থাকবে। এ পর্যন্ত এরূপ কোন ভ্রান্তি ছিল না, যা আল্লাহর রোষের কারণ হতে পারে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যখন সম্প্রদায়ের খাঁটি তওবা ও কান্নাকাটি কবুল করে তাদের উপর থেকে আবাব অপসৃত করেন, তখন তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে ফিরে না আসা এবং হিজরতের উদ্দেশ্যে সফর করা তাঁর নিজস্ব ইজতিহাদের ভিত্তিতে ছিল। তাঁর ইজতিহাদ ছিল এই যে, এই পরিস্থিতিতে সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেলে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হব এবং আমার দাওয়াত প্রভাব হারিয়ে ফেলবে ; বরং প্রাণনাশেরও আশংকা আছে। তাদেরকে ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলে তজ্ঞন্যো আল্লাহ তা'আলা ধর-পাকড় করবেন না। নিজস্ব ইজতিহাদের ভিত্তিতে হিজরতের সংকল্প করা এবং ওহীর অপেক্ষা না করেই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাওয়া যদিও শুনাহু ছিল না ; কিন্তু উত্তম পন্থায় খেলাক অবশ্যই ছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা তা পছন্দ করেননি। পয়গম্বর ও আল্লাহর নৈকট্যশীলদের মর্তবা অনেক উর্ধ্বে। তাদের অভিক্রটি-জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। এ ব্যাপারে তাঁদের পক্ষ থেকে সামান্য ত্রুটি হলেও তজ্ঞন্যো পাকড়াও করা হয়। এ কারণেই ইউনুস (আ) আল্লাহর রোষে পতিত হন।

তফসীরে কুরতুবীতে কুশায়রী থেকেও বর্ণিত আছে যে, বাহ্যত তাঁর পছন্দের বিপরীতে সম্প্রদায়ের উপর থেকে আবাব হটে যাওয়ার পরই ইউনুস (আ)-এর প্রতি রোষের এই মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ) — ২৮

ঘটনা সংঘটিত হয়। মাছের পেটে কয়েকদিন অবস্থান করাও আযাব দানের উদ্দেশ্যে নয়, শিষ্টাচার শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ছিল ; যেমন পিতা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানকে শাসালে তা শিষ্টাচার শিক্ষাদান গণ্য হয়ে থাকে ; যাতে ভবিষ্যতে সে সতর্ক হয়। (কুরতুবী) ঘটনা হৃদয়ঙ্গম করার পর এবার আয়াতসমূহে বর্ণিত শব্দাবলীর তফসীর দেখুন।

ذَمِبْ مُفَاضِبًا — অর্থাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গেলেন। বাহ্যত এখানে সম্প্রদায়ের প্রতি ক্রোধ বোঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে তাই বর্ণিত রয়েছে। رَب শব্দটিকে مَفَاضِبًا এর مَفْعُول বলেছেন, তাদের উদ্দেশ্যও مَفَاضِبِ الرَّبِّ অর্থাৎ পালনকর্তার খাতিরে ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গেলেন। কাকির ও পাপাচারীদের প্রতি আল্লাহর খাতিরে রাগান্বিত হওয়া সাক্ষাৎ ঈমানের আলামত। — (কুরতুবী, বাহরে মুহীত)

فَطَرْنَا أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ অভিধানের দিক দিয়ে قَدِر শব্দের তিন রকম অর্থ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রথম, যদি قَدِرْت ধাতু থেকে উদ্ভূত হয়, তবে আয়াতের অর্থ হবে তিনি ধারণা করলেন যে, আমি তাকে কাবু করতে পারব না বলা বাহুল্য, এরূপ ধারণা কোন পয়গম্বর তো দূরের কথা, সাধারণ মুসলমানও করতে পারে না ; কারণ এরূপ মনে করা প্রকাশ্য কুফর। কাজেই আয়াতে এই অর্থ হওয়া মোটেই সম্ভবপর নয়। দ্বিতীয় এটা قَدِر ধাতু থেকে উদ্ভূত হতে পারে। এর অর্থ সংকীর্ণ করা ; যেমন এক আয়াতে রয়েছে : اللَّهُ يَنْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ এবং যার জন্য ইচ্ছা সংকীর্ণ করে দেন। আতা, সাঈদ ইবনে যুবার, হাসান বসরী প্রমুখ তফসীরবিদ এই অর্থই নিয়েছেন। তাঁদের মতে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, ইউসুফ (আ) মনে করতেন, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সম্প্রদায়কে ছেড়ে কোথাও চলে যাওয়ার ব্যাপারে আমার প্রতি কোনরূপ সংকীর্ণ আচরণ করা হবে না। তৃতীয়, এটা তফসীরের অর্থে قَدِر থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বিচারে রায় দেওয়া। আয়াতের অর্থ হবে এই যে, ইউনুস (আ) মনে করলেন, এ ব্যাপারে আমার কোন ক্রটি ধরা হবে না। কাতাদাহ, মুজাহিদ, ফাররা প্রমুখ তফসীরবিদ এ অর্থই নিয়েছেন। মোটকথা, প্রথম অর্থের সম্ভাবনাই নেই, দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় অর্থ সম্ভবপর।

ইউনুস (আ)-এর দোয়া প্রত্যেকের জন্য, প্রতি যুগের ও প্রতি মকসুদের জন্য মকবুল : وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ — অর্থাৎ আমি যেভাবে ইউনুস (আ)-কে দুচ্ছিত্তা ও সংকট থেকে উদ্ধার করেছি, তেমনিভাবে সব মু'মিনকেও করে থাকি ; যদি তারা সততা ও আন্তরিকতার সাথে আমার দিকে মনোনিবেশ করে এবং আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ মাছের পেটে কৃত ইউনুস (আ)-এর এই দোয়াটি যদি কোন মুসলমান কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য করে, তবে আল্লাহ তা'আলা তা কবুল করবেন। — মাযহারী

وَزَكْرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ
الْوَارِثِينَ ۝ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَاهُ
زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا
رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ ۝

(৮৯) এবং যাকারিয়ার কথা আলোচনা করুন, যখন সে তাঁর পালনকর্তাকে আহ্বান করেছিল : হে আমার পালনকর্তা, আমাকে একা রেখো না। তুমি তো উত্তম ওয়ারিস। (৯০) অতঃপর আমি তাঁর দোয়া কবুল করেছিলাম, তাঁকে দান করেছিলাম ইয়াহইয়া এবং তাঁর জন্য তাঁর স্ত্রীকে প্রসবযোগ্য করেছিলাম। তাঁরা সৎকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়ত, তাঁরা আশা ও ভীতি সহকারে আমাকে ডাকত এবং তাঁরা ছিল আমার কাছে বিনীত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং যাকারিয়া (আ)-এর (কথা) আলোচনা করুন, যখন তিনি তাঁর পালনকর্তাকে আহ্বান করেছিলেন : হে আমার পালনকর্তা, আমাকে নিঃসন্তান রেখো না (অর্থাৎ আমাকে সন্তান দিন, যে আমার ওয়ারিস হবে) এবং (এমনিতে তো) ওয়ারিসদের মধ্য থেকে উত্তম (অর্থাৎ সত্যিকার ওয়ারিস) আপনিই (কাজেই সন্তানও সত্যিকার ওয়ারিস হবে না ; বরং এক সময় সেও ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু এই বাহ্যিক ওয়ারিস দ্বারা কতিপয় ধর্মীয় উপকার হাসিল হবে। তাই তা প্রার্থনা করছি।) অতঃপর আমি তাঁর দোয়া কবুল করেছিলাম, তাঁকে দান করেছিলাম ইয়াহইয়া (পুত্র) এবং তাঁর জন্য তাঁর (বক্ষ্য) স্ত্রীকেও প্রসবযোগ্য করেছিলাম। (যে সমস্ত পয়গম্বরের কথা এই সূরায় উল্লেখ করা হলো) তাঁরা সবাই সৎকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়তেন, আশা ও ভীতি সহকারে আমার ইবাদত করতেন এবং আমার সামনে বিনীত হয়ে থাকতেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হযরত যাকারিয়া (আ)-এর একজন উত্তরাধিকারী পুত্র লাভের একান্ত বাসনা ছিল। তিনি তারই দোয়া করেছেন ; কিন্তু সাথে সাথে أَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ও বলে দিয়েছেন ; অর্থাৎ পুত্র পাই বা না পাই ; সর্বাবস্থায় আপনিই উত্তম ওয়ারিস। এটা পয়গম্বরসুলভ শিষ্টাচার প্রদর্শন বৈ নয়। কারণ, পয়গম্বরদের আসল মনোযোগ আল্লাহ তা'আলার দিকে থাকা উচিত। অন্যের প্রতি মনোযোগ হলেও আসল বিষয় থেকে কেন্দ্রচ্যুত হয়ে নয়।

يَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا তারা আগ্রহ ও ভয় অর্থাৎ সুখ ও দুঃখ সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ তা'আলাকে ডাকে। এর এরূপ অর্থও হতে পারে যে, তারা ইবাদত ও দোয়ার সময় আশা ও ভীতি উভয়ের মাঝখানে থাকে। আল্লাহ তা'আলার কাছে কবুল ও সওয়াবের আশাও রাখে এবং স্বীয় তনাহ ও ক্রটির জন্য ভয়ও করে। —(কুরতুবী)

وَالَّتِي أَحْصَنْتُ فَرْجَهَا مَنَعْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا
وَابِنَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿৯১﴾

(৯১) এবং সেই নারীর কথা আলোচনা করুন, যে তাঁর কামপ্রবৃত্তিকে বশে রেখেছিল, অতঃপর আমি তাঁর মধ্যে আমার রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং তাঁকে ও তাঁর পুত্রকে বিশ্বাসীর জন্য নিদর্শন করেছিলাম।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং সেই নারীর (অর্থাৎ মারইয়ামের কথা) আলোচনা করুন, যিনি তাঁর সন্তীভুকে (পুরুষদের কাছ থেকে) রক্ষা করেছিলেন (বিবাহ থেকেও এবং অবৈধ সম্পর্ক থেকেও)। অতঃপর আমি তার মধ্যে (জিবরাঈলের মধ্যস্থতায়) আমার রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম (ফলে স্বামী ছাড়াই তাঁর গর্ভ সঞ্চারণ হয়) এবং তাঁকে ও তাঁর পুত্র ইসা (আ)-কে বিশ্বাসীর জন্য (আমার কুদরতের) নিদর্শন করেছিলাম। যাতে তাকে দেখে শুনে তারা বুঝে নেয় যে, আল্লাহ তা'আলা সর্বশক্তিমান। তিনি পিতা ছাড়াও সন্তান সৃষ্টি করতে পারেন এবং পিতামাতা ছাড়াও পারেন; যেমন আদম (আ)।।

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴿৯২﴾
وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ۖ كُلُّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ ۚ ﴿৯৩﴾ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ
الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيدٍ ۖ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ ﴿৯৪﴾
وَحَرَمٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۚ ﴿৯৫﴾ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ
يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ۚ ﴿৯৬﴾ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ
الْحَقُّ فَاذْهَبِي شَاحِصَةً أَبْصَارَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ وَيُؤَلِّفُنَا قَدْ
كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ۚ ﴿৯৭﴾ إِنَّكُمْ وَمَا
تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ ۖ أَنْتُمْ لَهَا وَرَدُونَ ۚ ﴿৯৮﴾

لَوْ كَانَ هُوَ لِآءِ إِلَهَةٍ مَا وُرِدُوَهَا ۖ وَكُلٌّ فِيهَا خَلِيدُونَ ﴿٥٥﴾
 لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿٥٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ
 لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ ۖ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿٥٧﴾ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ۖ
 وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَلِيدُونَ ﴿٥٨﴾ لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ
 الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّيْهُمْ الْمَلَائِكَةُ ۖ هَٰذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٥٩﴾
 يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ۖ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ۖ
 وَعَدُّ أَعْلَيْنَا ۖ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿٦٠﴾ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ
 الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴿٦١﴾

(৯২) তারা সকলেই তোমাদের ধর্মের ; একই ধর্মে তো বিশ্বাসী সবাই এবং আমিই তোমাদের পালনকর্তা, অতএব আমার বশেষী কর। (৯৩) এবং মানুষ তাদের কার্যকলাপ দ্বারা পারম্পরিক বিষয়ে ভেদ সৃষ্টি করেছে। এতদ্ব্যতীত আমার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। (৯৪) অতঃপর যে বিশ্বাসী অবস্থায় সংকর্ম সম্পাদন করে, তার এচেষ্টা অস্বীকৃত হবে না এবং আমি তা লিপিবদ্ধ করে রাখি। (৯৫) যে সব জনপদকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, তার অধিবাসীদের কিরে না আসা অবধারিত ; (৯৬) যে পর্যন্ত না ইরাজুজ ও মাজুজকে বন্ধনমুক্ত করে দেওয়া হবে এবং তারা প্রত্যেক উচ্চভূমি থেকে দ্রুত ছুটে আসবে। (৯৭) অমোঘ প্রতিশ্রুত সময় নিকটবর্তী হলে কাকিরদের চক্ষু উন্মেষ্ট হয়ে যাবে ; হায়, আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা এ বিষয়ে বেখবর ছিলাম ; বরং আমরা গুনাহ্‌গারই ছিলাম। (৯৮) তোমরা এবং আল্লাহর পরিবারে তোমরা যাদের পূজা কর, সেগুলো দোষের ইচ্ছন। তোমরাই তাতে প্রবেশ করবে। (৯৯) এই মূর্তিরা যদি উপাস্য হতো, তবে জাহান্নামে প্রবেশ করত না। এতদ্ব্যতীত তাতে চিরস্থায়ী হয়ে পড়ে থাকবে। (১০০) তারা সেখানে চীৎকার করবে এবং সেখানে তারা কিছুই শুনতে পাবে না। (১০১) যাদের জন্য প্রথম থেকেই আমার পক্ষ থেকে কল্যাণ নির্ধারিত হয়েছে তারা দোষ থেকে দূরে থাকবে। (১০২) তারা তার ক্ষীণতম শব্দও শুনবে না এবং তারা তাদের মনের বাসনা অনুযায়ী চিরকাল বসবাস করবে। (১০৩) মহা জ্ঞান তাদেরকে চিন্তাবিহীন করবে না এবং ফেরেশতারা তাদেরকে অভ্যর্থনা করবে : আজ তোমাদের দিন, যে দিনের ওয়াদা তোমাদেরকে দেওয়া

হয়েছিল। (১০৪) সে দিন আমি আকাশকে তুটিয়ে নেব, যেমন তটানো হয় লিখিত কাগজপত্র। যে ভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সেইভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব। আমার ওয়াদা নিশ্চিত, আমাকে তা পূর্ণ করতেই হবে। (১০৫) আমি উপদেশের পর যবুরে লিখে দিয়েছি যে, আমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাগণ অবশেষে পৃথিবীর অধিকারী হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(পূর্বাপর সম্বন্ধ : এ পর্যন্ত পয়গম্বরদের কাহিনী, ঘটনাবলী এবং অনেক আনুসঙ্গিক মৌলিক ও শাখাগত রীতিনীতি বর্ণিত হয়েছে। তওহীদ, রিসালত, পরকালের বিশ্বাস ইত্যাদি মূলনীতি সব পয়গম্বরদের মধ্যে অভিন্ন। এগুলো তাদের দাওয়াতের ভিত্তি। উল্লিখিত ঘটনাবলীতে পয়গম্বরগণের প্রচেষ্টার মূলকেন্দ্র ছিল তওহীদের বিষয়বস্তু। পরবর্তী আয়াতসমূহে কাহিনীসমূহের ফলাফল হিসেবে তওহীদ প্রমাণ করা হয়েছে এবং শিরকের নিন্দা করা হয়েছে।)

লোকসকল, (উপরে পয়গম্বরদের যে তরীকা ও তওহীদী বিশ্বাস জানা গেল,) এটা তোমাদের তরীকা (যা মেনে চলা তোমাদের উপর ওয়াজিব।)—একই তরীকা (এতে কোন নবী ও কোন শরীয়তের মতভেদ নেই। এই তরীকার সারমর্ম এই যে,) আমি তোমাদের পালনকর্তা, অতএব আমার ইবাদত কর এবং (যখন এটা প্রমাণিত যে, সব আল্লাহর গ্রন্থ এবং সব শরীয়ত এই তরীকার প্রবর্তক, তখন লোকদেরও এই তরীকায় থাকা উচিত ছিল ; কিন্তু তা হয়নি ; বরং মানুষ তাদের ধর্ম বিষয়ে ভেদাভেদ সৃষ্টি করেছে। (তারা এর শাস্তি দেখে নেবে ; কেননা) প্রত্যেকেই আমার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে (প্রত্যাবর্তনের পর প্রত্যেকেই তার কৃতকর্মের প্রতিদান পাবে)। অতঃপর যে বিশ্বাসী অবস্থায় সৎকর্ম সম্পাদন করবে, তার পরিশ্রম বিফলে যাবে না এবং আমি তা লিখে রাখি (এতে ভুলভ্রান্তির আশংকা নেই। এই লেখা অনুযায়ী প্রত্যেকেই সওয়াব পাবে)। আর (সবাই আমার কাছে ফিরে আসবে—আমার এই কথায় অবিশ্বাসীরা সন্দেহ করে বলে যে, দুনিয়ায় এত দীর্ঘ বয়স অতিক্রান্ত হয়ে গেছে ; কিন্তু আমরা এখনও পর্যন্ত কোন মৃতকে জীবিত হতে এবং তার হিসাব-নিকাশ হতে দেখিনি। তাদের এ সন্দেহ অমূলক। কেননা, আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের জন্য কিয়ামতের দিন নির্দিষ্ট আছে। সে দিনের পূর্বে কেউ প্রত্যাবর্তন করবে না। এ কারণেই) আমি যেসব জনপদকে (আযাব অথবা মৃত্যু দ্বারা) ধ্বংস করে দিয়েছি, সেগুলোর অধিবাসীদের জন্য এটা (শরীয়তগত অসম্ভাব্যতার অর্থে) অসম্ভব যে, তারা (দুনিয়াতে হিসাব-নিকাশের জন্য) ফিরে আসবে (কিন্তু এই ফিরে না আসা চিরকালীন নয় ; বরং প্রতিশ্রুতি সময় অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত)। যে পর্যন্ত না (ঐ প্রতিশ্রুত সময় আসবে, যার প্রাথমিক আয়োজন হবে এই যে,) ইয়াজ্জ-মাজ্জ (যাদের পথ এখন যুলকারনাইনের প্রাচীর দ্বারা রুদ্ধ আছে,) মুক্ত হয়ে যাবে এবং তারা (সংখ্যাধিক্যের কারণে) প্রত্যেক উচ্চভূমি (টিলা ও পাহাড়) থেকে অবতরণরত (মনে) হবে। আর (আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের সত্য প্রতিশ্রুত সময়) নিকটবর্তী হলে এমন অবস্থা হবে যে, অবিশ্বাসীদের চক্ষু বিস্ফারিত থেকে যাবে (এবং তারা বলতে থাকবে), হায় আমাদের

দুর্ভাগ্য ; আমরা এ বিষয়ে বে-খবর ছিলাম (এরপর কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলবে, একে তো তখন পাকিস্তানি বলা যেত, যখন আমাদেরকে কেউ সতর্ক না করত) বরং (সত্য এই যে,) আমরাই দোষী ছিলাম। (সারকথা এই যে, যারা কিয়ামতে পুনরুজ্জীবিত হওয়াকে অবিশ্বাস করত, তারাও তখন তাতে বিশ্বাসী হয়ে যাবে। এরপর মুশরিকদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হচ্ছেঃ) নিশ্চয় তোমরা এবং আল্লাহ্র পরিবর্তে তোমরা যাদের পূজা করছ, সবাই জাহান্নামের ইন্ধন হবে (এবং) তোমরা সবাই তাতে প্রবেশ করবে। (কোন কোন মুশরিক যেসব পয়গম্বর ও ফেরেশতাকে দুনিয়াতে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল, তারা তাদের অন্তর্ভুক্ত নয় ; কেননা, তাদের ক্ষেত্রে একটি শরীয়তসম্মত অন্তরায় আছে যে, তারা জাহান্নামের যোগ্য নয় এবং এ ব্যাপারে তাঁদের কোন দোষও নেই। পরবর্তী **إِنَّ الدِّينَ** **سَبَقَتْ لَهُمُ** আয়াতেও এই সন্দেহ নিরসন করা হয়েছে। এটা বুঝার বিষয় যে,) যদি তারা (মূর্তিরা) বাস্তবিকই উপাস্য হতো, তবে তাতে (জাহান্নামে) প্রবেশ করত না (প্রবেশও ক্ষণস্থায়ী নয় ; বরং) প্রত্যেকেই (পূজাকারী ও পূজিত) তাতে চিরকাল বাস করবে। তারা তথায় চীৎকার করবে এবং (হট্টগোলের কারণে) তথায় তারা কারও কোন কথা শুনবে না। (এ হচ্ছে জাহান্নামীদের অবস্থা এবং) যাদের জন্য প্রথম থেকেই আমার পক্ষ থেকে পুণ্য অবধারিত হয়ে গেছে, (এবং তা তাদের কাজে-কর্মে প্রকাশ পেয়েছে) তারা জাহান্নাম থেকে (এতদূর দূরে) থাকবে (যে) তারা তার ক্ষীণতম শব্দও শুনতে পাবে না। (কেননা, তারা জান্নাতে থাকবে। জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে অনেক ব্যবধান থাকবে।) তারা তাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তুসমূহের মধ্যে চিরবাসবাস করবে। তাদেরকে মহাত্মাস (অর্থাৎ কিয়ামতে জীবিত হওয়া এবং হাশরের ভয়াবহ দৃশ্যাবলী) চিন্তাবিত করবে না এবং (কবর থেকে বের হওয়া মাত্রই) ফেরেশতাগণ তাদেরকে অভ্যর্থনা করবে। (তারা বলবেঃ) আজ তোমাদের ঐ দিন, যেদিনের ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল। (এ সম্মান ও সুসংবাদের ফলে তাদের আনন্দ ও প্রফুল্লতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। তবে কোন কোন রেওয়াজে ত থেকে আভাস পাওয়া যায় যে, কিয়ামতের গ্রাস ও ভীতি থেকে কেউ মুক্ত থাকবে না—সবাই এর সম্মুখীন হবে। যেহেতু সৎ বান্দারা খুব কম সময়ের জন্য এর সম্মুখীন হবে, তাই সম্মুখীন না হওয়ারই শামিল।) ঐ দিনটিও স্বরণীয়, যেদিন আমি (প্রথম ফুৎকারের পর) আকাশমণ্ডলীকে গুটিয়ে নেব, যেমন লিখিত বিষয়বস্তুর কাগজপত্রকে গুটানো হয়। (গুটানোর পর নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া অথবা দ্বিতীয় ফুৎকার পর্যন্ত তদবস্থায় রেখে দেওয়া উভয়টি সম্ভবপর।) আমি যেমন প্রথমবার সৃষ্টি করার সময় (প্রত্যেক বস্তুর) সূচনা করেছিলাম, তেমনি (সহজেই) তাকে পুনরায় সৃষ্টি করব। এটা আমার ওয়াদা, আমি অবশ্যই (একে পূর্ণ) করব। (উপরে সৎ বান্দাদেরকে যে সওয়াব ও নিয়ামতের ওয়াদা দেওয়া হয়েছে তা অন্ত্যস্ত প্রাচীন ও জোরদার ওয়াদা। সেমতে) আমি (সব আল্লাহ্র) গ্রন্থসমূহে (লওহে মাহফুযে লেখার পর) লিখে দিয়েছি যে, এই পৃথিবীর (অর্থাৎ জান্নাতের) মালিক আমার সংকর্মপরায়ণ বান্দাগণ হবে। (এই ওয়াদার প্রাচীনত্ব এভাবে পরিস্ফুট যে, এটা লওহে মাহফুযে লিখিত আছে এবং জোরদার হওয়া এভাবে বুঝা যায় যে, কোন আল্লাহ্র গ্রন্থ এ ওয়াদা থেকে খালি নয়)।

আনুষঙ্গিক ক্ষতব্য বিষয়

وَحَرَامٌ عَلَىٰ قُرْبَىٰٓ أَهْلَكُنَا مَا أَنُحْمَ لَا يَرْجِعُونَ এখানে 'হারাম' শব্দটি 'শরীয়তগত অসম্ভব'-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এর অনুবাদ করা হয়েছে 'অসম্ভব'।

وَلَا يَرْجِعُونَ বাক্যে অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে ১ অতিরিক্ত। আয়াতের অর্থ এই যে, যে জনপদ ও তার অধিবাসীদেরকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, তাদের জন্য পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসা অসম্ভব। কোন কোন তফসীরবিদ حَرَامٌ শব্দটিকে এখানে ওয়াজিব ও জরুরী অর্থে ধরে ১ কে তার প্রচলিত না-বোধক অর্থে রেখেছেন। তাদের মতে আয়াতের মর্ম এই যে, যে জনপদকে আমি আঘাব দ্বারা ধ্বংস করেছি, তাদের জন্য দুনিয়াতে ফিরে না আসা ওয়াজিব ও জরুরী।—(কুরতুবী) আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মৃত্যুর পর তওবার দ্বার বন্ধ হয়ে যায়। যদি কেউ দুনিয়াতে এসে সৎকর্ম করতে চায়, তবে সেই সুযোগ সে পাবে না। এরপর তো শুধু কিয়ামত দিবসের জীবনই হবে।

حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ এখানে حَتَّىٰ শব্দটি পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর সাথে সংযুক্তির দিকে ইশারা করে। পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল যে, যারা কাফির অবস্থায় মারা গেছে, তাদের পুনরায় দুনিয়াতে জীবিত হয়ে ফিরে আসা অসম্ভব। এই অসম্ভাব্যতার চূড়ান্ত সীমা এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, পুনরায় জীবিত হয়ে ফিরে আসা তখন পর্যন্ত অসম্ভব, যে পর্যন্ত ইয়াজুজ-মাজুজের ঘটনা সংঘটিত না হয়। এই ঘটনা কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আলামত। সহীহ মুসলিমে হযরত হুয়ায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমরা কয়েকজন সাহাবী একদিন পরস্পর কিছু আলোচনা করেছিলাম। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) আগমন করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা কি বিষয়ে আলোচনা করছ ? আমরা বললাম : আমরা কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছি। তিনি বললেন : যে পর্যন্ত দশটি আলামত প্রকাশ না পায়, সেই পর্যন্ত কিয়ামত কয়েম হবে না। তিনি দশটি আলামতের মধ্যে ইয়াজুজ-মাজুজের আত্মপ্রকাশও উল্লেখ করলেন।

আয়াতে ইয়াজুজ-মাজুজের জন্য فَتَحَتْ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, সেই নির্ধারিত সময়ের পূর্বে তারা কোন বাধার সম্মুখীন হয়ে থাকবে। কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে যখন আল্লাহ তা'আলা চাইবেন যে, তারা বের হোক, তখন এই বাধা সরিয়ে দেয়া হবে। কোরআন পাক থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, এই বাধা হচ্ছে যুলকারনাইনের প্রাচীর, যা কিয়ামত নিকটবর্তী হলে খতম হয়ে যাবে। প্রাচীরটি এর পূর্বেও ভেঙ্গে যেতে পারে, কিন্তু রাস্তা তখনই সম্পূর্ণ সুগম হবে। সূরা কাহ্‌ফে ইয়াজুজ-মাজুজ, যুলকারনাইনের প্রাচীরের অবস্থানস্থল ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়ে গেছে। সেখানে দেখে নেওয়া দরকার।

حَدَب শব্দের অর্থ প্রত্যেক উচ্চ ভূমি—বড় পাহাড় হোক কিংবা ছোট ছোট টিলা। সূরা কাহ্‌ফে ইয়াজুজ-মাজুজের অবস্থানস্থল সম্পর্কিত আলোচনা থেকে জানা যায় যে, তাদের

জায়গা পৃথিবীর উত্তরদিকস্থ পর্বতমালায় পশ্চাতে। তাই আবির্ভাবের সময় তাদেরকে উত্তরদিকস্থ পর্বত ও টিলাসমূহ থেকে উছলিয়ে পড়তে দেখা যাবে।

انْكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ—অর্থাৎ তোমরা এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাদের ইবাদত কর, সবাই জাহান্নামের ইচ্ছন হবে। দুনিয়াতে কাফিরদের বিভিন্ন দল যেসব মিথ্যা উপাস্যের উপাসনা করেছে, এ আয়াতে তাদের সবার জাহান্নামে প্রবেশ করার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, অবৈধ ইবাদত তো হযরত ইসা (আ), হযরত ওয়ায়র (আ) ও ফেরেশতাদেরও করা হয়েছে। অতএব তাঁরাও কি জাহান্নামে যাবেন? তফসীরে কুরতুবীর এক রেওয়ায়েতে এই প্রশ্নের জওয়াব প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : কোরআন পাকের একটি আয়াত সম্পর্কে অনেকেই সন্দেহ করে ; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এ সম্পর্কে কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করে না। জানি না, সন্দেহের জওয়াব তাদের জানা আছে, এ কারণে জিজ্ঞেস করে না, না তারা সন্দেহ ও জওয়াবের প্রতি জরুপই করে না। লোকেরা আরম্ভ করল? আপনি কোন আয়াতের কথা বলছেন? তিনি বললেন : আয়াতটি হলো এই :

انْكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ—এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর কাফিরদের বিতর্কার অবধি থাকেনি। তারা বলতে থাকে : এতে আমাদের উপাস্যদের চরম অবমাননা করা হয়েছে। তারা (কিতাবী আলিম) ইবনে যবআরীর কাছে পৌছে এ বিষয়ে নালিশ করল। তিনি বললেন : আমি সেখানে উপস্থিত থাকলে তাদেরকে এর সমুচিত জওয়াব দিতাম। আগন্তুকরা জিজ্ঞেস করল : আপনি কি জওয়াব দিতেন? তিনি বললেন : আমি বলতাম যে, খ্রিস্টানরা হযরত ইসা (আ)-এর এবং ইহুদীরা হযরত ওয়ায়র (আ) এর ইবাদত করে। তাদের সম্পর্কে (হে মুহাম্মদ) আপনি কি বলেন? (নাউযুবিল্লাহ) তাঁরাও কি জাহান্নামে যাবেন? কাফিররা একথা শুনে খুবই আনন্দিত হলো যে, বাস্তবিকই মুহাম্মদ এ কথার কোন জওয়াব দিতে পারবেন না। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা—

انَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ—

আয়াতটি নাখিল করেন। অর্থাৎ যাদের জন্য আমার পক্ষ থেকে পুণ্য ও সুফল অবধারিত হয়ে গেছে, তারা এই জাহান্নাম থেকে অনেক দূরে থাকবে।

এই ইবনে যবআরী সম্পর্কেই কোরআন পাকের এই আয়াত নাখিল হয়েছিল :

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْثَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِيتُونَ—অর্থাৎ যখন মারইয়াম তনয়ের দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়, তখন আপনার সম্প্রদায় শোরগোল আরম্ভ করে দেয়।

لا يَخْرُجُ عَنْهُمْ الْفَرْعُ الْاَكْبَرُ—হযরত ইবনে আব্বাস বলেন : ফরজ-আকবর (মহাআস) বলে শিঙ্গার দ্বিতীয় ফুৎকার বোঝানো হয়েছে। এর ফলে সব মৃত জীবিত হয়ে হিসাব-নিকাশের জন্য উদ্ভিত হবে। কারও কারও মতে শিঙ্গার প্রথম ফুৎকার বোঝানো হয়েছে। ইবনে আরাবী বলেন : শিঙ্গায় তিনবার ফুৎকার দেয়া হবে। প্রথম ফুৎকার হবে আসের ফুৎকার। মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)—২৯

এতে সারা বিশ্বের মানুষ সম্ভব হয়ে যাবে। আয়াতে একেই فزع أكبر বলা হয়েছে। দ্বিতীয় ফুৎকার হবে বজ্রের ফুৎকার। এতে সব মানুষ মারা যাবে এবং সবকিছু কানা হয়ে যাবে। তৃতীয় ফুৎকার হবে পুনরুত্থানের ফুৎকার। এতে সব মৃত জীবিত হয়ে যাবে। এই বক্তব্যের সমর্থনে মুসনাদে আবু ইয়াল্লা, বায়হাকী, ইবনে জারীর, তাবারী ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে হযরত আবু হুরায়রার একটি হাদীস উদ্ধৃত করা হয়েছে।—(মায়হারী) وَاللَّهِ أَكْبَرُ

হযরত ইবনে আব্বাস সজ শব্দের অর্থ করেছেন সহীফা। আনী ইবনে ভালহা, আউফী, মুজাহিদ, কাতাদাহ প্রমুখও এই অর্থে বর্ণনা করেছেন। ইবনে কাসীর, ইবনে জারীর প্রমুখও এই অর্থ পছন্দ করেছেন। كتب শব্দের অর্থ এখানে مَكْتُوب অর্থাৎ লিখিত। আয়াতের অর্থ এই যে, কোন সহীফাকে তার লিখিত বিষয়বস্তুসহ যেভাবে গুটানো হয়, আকাশমণ্ডলীকে সেইভাবে গুটানো হবে। (ইবনে কাসীর, রুহুল মা'আনী) سَجَل সম্পর্কে এক রেওয়াজেতে আছে যে, এটা কোন ব্যক্তি অথবা কেরেশতার নাম। হাদীসবিদদের কাছে এই রেওয়াজেতে গ্রাহ্য নয়। আয়াতের মর্ম সম্পর্কে বুখারীতে আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : আন্বাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীকে গুটিয়ে নিজের হাতে রাখবেন। ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, কিয়ামতের দিন আন্বাহ তা'আলা সত্তা আকাশকে তাদের অন্তর্ভুক্তি সব সৃষ্ট বস্তুসহ এবং সত্তা পৃথিবীকে তাদের অন্তর্ভুক্তি সব সৃষ্ট বস্তুসহ গুটিয়ে একত্রিত করে দেবেন। সবগুলো মিলে আন্বাহ তা'আলার হাতে সরিষার একটি দানা পরিমাণ হবে।—(ইবনে কাসীর)

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ

এর রূপটি زَبُور এর বহুবচন। এর অর্থ কিতাব। হযরত দাউদ (আ) এর প্রতি অবতীর্ণ বিশেষ কিতাবের নামও যবুর। এখানে زَبُور বলে কি বোঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি আছে। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের এক রেওয়াজেতে আছে, আয়াতে زَكْر বলে তওরাত এবং زَبُور তওরাতের পর অবতীর্ণ আন্বাহর গ্রন্থসমূহ বোঝানো হয়েছে ; যথা ইনজীল, যবুর ও কোরআন।—(ইবনে জারীর) যাহ্বাক থেকে এরূপ তফসীরই বর্ণিত আছে। ইবনে যায়দ বলেন : زَكْر বলে লগুহে যাহ্বফুয এবং زَبُور বলে পয়গম্বরদের প্রতি অবতীর্ণ সকল আন্বাহর গ্রন্থ বোঝানো হয়েছে। যাজ্জাজ এ অর্থই পছন্দ করেছেন।—(রুহুল মা'আনী)

الْأَرْضِ সাধারণ তফসীরবিদদের মতে এখানে اَرْض (পৃথিবী) বলে আন্বাহের পৃথিবী বোঝানো হয়েছে। ইবনে জারীর ইবনে আব্বাস থেকে এই তফসীর বর্ণনা করেছেন এবং মুজাহিদ, ইবনে যুয়য়র, ইকরামা, সুদী, আবুল আলিয়া থেকেও এই তফসীর বর্ণিত আছে। ইমাম রাযী বলেন : কোরআনের অন্য আয়াত এর সমর্থন করে। তাতে বলা হয়েছে وَأَرْزُقْنَا الْأَرْضَ نَتَّبِعُوا مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ অর্থাৎ সৎকর্মপরায়ণরা এই পৃথিবীর মালিক

হবে। এটাও ইঙ্গিত যে, পৃথিবী বলে জান্নাতের পৃথিবী বোঝানো হয়েছে। কারণ, দুনিয়ার পৃথিবীর মালিক তো মু'মিন-কাকির সবাই হয়ে যায়। এছাড়া এখানে সৎকর্মপরায়ণদের পৃথিবীর মালিক হওয়ার কথাটি কিয়ামতের আলোচনার পর উল্লেখ করা হয়েছে। কিয়ামতের পর জান্নাতের পৃথিবী ছাড়া অন্য কোন পৃথিবীর অস্তিত্ব নেই। ইবনে আব্বাসের অপর এক রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে যে, اَرْضُ -এর অর্থ এখানে সাধারণ পৃথিবী-অর্থাৎ দুনিয়ার পৃথিবীও এবং জান্নাতের পৃথিবীও। (জান্নাতের পৃথিবীর মালিক যে এককভাবে সৎকর্মপরায়ণ হবে, তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। তবে এক সময়ে তারা এককভাবে দুনিয়ার পৃথিবীর মালিক হবে বলেও প্রতিশ্রুতি আছে। কোরআন পাকের একাধিক আয়াতে এই সংবাদ দেয়া হয়েছে। এক আয়াতে আছে اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُورِثُهَا مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ পৃথিবী আল্লাহর। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর মালিক করেন এবং শুভ পরিণাম আলাহুতীরদের জন্যই। অপর এক আয়াতে আছে وَعَسَى اللّٰهُ الَّذِيْ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ اِنَّ تَنْخَسِرُوْا سَلًا وَّ اَلْفَيْنَ : মু'মিন ও সৎকর্মীদেরকে আলাহু ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদের পৃথিবীতে খলীফা করবেন। আরও এক আয়াতে আছে : اِنَّ تَنْخَسِرُوْا سَلًا وَّ اَلْفَيْنَ : নিচর আমি আমার পরায়ণগণকে এবং মু'মিনগণকে পার্থিব জীবনে এবং কিয়ামতের দিন সাহায্য করব। ইমানদার সৎকর্মপরায়ণেরা একবার পৃথিবীর বৃহদাংশ অধিকারভুক্ত করেছিল। জগদ্বাসী তা প্রত্যক্ষ করেছে। দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই পরিস্থিতি অটুট ছিল। মেহদী (আ)-এর যমানায় আবার এ পরিস্থিতির উদ্ভব হবে।—(রুহুল মা'আনী, ইবনে কাসীর)

اِنَّ فِيْ هٰذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عٰبِدِيْنَ ۝ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝ قُلْ اِنَّمَا يُوْحٰى اِلَيَّ اَنْسَا الْهُكْمَ اِلَهٌ وَّ اَحَدٌ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ اَدْنٰكُمْ عَلٰى سَوَآءٍ ۚ وَاِنْ اَدْرِيْ اَقْرَبُ اَمْ بَعِيْدُ مَا تُوعَدُوْنَ ۝ اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُوْنَ ۝ وَاِنْ اَدْرِيْ لَعَلَّهٗ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ۝ قُلْ رَبِّ اَحْكُمْ بِالْحَقِّ ۚ وَرَبُّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعٰنُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ۝

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৩

সূরা মুমিনুন ৫১-৭৭ আয়াত

আয়োজনে



মাউন ফাউন্ডেশন

www.maunfoundation.org

হত্যা করার চেষ্টায় ছিল, তাই) আমি (তার কাছ থেকে সরিয়ে) তাদেরকে এমন এক টিনায় আশ্রয় দিয়েছিলাম, যা (শস্য ও ফলমূল উৎপন্ন হওয়ার কারণে) অবস্থানবোধ্য এবং (নদীনালা প্রবাহিত হওয়ার কারণে) সবুজ-শ্যামল ছিল। (ফলে তিনি শান্তিতেই যৌবনে পদার্পণ করেন এবং নবুয়ত প্রাপ্ত হন। তখন তাওহীদ ও রিসালতের দাবিতে তাকে সত্যবাদী মনে করা জরুরী ছিল ; কিন্তু কেউ কেউ করেনি।)

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿٥٢﴾ فَتَقَطُّوْا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٥٣﴾ فَذَرَهُمْ فِي عُمُرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٥٤﴾ ائْتَسِبُونَ ائْتِمَادَهُمْ مِنْ مَّالٍ وَبَيْنٍ ﴿٥٥﴾ نَسَارَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ مُبِلٌ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٦﴾

(৫১) হে রাসূলগণ, পবিত্র বস্তু আহার করুন এবং সৎকাজ করুন। আপনারা যা করেন সে বিষয়ে আমি পরিজ্ঞাত। (৫২) আপনাদের এই উম্মত সব তো একই ধর্মের অনুসারী এবং আমি আপনাদের পালনকর্তা ; অতএব আমাকে ভয় করুন। (৫৩) অতঃপর মানুষ তাদের বিষয়কে বহুধা বিভক্ত করে দিয়েছে। প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে আনন্দিত হচ্ছে। (৫৪) অতএব তাদের কিছুকালের জন্য তাদের অজ্ঞানতায় নিমজ্জিত থাকতে দিন। (৫৫) তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে যাচ্ছি, (৫৬) তাতে করে তাদেরকে দ্রুত মঙ্গলের দিকে নিয়ে যাচ্ছি ? বরং তারা বুঝে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(আমি যেভাবে তোমাদেরকে নিয়ামতসমূহ ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছি এবং ইবাদত করার আদেশ করেছি, তেমনিভাবে সব পয়গম্বরকে এবং তাঁদের মাধ্যমে তাঁদের উম্মতগণকেও আদেশ করেছি যে,) হে পয়গম্বরগণ, তোমরা (এবং তোমাদের উম্মতগণ) পবিত্র বস্তু আহার কর (কারণ, তা আল্লাহর নিয়ামত) এবং (আহার করে শোকর কর ; অর্থাৎ সৎকাজ কর (অর্থাৎ ইবাদত)। তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে আমি অবগত (অতএব তাদেরকে ইবাদত ও সৎ কর্মের প্রতিদান দেব।) এবং (আমি তাদেরকে আরও বলেছিলাম যে, যে তরিকা এখন তোমাদেরকে বলা হয়েছে) এটা তোমাদের তরিকা (যা মেনে চলা ওয়াজিব) একই তরিকা (সব পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতগণের। কোন শরীয়তে তা বদলায়নি)। এবং তরিকার সারমর্ম এই যে,) আমি তোমাদের পালনকর্তা, অতএব আমাকে ভয় কর। (অর্থাৎ

আমার নির্দেশাবলীর বিরুদ্ধাচরণ করো না। কেননা, পালনকর্তা হওয়ার কারণে আমি তোমাদের স্রষ্টা ও মালিক এবং নিয়ামতদাতা হওয়ার কারণে তোমাদেরকে অগণিত নিয়ামতও দান করি। এসব বিষয় আনুগত্যই দাবি করে।) কিন্তু (এর ফলশ্রুতি হিসেবে সবাই উল্লিখিত একই তরিকার অনুগামী থাকা উচিত ছিল। কিন্তু তারা তা করেনি; বরং) মানুষ তাদের দীন ও তরীকা আলাদা আলাদা করত বিভেদ সৃষ্টি করেছে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কাছে যে দীন (অর্থাৎ নিজেদের তৈরি মতবাদ) আছে, তারা তাতেই বিভোর ও সম্বুষ্ট। (বাতিল হওয়া সত্ত্বেও তাকেই সত্য মনে করে।) অতএব আপনি তাদেরকে তাদের অজ্ঞানতায় বিশেষ সময় পর্যন্ত নিমজ্জিত থাকতে দিন। (অর্থাৎ তাদের মূর্খতা দেখে আপনি দুঃখিত হবেন না। তাদের মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময় যখন এসে যাবে, তখন সব স্বরূপ খুলে যাবে। তাৎক্ষণিকভাবে তাদের উপর আযাব আসে না দেখে) তারা কি মনে করে যে, আমি যে তাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেই, এতে করে তাদেরকে দ্রুত মঙ্গলের দিকে নিয়ে যাচ্ছি? (কখনই নয়) বরং তারা (এই অবকাশ দেওয়ার কারণ) জানে না। অর্থাৎ (এই অবকাশ তো তাদেরকে সুযোগদানের উদ্দেশ্যে দেওয়া হচ্ছে, যা পরিণামে তাদের জন্য আরও বেশি আযাবের কারণ হবে। কারণ, অবকাশ পেয়ে তারা আরও উদ্ধত ও অবাধ্য হবে এবং পাপকাজে বাড়িবাড়ি করবে। ফলে আযাব বাড়বে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا উত্তম বস্তু। ইসলামী শরীয়তে যেসব বস্তু হারাম করা হয়েছে, সেগুলো পবিত্রও নয় এবং জ্ঞানীদের দৃষ্টিতে উত্তম বা কাম্যও নয়। তাই طَيِّبَات শব্দ দ্বারা শুধু বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে পবিত্র হালাল বস্তুসমূহই বুঝতে হবে। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, পয়গম্বরগণকে তাদের সময়ে দুই বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এক, হালাল ও পবিত্র বস্তু আহার কর। দুই, সংকর্ম কর। আল্লাহ তা'আলা পয়গম্বরগণকে নিষ্পাপ রেখেছিলেন, তাঁদেরকেই যখন একথা বলা হয়েছে, তখন উম্মতের জন্য এই আদেশ আরও পালনীয়। বস্তুত আসল উদ্দেশ্যও উম্মতকে এই আদেশের অনুগামী করা।

আলিমগণ বলেন : এই দুটি আদেশকে এক সাথে বর্ণনা করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সংকর্ম সম্পাদনে হালাল খাদ্যের প্রভাব অপরিণীম। খাদ্য হালাল হলে সংকর্মের তওফীক আপনা-আপনি হতে থাকে। পক্ষান্তরে খাদ্য হারাম হলে সংকর্মের ইচ্ছা করা সত্ত্বেও তাতে নানা বিপত্তি প্রতিবন্ধক হয়ে যায়। হাদীসে আছে, কেউ কেউ সুদীর্ঘ সফর করে এবং ধূলি-ধূসরিত থাকে। এরপর আল্লাহর সামনে দোয়ার জন্য হাত প্রসারিত করে ইয়া রব বলে ডাকে; কিন্তু তাদের খাদ্যও হারাম এবং পানীয়ও হারাম। পোশাকও হারাম ঘরা তৈরি হয় এবং হারাম পথেই তাদের খাদ্য আসে। এরূপ লোকদের দোয়া কিরূপে কবুল হতে পারে? —(কুরতুবী)

এ থেকে বুঝা গেল যে, ইবাদত ও দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে হালাল খাদ্যের অনেক প্রভাব আছে। খাদ্য হালাল না হলে ইবাদত ও দোয়া কবুল হওয়ার যোগ্য হয় না।

وَإِنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ — শব্দটি সম্প্রদায় ও কোন বিশেষ পয়গম্বরের জাতির অর্থে প্রচলিত ও সুবিদিত। কোন সময় তরিকা ও দীনের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন وَجِئْنَا بِآبَاعِ عَلَى أُمَّةٍ আয়াতে দীন ও তরিকা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতেও এই অর্থ বুঝানো হয়েছে।

فَنَقْطَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُورًا — শব্দটি زبور এর বহুবচন। এর অর্থ কিতাব। এই অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা সব পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতকে মূলনীতি ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে একই দীন ও তরীকা অনুযায়ী চলার নির্দেশ দিয়েছিলেন; কিন্তু উম্মতগণ তা মানেনি। তারা পরস্পর বহুধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ তরীকা ও কিতাব আলাদা করে নিয়েছে। زبور শব্দটি কোন সময় زبرة এরও বহুবচন হয়। এর অর্থ খণ্ড ও উপদল। এখানে এই অর্থই সুস্পষ্ট। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, তারা বিশ্বাস ও মূলনীতিতেও বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। মুজতাহিদ ইমামগণের শাখাগত মতবিরোধ এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ, এসব মতবিরোধের ফলে দীন ও মিল্লাত পৃথক হয়ে যায় না এবং এরূপ মতভেদকারীদেরকে ভিন্ন সম্প্রদায় বলে অভিহিত করা হয় না। এই ইজতিহাদী ও শাখাগত মতবিরোধকে সাম্প্রদায়িকতার রং দেওয়া মূর্খতা, যা কোন মুজতাহিদের মতেই জায়েয নয়।

إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ⑤٩ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ⑥٠ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ⑥١ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ ⑥٢ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ⑥٣ أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ⑥٤ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ⑥٥ وَلَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ ⑥٦ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ⑥٧

(৫৯) নিশ্চয় যারা তাদের পালনকর্তার ভয়ে সন্ত্রস্ত, (৫৮) যারা তাদের পালনকর্তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে, (৫৯) যারা তাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক করে না (৬০) এবং যারা যা দান করবার, তা ভীত কল্পিত হৃদয়ে এ কারণে দান করে যে, তারা তাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করবে; (৬১) তারাই কল্যাণ দ্রুত অর্জন করে এবং তারা তাতে অগ্রগামী। (৬২) আমি কাউকে তার সাধ্যাভীত দায়িত্ব অর্পণ করি না। আমার এক কিতাব আছে, যা সত্য ব্যক্ত করে এবং তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যারা তাদের পালনকর্তার ভয়ে সন্ত্রস্ত, যারা তাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, যারা তাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক করে না এবং যারা (আল্লাহর পথে) যা দান করবার তা দান করে, (দান করা সত্ত্বেও) তাদের হৃদয় ভীতকম্পিত থাকে এ কারণে যে, তাদেরকে তাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে (সেখানে তাদের দান খয়রাতের কি ফল প্রকাশ পাবে। কোথাও এই দান আদেশ অনুযায়ী না হয়ে থাকে ; যেমন দানের মাল হালাল ছিল না, কিংবা নিয়ত ঝাঁটি ছিল না। এসব হলে উল্টা বিপদে পড়তে হবে। অতএব যাদের মধ্যে এসব গুণ আছে) তারাই নিজেদের কল্যাণ দ্রুত অর্জন করে এবং তারা তাতে অগ্রগামী। (উল্লিখিত আমলগুলো তেমন কঠিনও নয় যে, তা পালন করা দুষ্কর হবে। কেননা,) আমি কাউকে তার সাধ্যাভীত কাজ করতে বলি না। (তাই এসব কাজ সহজ এবং এগুলোর শুভ পরিণতি নিশ্চিত। কেননা,) আমার কাছে এক কিতাব (আমলনামা সংরক্ষিত) আছে, যা ঠিক ঠিক (সবার অবস্থা) ব্যক্ত করবে এবং তাদের প্রতি যুলুম হবে না।

আনুমানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

“وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَاوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ” — وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ শব্দটি ইন্যা থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ দেওয়া ও খরচ করা। তাই দান-খয়রাত দ্বারা এর তফসীর করা হয়েছে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে এর এক কিতাবাত آتَاوْا بِمَا يُؤْتُونَ ও বর্ণিত আছে। অর্থাৎ যা আমল করার, তা আমল কর। এতে দান-খয়রাত নামায, রোযা ও সব সংকর্ম शामिल হয়ে যায়। প্রসিদ্ধ কিতাবাত অনুযায়ী যদিও এখানে দান-খয়রাতেরই আলোচনা হবে ; কিন্তু উদ্দেশ্য সাধারণ সংকর্ম ; যেমন এক হাদীসে হযরত আয়েশা (রা) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এই আয়াতের মর্ম জিজ্ঞেস করলাম যে, এই কাজ করে লোক ভীতকম্পিত হবে ? তারা, কি মদ্যপান করে কিংবা চুরি করে ? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : হে সিদ্দীকতনয়া, এরা নয় ; বরং এরা তারা, যারা রোযা রাখে, নামায পড়ে এবং দান-খয়রাত করে। এতদসত্ত্বেও তারা শঙ্কিত থাকে যে, সম্ভবত আমাদের এই কাজ আল্লাহর কাছে (আমাদের কোন ত্রুটির কারণে) কবুল হবে না। এ ধরনের লোকই সংকাজ দ্রুত সম্পাদন করে এবং তাতে অগ্রগামী থাকে। (আহমদ, তিরমিযী, ইবনে-মাজা-মায়হারী), হযরত হাসান বসরী বলেন : আমি এমন লোক দেখেছি যারা সংকাজ করে ততটুকুই ভীত হয়, যতটুকু তোমরা মন্দ কাজ করেও ভীত হও না। —(কুরতুবী)

وَأُولَٰئِكَ يَسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَمَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ দ্রুত সংকাজ করার অর্থ এই যে, সাধারণ লোক যেমন পার্থিব মুনাফার পেছনে দৌড়ে এবং অপরকে পেছনে ফেলে অগ্রে যাওয়ার চেষ্টা করে, তারা ধর্মীয় উপকারের কাজে তেমনি সচেষ্ট হয়। এ কারণেই তারা ধর্মের কাজে অন্যদের চাইতে অগ্রগামী থাকে।

بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَٰذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا
 عَمَلُونَ ﴿٥٥﴾ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيَهُم بِالْعَظَابِ إِذَا هُمْ يَجْرُونَ ﴿٥٦﴾ لَا تَجْعَلُوا
 الْيَوْمَ مَقَاتِلَكُمْ مِّثْلًا لَا تَنْصُرُونِ ﴿٥٧﴾ قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ آعْقَابِ
 بِكُمْ تَتَكَبَّرُونَ ﴿٥٨﴾ مُسْتَكْبِرِينَ فِيهِ سَمِرًا تَهْجُرُونَ ﴿٥٩﴾ أَفَلَمْ يَذَرُوا الْقَوْلَ
 أَمْ جَاءَهُمْ مَّا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٦٠﴾ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ
 لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿٦١﴾ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ ۚ بَلْ جَاءَهُمُ بِالْحَقِّ وَكَثُرَهُمُ لِلْحَقِّ
 كِرْهُونَ ﴿٦٢﴾ وَلَوْ أَتَبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۚ
 بَلْ أَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿٦٣﴾ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خُرْجًا
 فَخَرَجَ رَبُّكَ خَيْرٌ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٦٤﴾ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ
 مُّسْتَقِيمٍ ﴿٦٥﴾ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنُكَيِّسُونَ ﴿٦٦﴾
 وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلْجُؤَافِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٦٧﴾
 وَلَقَدْ أَخَذْنَا لَهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَاثُوا إِلَهُهُمْ وَمَا يَنْصُرُهُمْ عُونٌ ﴿٦٨﴾ حَتَّىٰ
 إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٦٩﴾

(৬৩) না, তাদের অন্তর এ বিষয়ে অজ্ঞানতার আচ্ছন্ন, এ ছাড়া তাদের আরও কাজ রয়েছে, যা তারা করছে। (৬৪) এমনকি যখন আমি তাদের ঐশ্বর্যশালী লোকদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করব, তখনই তারা চিৎকার জুড়ে দেবে। (৬৫) অদ্য চিৎকার করো না। তোমরা আমার কাছ থেকে নিষ্কৃতি পাবে না। (৬৬) তোমাদেরকে আমার আয়াতসমূহ শোনানো হতো, তখন তোমরা উষ্টো পায়ে সরে পড়তে (৬৭) অহংকার করে এ বিষয়ে অর্থহীন পল্ল-পল্লব করে যেতে। (৬৮) অতএব তারা কি এই কালাম সম্পর্কে চিন্তাভাবনা

করে না ? না তাদের কাছে এমন কিছু এসেছে, যা তাদের পিতৃপুরুষদের কাছে আসেনি? (৬৯) না তারা তাদের রাসূলকে চেনে না, ফলে তারা তাঁকে অস্বীকার করে ? (৭০) না তারা বলে যে, তিনি পাগল -? বরং তিনি তাদের কাছে সত্য নিয়ে আগমন করেছেন এবং তাদের অধিকাংশ সত্যকে অপছন্দ করে। (৭১) সত্য যদি তাদের কাছে কামনা-বাসনার অনুসারী হতো, তবে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এতলোর মধ্যবর্তী সবকিছুই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ত। বরং আমি তাদেরকে দান করেছি উপদেশ কিন্তু তারা তাদের উপদেশ অনুধাবন করে না। (৭২) না আপনি তাদের কাছে কোন প্রতিদান চান ? আপনার পালনকর্তার প্রতিদান উত্তম এবং তিনিই রিযিকদাতা। (৭৩) আপনি তো তাদেরকে সোজা পথে দাওয়াত দিচ্ছেন ; (৭৪) আর যারা পরকাল বিশ্বাস করে না, তারা সোজা পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে। (৭৫) যদি আমি তাদের প্রতি দয়া করি এবং তাদের কষ্ট দূর করে দেই, তবুও তারা তাদের অবাধ্যতায় দিশেহারা হয়ে লেগে থাকবে। (৭৬) আমি তাদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম ; কিন্তু তারা তাদের পালনকর্তার সামনে নত হলো না এবং কাকুতি-মিনতিও করল না। (৭৭) অবশেষে যখন আমি তাদের জন্য কঠিন শাস্তির দ্বার খুলে দেব, তখন তাতে তাদের আশা ভঙ্গ হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(উপরে মু'মিনদের অবস্থা ওনলে ; কিন্তু কাকিররা এরূপ নয় ;) বরং (এর বিপরীতে,) কাকিরদের অন্তর এ (দীনের) বিষয়ে (যা بَيِّنَاتٍ رَبِّهِمْ এ উল্লিখিত হয়েছে) অজ্ঞানতায় (সন্দেহে) নিমজ্জিত রয়েছে। (তাদের অবস্থা فَنَزَلْنَاهُمْ فِي غُرَّتِهِمْ আয়াতেও জানা গেছে)। এছাড়া (অর্থাৎ এই অজ্ঞানতা ও অস্বীকৃতি ছাড়া) তাদের আরও (মন্দ ও অপবিদ্র) কাজ আছে, যা তারা (অনবরত) করছে। (তারা শিরক ও মন্দকাজে সর্বদা লিপ্ত থাকবে) এমনকি, যখন আমি তাদের ঐশ্বর্যশালী লোকদেরকে (যাদের কাছে মাল-দৌলত, চাকর-নওকর সবকিছু রয়েছে, মৃত্যু-পরবর্তী) আযাব দ্বারা পাকড়াও করব (গরীবদের তো কথাই নেই, এবং তাদের আযাব থেকে বাঁচার কোন প্রশ্নই উঠে না। মোটকথা, যখন তাদের সবার উপর আযাব নাযিল হবে) তখনই তারা আর্তনাদ করে ওঠবে (এবং তাদের বর্তমান অস্বীকৃতি ও অহংকার কর্পূরের ন্যায় উবে যাবে। তখন তাদেরকে বলা হবে :) আজ আর্তনাদ করো না (কারণ, কোন ফায়দা নেই) আমার পক্ষ থেকে তোমাদেরকে মোটেই সাহায্য করা হবে না। (কারণ, এটা প্রতিদান জগৎ—কর্মজগৎ নয়, যাতে আর্তনাদ ও কাকুতি-মিনতি কাজে আসে। কর্ম জগতে তো তোমাদের এমন অবস্থা ছিল যে,) আমার আয়াতসমূহ তোমাদেরকে (রাসূলের মুখে) পাঠ করে শোনানো হতো, তখন তোমরা দম্ভভরে এই কোরআন সম্পর্কে বাজে গল্পগুজব বলতে বলতে উষ্টোপায়ে সরে পড়তে (কেউ একে যাদু বলত এবং কেউ কবিতা বলত। সুতরাং তোমরা কর্মজগতে যা করেছ, প্রতিদান জগতে তা ভোগ কর। তারা যে কোরআন ও কোরআনবাহীকে মিথ্যাবাদী বলছে, এর কারণ কি ?) তারা কি এই (আল্লাহর) কালাম সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করেনি ? (যাতে

এর অলৌকিকতা ফুটে উঠত এবং তারা বিশ্বাস স্থাপন করত) না, তাদের কাছে এমন কিছু এসেছে, যা তাদের পিতৃপুরুষদের কাছে আসেনি ? (অর্থাৎ আল্লাহর বিধানাবলী আসা, যা নতুন কিছু নয়। চিরকালই পয়গম্বরদের মাধ্যমে উম্মতদের কাছে বিধানাবলীই এসেছে। যেমন এক আয়াতে আছে *مَا كُنْتُ بِذَعَا مِنْ الرُّسُولِ* সূতরাং মিথ্যাবাদী বলার এই কারণও অসার প্রতিপন্ন হলো। এই দুইটি কারণ কোরআন সম্পর্কিত ; অতঃপর কোরআনবাহী সম্পর্কে বলা হচ্ছেঃ) না, (মিথ্যাবাদী বলার কারণ এই যে) তারা তাদের রাসূল সম্পর্কে (অর্থাৎ রাসূলের সত্যতা, ধর্মপরায়ণতা ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে) জ্ঞাত ছিল না, ফলে, তাঁকে অস্বীকার করে ? (অর্থাৎ এই কারণও বাতিল। কেননা, রাসূলের সত্যতা ও ন্যায়পরায়ণতা সবাই এক বাক্যে স্বীকার করত।) না (কারণ এই যে,) তারা (নাউযুবিল্লাহ) বলে যে, সে পাগল ? (রাসূল যে উকুত্তরের বুদ্ধিমান ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন, তাও সুস্পষ্ট। অতএব উল্লিখিত কোন কারণই বাস্তবে যুক্তিযুক্ত নয়।) বরং (আসল কারণ এই যে,) তিনি (রাসূল) তাদের কাছে সত্য নিয়ে আগমন করেছেন এবং তাদের অধিকাংশই সত্যকে অপছন্দ করে। (বাস, মিথ্যাবাদী বলার এবং অনুসরণ না করার এটাই একমাত্র কারণ। বস্তুত তারা সত্য ধর্মের কি অনুসরণ করবে, তারা তো উল্টা এটাই চায় যে, সত্য ধর্মই তাদের চিন্তাধারার অনুসরণ করুক। কাজেই কোরআনে যেসব বিষয়বস্তু তাদের চিন্তাধারার বিপক্ষে রয়েছে, সেগুলোকে বাতিল কিংবা পরিবর্তন করা হোক। যেমন এক আয়াতে আছে *قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا إِنَّهُ بَقْرَانٌ غَيْرُ هَذَا أَوْ بَدَّلَهُ* এবং (অসম্ভবকে ধরে নেওয়ার পর্যায়ে) যদি (বাস্তবে এমন হতো এবং) সত্য তাদের কামনা-বাসনার আনুগামী (ও অনুকূলে) হতো, তবে (সারা বিশ্বে কুফরেরই শিরক ছড়িয়ে পড়ত। ফলে, আল্লাহর গযব বিশ্বকে গ্রাস করে নিত। পরিণামে) নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল এবং এগুলোর মধ্যবর্তী সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যেত ; (যেমন কিয়ামতে সব মানুষের মধ্যে পথভ্রষ্টতা ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়ার কারণে আল্লাহ তা'আলার গযবও সবার উপর ব্যাপক আকারে হবে এবং গযব ব্যাপক হওয়ার কারণে ধ্বংসযজ্ঞও ব্যাপক হবে। কোন বিষয় যদি সত্য হয়, তবে তা উপকারী না হলেও কবুল করা ওয়াজিব হয়। এমতাবস্থায় কবুল না করাই স্বয়ং অপরাধ। কিন্তু তাদের শুধু সত্যকে অপছন্দ করারই দোষ নয় ;) বরং (এছাড়া অন্য আরও দোষ আছে। তা এই যে, সত্যের অনুসরণ থেকে তারা দূরে পলায়ন করে ; অথচ এতে তাদেরই উপকার ছিল। বাস,) আমি তাদের কাছে তাদের উপদেশ (ও উপকার) প্রেরণ করেছি ; কিন্তু তারা তাদের উপদেশ থেকেও মুখ ফিরিয়ে নেয়। না (উপরোক্ত কারণগুলো ছাড়া তাদের মিথ্যাবাদী বলার কারণ এই যে, তাদের সন্দেহ হয়েছে যে,) আপনি তাদের কাছে প্রতিদান জাতীয় কোনকিছু চান ? (এটাও ভুল। কেননা, আপনি যখন জানেন যে,) আপনার পালনকর্তার প্রতিদানই সর্বোত্তম এবং তিনিই শ্রেষ্ঠতম দাতা (তখন আপনি তাদের কাছে কেন প্রতিদান চাইতে যাবেন ? তাদের অবস্থার সারমর্ম এই যে,) আপনি তো তাদেরকে সরল পথের দিকে (যাকে উপরে সত্য বলা হয়েছে) দাওয়াত দিচ্ছেন, আর যারা পরকাল বিশ্বাস করে না, তারা এই (সরল) পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছে। (উদ্দেশ্য এই যে, সত্য হওয়া, সরল হওয়া ও উপকারী হওয়া এগুলো সবই ইমানের দাবি করে এবং অন্তরায়ের যেসব কারণ হতে পারত, তার একটিও বিদ্যমান নেই। এমতাবস্থায়

ইমান না আনা মূর্খতা ও পথভ্রষ্টতা।) এবং (তাদের অন্তর এমনি কঠোর ও হঠকারী যে, শরীয়তের নিদর্শনাবলী দ্বারা যেমন তারা প্রভাবান্বিত হয় না, তেমনি বালা-মুসীবত ও গম্বের নিদর্শনাবলী দ্বারাও তারা প্রভাবান্বিত হয় না, যদিও বিপদ মুহূর্তে আমাকে আহ্বান করে, কিন্তু এই আহ্বান নিছক বিপদ বলানোর উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। সেমতে) যদি আমি তাদের প্রতি দয়া করি এবং তাদের কষ্ট দূরও করে দেই, তবুও তারা অবাধ্যতায় দিশেহারা হয়ে লেগে থাকবে (এবং বিপদের সময় যে ওয়াদা অঙ্গীকার করেছিল, সব খতম হয়ে যাবে; যেমন এ আয়াতে আছে اِنَّ مَسُّ الْاَنْسَانِ الْفُسْرُ دَعَانَا الْخِ অর্থাৎ অন্য আয়াতে আছে اِنَّ رَكْبُوْا فِى الْاَفْكَ এর প্রমাণ এই যে, মাঝে মাঝে) আমি তাদেরকে আযাবে প্রেফতারও করেছি; কিন্তু তারা তাদের পালনকর্তার সামনে (পুরোপুরি) নত হয়নি এবং কাকুতি-মিনতি করেনি। (সুতরাং ঠিক বিপদমুহূর্তেও যখন—বিপদও এমন কঠোর, যাকে আযাব বলা চলে; যেমন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বদদোয়ার ফলে মক্কায় দুর্ভিক্ষ হয়েছিল—তারা নতি স্বীকার করেনি, তখন বিপদ দূর হয়ে গেলে তো এরূপ আশা করাই বৃথা। কিন্তু তাদের এসব বেপরোয়া ভাব ও নিভীকতা অভ্যস্ত বিপদাপদ পর্যন্তই থাকবে।) অবশেষে আমি যখন তাদের জন্য কঠিন আযাবের দ্বার খুলে দেব (যা হবে অলৌকিক, দুনিয়াতেই কোন গায়েবী গম্ব এসে পড়বে কিংবা মৃত্যুর পর তো অবশ্যজারী হবে), তখন তারা সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে যাবে (যে একি হলো; তখন সব নেশা উধাও হয়ে যাবে;)

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

“غَمْرَةٌ” এর অর্থ এমন গভীর পানি, যাতে মানুষ ডুবে যায় এবং যা প্রবেশকারীকে নিজের মধ্যে গোপন করে নেয়। এ কারণেই غَمْرَةٌ শব্দ আবরণ ও আবৃতকারী বস্তুর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে তাদের মুশরিকসুলভ মূর্খতাকে غَمْرَةٌ বলা হয়েছে, যাতে তাদের অন্তর নিমজ্জিত ও আবৃত ছিল এবং কোন দিক থেকেই আলোর কিরণ পৌছত না।

“وَلَهُمْ اَعْمَالٌ مِّنْ تٰوْنِ ذٰلِكَ” অর্থাৎ তাদের পথভ্রষ্টতার জন্য তো এক শিরক ও কুফরের আবরণই যথেষ্ট ছিল; কিন্তু তারা এতেই ক্ষান্ত ছিল না, অন্যান্য কুক্রমও অনবরত করে যেত।

مُتْرَفِيْهِمْ শব্দটি تَرَف থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ ঐশ্বর্য ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যশীল হওয়া। এখানে কওমকে আযাবে প্রেফতার করার কথা আলোচনা করা হয়েছে। এতে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবাই দাখিল হবে। কিন্তু ঐশ্বর্যশালীদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, তারাই দুনিয়ার বিপদাপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার কিছু না কিছু ব্যবস্থা করে নেয়। কিন্তু আল্লাহর আযাব যখন আসে, তখন সর্বপ্রথম তারাই অসহায় হয়ে পড়ে। এই আয়াতে তাদেরকে যে আযাবে প্রেফতার করার কথা বলা হয়েছে, হয়রত ইবনে আব্বাস বলেন যে, এতে সেই আযাব বুঝানো হয়েছে, যা বদর যুদ্ধে মুসলমানদের তরবারি দ্বারা তাদের সরদারদের উপর পতিত হয়েছিল। কারণ কারণ মতে এই আযাব দ্বারা দুর্ভিক্ষের আযাব বুঝানো হয়েছে, যা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বদদোয়ার কারণে মক্কাবাসীদের উপর চাপিয়ে

দেয়া হয়েছিল। ফলে, তারা মৃত জন্তু, কুকুর এবং অস্থি পর্যন্ত খেতে বাধ্য হয়েছিল। রাসূলে করীম (সা) কাকিরদের জন্য খুবই কম বদদোয়া করেছিলেন। কিন্তু এ স্থলে মুসলমানদের উপর তাদের নির্যাতন সীমা ছাড়িয়ে গেলে তিনি বাধ্য হয়ে এরূপ দোয়া করেন **اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسنى يوسف** (বুখারী, মুসলিম-কুরতুবী)

—**مُسْتَكْبِرِينَ بِسَامِرٍ أَتَجَرُّونَ**—অধিকাংশ তফসীরবিদদের মতে **سَمِرٍ** শব্দের সর্বনাম হেরেমের দিকে ফেরে, যা পূর্বে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। হেরেমের সাথে কুরাইশদের গভীর সম্পর্ক এবং একে নিয়ে তাদের গর্ব সুবিদিত ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে শব্দটি উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। অর্থ এই যে, মক্কার কুরাইশদের আব্দুল্লাহর আয়াতসমূহ শুনে উল্টা পায়ে সরে যাওয়া এবং না মানার কারণ হেরেমের সাথে সম্পর্ক ও তার তত্ত্বাবধানপ্রসূত অহংকার ও গর্ব ছিল। **سَامِرٍ** শব্দটি **سَمَر** থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ চাঁদনী রাত্রি। চাঁদনী রাতে বসে গল্পগুজব করা ছিল আরবদের অভ্যাস। তাই **سَمَر** শব্দটি গল্পগুজব করার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। **سَامِر** বলা হয় গল্পগুজবকারীকে। শব্দটি একবচন হলেও বহুবচনের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে বহুবচনের অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। মুশরিকরা যে আব্দুল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করত, তার এক কারণ ছিল হেরেমের সাথে সম্পর্ক, তত্ত্বাবধানজনিত অহংকার ও গর্ব, দ্বিতীয় কারণ বর্ণিত হয়েছে এই যে, তারা ভিত্তিহীন ও বানোয়াট গল্পগুজবে মেতে থাকে, এটাই তাদের অভ্যাস। আব্দুল্লাহর আয়াতসমূহের প্রতি তাদের কোন ঔৎসুক্য নেই।

تَهْجُرُونَ শব্দটি **فُجِرَ** থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বাজে প্রলাপ ও গালিগালাজ। আব্দুল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করার এটা তৃতীয় কারণ। অর্থাৎ তারা বাজে প্রলাপোক্তি ও গালিগালাজে অভ্যস্ত। রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে এমনি ধরনের ধৃষ্টতাপূর্ণ বাক্যে তারা বলত।

এশার পর কিসসা-কাহিনী বলা নিষিদ্ধ, এ সম্পর্কে বিশেষ নির্দেশ : রাত্রিকালে কিসসা-কাহিনী বলার প্রথা আরব-আজমে প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত রয়েছে। এতে অনেক কৃতিকর দিক ছিল এবং বৃথা সময় নষ্ট হতো। রাসূলুল্লাহ (সা) এই প্রথা মিটানোর উদ্দেশ্যে এশার পূর্বে নিদ্রা যাওয়া এবং এশার পর অনর্থক কিসসা-কাহিনী বলা নিষিদ্ধ করে দেন। এর পেছনে রহস্য ছিল এই যে, এশার নামাযের সাথে সাথে মানুষের সেদিনের কাজকর্ম শেষ হয়ে যায়। এই নামায সারাদিনের গুনাহসমূহের কাফফারাও হতে পারে। কাজেই এটাই তার দিনের সর্বশেষ কাজ হওয়া উত্তম। যদি এশার পর অনর্থক কিসসা-কাহিনীতে লিপ্ত হয়, তবে প্রথমত এটা স্বয়ং অনর্থক ও অপছন্দনীয় ; এছাড়া এই প্রসঙ্গে পরনিশা, মিথ্যা এবং আরও কত রকমের গুনাহ সংঘটিত হয়। এর আরেকটি কুপরিণতি এই যে, বিলম্বে নিদ্রা গেলে প্রত্যুষে জাগ্রত হওয়া সম্ভবপর হয় না। এ কারণেই হযরত উমর (রা) এশার পর কাউকে গল্পগুজবে মত্ত দেখলে শাসিয়ে দিতেন এবং কতককে শাস্তিও দিতেন। তিনি বলতেন : শীঘ্র নিদ্রা যাও; সম্ভবত শেষরাতে তাহাজ্জুদ পড়ার তওফীক হয়ে যাবে। —(কুরতুবী)

‘أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ’ পর্যন্ত পাঁচটি এমন বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, যা মুশরিকদের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে কোন না কোন স্তরে প্রতিবন্ধক হতে পারত। এগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটি বিষয়ই যে অনুপস্থিত, তাও সাথে সাথে বর্ণনা করা হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, যেসব কারণ তাদের জন্য ঈমানের পথে অন্তরায় হতে পারত, তার একটিও এখানে বর্তমান নেই। পক্ষান্তরে বিশ্বাস স্থাপনের জন্যে যেসব কারণ হতে পারে, সেগুলো সব বর্তমান রয়েছে। এমতাবস্থায় তাদের অস্বীকার নির্ভেজাল শত্রুতা ও হঠকারিতা ছাড়া কিছুই নয়। পরবর্তী আয়াতে একথা এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে: **بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمُ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ** অর্থাৎ রিসালত অস্বীকার করার কোন যুক্তিসঙ্গত ও স্বভাবজাত কারণ তো বর্তমান নেই; এতদসত্ত্বেও তাদের অস্বীকারের কারণ এছাড়া কিছুই নয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) সত্য নিয়ে আগমন করেছেন, আর তারা সত্যকেই অপছন্দ করে শুনতে চায় না। এর কারণ কুপ্রবৃত্তি ও কুবাসনার আধিক্য, রাজত্ব ও ক্ষমতার মোহ এবং মূর্খদের অনুসরণ। ঈমান ও নবুয়ত স্বীকার করে নেওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হিসেবে যে পাঁচটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে, তন্মধ্যে একটি এই।

أَفَلَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ—অর্থাৎ তাদের অস্বীকারের এক কারণ হতে পারত এই যে, যে ব্যক্তি সত্যের দাওয়াত ও নবুয়তের দাবি নিয়ে আগমন করেছেন, তিনি ভিন দেশের লোক। তাঁর বংশ, অভ্যাস, চালচলন ও চরিত্র সম্পর্কে তারা জ্ঞাত নয়। এমতাবস্থায় তারা বলতে পারত যে, আমরা এই নবীর জীবনালেখ্য সম্পর্কে অবগত নই; কাজেই তাঁকে নবী ও রাসূল মেনে কিরূপে অনুসরণ করতে পারি? কিন্তু এখানে তো এরূপ অবস্থা নয়। বরং একথা সুস্পষ্ট ছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সা) সম্ভ্রান্ত কুরাইশ বংশে এই শহরেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং শৈশব থেকে শুরু করে তাঁর যৌবন ও পরবর্তী সমগ্র যামানার তাদের সামনেই অতিবাহিত হয়েছিল। তাঁর কোন কর্ম, কোন অভ্যাসই তাদের কাছে গোপন ছিল না। নবুয়ত দাবি করার পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র কাফির সম্প্রদায় তাঁকে ‘সাদিক’ ও ‘আমীন’—সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত বলে সন্মোদন করত। তাঁর চরিত্র ও কর্ম সম্পর্কে কেউ কোনদিন কোন সন্দেহই করেনি। কাজেই তাদের এ অজুহাতও অচল যে, তারা তাঁকে চেনে না।

وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَلَا يَتَضَرَّعُونَ-

পূর্ববর্তী আয়াতে মুশরিকদের সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, তারা আযাবে পতিত হওয়ার সময় আল্লাহ্র কাছে অথবা রাসূলের কাছে ফরিয়াদ করে। আমি যদি তাদের ফরিয়াদের কারণে দয়াপরবশ হয়ে আযাব সরিয়ে দেই, তবে মজ্জাগত অবাধ্যতার কারণে আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার পরক্ষণেই আবার নাফরমানীতে মশগুল হয়ে যাবে। এই আয়াতে তাদের এমনি ধরনের এক ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদেরকে একবার এক আযাবে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু রাসূলে করীম (সা)-এর দোয়ার বরকতে আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার পরও তারা আল্লাহ্র কাছে নত হয়নি এবং কুফর ও শিরকেই আঁকড়ে থাকে।

মক্কাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষের আযাব এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দোয়ায় তা দূর হওয়াঃ পূর্বেই বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষের আযাব সওয়াব হওয়ার দোয়া করেছিলেন। ফলে তারা ঘোরতর দুর্ভিক্ষে পতিত হয় এবং মৃত জন্তু, কুকুর ইত্যাদি ভক্ষণ করতে বাধ্য হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে আবু সুফিয়ান রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে মদীনায় উপস্থিত হয় এবং বলে : আমি আপনাকে আল্লাহর আত্মীয়তার কসম দিচ্ছি। আপনি কি একথা বলেন নি যে, আপনি বিশ্ববাসীদের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন ; তিনি উত্তরে বললেন : নিঃসন্দেহে আমি একথা বলেছি এবং বাস্তবেও তাই। আবু সুফিয়ান বলল : আপনি স্বগোত্রের প্রধানদেরকে তো বদর যুদ্ধে তরবারি দ্বারা হত্যা করেছেন। এখন যারা জীবিত আছে, তাদেরকে ক্ষুধা দিয়ে হত্যা করেছেন। আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, যাতে এই আযাব আমাদের উপর থেকে সরে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা) দোয়া করলেন। ফলে, তৎক্ষণাৎ আযাব খতম হয়ে গেল। এর পরিপ্রেক্ষিতেই لَقَدْ أَخَذْنَاهُمُ الْغَلَّ, আয়াত নাযিল হয়।

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, আযাবে পতিত হওয়া অতঃপর তা থেকে মুক্তি পাওয়ার পরও তারা তাদের পালনকর্তার সামনে নত হয়নি। বাস্তব ঘটনা তাই ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দোয়ায় দুর্ভিক্ষ দূর হয়ে গেল ; কিন্তু মক্কার মুশরিকরা তাদের শিরক ও কুফরে পূর্ববৎ অটল রইল। —(মাযহারী)

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٩٧﴾
 وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٨﴾ وَهُوَ الَّذِي
 يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۚ فَلَآ تَعْقِلُونَ ﴿٩٩﴾ بَلْ
 قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ﴿١٠٠﴾ قَالُوا ۖ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا
 وَعِظَامًا ۖ إِنَّا لَبَعُوثُونَ ﴿١٠١﴾ لَقَدْ وَعَدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِن قَبْلُ
 إِن هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٠٢﴾ قُلْ لِّلنَّارِ وَالْأَرْضِ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ
 تَعْلَمُونَ ﴿١٠٣﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٠٤﴾ قُلْ مَن رَّبُّ
 السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿١٠٥﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا
 تَتَّقُونَ ﴿١٠٦﴾ قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ جِئْرٌ وَلَا يُجَارُ

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৩

সূরা যুমার

আয়োজনে



মাউন ফাউন্ডেশন

www.maunfoundation.org

سورة الزمر

अज्ञा अज्ञा

पञ्चाशत् अक्षरीयः १० वाक्यः, ८० अक्षरः

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ بِالْحَقِّ ۖ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۚ الْأَلِلُّ الدِّينَ الْغَالِصُ
وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ
زُلْفَىٰ ۖ إِنْ أَرَادَ اللَّهُ بِكُمُ الْيَقِينَ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۚ إِنْ أَرَادَ اللَّهُ
بِكُمُ الْيَقِينَ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۚ إِنْ أَرَادَ اللَّهُ بِكُمُ الْيَقِينَ فِي مَا هُمْ فِيهِ
يَخْتَلِفُونَ ۚ إِنْ أَرَادَ اللَّهُ بِكُمُ الْيَقِينَ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۚ
يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۖ سُبْحَنَهُ ۖ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۚ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۖ يَكُونُ اللَّيْلُ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ
وَسَعَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى ۖ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ
الْعَلِيُّ الْخَلَّاقُ ۚ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ
لَكُمْ مِنْ الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَّةَ أَزْوَاجٍ ۚ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا
مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمٍ ثَلَاثٍ ۚ ذُرِّيَّتُكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۖ لَا إِلَهَ
إِلَّا هُوَ ۖ فَاتَّقُوا ۚ تَصَرُّفُونَ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু—

(১) কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে পরাক্রমশালী, প্রভাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে। (২) আমি আপনার প্রতি এ কিতাব স্বার্থরূপে ন্যায় করেছি। অতএব আপনি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর ইবাদত করুন। (৩) জেনে রাখুন, নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদত আল্লাহরই নিমিত্ত। যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে রেখেছে এবং বলে যে, আমরা তাদের ইবাদত এ জন্যই করি, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়। নিশ্চয় আল্লাহ তাদের মধ্যে তাদের পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ বিষয়ের ফরসাজা করে দেবেন। আল্লাহ মিথ্যাবাদী কাফিরকে সংগে পরিচালিত করেন না। (৪) আল্লাহ যদি সন্তান গ্রহণ করার ইচ্ছা করতেন তবে তাঁর সৃষ্টির যথা থেকে যা কিছু ইচ্ছা মনোনীত করতেন, তিনি পবিত্র। তিনি আল্লাহ, এক, পরাক্রমশালী। (৫) তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন স্বাধীনভাবে। তিনি রাত্রিকে দিবস দ্বারা আবৃত্তি করেন এবং দিবসকে রাত্রি দ্বারা আবৃত্তি করেন এবং তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিযুক্ত করেছেন। প্রত্যেকেই বিচরণ করে নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত। জেনে রাখুন, তিনি পরাক্রমশালী, জ্ঞানশালী। (৬) তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে একই ব্যক্তি থেকে। অতপর তা থেকে তাঁর মূল সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তোমাদের জন্য আট প্রকার চতুষ্কদ জন্তু অবতীর্ণ করেছেন। তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মাতৃপুত্র পরিবাররূপে একের পর এক দ্বিবিধ অঙ্গকারে। তিনি আল্লাহ, তোমাদের পালনকর্তা, সাক্ষ্যাতীভূত। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছ?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে পরাক্রমশালী, প্রভাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে। (পরাক্রমশালী হওয়ার দাবি ছিল এই যে, কেউ এর প্রতি মিথ্যারোপ করলে তাকে অনতিবিলম্বে শাস্তি দেবেন; কিন্তু যেহেতু তিনি প্রভাময় ও বটে এবং অবকাল দানের ক্ষেত্রেই কল্পনা করছে, তাই শাস্তির ব্যাপারে অবকাল দিয়ে রেখেছেন।) আমি স্বাধীনভাবে এ কিতাব আপনার প্রতি ন্যায় করেছি। অতএব আপনি (কোরআনের নিকা অনুযায়ী) নিষ্ঠাপূর্ণ বিশ্বাসসহ আল্লাহর ইবাদত করতে থাকুন (যেমন, এ পর্বত করে এসেছেন। আপনার উপরও যখন তা ওয়াজিব, তখন অন্যদের উপর ওয়াজিব হবে না কেন? হে মানবকুল,) জেনে রাখ, (নিরাক ও রিহা থেকে) যাঁটি ইবাদত আল্লাহর গ্রাপ্য। যারা (যাঁটি ইবাদত ছেড়ে) আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে (এবং বলে, আমরা তো তাদের পূজা শুধু এ জন্যই করি, যাতে তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয় (অর্থাৎ আমাদের প্রয়োজনাদি অথবা ইবাদত আল্লাহর সাহায্যে পেশ করে দেয়। যেমন, দুনিয়াতে মজী ও পারিসম্বর্গ করে থাকে।) নিশ্চয় আল্লাহ তাদের (এবং মুমিনদের) মধ্যে পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ বিষয়ের (কার্যত) ফরসাজা (কিন্সমতের দিন) করে দেবেন। (তওহীদপন্থীকে আল্লাহে এবং শিরকপন্থীকে আল্লাহমুখে দাখিল করবেন। অর্থাৎ তারা না মানলে আপনি চিড়াকুড় হবেন না, তাদের ফরসাজা সেখানে হবে। আপনি এতও

আশ্চর্যান্বিত হবেন না যে, প্রমাণাদি সঙ্কেত তারা সৎপথে আসছে না। কেননা) আল্লাহ্ জগৎ সৎপথে আনেন না, যে (কথার) মিথ্যাবাদী এবং (কিছুর) কাকির। (অর্থাৎ মুখে কুফরী কথাবার্তা এবং অন্তরে কুফরী বিশ্বাস রাখতে বন্ধপরিবর ও সত্যস্বয়ম্বে অনিশ্চয়ক।) তার এ হঠকারিতার কারণে আল্লাহ্ তা'আলাও তাকে সৎপথের-তওফীক দেন না। যেহেতু কোন কোন মুশরিক ফেরেশতাপনকে আল্লাহর কন্যা বলে আখ্যা দিত, সুতরাং পরবর্তীতে তাদের উক্তি খণ্ডন করা হয়েছে যে, যদি আল্লাহ্ তা'আলা (কাউকে সন্তান বানাতেন, তবে ইচ্ছা ব্যতীত যেহেতু কোন কিছু হয় না, তাই প্রথমে সন্তান করতে ইচ্ছা করতেন এবং যদি) কাউকে সন্তানরূপে গ্রহণ করায় ইচ্ছা করতেন, তবে (আল্লাহ্ ব্যতীত সবই যেহেতু সৃষ্টি, তাই) অবশ্যই সৃষ্টির মধ্য থেকেই যাকে ইচ্ছা (এজন্য) মনোনীত করতেন। (এটা ব্যতিল। কেননা) তিনি (দোষদুটি থেকে) পবিত্র। (সৃষ্টির মধ্য থেকে সন্তান হওয়া দোষ। কাজেই সৃষ্টিকে সন্তান করা অসম্ভব। অসম্ভব কাজের ইচ্ছা করাও অসম্ভব। এভাবে প্রমাণিত হয় যে, তিনিই একক আল্লাহ, (কার্যক্ষেত্রে তাঁর কোন শরীক নেই এবং) পরাক্রমশালী। (সন্তানবানার ক্ষেত্রেও তার কোন শরীক নেই। কেননা তাঁর যতই পরাক্রমশালী কেউ থাকলে সন্তানবান থাকতে পেরুত, কিন্তু তা নেই। অতপর তওহীদের দরীল-বর্ণিত হয়েছে—) তিনি (আসমান ও স্বমীন্দ্রকে) স্বাধঃপাতিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাগিকে (অর্থাৎ তার অঙ্গকারকে) দিবসের উপর (অর্থাৎ তার আলোর উপর) আচ্ছাদিত করেন। (ফলে দিবস অদৃশ্য এবং রাত্রি দৃশ্য হয়ে যায়) এবং দিবসকে (অর্থাৎ তার আলোকে) রাত্রির উপর (অর্থাৎ তার অঙ্গকারের উপর) তিনি আচ্ছাদিত করেন। (ফলে রাত্রি অদৃশ্য এবং দিবস দৃশ্য হয়।) তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিয়োজিত রেখেছেন। প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত বিচরণ করবে। জেনে রাখ, (এসব প্রমাণের পর তওহীদ অস্বীকার করলে শাস্তির আশংকা রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা শাস্তি দিতে সক্ষমও বটে। কেননা) তিনি পরাক্রমশালী, (কিন্তু অস্বীকারের পরেও স্বীকার করে নিলে অতীত অস্বীকারের কারণে শাস্তি হবে না। কেননা তিনি) ক্ষমাপ্রিয়ও বটে। (এ বিবরণের আধায়ে তওহীদের প্রতি উৎসাহদান করা হল। উপরের প্রমাণগুলো ছিল প্রকৃতিসত্ত। অতপর আচ্ছাদিত প্রমাণাদি বর্ণনা করা হচ্ছে। এতে প্রসঙ্গক্রমে কিছু কিছু প্রাকৃতিক প্রমাণও এসে গেছে।) তিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে (অর্থাৎ আদম থেকে) সৃষ্টি করেছেন। অতপর তা থেকেই তার মূল (অর্থাৎ বিবি হাওয়াকে) সৃষ্টি করেছেন। অতপর তাদের থেকে (সমস্ত মানুষ হড়িয়ে দিয়েছেন।) তিনি তোমাদের (কন্যাপের) জন্য আট প্রকার (নর ও মাদী) চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন। (অষ্টম স্তান্নার এসম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এগুলো অধিক উপকারী বিধায় এখানে বিশেষভাবে এগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে। এটাই দিগন্তহিত প্রমাণ যা প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত হয়েছে। কেননা ব্যক্তিসত্তার স্থানিহ বর্ণনা প্রসঙ্গে এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অতপর মানবগোষ্ঠীর সৃষ্টি প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ) তিনি তোমাদেরকে মাভূগর্ভে পর্যায়ক্রমে একের পর এক অবস্থার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি করেন। (প্রথমে বীর্য, অতপর জমাট রক্ত, অতপর মাংসপিণ্ড এভাবে সৃষ্টিকার্য অব্যাহত থাকে। এই সৃষ্টি) তিন

অজ্ঞকারে সম্পন্ন হয়। (এক. পেটের অজ্ঞকার। দুই. পর্ডানবের অজ্ঞকার এবং তিন. চুপকে অজ্ঞানো। খিজীর অজ্ঞকার। এসব পর্যায্যক্রমিক অবস্থা এবং একাধিক অজ্ঞকারে সৃষ্টি করা পরিপূর্ণ সঙ্কমতা ও পরিপূর্ণ জ্ঞানের মজল।) তিনিই আজাহ্ তোমাদের পালনকর্তা। সাদ্ভাজা ধীরই। তিনি ব্যতীত কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়। (কিসব প্রমাণের পর সত্য থেকে) তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছ? (তওহীদ কবুল করা এবং শিরক পরিভ্যাগ করা-তোমাদের দাব্বা কর্তব্য।)

আনুযায়িক জ্ঞাতব্য বিষয়

دِينُنَا مَعِدَ اللَّهِ مُتَخَلِّمًا لِّلَّذِينَ لَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ শব্দের

অর্থ এখানে ইবাদত অথবা আনুগত্য। অর্থীঃ ধর্মের স্বাভাবিক বিধি-বিধান মেনে চলা। এর পূর্ববর্তী বাক্যে রসুলুল্লাহ (সা)-কে সম্বোধন করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আজাহ্ ইবাদত ও আনুগত্যকে তীরই জন্য খাঁটি করুন, যাতে শিরক, রিয়া ও নাম-মশের নামগন্ধও না থাকে। এরই তাকীদার্থে দ্বিতীয় বাক্যে বলা হয়েছে যে, খাঁটি ইবাদত একমাত্র আজাহ্ জন্যই লোভনীয়। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ এর যোগ্য নয়।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ (সা)-র কাছে আরম্ভ করলঃ ইয়া রসুলুল্লাহ্ আমি মাঝে মাঝে দান-খয়রাত করি অথবা কারও প্রতি অনুগ্রহ করি। এতে আমার নিয়ত আজাহ্ তা'আলা'র সন্তুষ্টি ও থাকে এক-এটাও থাকে যে, মানুষ আমার প্রশংসা করবে। রসুলুল্লাহ (সা) বললেনঃ সে সত্যের কসম, কার হাতে শূহাদ্দদের জ্ঞান, আজাহ্ তা'আলা' এখন কোন বস্তু কবুল করছেন না, যাতে অন্যকে শরীক করা হয়। অতপর তিনি প্রমাণস্বরূপ

لَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ আয়াতখানি তেলাওয়াত করলেন।—(হুরতুবী)

নিষ্ঠা অনুপাতে আজাহ্ নিকট আমল গৃহীত হয়ঃ কোরআন পাকের অনেক আয়াত সাক্ষ্যদেয় যে, আজাহ্ কাছে আমলের হিসাব গণনা দ্বারা নয়—ওজন দ্বারা হয়ে থাকে। وَنُفَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ এবং উল্লিখিত আয়াত-

সমূহের বক্তব্য এই যে, আজাহ্ কাছে আমলের মূল্যায়ন ও ওজন নিষ্ঠাপূর্ণ নিয়তের অনুপাতে হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য, পূর্ণ দৈয়ান ব্যক্তিরকে নিয়ত পূর্ণরূপে খাঁটি হতে পারে না। কেননা, পূর্ণ খাঁটি নিয়ত এই যে, আজাহ্ ব্যতীত কাউকে লাভ-লোকসানের মালিক গণ্য করা যাবে না, নিজের কাজকর্মে কাউকে ক্রয়তালী মনে করা যাবে না এবং কোন ইবাদত ও আনুগত্যে অপরের কল্পনা ও ধ্যান করা যাবে না। অনিচ্ছাধীন জব্বা-কল্পনা আজাহ্ তা'আলা' ক্রমা করে দেন।

যে সাহাবায়ে কিরাম মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রথম সারিতে অবস্থিত, তাঁদের আমল ও সাধনার পরিমাপ কেমন একটা বেশি দেখা যাবে না, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাঁদের সাক্ষ্য আমল ও সাধনা অবশিষ্ট উল্লেখের বড় বড় আমল ও সাধনার চেয়ে উচ্চতর ও স্বেচ্ছা তো তাঁদের পূর্ণ ঈমান ও পূর্ণ নিষ্ঠার কারণেই ছিল।

وَالَّذِينَ اتَّخَفُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ

এ হল আরবের মুশরিকদের অবস্থা। তখনকার দিনে সাধারণ মুশরিকরাও দ্বার এ বিশ্বাসই রাখত যে, আল্লাহ্ তা'আলাই সৃষ্টিকর্তা, মালিক এবং সব কিছুতে ক্ষমতাশালী। শরতান তাদেরকে বিভ্রান্ত করলে তারা নিজেদের কল্পনা অনুযায়ী ফেরেশতাগণের আকার-আকৃতিতে মূর্তি-বিগ্রহ তৈরি করল। অতঃপর এই বিশ্বাস গোষণ করে নিজ ঘরে, এসব মূর্তি-বিগ্রহের প্রতি সন্মান ও ভক্তি প্রদর্শন করলে সে ফেরেশতাগণ সন্তুষ্ট হবে, তাদের আকৃতিতে মূর্তি-বিগ্রহ নিমিত্ত হয়েছে। ফেরেশতাগণ আল্লাহর নৈকট্যশীল। অথচ তারা জানত যে, এসব মূর্তি তাদেরই হাতের তৈরি। এদের কোন বুদ্ধি-জ্ঞান, চেতনা-চৈতন্য ও শক্তি-বল কিছুই নেই। তারা আল্লাহ্ তা'আলার দরবারকে দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের দরবারের মতই ধারণা করে নিয়েছিল। রাজদরবারের নৈকট্যশীল ব্যক্তি কারও প্রতি প্রসন্ন হলে রাজার কাছে সুপারিশ করে তাকেও রাজার নৈকট্যশীল করে দিতে পারে। তারা মনে করত, ফেরেশতাগণও রাজকীয় সন্তোষদর্শকের ন্যায় যে কারও জন্য সুপারিশ করতে পারে। কিন্তু তাদের এসব ধারণা শরতানী, বিভ্রান্তি ও ভিত্তিহীন কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রথমত এসব মূর্তি-বিগ্রহ ফেরেশতাগণের আকৃতির অনুরূপ নয়। হলেও আল্লাহর নৈকট্যশীল ফেরেশতাগণ নিজেদের পূজা-অর্চনায় কিছুতেই সন্তুষ্ট হতে পারে না। আল্লাহর কাছে অপহৃদয় এমন যে কোন বিষয়কে তারা স্বতাবৎভাবে ঘূর্ণা করে। এতদ্ব্যতীত তারা আল্লাহর দরবারে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কোন সুপারিশ করতে পারে না যে পর্যন্ত না তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা কোন বিশেষ ব্যক্তির কারণে সুপারিশ করার অনুমতি দেন। নিম্নোক্ত কোরআনী আয়াতের অর্থ তাই :

كَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي عَنْهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ

يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ يَشَاءُ وَيُفْضَىٰ -

তৎকালীন মুশরিকরাও বর্তমান কাফিরদের চেয়ে ঈর্ষম ছিল : বর্তমান যুগের বহুবাদী কাফিররা আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব তো স্বীকার করেই না, উপরন্তু আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি সরাসরি খণ্ডিতা প্রদর্শন করে। ইউরোপ থেকে আমদানীকৃত কমিউ-নিজম ও ক্যাপিটালিজমের পারস্পরিক রণ-যত্নের ভিত্তিই হোক না কেন, উক্ত কুফরের মোদাক্ষা এই যে, নাউবুবিলাহ 'খোদা' বলতে কিছুই নেই, আমরাই আমাদের ইচ্ছার

মানিক। আশ্বাসের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার কেউ নেই। এ জঘন্যতম কুফর ও অকুতুভতার ফলশ্রুতিতেই সমগ্র বিশ্ব থেকে শান্তি, স্থিতি, স্থিতিশীলতা ও সুখ-স্বাস্থ্য-শ্রীলাভ নিরুৎসাহ। বর্তমান সুখ ও আশ্বাসের নতুন নতুন সাজসজ্জা রয়েছে, কিন্তু মুগ্ধ নেই। চিকিৎসার আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং প্রযুক্তির প্রাদুর্ভাব রয়েছে, কিন্তু রোগ-ব্যাদিরও এত আশঙ্ক্য, যা পূর্বে কোনকালে শোনা যায়নি। পাহারা চৌকি, পুলিশ ও গুপ্ত পুলিশ যন্ত্রের হাতিয়ে থাকা সত্ত্বেও অপরাধের মাত্রা নিত্যদিনই বেড়ে চলেছে। চিন্তা করলে দেখা যায়, নতুন নতুন যন্ত্রপাতি এবং সুখ ও আশ্বাসের নব নব পদ্ধতিই মানব জাতির বিপদ ডেকে আনিছে। কুফরের শাস্তি তো পরকালে সকল কাকিরের জন্যই চিরহারী আহাম্মায়। কিন্তু এ অকুতুভতার কিছু শাস্তি দুনিয়াতেও ভোগ করতে হবে ঐকি। যে আল্লাহর দেওয়া উপদানসমূহ ব্যবহার করে তারা আকাশে আরোহণ করতে সাহসী হয়েছে, সে আল্লাহকে অস্বীকার করা অকুতুভতা নয় কি? **وَمِمَّا نُنْزِلُكَ فِيهِمْ مَا حَبَّ خِلَا** (আমরা পৃথিবীতে পৃথিবীতে নামিয়ে দিচ্ছি যা)

لَهُمْ رَازِقٌ يُنْزِلُ তারা কেবলতাপগকে আল্লাহর সন্তান বলে

আখ্যা দিত, তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা নিরসনকল্পে অসম্ভবকে সম্ভব করে নেওয়ার পর্যায়ে বলা হয়েছে, যদি আল্লাহ তা'আলার কোন সন্তান হত, তবে তা তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত হওয়া অসম্ভব। কেননা, জ্বরদণ্ডি সন্তান তাঁর উপর চাপতে পারে না। যদি আল্লাহর ইচ্ছা হত, তবে তাঁর সন্তা ব্যতীত সবই তো তাঁর সৃষ্টি, অতএব তাদের মধ্য থেকেই কাউকে সন্তানরূপে গ্রহণ করতেন। সন্তান ও সন্তান জন্মদাতা উভয়ের সম্বন্ধে হওয়া অত্যাশঙ্ক্য। অশচ সৃষ্টি চলার সমজাত হতে পারে না। তাই সৃষ্টিকে সন্তানরূপে গ্রহণ করা অসম্ভব।

كُوَيِّرُ—**يَكْوَرُ اللَّيْلُ عَلَى النَّهَارِ**

তাকে আচ্ছাদিত করে দেওয়া। কোরআন পাক দিবসরাত্রির পরিবর্তনকে এখানে সাধারণের জন্য **কুয়ির** শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে। রাত্রি আগমন করলে যেন দিনের আলোর উপর পর্দা রেখে দেওয়া হয় এবং দিনের আগমনে রাত্রির অন্ধকার যেন যবনিকার অভ্যন্তরে চলে যায়।

চল ও সূর্য উভয়ই পতিশীল: **كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى**

যার যে, সূর্য ও চল উভয়ই বিচরণ করে। সৌর বিজ্ঞান ও জ্যোতিষের কল্পিত গবেষণা কোরআন পাক অথবা যে কোন আসমানী গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় নয়। কিন্তু এ ধরনের গবেষণার মধ্যে কোথাও কোর' বিষয় বর্ণিত হলে তার উপর ঈমান রাখা কঠিন। বৈজ্ঞানিকদের

প্রাচীন ও আধুনিক পৰ্যবেক্ষণ ভাে নিত্য পরিবর্তনশীল বিষয়, কিন্তু কোরআন পাকের
অখ্যাবলী অপরিবর্তনীয়। আলোচ্য আয়াত এতটুকু ব্যক্ত করেছে যে, চন্দ্র ও সূর্য উভয়েই
পতিশীল। এর উপর বিশ্বাস রাখা করত্ব। এখন আমাদের সামনে সূর্যের উদয় ও অস্ত
পৃথিবীর ঘূর্ণন দ্বারা হয় না, বরং সূর্যের ঘূর্ণন দ্বারা হয়, তা কোরআন পাক বর্ণনা
করেনি। অস্তিত্বভার আমোকে যা জানা যায়, তা মেনে নিতে আপত্তি নেই।

مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ
 الصُّدُورِ ۝ وَإِذَا مَتَّسَ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ
 إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسَىٰ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ
 لِلَّهِ أُمْدَادًا يُفَوِّتُ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَكْفُرُ أَفَكُلًا إِنَّكَ
 مِنَ الْأَخْصَابِ النَّارِ ۝ أَمَّنْ هُوَ قَانِثٌ إِنَّا إِلَهُ الْإِنْسِ سَاجِدًا وَقَانِثًا يُغْلَدُ
 الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ
 وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۝ قُلْ يٰعِبَادِ الَّذِينَ
 آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَالَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ
 وَارْضُ بِاللَّهِ وَاسِعَةً إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّادِقُونَ أَجْرَهُمْ بِغَدْرٍ حَسَابٍ ۝

(৭) যদি তোমরা অস্বীকার কর, তবে আল্লাহ তোমাদের থেকে বেপনওরা।
 তিনি তাঁর বান্দাদের কাফির হয়ে পড়া পছন্দ করেন না। পক্ষান্তরে যদি তোমরা
 কৃতজ্ঞ হও, তবে তিনি তোমাদের জন্য তা পছন্দ করেন। একের পাপভার অন্যে
 বহন করবে না। অতপর তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে ফিরে যাবে। তিনি
 তোমাদেরকে তোমাদের কর্ম সম্বন্ধে অবহিত করবেন। নিশ্চয় তিনি জ্ঞানের বিষয়
 সম্বন্ধেও অবগত। (৮) যখন মানুষকে সুখ-কষ্ট পল্লি করে, তখন সে একান্তিতে
 তার পালনকর্তাকে ডাকে, অতপর তিনি যখন তাকে নিরায়ত দান করেন, তখন সে
 কলঙ্কের কথা কিস্বত হয়ে যায়, যার জন্য পূর্বে ডেকেছিল এবং আল্লাহর সমকক্ষ
 হির করে, যাতে করে জগতকে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করে। বলুন, তুমি তোমার
 কুস্তর সহকারে কিছুকাল জীবনোগতোধ করে নাও। নিশ্চয় তুমি আহাম্মাদীদের
 অন্তর্ভুক্ত। (৯) যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সিজদার মাধ্যমে অথবা দাঁড়িয়ে ইবাদত করে,
 পরকালের প্রাপ্তকা রাখে এবং তার পালনকর্তার রহমত প্রত্যাশা করে, সে কি তার
 সমান, যে এতদপ করে না? বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান
 হতে পারে? চিন্তাভাবনা কেবলমাত্র ভ্রান্তি করে, যারা বুদ্ধিমান। (১০) বলুন, হে আমার
 বিশ্বাসী বান্দাগণ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। যারা এ দুখিতাকে

সংকাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে পূনা। আল্লাহর পৃথিবী প্রশস্ত। যারা সবারকারী, তারাই তাদের পুরস্কার পার অর্জনিত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(হে মানবকুল! তোমরা কুফর ও শিরকের অসারতা শুনে, এরপর) যদি তোমরা কুফর কর, (শিরকও এর অন্তর্ভুক্ত) তবে (তাতে) আল্লাহ তা'আলা কোন রূপ ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। কেননা, তিনি) তোমাদের (এবং তোমাদের ইবাদতের) মুখাপেক্ষী নন। (তোমরা তওহীদ ও ইবাদত অবলম্বন না করলে তাঁর কোন ক্ষতি নেই। আর একথা অতি নিশ্চিত যে,) তিনি তাঁর বাস্বাদেশ কুফর পছন্দ করেন না। (কেননা এতে বাস্বাদেশ ক্ষতি হয়।) যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, (যার প্রথম লক্ষণ হল ইমান) তবে (তাতে) তার কোন লাভ নেই, কিন্তু যেহেতু এতে তোমাদের লাভ হয়, (তাই) তিনি তোমাদের জন্য তা পছন্দ করেন। (যেহেতু আমার নীতি এই যে,) একের অপেক্ষার অন্য বহন করবে না, (তাই কুফর করে এরূপ মনে করো না যে, তোমার কুফর অপরের আনন্দনামায় কোন কারণে সঞ্চিত হয়ে যায় এবং তুমি নির্দোষ হয়ে যাবে। যেমন, অপরের অনুসারী হওয়ার কারণে অথবা অপরে তা বহন করার ওয়াদা করার কারণে। কোন কোন লোক বলে : وَلَنُثْمِلَ خَطَايَاكُمْ — মোটকথা, এরূপ হবে না

বরং তোমার কুফর তোমার আনন্দনামায়ই লেখা হবে।) অতপর তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে ফিরে যাবে। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কর্ম সম্বন্ধে অবহিত করবেন। (এবং শাস্তি দিবেন। সুতরাং কিয়ামত হবে না বলে তোমাদের ধারণাও ভ্রান্ত।) তিনি অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কে অবগত। (সুতরাং এরূপ ধারণাও মিথ্যা যে, তিনি হয়তো তোমাদের কুফর সম্পর্কে অবগত নন। হাদীসে আছে কোন কোন লোকের মধ্যে এরূপ আলোচনা হয় যে, জানি না আল্লাহ আমাদের কথাবার্তা শুনে কিনা। অতপর এ সম্পর্কে

وَمَا كُفْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ —

—আয়াত নাযিল হয়।) যখন (মুশরিক) লোকদেরকে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন তারা তাঁর (সত্যিকার) পালনকর্তাকে একনিষ্ঠভাবে ডাকে (এবং অন্য সব উপাস্যকে ভুলে যায়।) অতপর যখন তিনি তাকে নিজের পক্ষ থেকে নিয়ামত (শান্তি ও সুখ) দান করেন, তখন সে কষ্টের বিষয় ভুলে যায়, যার (অর্থ) যা অপসারিত করার জন্যই পূর্বে (আল্লাহকে) ডেকেছিল এবং আল্লাহর অংশীদার স্থির করে, যাতে (নিজে তো বিভ্রান্ত আছেই, এছাড়া) অপরকেও আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করে। (সে যদি পূর্বের দুঃখকষ্ট বিস্মৃত না হত, তবে ষাটি-তওহীদপন্থী হয়ে যেত। এ হল মুশরিকের নিন্দা। অতপর শান্তি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছেঃ) আপনি (এ ধরনের লোকদেরকে) বলে দিন, তুমি তোমার কুফরের দ্বাদ কিছুকাল ভোগ করো নাও। (অতপর নিশ্চয় তুমি আহাম্মাদীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। অতপর তওহীদ পন্থীদের প্রশংসা করে

মুশরীক দেওয়া হয়েছেঃ) যে ব্যক্তি (উপরোক্ত মুশরিকের বিপরীতে) রাষ্ট্রিকালে (সাধারণত পার্শ্বভিত্তির সময়) সিজদা ও সন্তানধান (অর্থাৎ নামাযের) অবস্থায় ইবাদত করে (এবং অন্তরে) পরকালের আশংকা রাখে এবং তার পালনকর্তার রহমত প্রত্যাশা করে, (এমন ব্যক্তিও উপরোক্ত মুশরিকদের সমান হতে পারে কি? কখনও নয়। বরং ‘কানেত’ তথা নিরমিত ইবাদতকারী এবং আল্লাহকে যে ডর করে এবং তার কাছ থেকেই রহমত প্রত্যাশা করে সে প্রশংসার যোগ্য। পক্ষান্তরে যে মুশরিক স্বার্থ উদ্ধারের পর নিষ্ঠা পরিহার করে সে নিন্দার যোগ্য। আর যেহেতু এভাবে ইবাদত পরিহার করাকে কাকিররা নিন্দনীয় বলে মনে করত না, তাই এ পার্থক্যের কারণে প্রশংসা ও নিন্দার হকুম সম্পর্কে তাদের সন্দেহ হতে পারত। কাজেই পরবর্তীতে অধিকতর প্রকৃষ্টভাবে প্রমাণ করা হচ্ছে যে, হে পরগম্বর!) আপনি (তাদেরকে এভাবে) বলে দিন যে, জানী ও মূর্থ কি সমান হতে পারে? (মূর্থতাকে যেহেতু সবাই নিন্দনীয় মনে করে, তাই এর উত্তরে তারা বলবে, যে জানে না, সে নিন্দার। যদিও এ বর্ণনা থেকে কুফর ও কাকিরের নিন্দার যোগ্য হওয়া এবং ইমান ও মুমিনের প্রশংসার যোগ্য হওয়া প্রমাণিত হয়ে গেছে, তথাপি) উপদেশ তারাই গ্রহণ করে, যারা (সুস্থ) বুদ্ধির অধিকারী। (অতএব, আপনি আনুগত্যের প্রতি উৎসাহিত করার জন্য মুমিনদেরকে আমার পক্ষ থেকে) বলে দিন, হে আমার বিশ্বাসী বান্দাগণ, তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ডর কর (অর্থাৎ সদাসর্বদা তাঁর আনুগত্য কর এবং নাকল্পমানী থেকে বেঁচে থাক। এগুলো আল্লাহ জীতিল শাখা। অতপর এর ফলাফল বর্ণিত হয়েছেঃ) যারা দুনিয়াতে সৎকাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে প্রতিদান। (পরকালে তো অবশ্যই, আন্তরিক সুখ অনিবার্য এবং কখনও বাহ্যিক সুখও।) নিজ দেশে সৎকাজ করার পক্ষে বাধা থাকলে হিজরত করে অন্যত্র চলে যাও। (কেননা,) আল্লাহর পৃথিবী সুবিভীর্ণ। (যদি দেশ ত্যাগে কষ্ট অনুভব কর, তবুও অন্তরে দৃঢ়তা পোষণ কর। কেননা, ধর্মের কাজে) দৃঢ়তা পোষণকারীরা তাদের পুরস্কার পাবে অগণিত। (এর মাধ্যমে আনুগত্যের প্রতি উৎসাহিত করা হল।)

আনুশঙ্গিক ভাষ্য বিষয়

ان تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ — অর্থাৎ তোমাদের ইমান দারা আল্লাহর

কোন উপকার হয় না এবং কুফর দারাও কোন ক্ষতি হয় না। সহীহ মুসলিমের হাদীসে আছে, আল্লাহ তা’আলা বলেন, হে আমার বান্দারা, যদি তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী লোকগণ এবং জিন ও মানব সবাই চূড়ান্ত পাগাচারে লিপ্ত হয়ে যায়, তবুও আমার রাজত্ব বিন্দু পরিমাণও হ্রাস পায় না—(ইবনে কাসীর)

وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِي الْكَفْرَ — অর্থাৎ আল্লাহ তা’আলা তাঁর বান্দাদের কুফর

পছন্দ করেন না। এখানে رضاء শব্দের অর্থ মহাবত করা অথবা আপত্তি ব্যতিরেকে

কোন কাজের ইচ্ছা করা। এর বিপরীতে سَلَطَ শব্দ ব্যবহৃত হয়, যার অর্থ কোম কিসুকে অপহরণ করা অথবা আপত্তিকর সাব্যস্ত করা যদিও তার সাথে ইচ্ছাও জড়িত থাকে।

আহলে সুন্নত ওয়াল জমা'আতের বিশ্বাস এই যে, দুনিয়াতে কোন ভাল অথবা মন্দ কাজ, ইমান অথবা কুফর আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা বাতিরেকে অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। তাই প্রত্যেকটি কাজের অস্তিত্ব লাভের জন্য আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা শর্ত। তবে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও পছন্দ কেবল ইমান ও ভাল কাজের সাথেই সম্পৃক্ত। কুফর, শিরক ও পাপাচার তিনি পছন্দ করেন না। শারহুল ইসলাম নভভী 'উসুল ও যাওরায়েত' গ্রন্থে লিখেছেন :

مذهب أهل الحق الإيمان بالقدر و اثباته وإن جميع الكائنات خورها
و شرها بقضاء الله و قدره و هو مرید لها كلها و يكره المعاضی مع أنه تعالى
مرید لها لعلمها - جل و ملا -

সত্যপন্থীদের মতাবলম্ব তকদীরে বিশ্বাস করা। আরও এই যে, ভাল-মন্দ সমস্ত সৃষ্ট বস্তু আল্লাহর আদেশ ও তকদীর দ্বারা অস্তিত্ব লাভ করে এবং আল্লাহ তা'আলা এগুলো সৃষ্টির ইচ্ছাও করেন। কিন্তু তিনি পাপাচারকে অপছন্দ করেন যদিও কোন উপযোগিতার কারণে এর পাপাচার সৃষ্টির ইচ্ছা করেন। এই উপযোগিতা কি, তা তিনিই জানেন। —(রহুল মা'আনী)

এই বাক্যের পূর্বে কাকিরদেরকে আল্লাহর

শব্দ থেকে বলা হয়েছে, দুনিয়ার ফলস্বারী জীবনে কুফর ও পাপাচারের দ্বারা উপভোগ করে নাও। অবশেষে তোমরা জাহান্নামের ইচ্ছন হবে। এর পর এ বাক্যে অনুগত

মুমিনের কথা বর্ণনা করা হয়েছে এবং একে آمِن প্ররবোধক শব্দ দ্বারা গুরু করা

হয়েছে। তকদীরবিশদগণ বলেন, এর পূর্বে একটি বাক্য উহা রয়েছে, অর্থাৎ কাকিরকে বলা হবে—তুমি উত্তম, না সে অনুগত মুমিন বান্দা উত্তম, যার কথা এখন উল্লেখ করা হবে? قَاتِن শব্দের কয়েক রকম তরজমা করা হয়েছে। হযরত ইবনে মসউদ (রা) বলেন, এর অর্থ আনুগত্যশীল। শব্দটি স্বর্ন বিশেষভাবে নামাযের ক্ষেত্রে বলা

হয়, যেমন قَوْمُوا لِلَّهِ قَاتِنِينَ—তখন এর অর্থ হবে সে ব্যক্তি, যে নামাযে দৃষ্টি নাক্ষ রয়েছে এবং ঈদিক-সৈদিক দেখে না, নিজের কোন অঙ্গ অথবা আপড় নিয়ে খেলা করে না এবং দুনিয়ার কোন বিষয় ইচ্ছাকৃতভাবে নামাযে শ্মরণ করে না। ভুল ও অনিচ্ছাকৃত কল্পনা এর পরিপন্থী নয়।—(কুরতুবী)

إِنَّا لِلَّهِ—এর অর্থ রাত্রির প্রহরসমূহ। অর্থাৎ রাত্রির প্রকটভাস, মধ্যবর্তী ও শেষাংশ। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : যে ব্যক্তি হাশরের ফরদানে সহজ হিসাব কামনা করে, তাহা উচিত হবে আল্লাহ যেন তাকে রাত্রির অন্ধকারে সিজদারত ও দাঁড়ানো অবস্থায় পান। তার মধ্যে পরকালের চিন্তা এবং রহমতের প্রত্যাশাও থাকে দরকার। কেউ কেউ মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়কেও إِنَّا لِلَّهِ বলাছেন।—(কুরতুবী)

وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ

এর পূর্বের বাক্যে সংকালের নির্দেশ রয়েছে। এতে কেউ আপত্তি করতে পারত যে, আমি যে শহরে অথবা রাষ্ট্রে বাস করছি কিংবা যে পরিবেশে আটকে আছি তা সংকালের প্রতিবন্ধক। এর জওয়াব এ বাক্য দেওয়া হয়েছে যে, কোন বিশেষ রাষ্ট্র কিংবা শহর অথবা বিশেষ পরিবেশ থেকে যদি শরীরতের হকুম-আহকাম পালন করা দৃঢ় হর, তবে তা ভাঙ্গ করা উচিত, আল্লাহর পৃথিবী সুলভতঃ সূতরাং আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালনের উপযোগী কোন স্থানে ও পরিবেশে গিয়ে বসবাস করা দরকার। এতে অনুপযুক্ত পরিবেশ থেকে হিজরত করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। হিজরতের বিস্তারিত বিধি-বিধান সূরা নিসার বর্ণিত হয়েছে :

بِغَيْرِ حِسَابٍ—إِنَّمَا يُؤْنَى الْمَا بِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

সবরকারীদের সওয়াব কোন নির্ধারিত পরিমাণে নয়—অপরিমিত ও অগণিত দেওয়া হবে। হাদীসে তাই বর্ণিত হয়েছে। কেউ কেউ بِغَيْرِ حِسَابٍ—এর অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, দুনিয়াতে কারও কাছে কারও কোন প্রাপ্য থাকলে তাকে নিজের প্রাপ্য দাবি করে আদায় করতে হয়। কিন্তু আল্লাহর কাছে দাবি বাড়িরেকই সবরকারীরা তাদের সওয়াব পাবে।

হযরত আনাসের রেকর্ডেতে রসুলুল্লাহ (সা) বলেন, কিয়ামতের দিন ইনসানের দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে। দাতাগণ আশ্রয় করলে তাদের দান ঋণাত্মক ওহন করে সে হিসাবে পূর্ণ সওয়াব দান করা হবে। এমনিভাবে নামায, হজ্জ ইত্যাদি ইবাদতকারীদের ইবাদত যোগে তাদেরকে প্রতিদান দেওয়া হবে। অতপর বাগ্ম-শুসিবাতে সবরকারীরা আশ্রয় করলে তাদের জন্য কোন ওহন ও সাপ হবে না, বরং তাদেরকে অপরিমিত ও অগণিত সওয়াব দেওয়া হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

إِنَّمَا يُؤْنَى الْمَا بِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ —কলে তাদের পাখির জীবন

সুখ-স্বাস্থ্যে অভিযুক্ত হয়েছে, তারা বাসনা প্রকাশ করবে—হার, দুনিয়াতে আমাদের দেহ কাঁটির সাহায্যে কতিপয় ক্ষণে অল্প আশ্রয়ও সবরের এমনি প্রতিদান দেবাম।

ইমাম মালিক (র) এ আয়াতে **مَا بَرَّيْن**—এর অর্থ নিম্নেহেন যারা দুনিয়াতে বিপদাগল ও দুঃখ-কষ্টে সবার করে। কেউ কেউ বলেন, যারা পাপকাজ থেকে সংযম অবলম্বন করে, আয়াতে তাদেরকে **مَا بَرَّوْن** বলা হয়েছে। কুরতুবী বলেন, **مَا** শব্দকে অন্য কোন শব্দের সাথে সংযুক্ত না করে ব্যবহার করলে তার অর্থ হয় পাপ-কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখার কষ্ট সহ্যকারী। পক্ষান্তরে বিপদাগলে সবারকারীর অর্থে ব্যবহার করা হলে তার সাথে সে বিপদও সংযুক্ত হয়ে উল্লেখিত হয়। যেমন বলা হয়—**مَا بَرَّ عَلَى كَذَا** অর্থাৎ অধিক বিপদে সবারকারী।

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۖ وَأُمِرْتُ
لَأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ۖ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رِجْزَ
عَذَابِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۖ قُلْ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ۖ
فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ ۚ قُلْ إِنْ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا
أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ۖ
لَهُمْ مِنْ قُوَّتِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ۚ ذَلِكَ يُخَوِّفُ
اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ لِيُعْبَادَ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَالَّذِينَ ابْتَغَتْوُا الظَّاعُونَ
أَنْ يُعْبُدُوهُمْ وَأَنْ يَبُولُوا لَئِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ، فَبَشِّرْ عِبَادَ ۖ
الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
هَدَاهُمُ اللَّهُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ ۖ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ
الْعَذَابِ ۚ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ ۚ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ
لَهُمْ عُزْفٌ مِّنْ قُوَّتِهَا عَزْفٌ مَّبِينٌ ۚ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ وَعَدَ
اللَّهُ ۚ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ ۖ

(১৪) বলুন, আমি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর ইবাদত করতে আদিষ্ট হয়েছি। (১৫) আরও আদিষ্ট হয়েছি, সর্ব প্রথম নির্দেশ পালনকারী হওয়ার জন্য। (১৬) বলুন, আমি আমার পালনকর্তার অবাধ্য হলে এক মহা দিবসের শাস্তির ভয় করি। (১৭) বলুন, আমি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ তা'আলারই ইবাদত করি। (১৮) অতএব তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইচ্ছা তার ইবাদত কর। বলুন, কিয়ামতের দিন তারাই বেনী কতিয়ন্ত হবে; যারা নিজদের ও পরিবারবর্গের তরফ থেকে কতিয়ন্ত হবে। জেনে রাখ, এটাই সুস্পষ্ট স্মৃতি। (১৯) তাদের জন্য উপর দিক থেকে এবং নিচের দিক থেকে আগুনের মেঘমালা থাকবে। এ শাস্তি যারা আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করেন যে, হে আমার বান্দাগণ, আমাকে ভীত কর। (২০) যারা শরতানী পবিত্র পূজা-অর্চনা থেকে দূরে থাকে এবং আল্লাহ অতিমুখী হয়, তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দিন আমার বান্দাদেরকে, (২১) যারা মনোনিবেশ সহকারে কথা শুনে, অতপর যা উভয় তার অনুসরণ করে। তাদেরকেই আল্লাহ সংগঠিত প্রদর্শন করেন এবং তারাই বুদ্ধিমান। (২২) যার জন্য শাস্তির হুকুম অবধারিত হয়ে গেছে আপনি কি সে জাহান্নামীকে মুক্ত করতে পারবেন? (২৩) কিন্তু যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে, তাদের জন্য নিমিত্ত রয়েছে প্রাসাদের উপর প্রাসাদ। এগুলোর তলদেশে নদী প্রবাহিত। আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহ প্রতিশ্রুতির খেলাফ করেন না।

তকসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি বলে দিন, আমি (আল্লাহর পক্ষ থেকে) আদিষ্ট হয়েছি যেন খাঁটিভাবে আল্লাহর ইবাদত করি (অর্থাৎ তাতে যেন শিরকের নামগন্ধও না থাকে)। আমি (আরও) আদিষ্ট হয়েছি, (এ উম্মতের সমস্ত লোকের মাঝে যেন) আমিই হই সর্ব প্রথম মুসলমান (ইসলামকে সত্য জানকারী)। (বলাবাহুল্য, বিধি-বিধান কবুল করার ব্যাপারে পরগণ্যবের সর্বাপ্রবর্তী হওয়া জরুরী)। আপনি (আরও) বলে দিন, যদি আমি আমার পালনকর্তার অবাধ্য হই, তবে আমি এক মহা দিবসের (অর্থাৎ কিয়ামতের) শাস্তির আশংকা করি। আপনি (আরও) বলে দিন, (আমাকে যা আদেশ করা হয়েছে, আমি তাই পালন করছি, সেমতে) আমি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ তা'আলারই ইবাদত করি (এতে শিরকের নামগন্ধ নেই)। অতএব (এর দাবি এই যে, তোমরাও একরূপ খাঁটি ইবাদত কর। কিন্তু তোমরা যদি তা না মান, তবে) তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইচ্ছা তার ইবাদত করতে পার। (কিয়ামতের দিন এর স্বাদ বুঝতে পাবে)। আপনি (আরও) বলে দিন, সে ব্যক্তিরাই কতিয়ন্ত যারা নিজের ও পরিবারবর্গের তরফ থেকে কিয়ামতের দিন কতিয়ন্ত হবে। (অর্থাৎ নিজের পক্ষ থেকেও কোন উপকার পাবে না এবং পরিবারবর্গের তরফ থেকেও না। কেননা পরিবারবর্গ তাদেরই মত পদ্ধতিতে হলে তারাও আঘাতে থাকবে। এমতাবস্থায় অপরের কি উপকার করতে পারবে? যদি তারা খাঁটি মু'মিন হয়ে জাম্মাতে থাকে, তাহলেও তারা কাফিরদের জন্য সুপারিশ করে উপকার করতে পারবে না।) মনে রেখো, এটাই

সুন্দরী স্ত্রী। তাদের জন্য উপর দিক থেকে এবং নিচের দিক থেকে পরিস্ফুটনকারী অগ্নিশিখা থাকবে। এ শক্তি দ্বারা আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করেন (এরং এ থেকে আশ্রয়কার উপায় বর্ণনা করেন)। অতএব হে আমার বান্দারা, আমাকে (অর্থাৎ আমার শক্তিকে) ভয় কর। (এ হচ্ছে কাকির-মুশরিকদের অবস্থা।) যারা শরতানী শক্তির পূজা থেকে দূরে থাকে, (শরতানের পূজা অর্থ শরতাবের অনুগত্য করা।) এবং সর্বতোভাবে আল্লাহ অতিমুখী হয়, তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ। অতএব আপনি আমার বান্দাদেরকে সুসংবাদ দিন, যারা মনোযোগ দিয়ে (আল্লাহর) কথা শুনে, অতপর যা উত্তম (আল্লাহর কথা সবই উত্তম।) তার অনুসরণ করে, তাদেরকেই আল্লাহ সৎপথ প্রদর্শন করেন এবং তাঁরাই মুজিবান। (তাদেরকে কিসের সুসংবাদ দিতে হবে, তার বর্ণনা **لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقُوا** আয়াতে রয়েছে

যখনই রসূলুল্লাহ (সা)-কে সাল্হনা দানের জন্য বলা হয়েছেঃ) যার জন্য (ভকদী-পতভাবে) শক্তির আদেশ অবধারিত হয়ে গেছে, আপনি কি (আল্লাহর জানা)-সেই জাহান্নামীকে (জাহান্নামের কারণাদি থেকে) রক্ষা করতে পারেন? (অর্থাৎ যে জাহান্নামে যাবে, তাকে চেষ্টা করও কিরানো যাবে না। অতএব তাদের জন্য দুঃখ করা অর্থহীন। কিন্তু যারা এমন যে, তাদের জন্য শক্তির আদেশ অবধারিত হয়নি। ফলে আপনার কাছে আদেশ নিবেশ শুনে তারা) তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে (জাহান্নামের) প্রাসাদ, যার উপরে আরও প্রাসাদ নির্মিত রয়েছে। এগুলোর পাদদেশে নদী প্রবাহিত। আল্লাহ এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহ ওয়াদার খিলাফ করেন না। (উপরে **فَبَشِّرْهُنَّ** বলে যে সুসংবাদ দানের আদেশ দেওয়া হয়েছিল, এটাও সে একই বিষয়বস্তু।)

আনুমানিক অন্তব্য বিষয়

فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أَتْلُوبَا

এ আয়াতের তুফসীরে তুফসীরবিদগণের উক্তি বিভিন্নরূপ। ইবনে কাসীর কতৃক গৃহীত উক্তি তুফসীরের সারসংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। তা এই যে, এখানে **قَوْل** অর্থ আল্লাহর কালাম কোরআন অথবা তৎসহ রসূলের শিক্ষাসমূহ। এগুলো সবই উত্তম। তাই হানোয়াযোগী বাহ্যিক বাক্য এরূপ ছিলঃ **يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ**

কিন্তু এ স্থলে احسن শব্দটি যোগ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তারা কোরআন ও রসূলের শিক্ষাসমূহের অনুসরণ চক্ষুধাক করে করেনি। মূর্খরা তাই করে। তারা কারও কথা শুনে হিতাহিত বিবেচনা না করেই তার অনুসরণ শুরু করে দেয়। বরং তারা আজাহ ও রসূলের কথাকে সত্য ও উত্তম দেখার পর তার অনুসরণ করেছে। এর কলশ্রুতিতে আয়াতের শেষাংশে তাদেরকে اولوالالباب তথা বোধশক্তি সম্পন্ন খেতাব দেওয়া হয়েছে। এর দৃষ্টান্ত কোরআনের মধ্যেই তওরাত সম্পর্কে হযরত মুসা (স্বা)-কে প্রদত্ত আদেশের ভেতরে রয়েছে। বলা হয়েছেঃ

اِحْسَن وَتَذَكَّرْ خُذْهَا بِقُوَّةٍ وَاَمْرًا مِّنْكَ يَأْخُذُهَا بِاِحْسَنِهَا

সমস্ত তওরাত ও তার বিধি-বিধান বোঝানো হয়েছে। আলোচ্য আয়াতেও ভেদনি। অর্থ কোরআন এবং اتباع احسن অর্থ সমস্ত কোরআনের অনুসরণ। পরবর্তী এক আয়াতে একেই احسن الحديث বলা হয়েছে। এই তফসীর অনুযায়ী কেউ কেউ আরও বলেন যে, কোরআন থাকেও অনেক احسن (ভাল) ও احسن (উত্তম) শ্রেণীর বিধান রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ প্রতিশোধ নেওয়া ও ক্ষমা করা উভয়টি আয়েয, কিন্তু ক্ষমা করা উত্তম ও শ্রেয় বলা হয়েছে—وَاَنْ تَصْهَرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ—অনেক

বাগারে কোরআন মানুষকে বৈধ দু'টি পন্থার যে কোন একদিক অবগত করার ক্ষমতা দিয়েছে। কিন্তু তবুও একটি পন্থাকে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ বর্ণেছে; যেমন, وَاَنْ تَتَّقُوا

اقْرَبُ لِلتَّقْوَى—অনেক বাগারে বাধীনতা দিয়েছে, কিন্তু বাধ্যবাধকতার উপর আরও কল্লাকে উত্তম বলা হয়েছে। অতএব আয়াতের সার্থক্য নীতাস্থে এই যে, এসব লোক কোরআনের সারধানতার বিধানও শুনে বাধ্যবাধকতাও শুনে, কিন্তু অনুসরণ করে বাধ্যবাধকতার উপর এবং احسن ও احسن শ্রেণীর দু'পন্থার মধ্য থেকে احسن—কে অবগত করে।

অনেক তফসীরবিদ একেছে قول—এর অর্থ নিম্নোক্ত সাধারণ মানুষের কথা-বার্তা। এতে তওহীদ, শিরক, কুফর, ইয়লায, সত্য, মিথ্যা ইত্যাদি সব রকম কথ্যবাহ্যই অন্তর্ভুক্ত। এ তফসীর অনুযায়ী আয়াতের অর্থ এই যে, যারা কাকির, মুসলিম, সত্য-মিথ্যা ও ভাল-বন্দ নিবিশেষে সব কথ্যই শুনে, কিন্তু অনুসরণ উত্তমটিরই করে, তওহীদ ও শিরকের কথা শুনে তওহীদের অনুসরণ করে এবং সত্য ও মিথ্যা

কথা শুনে সত্যের অনুসরণ করে। সত্ত্বেরও বিভিন্ন স্তর থাকলে সর্বোত্তম স্তরের অনুসরণ করে। এ কারণেই তাদেরকে দু'টি বিশেষণে বিশেষিত করা হয়েছে। এক **هَٰذَا هُمُ اللَّهُ** অর্থাৎ তাদেরকে আল্লাহ হিদায়েত দান করেছেন, ফলে বিভিন্ন প্রকার কথা শুনে বিভ্রান্ত হয় না। দুই—**أُولَٰئِكَ هُمُ أُولُوا الْأَلْبَابِ** অর্থাৎ তারাই বুদ্ধিমান। বস্তুত জ্ঞান-মঙ্গল ও সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করাই বুদ্ধির কাজ।

তাই বলা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াত আমর ইবনে নুফায়ের, আবু হর গিফারী ও সালমান ফারসী (রা) প্রমুখ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আমর ইবনে নুফায়ের জাহেলিয়াত যুগেও শিরক ও মূর্তি পূজাকে ঘৃণা করতেন। আবু হর গিফারী ও সালমান ফারসী যুশরিক, ইহুদী, খ্রিস্টান ইত্যাদি ধর্মাবলম্বীদের কথাবার্তা শুনে ও তাদের রীতিনীতি আচার-আচরণ পরখ করার পর ইসলামকেই গ্রহণ করেছেন।—(কুরতুবী)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفًّراً ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۝ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ ۖ قَوْلٌ لِّلنَّفْسِیَّةِ قُلُوبُهُمْ مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانًّی تَقْشَعُرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُدًى لِّلَّذِينَ يَهْتَدُونَ بِهِ ۖ مَن يَشَٰكُرْ ۖ وَمَن يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ ۝

(২১) তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ জাকান থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, জতপর সে পানি ধর্মীদের কর্ণাসমূহে প্রবাহিত করেছেন। এরপর তন্মধ্যীরা বিভিন্ন স্তরের ফসল উৎপন্ন করেন, জতপর তা শুকিয়ে ঘাস, ফলে ভোমরা তা পীতবর্ণ দেখতে পাও। এরপর আল্লাহ তাকে ঝড়-কুটায় পরিণত করে দেন। নিশ্চয় এতে বুদ্ধিমানদের জন্য উপদেশ রয়েছে। (২২) আল্লাহ হার বরু ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, জতপর সে তার পালনকর্তার পর থেকে থেকে আগত আলোর মাঝে রয়েছে, সে কি তার

সমান, যে এরূপ নয় : যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণের ব্যাপারে কঠোর, তাঁদের জন্য দূর্ব্বোধ। তারা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে রয়েছে। (২৩) আল্লাহ উত্তম বাণী তথা কিতাব নাযিল করেছেন, যা সামঞ্জস্যপূর্ণ, পুনঃ পুনঃ পঠিত। এতে তাদের জ্ঞান কীর্তি দিয়ে উঠে চামড়ার উপর, যারা তাদের পালনকর্তাকে ভুল করে, এরপর তাদের চামড়া ও অন্তর আল্লাহর স্মরণে বিনষ্ট হয়। এটাই আল্লাহর পথনির্দেশ, এর মাধ্যমে আল্লাহ হাকে ইচ্ছা পথদর্শন করেন। আর আল্লাহ হাকে গোমরাহ করে, তার কোন পথদর্শক নেই।

তকসীরের সার-সংক্ষেপ

(যে সম্বোধিত ব্যক্তি,) তুমি কি এ বিষয়টি লক্ষ্য করনি যে, আল্লাহ তা'আলা আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, অতপর তাকে স্বমীনের রক্ত্রে (অর্থাৎ সেসব অংশে) পৌঁছিয়ে দেন (সেখান থেকে পানি নির্গত হয়ে কূপ ও খর্ণার আকারে বের হয়ে আসে।) তারপর (যখন তা নির্গত হয়, তখন) তন্দ্বারা শস্য উৎপন্ন করেন যা বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। তারপর সে শস্যসমূহ সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায়। ফলে তোমরা সেগুলোকে শুঁত বর্ণের দেখতে পাও। অতপর (আল্লাহ তা'আলা) সেগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেন। এ (বিষয়গুলোতে) বুদ্ধিমানদের জন্য বিরাট শিক্ষা রয়েছে (যে, হুবহু এমন অবস্থা মানুষের পাখিব জীবনের। অর্থাৎ নিঃশেষ হয়ে যাওয়া। কাজেই এতে নিবিশ্টি হয়ে গিয়ে অনন্ত সুখ-খুশি থেকে বঞ্চিত থাকা এবং সীমাহীন বিপদ যাবার চাপিয়ে নেওয়া নিতান্তই বোকামীর কাজ। যদিও আমাদের বর্ণনা যথেষ্ট অলঙ্কারপূর্ণ, কিন্তু তবুও প্রোভাদের মধ্যে পারস্পরিক বিপুল পার্থক্য রয়েছে।) কাজেই যার বুক ইসলামের জন্য (অর্থাৎ ইসলাম কবুল করার জন্য) আল্লাহ তা'আলা খুলে দিয়েছেন (অর্থাৎ ইসলামের মূল বিষয়ে তার নিশ্চিত বিশ্বাস হয়ে গেছে) এবং সে স্বীয় পরওয়ারদিগারের (দেওয়া) নূর (অর্থাৎ হিদায়েতের দাবির) উপর (চলতে) রয়েছে (অর্থাৎ বিশ্বাস স্থাপন করার পর সৈমতে কাজ করতে শুরু করেছে) সে এবং সংকীর্ণহৃদয় ব্যক্তিরা কি সমান (যাদের কথা পরে বলা হচ্ছে)? সুতরাং যে সমস্ত লোকের অন্তর আল্লাহর যিকর দ্বারা (স্নাতে হুকুম-জাহকাম ও জীতি প্রদর্শন প্রভৃতি সবই অন্তর্ভুক্ত) প্রভাবিত হয় না (অর্থাৎ যারা ঈমান আনে না) তাদের জন্য (কিয়ামতে) রয়েছে বড়ই মন্দ পরিণতি। (আর দুনিয়াতেও) এরা প্রকাশ্য পথপ্রস্টিভার (বন্দী) রয়েছে। (পরবর্তীতে উল্লিখিত 'নূর' ও 'যিকর'-এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বড়ই উত্তম কলাম (অর্থাৎ কোর-আন) অবতীর্ণ করেছেন যা এমন এক কিতাব যে, (পঠনের অনন্যতা এবং অর্থের স্বার্থভার দিক দিয়ে) পারস্পরিক সামঞ্জস্যপূর্ণ (এবং যার ভেতরে মানুষের বাস্তব জ্ঞান এমন প্রয়োজনীয় কিছু বিষয় রয়েছে যা) বারবার পুনরাবৃত্ত হয়েছে। (যেমন, আল্লাহ বলেছেন : - وَلَقَدْ مَرْفَأًا যাতে উপকারিতা, তাকীদ এবং দাবি প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে প্রতিটি ক্ষেত্রে উদ্ভিষ্ট ব্যক্তির হৃদয়ের বিশেষ বিশেষ অনুপ্রাণের প্রতিও

সজ্জা রাখা হয়েছে। শুধু পুনরাবৃত্তিই উদ্দেশ্য নয়। আর এর 'মাসানী' হওয়ার অর্থও বার বার পুনরাবৃত্ত হওয়াই এর প্রমাণ যে, এটি পথপ্রদর্শকও বটে।) যক্ষারা সেসব লোকের শরীর কোঁপে উঠে যারা নিজেদের পালনকর্তাকে ভয় করে। (এটি ইহিত হল ভয়ের, যদিও ভীতি জড়িয়ে হয়, শরীরে তার কোন প্রতিক্রিয়া হয় না এবং সে ভয় তান ও ঈমানগত হয়, প্রকৃতি ও স্বভাবগত হয় না।) তারপর তাদের দেহ ও অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে আল্লাহর মিকরের (অর্থাৎ আল্লাহর কিতাবের উপর আমল করার) প্রতি আকৃষ্ট করে যার। (অর্থাৎ ভীত হয়ে দৈহিক ও আন্তরিক আমলসমূহ অনুগত্য ও বিনম্রতার সাথে সম্পাদন করে। এবং) এটি (কোরআন) হল আল্লাহর হিদায়েত। যাকে তিনি ইচ্ছা করেন তার জন্য একে হিদায়েত লাভের উপায় করে দেন। (যেমন, এই মাত্র ভীত লোকদের অবস্থা শোনাতে হল।) আর আল্লাহ যাকে পথপ্রদর্শক করতে চান কেউ তার পথপ্রদর্শক নেই।

আনুশঙ্গিক ভাষ্য বিবরণ

يَنْبُوعٌ—এর বহুবচন। اَنْبُوعٌ—একটি যাবু'য়—فِي الْأَرْضِ—

ভূমি থেকে নিগত স্বর্ণ। উদ্দেশ্য এই যে, আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করাই এক স্বর্ণ নিয়ামত, কিন্তু একে ভূগর্ভে সংরক্ষিত করার ব্যবস্থাপনা করা হলে মানুষ তৎপরতা কেবল বৃষ্টির দিনে অথবা এর অব্যবহিত পরে কয়েকদিন উপভুক্ত হতে পারত। অথচ পানির অপর নাম জীকম। পানি ব্যতীত মানুষ একদিনও বাঁচতে পারে না। তাই আল্লাহ তা'আলা কেবল এ নিয়ামত নাথিল করেই সন্তুষ্ট হন নি, একে সংরক্ষিত করার জন্যও বিস্ময়কর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। কিছু পানি ভৌগোলিক গর্ভে, চৌবাচ্চায় ও সুকুরসমূহে সংরক্ষিত হয়ে যার এবং অনেক বড় ভাণ্ডারকে বরফ পরিপূর্ণ করে পর্বতের চূড়ায় তুলে রাখা হয়। ফলে পানি গর্ভে যাওয়ার ও দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। অভ্যন্তর সে বরফ আস্তে আস্তে গলে পর্বতের শিরা-উপশিরার গর্ভে ভূমিতে নেমে আসে এবং স্থানে স্থানে স্বর্ণের আকারে আগনা-আগনি নির্গত হয়। এরপর নদীনালায় আকার ধারণ করে সমস্ত ভূমিতে প্রবাহিত হতে থাকে।

এই পানি নিকাশন ব্যবস্থার পূর্ণ বিবরণ কোরআনে পাকে সুকুরে মু'মিনদের
فَاَسْكَنَاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ—আল্লাহের তফসীরে
বর্ণনা করা হয়েছে।

مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ

কসল উৎপন্ন হওয়ার সময় এবং পাকার সময় তার উপর
বিভিন্ন রঙ বিবর্তিত হতে থাকে। যেহেতু সব রঙই বিবর্তনশীল ও নিত্যনতুন তাই

আলোচ্য আয়াতটি **أَتَمَّنْ** প্রয়োগক শব্দ দিয়ে শুরু করা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, যে ব্যক্তির অন্তর ইসলামের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে এবং সে তার পালনকর্তার তরফ থেকে আগত নূরের আলোকে কর্ম সম্পাদন করে, সে কি সে ব্যক্তির সমান, যে সংকীর্ণ অন্তর ও কঠোরপ্রাণ? এর বিপরীতে কঠোরপ্রাণ ব্যক্তির উল্লেখ পরবর্তী আয়াতে করা হয়েছে।

وَوَيْلٌ لِلْفَاسِقِينَ قُلُوبِهِمْ শব্দের অর্থ কঠোরপ্রাণ হওয়া, কারও প্রতি দয়াদ্র না হওয়া। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকির ও বিধানাবলী থেকে কোন প্রভাব কবুল করে না।

إِنَّ اللَّهَ نَزَّلَ لَحْسَنًا لِّتُحَدِّثَ كُنَّا بِأَمْتَشَا بِهَا مَتَانِي এর পূর্ববর্তী আয়াতে

يَسْتَمْعُونَ আল্লাহ তা'আলার শ্রিত বান্দাদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল।

الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ এ আয়াতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, সমস্ত কোরআনই তথা উত্তম বাণী। এর শাসনিক অর্থ এমন কথা অথবা কাহিনী, যা বর্ণনা করা হয়। কোরআনকে 'উত্তম বাণী' বলে আখ্যায়িত করার মর্ম এই যে, মানুষ যা কিছু বলে, তন্মধ্যে উত্তম বাণী হচ্ছে কোরআন। অতপর কোরআনের কতিপয় বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে—১. **مَتَانِي** এর অর্থ কোরআনের বিষয়বস্তু

পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। এর এক আয়াতের ব্যাখ্যা ও সত্যায়ন অন্য আয়াত দ্বারা হয়। এতে পরস্পর বিরোধিতা নেই। ২. **مَتَانِي** এটা

বহুবচন। অর্থাৎ কোরআনে একই বিষয়বস্তু বারবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে তা অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। ৩. **تَقَعَّرَ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ**

অর্থাৎ যারা আল্লাহর মাহাত্ম্যে ভীত, কোরআন পাঠ করে তাদের দেহের লোম শিউরে উঠে। ৪. **ثُمَّ تَلَيْنَ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ** অর্থাৎ কোরআন-ভিত্তিকভাবে প্রভাবে কখনও আশাবের কথা শুনে দেহের লোম শিউরে উঠে এবং কখনও রহমত ও মাগফিরাতের বর্ণনা শুনে দেহ ও অন্তর সবই আল্লাহর স্মরণে

নয়, হতে, সূর। হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা) বলেন, সাহাবায়ে কিয়ামের সম্মোহন আরম্ভ তাই ছিল। তাঁদের মাঝে কোরআন পাঠ করা হলে তাঁদের চকু অশ্রুপূর্ণ হয়ে যেত এবং দেহের জোম শিউরে উঠত।—(কুরতুবী)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন: আল্লাহর উরে যে বাঙ্গার লোম শিউরে উঠে, আল্লাহ তার দেহকে আগুনের জন্য হারাম করে দেন।—(কুরতুবী)

أَقْمِنِ يَتَّقِيْ بَوَّجْهِمْ سُوْءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِيْنَ
 ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ۝ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاتَتْهُمْ الْعَذَابُ
 مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝ فَآذَاهُمْ اللَّهُ الْغَزَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
 وَلِلعَذَابِ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُوْنَ ۝ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي
 هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝ قُرْآنًا عَرَبِيًّا
 غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ۝

(২৪) যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তার মুখ দ্বারা অশুভ আযাব ঠেকেবে এবং
 এরূপ অগ্নিসদেককে বসি হবে, তুমরা যা করতে, তার হাদ আত্মদান কর,—সে কি
 তার সমান, যে এরূপ নয়? (২৫) তাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যারোগ করেছিল, ফলে
 তাদের কাছে আযাব এমনভাবে আসল যা, তারা করনাও করতে না। (২৬) অতপর
 আল্লাহ তাদেরকে পৃথিবী জীবনে বাস্তবতার হাদ আত্মদান করায়েন, আর পরকালের
 আযাব হবে আরও গুরুতর—যদি তারা জানত! (২৭) আমি এ কোরআনে মানুষের
 জন্য সব দৃষ্টান্তই বর্ণনা করেছি, যাতে তারা অনুধাবন করে: (২৮) আরবী ভাষায়
 এ কোরআন সরাসরী, যাতে তারা সাবধান হয়ে চলে।

তফসীরের সর-সংক্ষেপ

যে ব্যক্তি নিজের মুখে কিয়ামতের দিন কঠোর আযাবের ঠাক করে দেবে,
 এরূপ অগ্নিসদেককে বসি হবে যে, তুমরা যা করতে, (এখন) তার হাদ আত্মদান
 কর। সে কি তার সমান হতে পারে, যে এরূপ নয়? (কাকিররা যেন এসব আযাব
 অস্বীকার না করে। কেননা,) তাদের পূর্ববর্তীরাও (সত্যকে) মিথ্যা করেছিল, ফলে
 তাদের কাছে আযাব এমনভাবে আসল, যা তারা করনাও করতে না। আল্লাহ

তাদের পাখিও জীবনেও লান্ধনর আদ আদ্বাদন করিরেছেন। (ভুলভে বিলীন হওয়া, মুখমণ্ডল বিকৃত হওয়া, আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণ ইত্যাদি আঘাতের মাধ্যমে তারা দুনিয়াতে লান্ধিত হয়েছে।) আর পরকালের আঘাত (হবে) আরও ওরুতর—যদি তারা জামত। (উপরে **أَلَمْ يَشْرَحَ اللَّهُ مَذْرَأَهُ**—আল্লাহ তা'আলা বলে দিয়েছেন যে, কোরআন শুনে কেউ প্রভাবান্বিত হয় এবং কেউ হয় না। পরের আঘাতে বলা হয়েছে যে, যারা প্রভাবান্বিত হয় না, তাদের মধ্যে যোগ্যতা ও প্রতিভার অভাব রয়েছে। নতুবা কোরআন সবার জন্যই সমান প্রভাবশালী। এতে কোন দ্বিধা নেই।) আমি মানুষের (হিসাবে) অন্য এ কোরআনে সর্বপ্রকার (জরুরী) বিষয়বস্তু বর্ণনা করেছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। (এর অবস্থা এই যে,) এটা আরবী ভাষার কোরআন, এতে সম্বন্ধও বন্ধও নেই যাতে তারা (এসব সত্য ও পরিষ্কার বিষয়বস্তু শুনে) ভয় করে। (হিসাবে) অন্য হওয়ার জন্য অত্যাবশ্যকীয় ওপাবলী কোরআনে সন্নিবেশিত রয়েছে। এর বিষয়বস্তু, সত্য ও সুস্পষ্ট। এর ভাষাও আরবী, যা আরবের লোকেরা প্রত্যক্ষভাবে বুঝতে সক্ষম। এরপর তাদের মাধ্যমে অন্যদের পক্ষেও বোঝা সহজ। মোটকথা, এই হিসাবেই কোন দ্বিধা নেই। কারণ মাঝে কবুল করার যোগ্যতা না থাকলে তার কি প্রতিকার।)

আনুমানিক ভাষিক বিষয়

أَلَمْ يَتَقَىٰ بُرْهَانَ—এতে আহাম্মাদের ভাববহতার বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে।

দুনিয়াতে মানুষের অভ্যাস এই যে, কোন কল্‌টদায়ক বিষয়ের সম্মুখীন হলে মানুষ তার মুখমণ্ডলকে বাঁচানোর জন্য হাত ও পানক ভালরূপে ব্যবহার করে। কিন্তু আহাম্মামীরা হাত-পায়ের দ্বারা প্রতিরক্ষা করতে সক্ষম হবে না। তাদের আঘাত সরাসরি তাদের মুখমণ্ডলে পতিত হবে। সে প্রতিরক্ষা করতে চাইলে মুখমণ্ডলকেই ভাল বানোতে পারবে। কেননা তাকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় আহাম্মামে নিক্ষেপ করা হবে। —(নাইজুবিরাহ)

তফসীরবিদ 'আতা ইবনে যারেস বলেন, আহাম্মামীকে আহাম্মামে হাত-পা বেঁধে হিচড়ে নিক্ষেপ করা হবে।—(কুরতুবী)

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا
لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا الْحَدُثِ اللَّهِ بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
إِنَّكَ مَيِّتٌ وَهُمْ مُتَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ
تَخْتَفَمُونَ ۝

جَاءَهُ الْيَسْ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ۝ وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدَقِ
وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَٰلِكَ
جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ۝ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ
بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

(২৯) আল্লাহ্ এক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন : একটি লোকের উপর পরস্পর-বিরোধী অনেক করজান মালিক রয়েছে, আরেক ব্যক্তির প্রভু যাই একজন—তাদের উত্তরের অবস্থা কি সমান? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না। (৩০) নিশ্চয় তোমারও মৃত্যু হবে এবং তাদেরও মৃত্যু হবে। (৩১) অতপর কিয়ামতের দিন তোমরা সবাই তোমাদের পালনকর্তার সামনে কথা কাটাকাটি করবে। (৩২) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা বলে এবং তার কাছে সত্য আগমন করার পর তাকে মিথ্যা সাক্ষ্য করে, তার চেয়ে অধিক জালিম আর কে হবে? কাকিরদের বাসস্থান আহাম্মায়ে নয় কি? (৩৩) যারা সত্য নিয়ে আগমন করেছে এবং সত্যকে সত্য মনে নিয়েছে, তারা ই তো আল্লাহ্‌ভীর। (৩৪) তাদের জন্য পালনকর্তার কাছে তাই রয়েছে, যা তারা চাইবে। এটা সংকল্পীদের পুরস্কার, (৩৫) যাতে আল্লাহ্ তাদের মন্দ কর্মসমূহ মার্জনা করেন এবং তাদের উত্তম কর্মের পুরস্কার তাদেরকে দান করেন।

তকসীরের সার-সংক্ষেপ

আল্লাহ্ তা'আলা (তওহীদপন্থী ও মুশরিক সম্পর্কে) একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন; এক (গোলাম) ব্যক্তিতে কয়েকজন অংশীদার, যারা পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন, আরেক ব্যক্তি পুরোপুরি একজনেরই (গোলাম)—তাদের উত্তরের অবস্থা কি সমান? (বলা-বাহলা, উত্তরে সমান নয়; প্রথম ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত। সে নুখে উঠতে পারে না যে, কোন্ প্রভুর আদেশ মানবে এবং কোন্ প্রভুর আদেশ মানবে না। দ্বিতীয় ব্যক্তি আরামে রয়েছে। তার সম্পর্ক এক প্রভুর সাথেই। সুতরাং প্রথমোক্ত ব্যক্তি মুশরিক। সে সর্বদা দোদুল্যমান অবস্থায় থাকে। কখনও আল্লাহ্‌র দিকে এবং কখনও মূর্তি-বিগ্রহের দিকে ছুটাহুটি করে। মূর্তিদের মধ্যেও এককে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে না, কখনও এক মূর্তির আবার কখনও অন্য মূর্তির পূজা করে। কাকিররাও উপরোক্ত প্রস্তরের উত্তর এছাড়া দিতে পারবে না যে, অনেক প্রভুর বোধ গোলামের শুধু বিপদই বিপদ। তাই তাদের জন্য দলীল পূর্ণ হয়ে গেছে। দলীলের এই পূর্ণতার কারণে বলা হয়েছে 'আলহামদু লিল্লাহ্' সত্য প্রমাণিত হয়ে গেছে। কিন্তু এর পরও তারা কবুল করে না।

কেননা, তাদের অধিকাংশই বোঝে না (এবং বোঝার ইচ্ছাও করে না। অতপর কিয়ামতের সর্বশেষ ফয়সালায় উল্লেখ করা হয়েছে। এ ফয়সালা থেকে কেউ গা বাঁচাতে পারবে না। মৃত্যু হলো পরকালে পৌঁছান ভূমিকা ও পথ। তাই আগে মৃত্যুর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, যে পয়গম্বর, যদি তারা দুনিয়াতে কোন ফয়সালা না মানে, তবে আপনি চিন্তিত হবেন না। দুনিয়া থেকে) আপনিও মৃত্যুবরণ করবেন এবং তারাও মৃত্যুবরণ করবে। অতপর কিয়ামতের দিন তোমরা (উভয় পক্ষ) তোমাদের পালনকর্তার সামনে (নিজ নিজ) মোকদ্দমা পেশ করবে। (তখন কার্যত ফয়সালা হয়ে যাবে। পরবর্তী **فَمَنْ أَظْلَمُ** আয়াতে এর বর্ণনা রয়েছে। ফয়সালা হবে এই যে, মৃত্যু উপাসকরা জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে এবং সত্যপন্থীরা মহা পুরস্কারে পুরস্কৃত হবে। বলা বাহুল্য,) যে ব্যক্তি আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা বলে (অর্থাৎ আল্লাহর সাথে অন্যকেও শরীক করে) এবং সত্য (অর্থাৎ কোরআন) তার কাছে (রসুলের মাধ্যমে) আসার পরও তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, তার চেয়ে অধিক জালিম (ও অসত্যের পূজারী) আর কে হবে? (সে যে জালিম এবং আযাবের যোগ্য, তা বলাই বাহুল্য। বস্তুত বড় আযাব হচ্ছে জাহান্নামের আযাব। অতএব) এহেন কাফিরদের আবাসস্থল (কিয়ামতের দিন) জাহান্নামে নয় কি? (পক্ষান্তরে) যারা সত্য নিয়ে (আল্লাহর পক্ষ থেকে অথবা রসুলের পক্ষ থেকে মানুষের কাছে) আগমন করেছে এবং (নিজেরাও) সত্যকে সত্য হিসাবে মেনে নিয়েছে, (অর্থাৎ যারা সত্যবাদী এবং সত্যম্মনকারী যেমন প্রথমোক্তরা মিথ্যাবাদী এবং মিথ্যা সাব্যস্তকারী ছিল) তারাই আল্লাহ্‌ভীর। (তাদের ফয়সালা এই যে,) তাদের জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে তাই রয়েছে যা তারা চাইবে। এটা সংকরীদের পুরস্কার, (এজন্য), যাতে আল্লাহ তা'আলা তাদের মঙ্গলকর্মসমূহ মার্জনা করেন এবং তাদের উত্তম কর্মের বিনিময়ে তাদেরকে সওয়াব দান করেন।

আনুবাদিক জাতব্য বিষয়

إِنَّكَ مِثٌّ وَأَنْتُمْ مِثُّونَ —যে ভবিষ্যৎকালে মরবে, তাকে **مِثٌّ** এবং

যে অতীত কালে মরে গেছে, তাকে **مِثٌّ** বলা হয়। আলোচ্য আয়াতে রসুলে করীম (সা)-কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, আপনিও মৃত্যুবরণ করবেন এবং আপনার শত্রু মিলে সবাই মৃত্যুবরণ করবে। এরূপ বলার উদ্দেশ্য সবাইকে পরকাল চিন্তায় মনোযোগী করা এবং পরকালের কাজে আত্মনিয়োগে উৎসাহিত করা। প্রসঙ্গত একথাও বলে দেওয়া উদ্দেশ্য যে, সৃষ্টির সেরা এবং পয়গম্বরকুলের মধ্যমণি হওয়া সত্ত্বেও রসুলুল্লাহ (সা) মৃত্যুর আওতাবিহীন নন, যাতে তাঁর ইতিকালের পর মানুষের মধ্যে এ বিষয়ে বিরোধ সৃষ্টি না হয়।—(কুরতুবী)

انکم الثقیما مة مند ربکم تفتنمون — হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এখানে

ডিবরানীতে বণিত আবু আইয়্যুব আনসারীর রেওয়াজেতে রসুলুল্লাহ (স।) বলেন, আল্লাহ তা'আলার আদালতে সর্বপ্রথম স্বামী ও স্ত্রীর মোকদ্দমা পেশ হবে। সেখানে জিহবা কথা বলবে না, বরং স্ত্রীর হাত-পা সাক্ষ্য দেবে যে, সে তার স্বামীর প্রতি কি কি দোষ আরোপ করত। এমনভাবে স্বামীর হাত-পা সাক্ষ্য দেবে সে কিভাবে তার স্ত্রীর উপর নির্ধাতন চালাত। অতপর প্রত্যেকের সামনে তার চাকর-চাকরানী উপস্থিত হবে এবং তাদের অভিযোগের স্বয়ংসাক্ষ্য করা হবে। এরপর বাজারের যে সব লোকের সাথে তার কাজ-করবার ও মেনেদেন ছিল, তারা উপস্থিত হবে। সে কারও প্রতি জুলুম করে থাকলে তাকে তার হক দিতে বাধ্য করা হবে।

জুলুম ও হকের বিনিময়ে সবরকম আমল দেওয়া হবে কিন্তু ঈমান দেওয়া হবে না ; তৎসমীয়ে ময়হারীতে লিখিত আছে, ময়লুমের হকের বিনিময়ে আলিমের আমল দেওয়ার অর্থ এই যে, ঈমান বাতীত অন্যান্য আমল দেওয়া হবে। কেননা, সব জুলুমই কর্মগত গোনাহ—কুফর নয়। কর্মগত গোনাহসমূহের শাস্তি হবে সীমিত। কিন্তু ঈমান একটি অসীম আমল, এর পুরস্কারও অসীম। অর্থাৎ চিরকাল জাহান্নামে বসবাস করা ; যদিও তা গোনাহের শাস্তি ভোগ করা এবং কিছুকাল জাহান্নামে অবস্থান করার পরে হয়। এর সারমর্ম এই যে, আলিমের ঈমান বাতীত সব সংকর্মই যখন নিঃশেষ হয়ে যাবে কেবল ঈমান বাকী থাকবে, তখন তার কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নেওয়া হবে না, বরং ময়লুমদের গোনাহ তার উপর চাপিয়ে হক আদায় করা হবে। ফলে সে গোনাহের শাস্তি ভোগ করার পর অবশেষে জাহান্নামে প্রবেশ করবে এবং অনন্তকাল সেখানে থাকবে। ময়হারীর বর্ণনা মতে ইমাম বায়হাকীও তাই বলেছেন।

(৩৬) আল্লাহ্ কি তাঁর বান্দার পক্ষে যথেষ্ট মন? অথচ তারা আপনাকে আল্লাহর পরিবর্তে অন্য উপাস্যদের ভর দেখায়। আল্লাহ্ যাকে পোষাদ করেন, তার কোন পথপ্রদর্শক নেই। (৩৭) আর আল্লাহ্ যাকে পথপ্রদর্শন করেন, তাকে পথপ্রদর্শকরা কেউ নেই। আল্লাহ্ কি পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী মন? (৩৮) যদি আপনি তাদেরকে জিত্তেস করেন, আসমান ও স্বর্গীয় কে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে—আল্লাহ্। বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ্ আমার জমিষ্ট করায় ইচ্ছা করেন, তবে তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদেরকে ডাক, তারা কি সে জমিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি রহমত করার ইচ্ছা করলে তারা কি সে রহমত রোধ করতে পারবে? বলুন, আমার পক্ষে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। নির্ভরকারীরা তাঁরই উপর নির্ভর করে। (৩৯) বলুন, হে আমার কণ্ঠ, তোমরা তোমাদের জ্ঞানভান্ডার কাজ কর, আমিও কাজ করছি। সত্যরই জ্ঞানে পারবে (৪০) কার কাছে অবমাননা-কর আশা-এবং চিরস্থায়ী শান্তি নেমে আসে। (৪১) আমি আপনার প্রতি সত্য ধর্মসহ কিতাব নাখিল করেছি মানুষের কল্যাণকরে। সত্যপর যে সংগথে আসে, সে নিজের কল্যাণের জন্যই আসে, আর যে পথপ্রদর্শক হয়, সে নিজেরই অনিশ্চয়ের জন্য পথপ্রদর্শক হয়। আপনি তাদের জন্য দায়ী নন।

তকসীরের সার-সংক্ষেপ

আল্লাহ্ তা'আলা কি তাঁর বান্দার [অর্থাৎ বিশেষভাবে মোহাম্মদ (সা)-এর হিকায়তের] জন্য যথেষ্ট মন? (অর্থাৎ তিনি তো সবার হিকায়তের জন্যই যথেষ্ট। এমতাবস্থায় তাঁর প্রিয় বান্দার হিকায়তের জন্য যথেষ্ট হবেন না কেন?) বস্তুত তারা (এমন নিবোধ যে, খোদাতায়ী হিকায়তের ব্যাপারে অভ্যস্ত সেজে) আপনাকে আল্লাহ্ ব্যতীত সিঁখা উপাস্যদের ভর দেখায়। (অথচ তারা নিশ্চাপ ও অক্লম। সক্রম হলেও আল্লাহর মুকাবিলায় অক্লমই হত। আসল ব্যাপার এই যে,) আল্লাহ্ যাকে পথপ্রদর্শক করেন, তার কোনও পথ প্রদর্শক নেই, আর আল্লাহ্ যাকে পথপ্রদর্শন করেন তাকে পথপ্রদর্শকরা কেউ নেই। (অতপর আল্লাহর কুদরত বর্ণনা করে তাদের নিবুদ্ধিতা প্রকাশ করা হয়েছে যে,) আল্লাহ্ কি (তাদের মতে) পরাক্রমশালী (ও) প্রতিশোধ গ্রহণকারী মন? (কাজেই আপনাকে ভর দেখানো নিবুদ্ধিতা নয় তো কি? আশ্চর্যের বিষয় যে, আল্লাহর কুদরত তারাও স্বীকার করে। সেমতে) আপনি যদি তাদেরকে জিত্তেস করেন যে, আসমান ও স্বর্গীয় কে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্। (তাই) আপনি (তাদেরকে) বলুন, (তোমরা যখন আল্লাহ্কে একক স্রষ্টা স্বীকার কর, তখন) তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ্ আমাকে কোন কণ্ট দেওয়ার ইচ্ছা করেন, তবে আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যাদের পূজা কর তারা কি সে কণ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি যদি আমার প্রতি রহমত করার ইচ্ছা করেন, তবে তারা কি সে রহমত রোধ করতে পারবে? (এতে আল্লাহর কুদরত প্রমাণিত হয়ে গেল।) আপনি বলুন, (এতে প্রমাণিত হল যে,) আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। নির্ভরকারীরা তাঁরই

উপর নির্ভর করে। (তাই আমিও তাঁরই উপর নির্ভর ও ভরসা করি এবং তোমাদের বিরোধিতা ও শত্রুতার আসৌ পরওয়া করি না। যেহেতু তারা এসব কথা শুনেও তাদের দ্রষ্টা খারদ্যর অটল, তাই আপনাকে সর্বশেষ জওয়াব এই দেখানো হচ্ছে যে,) আপনি বলুন, (যদি এতেও তোমরা না মান, তবে তোমরাই জান,) তোমরা তোমাদের অবস্থার কাজ করে যাও, আমিও (নিজের মতে) কাজ করছি। (অর্থাৎ তোমরা যখন মিথ্যা পথ ত্যাগ করছ না, তখন আমি সত্য পথ ত্যাগ করব কেন? সত্বরই, তোমরা জানতে পারবে সে ব্যক্তি কে, যার কাছে (দুনিয়াতে) অবমাননাকর আশাব আসে এবং (মৃত্যুর পর) চিরস্থায়ী শাস্তি নেমে আসবে। [সেমতে দুনিয়াতে বদর যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে তারা শাস্তি পেয়েছে। এরপর পরকালে আসবে চিরস্থায়ী আশাব। এপর্যন্ত রসুলুল্লাহ (সা)-কে শত্রুদের ভীতি প্রদর্শন থেকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে অতপর কাকির ও সাধারণ মানুষের প্রতি মহম্মদবোধের কারণ তাদের কুকর ও অস্বীকার দেখে তিনি যে ব্যথা অনুভব করতেন, সেদিকে লক্ষ্য করে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে।] আমি আপনার প্রতি সত্যসহ এ কিতাব (মানুষের কল্যাণের) জন্য নামিল করেছি। (আপনার কর্তব্য শুধু একে পৌঁছানো। এরপর) যে ব্যক্তি সংগে আসবে, সে নিজের কল্যাণের জন্যই আসবে, আর যে পথভ্রষ্ট হবে, সে নিজেরই অনিশ্চয়ের জন্য পথভ্রষ্ট হবে। আপনি তাদের উপর (এমন) তত্ত্বাবধায়ক নন (যে, তাদের পথভ্রষ্টতার কৈফিয়ত আপনার কাছে তলব করা হবে। সুতরাং আপনি তাদের পথভ্রষ্টতা দেখে চিহ্নিত হবেন কেন?)

আনুযায়িক ভাটব্য বিষয়

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدًا — কাকিররা একবার রসুলুল্লাহ (সা) ও সাহাবারে

কিরামকে একথা বলে ভর দেখিয়েছিল যে, যদি আপনি আমাদের প্রতিমাদের প্রতি বে-আদবী প্রদর্শন করেন, তবে তাদের কোপানল থেকে আপনাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না, তাদের প্রভাব খুব সাংঘাতিক। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং জওয়াবে বলা হয় যে, আল্লাহ কি তাঁর বান্দার পক্ষে যথেষ্ট নন?

সেজন্যই কোন কোন তফসীরবিদ এখানে বান্দার অর্থ নিলেছেন বিশেষ বান্দা অর্থাৎ রসুলুল্লাহ (সা)। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এ অর্থই অবলম্বন করা হয়েছে। অন্য তফসীরবিদগণ বলেন যে, এখানে যে-কোন বান্দা বোঝানো হয়েছে। এ আয়াতের

অপর এক কিরআত مَبَازٍ বর্ণিত আছে। এ কিরআত দ্বিতীয় তফসীরের সমর্থক।

বিষয়বস্তু সর্বাধিক ব্যাপক অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর প্রত্যেক বান্দার জন্যই যথেষ্ট।

وَيُظَوِّرُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِكَ — অর্থাৎ কাকিররা

আপনাকে তাদের মিথ্যা উপাসনাকোপানলের ভয় দেখায়। এ আয়াত পাঠ করে পাঠকবর্গ সাধারণত মনে করে যে, এটা আর কি, এতে রসুলুল্লাহ (সা)-র প্রতি কাফিরদের হুমকি বর্ণনা করা হয়েছে মাত্র। তারা এ বিষয়টি অনুমান করতে চেষ্টা করে না যে, এতে আমাদের জন্য কি পথনির্দেশ রয়েছে। অথচ সুস্পষ্ট ব্যাপার এই যে, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে ভয় দেখিয়ে বলে, তুমি অমুক ইফ্রাম অথবা পাপ-কাজ না করলে তোমার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা অথবা শাসকশ্রেণী তোমার প্রতি রাগান্বিত হবেন এবং তোমার ক্ষতি করবেন, এরূপ ভীতি প্রদর্শনকারী ব্যক্তিও এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত, যদিও সে মুসলমান হয়। আমাদের সমাজে এরূপ ঘটনার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। অধিকাংশ চাকরির ক্ষেত্রে আত্মাহর বিধানাবলী অমান্য করবে, না অফিসার বর্গের কোপানলের শিকার হবে, এরূপ টানা-পড়নের সম্মুখীন হতে হয়। আলোচ্য আয়াত তাদের সবাইকে নির্দেশ দিচ্ছে যে, আত্মাহ তা'আলা কি তোমাদের হিফায়তের জন্য যথেষ্ট নন? তোমরা খাঁটিভাবে আত্মাহর জন্য গোনাহ না করার সংকল্প করলে এবং আত্মাহর বিধানাবলীর বিপক্ষে কোন শাসক ও কর্মকর্তার রক্তচক্ষুর পরওয়া না করলে আত্মাহর সাহায্য তোমাদের সাথে থাকবে। বেশির ভাগে বেশি চাকরি নষ্ট হয়ে গেলেও আত্মাহ তা'আলা তোমাদের জীবিকার অন্য ব্যবস্থা করে দেবেন। নিজেই এ ধরনের চাকরি ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টায় থাকা মুসলমানের কর্তব্য। কোন উপযুক্ত জায়গা পেয়ে গেলে অনতিবিলম্বে এ ধরনের চাকুরী ত্যাগ করা উচিত।

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فِيمَا رَأَى
الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ أَمَّا تَعَذُّوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُعْعَاءَ قُلُوبِكُمْ
كَأَنْتُمْ لَا تَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ۝ قُلِ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْأَزَّتْ
قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ۖ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا
هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۝

(৪২) আত্মাহ মানুষের প্রাণ হরণ করেন তার মৃত্যুর সময়, আর যে মরে না, তার নিদ্রাকালে। অন্তর প্রাণ মৃত্যু অবধারিত করেন, তার প্রাণ ছাড়েন না এবং অন্যদের ছেড়ে দেন এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য

নির্দর্শনাবলী রয়েছে। (৪৬) তারা কি আল্লাহ্ ব্যতীত সুপারিশকারী গ্রহণ করেছে? বলায় তাদের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকলেও এবং তারা না শুবলেও? (৪৭) বলায়, সমস্ত সুপারিশ আল্লাহ্‌রই ক্ষমতাপ্রাপ্ত, আসমান ও যমীনে তাঁরই সাক্ষাৎ। অতপর তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (৪৮) যখন বাঁচিভাবে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন তারা পরকালে বিভ্রান্ত করেন না, তাদের অন্তর সংকুচিত হয়ে যায়, আর যখন আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য উপাস্যদের নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন তারা জানকণে উল্লসিত হয়ে উঠে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আল্লাহ্ তা'আলাই হরণ (অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়) করেন (সেসব) প্রাণ, (যাদের মৃত্যুর সময় এসে গেছে।) তাদের মৃত্যুর সময় পুরোপুরিভাবে জীবনাবসান ঘটিয়ে আর যাদের মৃত্যু আসেনি তাদের প্রাণও হরণ করেন তাদের নিদ্রার সময়। (এই প্রাণ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় করা হয় না, এক প্রকার জীবন বাকী থাকে, কিন্তু উপলব্ধি থাকে না। মৃত্যুতে জীবন ও উপলব্ধি উভয়ই শেষ হয়ে যায়।) অতপর যার মৃত্যু অবধারিত করেন, তার প্রাণ আটকিয়ে রাখেন। (অর্থাৎ দেহে ফিরে আসতে দেন না) এবং অন্য প্রাণ (যা নিদ্রার কারণে নিষ্ক্রিয় ছিল এবং যার মৃত্যুর সময় এখনও আসেনি, তাকে) এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছেড়ে দেন। (কলে সে দেহে ফিরে এসে পূর্বের মত কাজকর্ম করতে পারে।) এতে (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র এ কর্মকাণ্ডে) চিত্তাশীল লোকদের জন্য (আল্লাহ্‌র কুদরত ও এককভাবে সমগ্র জগৎ পরিচালনার) নিদর্শনাবলী রয়েছে, (যন্মারা তওহীদ প্রমাণিত হয়।) তারা কি (তওহীদের এমন সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সত্ত্বেও) আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে (উপাস্য) স্থির করেছে, যারা (তাদের) সুপারিশ করবে? (সুশরিকরা তাদের প্রতিমা সম্পর্কে বলত : **هَؤُلَاءِ شَفَعَاءُنَا عِنْدَ اللَّهِ**) আপনি বলুন,

যদিও তারা (অর্থাৎ তোমাদের মনগড়া সুপারিশকারীরা) কিছুই ক্ষমতা রাখে না এবং কিছুই বোঝে না? (তবুও কি তোমরা মনে করতে থাকবে যে, তারা তোমাদের সুপারিশ করবে? তোমরা কি এতটুকুও জান না যে, সুপারিশ করার জন্য তান ও উপযুক্ত ক্ষমতা থাকা অপরিহার্য যা তাদের মধ্যে অনুপস্থিত? এখানে সুশরিকরা বলতে পারত যে, প্রভুর নিষিদ্ধ এসব মূর্তি আমাদের উদ্দেশ্য নয়, বরং এগুলো ক্ষেত্রেশতা অথবা জিনদের প্রতিকৃতি। তারা তো প্রাণশীল এবং ক্ষমতা ও জ্ঞানের অধিকারী। তাই এর জওয়ার দেখানো হয়েছে যে,) আপনি (আরও) বলুন, সমস্ত সুপারিশ আল্লাহ্ তা'আলারই ক্ষমতাপ্রাপ্ত (তাঁর অনুমতি ছাড়া কোন ক্ষেত্রেশতা অথবা মানুষের পক্ষে কারও জন্য সুপারিশ করার সাধ্য নেই। আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতির জন্য দু'টি শর্ত রয়েছে। এক—যে সুপারিশ করবে সে আল্লাহ্‌র প্রিয়জন হবে। দুই—যার জন্য সুপারিশ করবে, তার ক্ষমাবোধ্য হতে হবে। সুশরিকদের প্রতিমা যদি জিন ও শরতামের প্রতিকৃতি হয়, তবে অনুমতি লাভের উত্তর শর্তই অনুপস্থিত।

সুপারিশকারী ছিন ও শরতান আল্লাহর প্রিয়জন নয় এবং মুশরিকরাও ক্রমাবোধ্য নয়। পক্ষান্তরে যদি তাদের যুঁজি ফেরেপড়া অথবা পরগণ্যকরণের প্রতিকৃতি হয়, তবে প্রথম শর্ত উপস্থিত থাকলেও দ্বিতীয় শর্ত অনুপস্থিত। কারণ, মুশরিকদের মধ্যে ক্রমা পাওয়ার যোগ্যতা নেই। অতপর বলা হয়েছে, আল্লাহর শান এই যে, (আসমান ও বর্মীনের রাজত্ব তাঁরই; অতপর তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (তাই সবকিছু ছেড়ে তাঁকেই ভয় কর, তাঁরই ইবাদত কর। কাফির ও মুশরিকদের অবস্থা এই যে,) যখন এককভাবে শুধুমাত্র আল্লাহর আলোচনা করা হয়, (বলা হয় যে, তিনি এককভাবে সমগ্র বিশ্বের ভাষ্যমন্দের সর্বময় মালিক) তখন যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর সংকুচিত হয়ে যায়, আর যখন আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্যদের আলোচনা করা হয় (এককভাবে অথবা আল্লাহর আলোচনার সাথে সংযুক্ত করে) তখন তারা আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠে।

আনুমানিক ভাষ্যক্য বিষয়

ইচ্ছা ও নিষ্কাশনীয় প্রাণ হরণের পার্থক্য: **اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ**

مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا — **يَتَوَفَّى** এর শাসনিক অর্থ দেওয়া ও

করায়ত্ত করা। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, প্রাণীদের প্রাণ সর্বাধিকার ও সর্ব-
ত্বপই আল্লাহ তা'আলার আয়ত্বাধীন। তিনি যখন ইচ্ছা তা হরণ করতে ও ফিরিয়ে
নিতে পারেন। আল্লাহ তা'আলার এ কুলকরত প্রত্যেক প্রাণীই প্রত্যাহ দেখে ও অনুভব
করে। নিদ্রার সময় তাঁর প্রাণ আল্লাহ তা'আলার এক প্রকার করায়ত্তে চলে যায়
এবং জাগ্রত হওয়ার পর ফিরে পায়। অবশেষে এমন এক সময় আসবে, যখন তা
সম্পূর্ণ করায়ত্ত হয়ে যাবে এবং ফিরে পাওয়া যাবে না।

অরুসীয়ে যথহারীতে আছে, প্রাণ হরণ করার অর্থ তাঁর সম্পর্ক দেহ থেকে
বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। কখনও বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সব দিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া
হয়, এরই নাম মৃত্যু। আবার কখনও শুধু বাহ্যিকভাবে বিচ্ছিন্ন করা হয়। অভ্যন্ত-
রীপভাবে যোগাযোগ থাকে। এর ফলে কেবল বাহ্যিকভাবে জীবনের সঞ্জন, চেতনা
ও ইচ্ছাভিত্তিক নড়াচড়ার শক্তি বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় এবং অভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে
দেহের সাথে প্রাণের সম্পর্ক থাকে। ফলে সে শ্বাস গ্রহণ করে ও জীবিত
থাকে। এটা এভাবে করা হয় যে, মানুষের প্রাণকে 'আলমে মিহাল' অধ্যায়নের দিকে
নিবিল্ট করে এ জগৎ থেকে বিমুখ ও নিষ্কিয় করে দেওয়া হয়, যাতে মানুষ পরিপূর্ণ
আরাম লাভ করতে পারে। যখন অভ্যন্তরীণ সম্পর্কও বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়, তখন
দেহের জীবন সম্পূর্ণরূপে শূন্য হয়ে যায়।

আলোচ্য আয়াতে توفى শব্দটি উপরোক্ত উক্ত প্রকার প্রাণ হরণের অর্থকেই অন্তর্ভুক্ত করে। মৃত্যু ও নিদ্রার উপরোক্ত পার্থক্যের সমর্থন হযরত আলী (রা)-এর এক উক্তি থেকেও পাওয়া যায়। তিনি বলেন, “নিদ্রার সময় মানুষের প্রাণ তার দেহ থেকে বের হয়ে যায়, কিন্তু প্রাণের একটি রেশ দেহে বাকী থাকে। ফলে মানুষ জীবিত থাকে। এ রেশের মাধ্যমেই সে স্বপ্ন দেখে। এ স্বপ্ন আলমে মিহালের দিকে প্রাণের নিবিষ্ট থাকা অবস্থায় দেখা হলে তা সত্য স্বপ্ন হয় এবং সেদিক থেকে দেহের দিকে ফিরে আসার সময় দেখলে তাতে শরতানের কারসাজি শামিল হয়ে যায়। ফলে সেটা সত্য স্বপ্ন থাকে না।” তিনি আরও বলেন, “নিদ্রাবস্থায় প্রাণ দেহ থেকে বেরিয়ে যায়, কিন্তু আগরণের সময় এক নিমেষের চেয়েও কম সময়ে দেহে ফিরে আসে।”

قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِيمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ
بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي
الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَبَدَأَ اللَّهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَهُمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ۝ وَبَدَأَ اللَّهُ مِنْ سَيِّئَاتِ مَا
كَسَبُوا وَحَقَّ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۝ وَقَدْ مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرْدَانَا
ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِمَّا ۝ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ قَدْ قَالُوا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ
عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ
هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا لَهُمْ بِمُحْزِزِينَ ۝ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

(৪৬) হালান, হে আল্লাহ, আসমান ও বর্ষানের স্রষ্টা, দূশ ও অসুখের জ্ঞানী, আপনিই আপনার বান্দাদের মধ্যে করসাজা করবেন যে বিচার তারা যতখিরোখ করত। (৪৭) যদি গোনাহ্গারদের কাছে পৃথিবীর সবকিছু থাকে এবং তার সাথে সমপরিমাণ আরও থাকে, তবে অবশ্যই তারা কিয়ামতের দিন সে সবকিছুই নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে দেবে। অথচ তারা দেখতে পারে, আল্লাহর পক্ষ

থেকে এমন শক্তি, যা তারা কল্পনাও করত না। (৪৮) আর দেখতে, তাদের দুর্ভিক্ষ-সমূহ এবং যে বিষয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তা তাদেরকে ঘিরে নেবে। (৪৯) মানুষকে যখন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে আমাকে ডাকতে শুরু করে, এরপর আমি যখন তাকে আমার পক্ষ থেকে নিয়ামত দান করি তখন সে বলে এটা তো আমি পূর্বের জানা মতেই প্রাপ্ত হয়েছি। অথচ এটা এক পরীক্ষা কিন্তু তাদের অধিকাংশই বোঝে না। (৫০) তাদের পূর্ববর্তীরাও তাই বলত অতপর তাদের কৃতকর্ম তাদের কোন উপকারে আসেনি। (৫১) তাদের দুর্ভিক্ষ তাদেরকে বিপদে ফেলেছে, এদের মধ্যেও যারা পাপী, তাদেরকেও অতিসত্ত্ব তাদের দুর্ভিক্ষ বিপদে ফেলেবে। তারা তা প্রতিহত করতে সক্ষম হবে না। (৫২) তারা কি জানেনি যে, আল্লাহ্ যার জন্য ইচ্ছা। যিহিক বৃদ্ধি করেন এবং পরিমিত দেন। নিশ্চয় এতে বিলাসী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাকণী রয়েছে।

তকসীরের সার-সংক্ষেপ

আগনি (তাদের শত্রুতায় চিহ্নিত হবেন না এবং আল্লাহ্‌র কাছে দোয়ার) বলুন যে আল্লাহ্, আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, অদৃশ্য ও দৃশ্যের জানী, আগনিই (কিয়ামতের দিন) আগ্নার বাস্তুদের মধ্যে ফয়সালা করবেন যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করত। (অর্থাৎ আগনি তাদের ব্যাপার আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সমর্পণ করুন। তিনি নিজে কার্যত ফয়সালা করে দেবেন। এই ফয়সালায় সময় ও অবস্থা এই হবে যে,) যদি ফুলুম (অর্থাৎ বিরক ও কুফর)-কারীদের কাছে পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু-সামগ্রী থাকে এবং তার সাথে সমপরিমাণ আরও থাকে, তবে অবশ্যই তারা তা কিয়ামতের দিন শোচনীয় আয়ব থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য (নিদ্বিধায়) দিয়ে দেবে, (যদিও তা কবুল করা হবে না, যেমন সূরা যাসেরার আছে—^{وَأَن تَقُولَ لَهُمْ} مَا تَقُولُ لَهُمْ) আল্লাহ্‌র

পক্ষ থেকে তারা এমন ব্যাপারের সম্মুখীন হবে, যা তারা কল্পনাও করত না। (কেননা, প্রথমত তারা পরকাল অস্বীকার করত, এরপরও দাবি করত যে, সেখানেও তারা সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করবে। তখন) তারা দেখতে পাবে তাদের যাবতীয় দুর্ভিক্ষ এবং যে (শাস্তির) বিষয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে নেবে। (মুশরিক তো মিথ্যা উপাস্যদের আলোচনায় সন্তুষ্ট এবং কেবল আল্লাহ্‌র আলোচনায় অসন্তুষ্ট থাকে, কিন্তু) যখন (মুশরিক) লোককে কোন দুঃখকষ্ট স্পর্শ করে, তখন (হাদের আলোচনায় সন্তুষ্ট থাকত, তাদের সবাইকে ছেড়ে) আমাকেই ডাকতে শুরু করে। অতপর আমি যখন তাকে আমার পক্ষ থেকে কোন নিয়ামত দান করি, তখন (সে তওহীদে কান্নেম থাকে না, যার সত্যতা তার নিজের স্বীকা-রোক্তি দ্বারাই প্রমাণিত হয়েছিল। সেমতে সে এই নিয়ামতকে আল্লাহ্‌র নিয়ামত বলে না, বরং) বলে, এটা তো আমি (আমার) পূর্ব জানামতেই প্রাপ্ত হয়েছি। (এভাবে সে পূর্বের ন্যায় শিরকে ফিরে যায় এবং মিথ্যা উপাস্যদের পুজার ভোগে

যারা (অতপর আল্লাহ্ তার উক্তি শ্রবণ করে বলেন যে, এটা তার নিজের তখিরের ফলশ্রুতি নয়, বরং এটা (অর্থাৎ মানুষের জন্য আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ামত) একটা পরীক্ষা। (আল্লাহ্ দেখতে চান যে, নিয়ামত পেয়ে মানুষ তাকে জুলে গিরে কুফরীয়তে লিপ্ত হয়ে পড়ে, নাকি তাকে স্মরণ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।) কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা বোঝে না। (তাই একে নিজের তখিরের ফলশ্রুতি বলে এবং গিরকে লিপ্ত হয়।) তাদের (কোন কোন) পূর্ববর্তীরাও একথা বলত (যেমন, কারান বলেছিল, **إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ مِلِّمٍ مُّندَىٰ**—নমরান, ফেরাউনও কোন নিয়ামতকে

আল্লাহ্‌র নিয়ামত বলত না। উপাজিত ও ইচ্ছাধীন নয়, এমন নিয়ামতকে তারা ঘটনাচক্রে দিকে এবং উপাজিত ও ইচ্ছাধীন নিয়ামতকে কৌশল ও ভানগরিয়ার সাথে সম্পৃক্ত করত।) অতপর তাদের কর্মতৎপরতা তাদের কোনই কাজে আসেনি (এবং আযাব থেকে রক্ষা করতে পারেনি)। তাদের দুর্কর্ম তাদেরকে বিপদেই ফেলছে (এবং তারা শাস্তিপ্ৰাপ্ত হয়েছে। বর্তমান যুগের লোকেরাও যেন মনে না করে যে, যা হওয়ার ছিল পূর্ববর্তীদের সাথেই হয়ে গেছে, বরং) তাদের মধ্যেও যারা যালিম, তাদেরকেও অভিসম্বর তাদের দুর্কর্ম বিপদে ফেলেবে। তারা (আল্লাহ্ তা'আলাকে) প্রতিহত করতে পারবে না। (সেহতে বদর যুদ্ধে তাদের যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে। যারা আল্লাহ্‌র নিয়ামতকে নিজেদের তখিরের ফলশ্রুতি মনে করে, অতপর তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে : তারা কি (অবস্থানি দেখে) জানেনি যে, আল্লাহ্ তা'আলাই যার জন্য ইচ্ছা রিযিক বৃদ্ধি করেন এবং তিনিই (যার জন্য ইচ্ছা) তা হ্রাস করেন। এতে (চিন্তা করলে) বিশ্বাসী লোকদের জন্য (এ বিষয়ের) নিদর্শনাবলী রয়েছে (যে, তিনিই রিযিক বৃদ্ধি করেন এবং হ্রাস করেন—তখির সত্যিকার কর্তা নয়। সুতরাং এসব নিদর্শন নিয়ে যারা চিন্তা-ভাবনা করবে, সে তখিরকে সবকিছু মনে করবে না, তওহীদে বিশ্বাসী হবে এবং সুখে ও দুঃখে তার কথা ও কাজ পরম্পরবিরোধী হবে না।)

আমুখারিক আতফা বিয়র

قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ—সহীহ মুসলিমের রেওয়াজেতে

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রসুলুল্লাহ্-(স)-তাহাজ্জুদের নামায কিসের দ্বারা শুরু করতেন? তিনি বললেন, তিনি যখন তাহাজ্জুদের জন্য উঠতেন, তখন এ দোয়া পাঠ করতেন :

اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَأِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

مَالِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ
أَهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنِّي تَهَيَّئُ لِي مِنْ تَشَاءِ إِلَى
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

হযরত সাদীদ ইবনে জুবায়ের (র) বলেন, আমি কোরআন পাকের এমন
এক আয়াত জানি, যা পাঠ করে দোয়া করলে সে দোয়া কবুল হয়। অতঃপর তিনি
এ আয়াত পাঠ করলেন : — (কুরতুবী)

وَبَدَّلَهُمْ مِنْ اللَّهِ مَالٌ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ

এ আয়াত পাঠ করে বললেন, ধ্বংস হোক লোক দেখানো ইবাদতকারীরা, ধ্বংস হোক
লোক দেখানো ইবাদতকারীরা, এ আয়াত তাদের সম্পর্কেই, যারা দুনিয়াতে মানুষকে
দেখানোর জন্য সৎকর্ম করত এবং লোকেরাও তাদেরকে সৎ মনে করত। তারা
ধোঁকার ছিল যে, এসব সৎকর্ম পরকালে তাদের মুক্তির উপায় হবে। কিন্তু এজগতে
যেহেতু নিষ্ঠা ছিল না, তাই আল্লাহর কাছে এরূপ সৎকর্মের কোন পুরস্কার ও সওয়াব
নেই। ফলে পরকালে তাদের ধারণার বিপরীতে শাস্তি হতে থাকবে। — (কুরতুবী)

সাহাবায়ে কিরামের পারস্পরিক বাদানুবাদ সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশ :
হযরত রবী ইবনে খাইসমকে কেউ হযরত হোসাইন (রা)-এর শাহাদত সম্পর্কে
প্রশ্ন করলে তিনি এক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে

أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ

আয়াতখানি ডিলাওয়ার করলেন, অতঃপর বললেন :
সাহাবায়ে কিরামের পারস্পরিক মতবিরোধ সম্পর্কে যখন তোমার মনে ঝটিকা দেখা
দেয়, তখন এ আয়াত পাঠ করনিও। রুহুল মা'আনী এই ঘটনা বর্ণনা করে বলেন :
এটি একটি বিরাট আদব ও শিক্ষা। এটা সদ্যসর্বদা মনে রাখা উচিত।

قُلْ يُعْبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَى

رَيْكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ۝
 وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ
 بُغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۝ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يُحْصِرْتَنِي عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ
 فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّخِرِينَ ۝ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي
 لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ۝ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي
 كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۝ بَلَىٰ قَدْ جَاءَ تَكَ أَيْتِي فَلَكَذَّبْتُ بِهَا
 وَاسْتَكْبَرْتُ وَكُنْتُ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا
 عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ۝ وَيُنَادِي
 اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا عَمَلَاتِهِمْ لَا يَمْسَسُهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يُعْزَرُونَ ۝

(৫৬) বলুন, হে আমার বান্দাগণ যারা নিজেদের উপর মূল্য করেছ তোমরা
 আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হলো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গোনাহ যাক করেন।
 তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৫৭) তোমরা তোমাদের পালনকর্তার অভিমুখী হও এবং
 তাঁর আজ্ঞাবহ হও তোমাদের কাছে আশাব আসার পূর্বে। এরপর তোমরা সাহাব্যপ্রাপ্ত
 হবে না; (৫৮) তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ উত্তম বিষয়ের অনুসরণ কর তোমাদের কাছে
 অতক্রিতে ও অভ্যন্তসারে আশাব আসার পূর্বে, (৫৯) হাতে কেউ না বলে, হায়, হায়,
 আল্লাহ সকাশে আমি কর্তব্যে অবহেলা করেছি এবং আমি ঠাট্টা-বিতৃপকারীদের
 অভ্যুত্থিত হিলাম। (৬০) অথবা না বলে, আল্লাহ যদি আমাকে গণপ্রদর্শন করতেন,
 তবে অবশ্যই আমি পরহেযকারীদের একজন হতাম। (৬১) অথবা আশাব প্রত্যক্ষ
 করার সময় না বলে, যদি কোনরূপে একবার ফিরে যেতে পারি, তবে আমি সংকর্ম-
 পরায়ণ হয়ে যাব। (৬২) হ্যাঁ, তোমার কাছে আমার নির্দেশ এসেছিল; অতপর তুমি
 তাকে মিথ্যা বলেছিলে, অহংকার করেছিলে এবং কাফিরদের অভ্যুত্থিত হয়ে গিয়েছিলে।
 (৬৩) যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, কিয়ামতের দিন আগনি তাদের মুখ
 কাল দেখবেন। অহংকারীদের আবাসস্থল জাহান্নামে নয় কি? (৬৪) আর যারা শিরক
 থেকে বেঁচে থাকত, আল্লাহ তাদেরকে সাকল্যের সাথে মুক্তি দেবেন, তাদেরকে অনিষ্ট
 প্ৰদর্শন করবে না এবং তারা চিহ্নিতও হবে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি (প্ররকারীদের জওয়াবে আমার একথা) বলে দিন, হে আমার বাঙ্গাল, যারা (কুফর ও শিরক করে) নিজেদের উপর বলুম করেছে, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হইয়া না (এবং এরূপ মনে করো না যে, ইমান আনার পর অতীত কুফর ও শিরকের হিসাব নেওয়া হবে। এমন নয়, বরং) মিশ্চর আল্লাহ তা'আলা (ইসলামের বরকতে) সমস্ত (অতীত) গোনাহ (কুফর ও শিরক হলেও) মাফ করে দেবেন। বাস্তবিক তিনি ক্ষমাদীল, পরম দয়ালু। (ক্ষমার এ শর্ত কুফর থেকে তওবা করা ও ইসলাম গ্রহণ করা। তাই) তোমরা (তওবা করার জন্য) তোমাদের পালন-কর্তার অধিমুখী হও এবং (ইসলাম গ্রহণ করার ব্যাপারে) তাঁর আজাব হও (ইসলাম গ্রহণ না করা অবস্থায়) তোমাদের কাছে আমার আসার পূর্বে। তখন (কারও পক্ষ থেকে) তোমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না। (অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করলে কুফর ও শিরক সবই মাফ হয়ে যাবে এবং ইসলাম গ্রহণ না করলে কুফর ও শিরকের কারণে আমার আসবে, যা প্রতিহত করা যাবে না। অতএব তোমাদের উচিত যে, তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত উত্তম বিধানাবলী মেনে চল, তোমাদের কাছে অতিক্রান্ত ও অভ্যুতসারে পর-কালের আমার আসার পূর্বে। ('অতিক্রান্ত' বলার এক কারণ এই যে, প্রথম ফু'কের পর সব প্রাণ অভ্যুত হয় যাবে, অতপর দ্বিতীয় ফু'কের পর হঠাৎ আমার অনন্তত হতে থাকবে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, আমার আসার পূর্বে আমারে স্বরূপ সম্পর্কিত কোন ধারণাই থাকবে না। কাজেই ধারণার বিপরীতে আমার আসাকেই 'অতিক্রান্ত' বলে প্রকাশ করা হয়েছে। উপরোক্ত আদেশ দেওয়ার কারণ) যাক্ (কাল কিয়ামতে) কেউ (একথা) না বলে যে, হায়, আমি আল্লাহ সকাশে আমার কর্তব্যে অরহেলা করেছি। আমি তো ঠাট্টা-বিদ্রূপকারীদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলাম অথবা (এমন) না বলে যে, আল্লাহ যদি (দুনিয়াতে) আমাকে পথপ্রদর্শন করতেন, তবে আমিও পরহেযগারদের একজন হতাম। (কিন্তু আমি পথপ্রদর্শন থেকেই বঞ্চিত ছিলাম, তাই এ স্রুষ্টি ও অরহেলা হয়েছে। অতএব আমি ক্ষমার যোগ্য।) অথবা কেউ আমার প্রত্যক্ষ করে (যেন) না বলে যে, যদি কোনরূপে একবার পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারি, তবে আমি সংকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। (দ্বিতীয় উত্তির জওয়াবে বলা হয়েছে:) হ্যাঁ, তোমার কাছে আমার আশ্রয়সমূহ পৌঁছেছিল, কিন্তু তুমি সেগুলোকে মিথ্যা বলেছিলে, (এবং সে মিথ্যা বলা কোন সন্দেহবশত ছিল না, বরং) তুমি অহংকার করেছিলে এবং (পরেও ঠিক হওনি, বরং) কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিলে। (কাজেই এখন একথা বলা ঠিক নয় যে, তোমাকে পথপ্রদর্শন করা হয়নি। অতপর কাফির এবং কুফর থেকে তওবাকারী উভয়ের শাস্তি ও প্রতিদান সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে।) আপনি কিয়ামতের দিন তাদের মুখ কাল দেখবেন যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে (অর্থাৎ আল্লাহ যা করতে বলেননি, যেমন কুফর ও শিরক—তা আল্লাহ করতে বলেছেন বলে এবং আল্লাহ যা করতে বলেননি, যেমন, কোরআনের আদেশ-নিষেধ, তা আল্লাহ করতে বলেননি বলে।) এসব অহংকারীর আবাসস্থল কি আদাম্ম নয়?

আর যারা (কুফর ও শিরক থেকে) বেঁচে থাকত, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সাফল্যের সাথে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন। তাদেরকে (সামান্য অনিশ্চিত) স্পর্শ করবে না এবং তারা চিহ্নিতও হবে না। (কেননা জাহান্নামে চিহ্ন নেই।)

জানকরিক ভাটব্য খিরর

قُلْ يَا مَعْشَرَ الَّذِينَ آمَنُوا هَمَزُوا لِلَّهِ لَئِنْ هُوَ لَآتِيكُمْ بِهِ فَتَرَخْتُمْ عَلَيْهِ ذُنُوبَكُمْ فَاَنْتُمْ تَكْفُرُونَ — হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, কিছু

লোক ছিল, যারা অন্যায় ইত্যা করেছিল এবং অনেক করেছিল। আরও কিছু লোক ছিল, যারা ব্যভিচার করেছিল এবং অনেক করেছিল। তারা এসে রসুলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে আরম্ভ করল : আপনি যে ধর্মের দাওয়াত দেন, তা তো খুবই উত্তম, কিন্তু চিন্তার বিষয় হল এই যে, আমরা অনেক সোনাহ্ করে ফেলেছি। আমরা যদি ইসলাম গ্রহণ করি, তবে আমাদের তওবা কবুল হবে কি? এর পরিস্থিতিতেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।—(কুরতুবী)

তাই আয়াতের বিষয়বস্তুর সারমর্ম এই যে, মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যুক বড় সোনাহ্ এমনকি শিরক ও কুফর থেকে তওবা করলেও তওবা কবুল হয়। সত্যিকার তওবা যারা সবরকম সোনাহ্ই মাফ হতে পারে। তাই আল্লাহ্ রহমত থেকে কারও নিরাশ হওয়া উচিত নয়।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) বলেন, এই আয়াতটি সোনাহ্গারদের জন্য কোরআনের সর্বাধিক আশাব্যক্তক আয়াত। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন :

إِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلُمِهِمْ — আয়াতই হল সর্বাধিক আশার আয়াত।

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ — এখানে 'উত্তম অবতীর্ণ বিষয়' বলে কোরআনকে বোঝানো হয়েছে। সমগ্র কোরআনই উত্তম। একে এদিক দিয়েও উত্তম বলা যায় যে, আল্লাহ্ র পক্ষ থেকে তওরাত, ইঞ্জীল, মবুর ইত্যাদি মত কিভাবে অবতীর্ণ হয়েছে, তদ্বোধে উত্তম ও পূর্ণতম কিভাবে হচ্ছে কোরআন।—(কুরতুবী)

أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَىٰ لَوْلَا أَنَّ مِثْلَ ظَنِّكَ أَلْمُوتُ مَا كُنْتُمْ بِهِ مُخِذِينَ — এই তিনটি

আয়াতে সে বিষয়বস্তুরই ব্যাখ্যা ও তাকীদ করা হয়েছে, যা পূর্বকার তিন আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। তা এই যে, কোন বৃহত্তম অপরাধী, কাফির, পাগাচারীও আল্লাহ্ র রহমত থেকে নিরাশ হওয়া উচিত নয়। তওবা করলে আল্লাহ্ তার সমস্ত অতীত সোনাহ্ মাফ করে দেন। কিন্তু একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, তওবার সময় হল মৃত্যুর

পূর্বে। যত্নের পরে কিয়ামতের দিন কেউ তওবা করলে অথবা অনুতপ্ত হলে তাকে কোন উপকার হবে না।

কোন কোন কাকির ও পাগাচারী কিয়ামতের দিন বিভিন্ন বাসনা প্রকাশ করবে। কেউ অনুতাপ করে বলবে, হায়, আমি আল্লাহর আনুগত্যে কেন সৈধিয়া করেছিলাম! কেউ সেখানেও তওবাদের উপর দোষ চাপিয়ে আশ্রয় চাইবে। সে বলবে, যদি আল্লাহ তা'আলা আমাকে পথপ্রদর্শন করতেন, তবে আমিও মুতাকীদের অন্তর্ভুক্ত থাকতাম। কিন্তু আল্লাহ পথপ্রদর্শন না করলে আমি কি করব? কেউ বাসনা করবে যে, আমাকে পুনরায় দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিলে আমি পাকাপাকি মুসলমান হয়ে যাব এবং আল্লাহর বিধানাবলী পুরোপুরি মেনে চলব। কিন্তু তখনকার এসব অনুতাপ ও বাসনা কোন কাজেই আসবে না।

উপরোক্ত তিন রকম বাসনা তিন ধরনের লোকদেরও হতে পারে এবং একই সময়ের পক্ষ থেকেও হতে পারে। তারা একের পর এক করে তিন রকম বাসনাই ব্যক্ত করবে। কেননা সর্বশেষ বাসনা, যাতে পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসার আশা প্রকাশ করা হয়েছে, এটা আশাব প্রত্যাক করার পরেই হবে। এতে বাহ্যত ক্ষণা যায় যে, পূর্বোক্ত দু'টি বাসনা আশাব প্রত্যাক করার পূর্বকাল। কিয়ামতের দিন তখনই তারা নিজেদের কর্মের দু'টি-বিদ্যুতি স্মরণ করে বলবে: **يَا حَسْرَتِي عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي**

جَنبِ اللَّهِ—এরপর ওয়র ও বাহানা করে বলবে, আল্লাহ হিদায়েত করলে আমরাও অনুগত মুতাকী হয়ে যেতাম। কাজেই আমাদের কি দোষ! এরপর আশাব প্রত্যাক করে বাসনা করবে, আমাদেরকে যদি পুনরায় দুনিয়াতে পাঠিয়ে দেওয়া হত! আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য তিনটি আল্লাতে বলে দিয়েছেন, আল্লাহর মাপফিরাত ও রহমত খুব বিস্তৃত, কিন্তু তা লাভ করতে হলে যত্নের পূর্বে তওবা করতে হবে। আমি এখনই বলে দিচ্ছি—যত্নের পরে যেন তোমরা পরিতাপ না কর এবং এ ধরনের ক্ষমত্বক ক্ষমতা প্রকাশ না কর।

بَلَىٰ قَدْ جَاءَ شَأْنُ أَتَيْتِ فَكَذَّبَتْ بِهَا—আল্লাহ তা'আলা হিদায়েত করলে

আমরা পরহিসগার হয়ে যেতাম—এখানে কাকিরদের এ উক্তিও জওরার দেওয়া হয়েছে। এর সারকথা এই যে, আল্লাহ পুরোপুরিই হিদায়েত করেছিলেন এবং কিতাব ও আল্লাত প্রেরণ করেছিলেন। তবে হিদায়েত করার পর কাউকে আনুগত্য বাক্য করেন নি, বরং সত্য ও মিথ্যা যে কোন পথ অবলম্বন করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। এটাই ছিল হাদার পরীক্ষা। এর উপরই ছিল তার সত্যতা ও বাস্তবতা নির্ভরশীল। সে হেদায় গোমরাহীর পথ অবলম্বন করেছে, তখন সে নিজেই দারী।

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي
 ۝ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ۝ وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَلَّىٰ الدِّينَ مِنْ قَبْلِكَ ۝ لَيْسَ
 أَشْرَكَتْ لِي حَبِطٌ عَلَيْكَ وَلَسَوْتُنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ بَلِ اللَّهُ فَعْبُدْ وَكُنْ مِنَ
 الشَّاكِرِينَ ۝ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَتَّىٰ قَدَرَهُ ۚ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ
 الْقِيَمَةِ ۚ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ۚ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ

(৬২) আল্লাহ্ সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সবকিছুর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।
 (৬৩) জিসমান ও যমীনের চাবি তাঁরই নিকট। যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে অস্বীকার
 করে, তারাষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত। (৬৪) বলুন, যে যুধরা, তোমরা কি আমাকে আল্লাহ্ বাতীল
 জনের ইবাদত করতে আদেশ করছ? (৬৫) আগনার প্রতি এবং আগনার পূর্ববর্তীদের
 প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে, যদি আল্লাহ্‌র শরীক হির করেন, তবে আগনার কর্ম নিষ্ফল
 হবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হবেন। (৬৬) বরং আল্লাহ্‌রই ইবাদত করুন
 এবং কৃতজ্ঞদের অতীত থাকুন। (৬৭) তারা আল্লাহ্‌কে স্বার্থান্বেষণে বুঝেনি।
 কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোতে এবং আসমানসমূহ তাঁর
 কব্জ অবস্থায় থাকবে তাঁর ডান হাতে। তিনি গবিহ। আর এরা যাকে শরীক করে,
 তা থেকে তিনি অনেক উর্ধে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আল্লাহ্ সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনিই সবকিছুর রক্ষক। আকাশ ও পৃথিবীর
 চাবি তাঁরই আয়ত্তে। (অর্থাৎ এগুলোর স্রষ্টাও তিনি এবং রক্ষকও তিনি। وَكُلُّ
 لَهٗ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ
 শব্দের তাবার্থ তাই। সবকিছুর নিয়ন্ত্রণও তাঁরই কাজ। এটা
 এর তাবার্থ। কেননা যার হাতে জীভারের চাবি থাকে, স্বভাবত সেই তার নিয়ন্ত্রণের
 মালিক হয়ে থাকে। সমস্ত সৃষ্ট জগতের স্রষ্টাও যখন তিনিই, তখন ইবাদতও শুধু
 তাঁরই হওয়া উচিত এবং শান্তি ও প্রতিদানের মালিকও তাঁরই হওয়া উচিত। এটাই
 তওহীদের সারমর্ম। আল্লাহ্‌র এসব ক্ষমতা অশরিকরাও স্বীকার করত। সুতরাং
 তাদের কর্তব্য ছিল তওহীদকে মেনে নেওয়া। তাই বলি হয়েছেঃ) যারা (এরপরও)
 আল্লাহ্‌র (তওহীদ, প্রতিদান ও শান্তির বিষয়বস্তু সম্বলিত) আয়াতসমূহ মানে না,

• आनुवंशिक क्रांति विचार

www.icsbook.info

وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ

কিয়ামতের দিন পৃথিবী আঙ্গুর মুঠোতে থাকবে এবং আকাশ ভাঁজ করা অবস্থায় তার ডান হাতে থাকবে। পূর্ববর্তী আলিমগণের মতে আক্ষরিক অর্থেই এমনটি হবে। কিন্তু আয়াতের বিষয়বস্তু **مُتَشَابِهَات** এর অন্তর্ভুক্ত, যার স্বরূপ আঙ্গুর বা ভাঁজ করা অন্য কেউ জানে না। এর স্বরূপ জানার চেষ্টা করাও সাধারণ লোকের জন্য নিষিদ্ধ। বিশ্বাস করতে হবে যে, আঙ্গুর যা উদ্দেশ্য তা সত্য ও বিশ্বস্ত। এ আয়াতের বাহ্যিক ভাষা থেকে জানা যায় যে, আঙ্গুর তা'আলার 'মুঠি' ও 'ডান হাত' আছে। এগুলো সৈনিক অস্ত্র-প্রত্যয়, অর্থাৎ আঙ্গুর তা'আলা সেই ও সেইরকম থেকে গঠিত ও মুক্ত। তাই আয়াতের উপসংহারে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এগুলোকে নিজেদের অস্ত্র-প্রত্যয়স্বরূপে আঙ্গুরকে বুঝতে চেষ্টা করো না। আঙ্গুর এগুলো থেকে গঠিত। **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ**

পরবর্তী আলিমগণ আঙ্গুর আয়াতকে দৃষ্টান্ত ও রূপক সাব্যস্ত করে এর অর্থ করেছেন যে, 'এ বস্তু আমার মুঠিতে ও ডান হাতে' এরূপ বলে রূপক ভঙ্গিতে বোঝানো হয় যে, বস্তুটি পূর্ণরূপে আমার করায়ত্ত ও নিয়ন্ত্রণাধীন। আয়াতে তাই বোঝানো হয়েছে।

وَنُفُخَ فِي الصُّورِ فَصُوعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ الْأَمِنُ كَانَ
 اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ۝ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ
 بِنُورٍ رَّيِّهِهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجَاءُ السَّالِقِينَ وَالشُّهَدَاءُ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ
 بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝ وَوُضِعَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا
 يَفْعَلُونَ ۝ وَوَسَّيْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا
 فَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ
 عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ
 حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ

خَلِيدِينَ فِيهَا. فَبِمَنْ شِئِيَ الْمُتَكِبِّرِينَ ۝ وَبَيْنَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ
 إِلَى الْجَنَّةِ زُجْرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا
 سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ۝ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ
 قَوْلًا وَعَدَهُ وَأَوْثَقَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ۖ فَنُحْمَ
 أَجْمَعِينَ ۝ هُوَ رَبُّ الْمَلَكِ ۚ حَاقِقِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ
 يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

(৬৬) নিরপার স্বর্গ দেওয়া হবে, ফলে জাহান্নাম ও স্বর্গে যারা আছে সবাই
 বৈশিষ্ট্য হয়ে যাবে, তবে জাহান্নাম দিকে ইচ্ছা করেন। অতপর জাহান্নাম নিরপার স্বর্গ
 দেওয়া হবে, তৎকালীন তারা দস্যবধান হয়ে দেখতে থাকবে। (৬৭) পৃথিবী তার
 পালনকর্তার নুরে উদ্ভাসিত হবে, জাহান্নাম দ্বাপন করা হবে, পরলোকলব ও সাক্ষী-
 লবকে জানা হবে এবং সকলের কথা ন্যায়বিচার করা হবে—তাদের প্রতি জুলুম করা
 হবে না। (৭০) প্রত্যেক যা করেছে, তার পূর্ণ প্রতিফল দেওয়া হবে। তারা যা কিছু
 করে, সে সন্দেহে জাহান্নাম সমাক জবাব। (৭১) কাফিরদেরকে জাহান্নামের দিকে
 ললে ললে ইচ্ছা করে দেওয়া হবে। তারা যখন সেখানে পৌঁছাবে, তখন তার পরজাহান্নাম
 ললে দেওয়া হবে—এক জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের কাছে কি
 তোমাদের কথা থেকে পরলোক জাহান্নাম, তারা তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার
 জাহান্নাম ললে জাহান্নাম করত এবং সত্য করত এ দিনের সাক্ষীদের বাপারে? তারা
 বলবে, হ্যাঁ, কিন্তু কাফিরদের প্রতি পাতির হুকুমই কতবারিত করেছে। (৭২) বলা হবে,
 তোমরা জাহান্নামের দরজা দিয়ে প্রবেশ কর, সেখানে চিরকাল জবাহানের জন্য। কত
 নিরুদ্ধ জাহান্নামের জাহান্নাম। (৭৩) তারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করত, তাদেরকে
 ললে ললে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা উপস্থিত দরজা দিতে জাহান্নামে
 পৌঁছাবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে
 থাক, অতপর সদাসর্বদা বসবাসের জন্য তোমরা জাহান্নামে প্রবেশ কর। (৭৪) তারা বলবে,
 সমস্ত প্রশংসা জাহান্নাম, যিনি জাহান্নামের প্রতি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং জাহান্নামেরকে
 এ জাহান্নাম উত্তরাধিকারী করেছেন। আমরা জাহান্নামের যেখানে ইচ্ছা বসবাস করব।
 মেহনতকারীদের পুরস্কার কতই চমৎকার। (৭৫) আগনি ফেরেশতাদেরকে দেখবেন,
 তারা জাহান্নাম তার পাশ দ্বারা তাদের পালনকর্তার পক্ষিতা ঘোষণা করছে। তাদের সবার
 মাঝে ন্যায় বিচার করা হবে। বলা হবে, সমস্ত প্রশংসা বিরপাক জাহান্নাম।

তুফসীরের সার-সংক্ষেপ

(উল্লিখিত কিয়ামতের দিন) শিংগার হুক দেওয়া হবে, ফলে আসমান ও
 স্বর্গীদের সবাই বেহেশ হয়ে যাবে। (অতপর জীবিতরা মরে যাবে এবং মৃতদের রূহ
 বেহেশ হয়ে যাবে।) কিন্তু আজাহ্ যাকে ইচ্ছা করবেন (সে বেহেশ হওয়া ও মরে যাওয়া
 থেকে মুক্ত থাকবে)। অতপর আবার শিংগার হুক দেওয়া হবে—তৎক্ষণাৎ সবাই
 (ভানপ্রাপ্ত হয়ে দেহের সাথে আত্মার সংযোগ হয়ে কবর থেকে) দস্তারমান হয়ে
 (চতুর্দিকে) দেখতে থাকবে। (অভ্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটলে স্বভাবত মেরাপ হয়। অতপর
 আজাহ্ তা'আলা হিসাবের জন্য তাঁর উপযুক্ত শান অনুযায়ী বিরাজমান হবেন এবং)
 স্বর্গীন তার পালনকর্তার নুরে উদ্ভাসিত হবে, (সবার) আমলনামা (প্রত্যেকের
 সামনে) স্থাপন করা হবে এবং পরসম্মত ও সাক্ষিপনকে উপস্থিত করা হবে
 (সাক্ষীর অর্থ ব্যাপক। এতে পরসম্মত, ফেরেশতা, উম্মতে-মোহাম্মদী এবং অজ-প্রত্যজ
 প্রভৃতি সবাই অন্তর্ভুক্ত।) এবং সবার মাঝে (আমলঅনুযায়ী) ন্যায়বিচার করা
 হবে, তাদের উপর জুজুম করা হবে না। (অর্থাৎ কোন সৎকর্ম গোপন করা হবে
 না এবং কোন পাপকর্ম বাড়িয়ে দেখানো হবে না।) প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের পূর্ণ
 প্রতিকূল দেওয়া হবে। (সৎকর্মের প্রতিকূল পূর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্য হল প্রতিকূল হ্রাস
 না করা এবং পাপকর্মের প্রতিকূল পূর্ণ হওয়ার মানে তাতে বৃদ্ধি না করা।) তিনি সমস্তের
 কলঙ্ককর্ম সম্পর্কে সম্যক অবগত। (সুতরাং প্রত্যেককে তদনুযায়ী প্রতিকূল দেওয়া তাঁর
 পক্ষে কঠিন নয়। প্রতিকূল এই-যে,) যারা কাকির, তাদেরকে দলে দলে জাহান্নামের
 দিকে হাঁকিয়ে (খান্না ঘেরে ঘেরে লাগ্ননার সাথে) নিয়ে যাওয়া হবে। (কুকরের
 প্রকার ও ভর বিভিন্ন হওয়ার কারণে দলে দলে ভাগ করে নেওয়া হবে। এক এক
 প্রকার কাকিরদের এক একটি দল হবে।) যখন তারা জাহান্নামের কাছে পৌঁছাবে,
 তখন দরআসমূহ খুলে দেওয়া হবে এবং তাদেরকে জাহান্নামের রক্ষী (ফেরেশতা)-গণ
 (ভৎসনা করে) বলবে, তোমাদের কাছে কি তোমাদেরই সখা থেকে (হাতে
 তোমাদের জন্য উপকার লাভ কঠিন না হয়) পরসম্মত আসেনি, যারা তোমাদেরকে
 তোমাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনাত এবং তোমাদেরকে এ দিনের
 সাক্ষাতের ব্যাপারে সতর্ক করত? কাকিররা বলবে, হ্যাঁ (পরসম্মত এসেছিলেন এবং
 সতর্কও করেছিলেন,) কিন্তু আযাবের ওয়াদা কাকিরদের প্রতি পূর্ণ হয়ে গেছে
 (এটা ওষরবাহী নয়, বরং স্বীকারোক্তি যে, সতর্ক করা সত্ত্বেও আমরা কুকর করেছি।
 ফলে আমরা কাকিরদের জন্য প্রতিশ্রুত শাস্তির সন্মুখীন হয়েছি। বাস্তবিকই আমরা
 অপরাধী। অতপর) বলা হবে, (অর্থাৎ ফেরেশতাগণ বলবে—) জাহান্নামের দরজা
 দিয়ে প্রবেশ কর এবং চিরকাল এখানে থাক। (আজাহ্ বিধানাবলীর ব্যাপারে)
 অহংকারীদের আবাসস্থল কত নিকৃষ্ট। (এরপর তাদেরকে জাহান্নামে হুকিয়ে দরজা
 বন্ধ করে দেওয়া হবে। অন্য এক আয়াতে আছে عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّوَصَّدَةٌ আর যারা
 তাদের পালনকর্তাকে ভয় করত (এর প্রথম ভয় ইমান এবং পরবর্তীতে আরও বহু

স্তর রয়েছে—) তাদেরকে (আল্লাহ্‌র সীতির স্তর অনুযায়ী) দলে দলে জামাতের দিকে (উৎসাহিত করে দ্রুত) নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা জামাতের (পূর্ব থেকে) উন্মুক্ত দরজার কাছে গিয়ে পৌঁছাবে (যাতে প্রবেশ বিলম্ব না হয়। সম্মানিত মেহমানদের জন্য পূর্ব থেকেই দরজা খোলা রাখা হয়—অন্য আয়াতে আছে—**مَقَاتِلُهُمْ آلُ بَوَّابٍ**) এবং জামাতের রক্ষী (ফেরেশতা)—রা তাদেরকে (অভ্যর্থনা জানাতে গিয়ে) বলাবে, আসসালামু আলাইকুম, তোমরা সুখে থাক। অতএব এতে (জামাতে) চিরকাল বসবাসের জন্য প্রবেশ কর। তারা (তখন প্রবেশ করবে। প্রবেশ করে) বলবে, আল্লাহ্‌র জামাতা ওকরিয়া যিনি আমাদের প্রতি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে এই ভূমির অধিবাসী করেছেন। আমরা জামাতে যথা ইচ্ছা বাস করব। (অর্থাৎ প্রত্যেকেই প্রশস্ত জায়গা পেরেছি। খুব স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করা যাবে। বসবাস তো নিজের জায়গাতেই হবে, ভ্রমণ ইত্যাদি অন্য জামাতীর জায়গাও হবে। মোটকথা,) সংকর্য পরামর্শদের পুরস্কার কতই চমৎকার! (এ বাক্য জামাতীদেরও হতে পারে, আল্লাহ্‌ তাঁ'আলারও হতে পারে।) আগনি ফেরেশতাগণকে দেখাবেন যে, (হিসাবের এজলাসে অবতরণের সময়) আল্লাহের চারপাশ ঘিরে তাঁদের পালনকর্তার পবিত্রতা ঘোষণা করছে। সমস্ত বান্দার মধ্যে ন্যায়বিচার করা হবে। (এই সুবিচারের কারণে চতুর্দিক থেকে প্রশংসাধ্বনি উদ্ভিত হবে এবং) বলা হবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য, যিনি বিশ্বজগতের পালনকর্তা। (তিনিই চমৎকার এ কর্মসাহা করেছেন। অতপর এ ধন্যবাদসূচক ধ্বনির মধ্যে দরবার সমাপ্ত হয়ে যাবে।)

আনুশঙ্গিক জাতিগত বিষয়

مَعْقُودٌ مِّنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ الْأَمِنْ شَاءَ اللَّهُ

এর শাস্তিক অর্থ বেহ'শ হওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, প্রথমে বেহ'শ হবে, স্তম্ভগর যারা হবে। যারা পূর্বেই মৃত, তাদের আত্মা বেহ'শ হয়ে যাবে।—(বরানুল কোরআন)

الْأَمِنْ شَاءَ اللَّهُ—দূরের মনসুরের রেওয়াজে অনুযায়ী এই ব্যতিক্রমের মধ্যে

চার ফেরেশতা—জিবরাঈল, মিকাইল, ইসরাফীল ও আযরাঈল এবং কৌন কৌন রেওয়াজে অনুযায়ী আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণও অন্তর্ভুক্ত। তাদের ব্যতিক্রমের অর্থ এই যে, শিংগা হু'কের প্রভাবে তাদের মৃত্যু হবে না। কিন্তু পরে তারাও যারা যাবে। আল্লাহ্‌ ব্যতীত তখন কেউ জীবিত থাকবে না। ইবনে কাসীর এ ব্যাখ্যাই অবজ্ঞান করেছেন। তিনি বলেন, তাঁদের মধ্যেও সবলেই আযরাঈলের মৃত্যু হবে।

সূরা নমাজেও এ ধরনের এক আয়াত বর্ণিত রয়েছে। সেখানে **مَعْقُودٌ**—এর পরিবর্তে **فَزِع** শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। সেখানেও এর কিছু বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে।

وَجَهَنَىٰ بِاللَّيْثِينَ وَالشَّهَدَاءِ — অর্থাৎ হাশিরের স্বরদানে হিসাব-নিকাশের

সময় সমস্ত পরগণরও উপস্থিত থাকবেন এবং অন্যান্য সাক্ষীও উপস্থিত থাকবে।

সাক্ষীদের এ ভূমিকার স্বয়ং পরগণরসমপও থাকবেন। যেমন, এক আয়াতে আছে—

وَجِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ — ফেরেশতাসমপও থাকবে। যেমন, কোরআনে আছে—

مَعَهَا سَاقِقٌ وَشَهِيدٌ — উক্ত মোহাম্মদীও থাকবে। যেমন, এক আয়াতে বলা

হয়েছে, وَكُفُّوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ — এবং স্বয়ং মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও থাকবে।

যেমন, কোরআনে বলা হয়েছে : وَكَلَّمْنَا آدَمَ إِبْرَاهِيمَ وَنُوحًا وَتَقْوَاهُ أَزْجَلَهُمْ —

تَتَّبِعُوا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَزَّاهُ — উদ্দেশ্য এই যে, জাহান্নামের নিজস্বের

জাহান্নাম ও বাগবাগিচা ভাে থাকবেই, উপরন্তু তাদেরকে অন্য জাহান্নামীদের কাছে সাক্ষী ও বেড়ানোর জন্য পক্ষন করার অনুমতিও দেওয়া হবে।—(তিবরানী) আনু-
নরীয় ও জিন্নার এক রেওয়াজেতে হযরত আরেশা (রা) বলেন : এক ব্যক্তি রসুলে
করীম (সা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে আরম্ভ করল, ইয়া রসুল্লাহ্ ! আপনার প্রতি আমার
ভালবাসা এত সুগভীর যে, বাড়িতে গেলেও আপনাকেই স্মরণ করি এবং পুনরায়
আপনার কাছে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি ধৈর্য ধরতে পারি না। কিন্তু যখন আমি
আমির মৃত্যু ও আপনার ওফাতের কথা স্মরণ করি, তখন বিষম হয়ে পড়ি। কারণ
মৃত্যুর পর আপনি তো জাহান্নামে পরগণরসমপের সাথে উচ্চাসনে আসীন থাকবেন, আর
আমি জাহান্নামে গেলেও মিন্তনস্তরেই স্থান পাব। কাজেই আমার চিন্তা এই যে, আপনাকে
কিরূপে দেখব ? রসুল্লাহ্ (সা) তার কথা শুনে কোন জবাব দিলেন না। অবশেষে
জিবরাঈল নিম্নোক্ত আয়াত নিয়ে আগমন করলেন :

وَمَنْ يَطْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ

النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَالشَّاهِدِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

এই আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, জাহান্নাম ও রসুলের আনুগত্য করতে থাকলে
মুসলমানসমপ পরগণর ও সিদ্দীক প্রমুখের সমেই থাকবে। আর আলোচ্য আয়াতের
ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, তারা উক্তস্তরে পয়নাগমনেরও অনুমতি লাভ করবে।

الْحَقُّنَا اللَّهُ بِهِمْ بِمَنْةٍ وَكَرْمَةٍ

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৩

সূরা হাশর

আয়োজনে



মাউন ফাউন্ডেশন

www.maunfoundation.org

সূরা العنكب
সূরা আনকব

মদীনান্ন অবতীর্ণ, ২৪ আয়াত, ৩ রুকু

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝
هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ
الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنْهُمْ مَانِعَتَهُمْ حصونهم مِنْ اللَّهِ
فَأَنَّهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ
يُخْرِجُونَ يُلُوتُهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ ۚ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ۝
وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
عَذَابُ النَّارِ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ
فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً
عَلَىٰ أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْرِجَ الْفَاسِقِينَ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে। তিনি পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী। (২) তিনিই কিতাবধারীদের মধ্যে যারা কাফির, তাদেরকে প্রথমবার একত্র করে তাদের বাড়ী-ঘর থেকে বহিস্কার করেছেন। তোমরা ধারণাও করতে পারনি যে, তারা বের হবে এবং তারা মনে করেছিল যে, তাদের দুর্গগুলো তাদেরকে আল্লাহর কবল থেকে রক্ষা করবে। অন্তঃপর আল্লাহর শক্তি তাদের উপর এমন দিক থেকে আসল, যার কল্পনাও তারা করেনি। আল্লাহ তাদের অন্তরে দ্বাস সঞ্চার করে দিলেন।

তারা তাদের বাড়ী-ঘরনিজেদের হাতে এবং মুসলমানদের হাতে ধ্বংস করছিল। অতএব যে চক্ষুমান ব্যক্তিগণ, তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। (৩) আর্রাহ্ যদি তাদের জন্য নির্বাসন অবধারিত না করতেন, তবে তাদেরকে দুনিয়াতে শান্তি দিতেন। আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আখাব। (৪) এটা এ কারণে যে, তারা আর্রাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। যে আর্রাহ্ র বিরুদ্ধাচরণ করে, তার জন্য উচিত যে, আর্রাহ্ কঠোর শাস্তিদাতা। (৫) তোমরা যে কিছু কিছু খজুর রুক্ষ কেটে দিয়েছ এবং কতক না কেটে ছেড়ে দিয়েছ, তা তো আর্রাহ্‌রই আদেশে এবং যাতে তিনি জবাবদেয়কে লাঞ্ছিত করেন।

যোগসূত্র ও নামে-মুহুল : পূর্ববর্তী সূরায় মুনাফিক ও ইহুদীদের বন্ধুত্বের নিশ্চয় করা হয়েছিল। এই সূরায় ইহুদীদের দুনিয়াতে নির্বাসনদণ্ড ও পরকালে জাহান্নামের শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইহুদীদের রুডান্ত এই যে, রসুলুজাহ্ (সা) মদীনায়ে আগমন করার পর ইহুদীদের সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করে। ইহুদীদের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে এক গোত্র ছিল বনু নুযায়ের। তারাও শান্তিচুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা মদীনা থেকে দু'মাইল দূরে বসবাস করত। একবার আমর ইবনে উমাইয়া স্বয়ংক্রিয় হাতে দু'টি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী এর রক্ত বিনিময় আদায় করা মুসলমান-ইহুদী সকলেরই কর্তব্য ছিল। রসুলুজাহ্ (সা) এর জন্য মুসলমানদের কাছ থেকে চাঁদা তুললেন। অতঃপর চুক্তি অনুযায়ী ইহুদীদের কাছ থেকেও রক্ত বিনিময়ের অর্থ গ্রহণ করার ইচ্ছা করলেন। সেমতে তিনি বনু নুযায়ের গোত্রের কাছে গমন করলেন। তারা দেখল যে, পয়গম্বরকে হত্যা করার এটাই প্রকৃষ্ট সুযোগ। তাই তারা রসুলুজাহ্ (সা)-কে এক জায়গায় খসিয়ে দিয়ে বলল : আগনি এখানে অপেক্ষা করুন। আমরা রক্ত বিনিময়ের অর্থ সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করছি। এরপর তারা গোপনে পরামর্শ করে স্থির করল যে, তিনি যে প্রাচীরের নীচে উপবিষ্ট আছেন, এক ব্যক্তি সেই প্রাচীরের উপরে উঠে একটি বিরাট ও ভারী পাথর তাঁর উপর ছেড়ে দেবে, যাতে তাঁর ভবলীলা সাজ হয়ে যায়। কিন্তু রাখে আর্রাহ্ মারে কে? রসুলুজাহ্ (সা) তৎক্ষণাৎ ওহীর মাধ্যমে এই চক্রান্তের বিষয় অবগত হয়ে গেলেন। তিনি সে স্থান ত্যাগ করে চলে এলেন এবং ইহুদীদেরকে বলে পাঠালেন : তোমরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে চুক্তি লংঘন করেছে। অতএব তোমাদেরকে দশ দিনের সময় দেওয়া হল। এই সময়ের মধ্যে তোমরা যেখানে ইচ্ছা চলে যাও। এই সময়ের পর কেউ এ স্থানে দৃষ্টিগোচর হলে তার গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হবে। বনু নুযায়ের মদীনা ত্যাগ করে চলে যেতে সম্মত হলে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই মুনাফিক তাদেরকে বাধা দিয়ে বলল : তোমরা এখানেই থাক। অন্যত্র যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আমার অধীনে দুই হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী আছে। তারা প্রাণ দেবে, কিন্তু তোমাদের গায়ে একটি আঁচড়ও লাগতে দেবে না। রূহল মা'আনীতে আছে এ ব্যাপারে ওদিয়া ইবনে মালিক, মুসাররিদ এবং রায়স ও আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই-এর সাথে শরীক ছিল। বনু নুযায়ের তাদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে রসুলুজাহ্ (সা)-কে সদর্পে বলে পাঠাল : আমরা কোথাও যাব না। আপনি যা করতে পারেন, করেন। অতঃপর রসুলুজাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরামকে সাথে নিয়ে বনু নুযায়ের গোত্রকে আক্রমণ করলেন। বনু নুযায়ের দুর্গের ফটক বন্ধ করে বসে

রইল এবং মুনাফিকরাও আত্মগোপন করল। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে চতুর্দিক থেকে অবরোধ করলেন এবং তাদের খজুর বৃক্ষে আশ্রয় ধরিয়ে দিলেন এবং কিছু কর্তন করিয়ে দিলেন। অবশেষে নিরুপায় হয়ে তারা নির্বাসনদণ্ড মেনে নিল। রসূলুল্লাহ্ (সা) এই অবস্থায়ও তাদের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন করে আদেশ দিলেন, আসবাবপত্র যে পরিমাণ সঙ্গে নিয়ে যেতে পার, নিয়ে যাও। তবে কোন অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে নিতে পারবে না। এগুলো বাজেয়াপ্ত করা হবে। সেমতে বনু নুযায়েরের কিছু লোক সিরিয়ায় এবং কিছু লোক খায়বারে চলে গেল। সংসারের প্রতি অসমর্থরণ মোহের কারণে তারা গৃহের কড়ি কাঠ, তক্তা ও কপাট পর্যন্ত উপড়িয়ে নিয়ে গেল। ওহদ যুদ্ধের পর চতুর্থ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। এরপর হযরত উমর (রা) তাঁর খিলাফতকালে তাদেরকে পুনরায় অন্যান্য ইহুদীর সাথে খায়বার থেকে সিরিয়ায় নির্বাসিত করেন। এই নির্বাসনদ্বয়ই ‘প্রথম সমাবেশ ও দ্বিতীয় সমাবেশ’ নামে অভিহিত।—(যাদুল মা‘আদ)

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে। তিনি পরাক্রমশালী, মহাজানী। (তাঁর মহত্ব, শক্তি-সামর্থ্য ও প্রভাব এক প্রভাব এই যে, তিনিই কাকির কিতাবধারীদেরকে অর্থাৎ বনু নুযায়েরকে) তাদের বসতবাড়ী থেকে প্রথমবার একত্র করে বহিষ্কার করেছেন। [যুহরী বলেন : তারা প্রথমবার এই বিপদে পতিত হয়েছিল, যা ছিল তাদের দুর্ভিক্ষের কলশ্রুতি। এতে পুনরায় তাদের এই বিপদে পতিত হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণীর দিকে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত আছে। সেমতে হযরত উমর (রা) তাঁর খিলাফতকালে পুনরায় তাদেরকে আরবভূমি থেকে বহিষ্কার করেন। তাদের বাসভিটা থেকে বহিষ্কার করা মুসলমানদের শক্তি ও প্রাধান্যের বহিঃপ্রকাশ ছিল। মুসলমানগণ, তাদের সাজসরঞ্জাম ও জাঁকজমক দেখে] ভোমরা ধারণা করতে পারনি যে, তারা (কখনও তাদের বাসভিটা থেকে) বের হবে এবং (খোদ) তারা মনে করেছিল যে, তাদের দুর্গগুলো তাদেরকে আল্লাহর প্রতিশোধ থেকে রক্ষা করবে। অর্থাৎ তারা তাদের দুর্ভেদ্য দুর্গের কারণে নিশ্চিত ছিল। তাদের মনে কোন সময় অদৃশ্য প্রতিশোধের আশংকাও জাগত না। অতঃপর আল্লাহর শক্তি তাদের উপর এমন জারগা থেকে আসল, যার কল্পনাও তারা করেনি। (অর্থাৎ তারা মুসলমানদের হাতে বহিষ্কৃত হল, যাদের নিরস্ত্রতার প্রতি লক্ষ্য করলে এরূপ সম্ভাবনাই ছিল না, এই নিরস্ত্র লোকেরা সশস্ত্রদের বিপক্ষে বিজয়ী হবে।) তাদের অন্তরে (আল্লাহ তা‘আলা মুসলমানদের) ভ্রাস সৃষ্টি করেছিলেন। (এই ভ্রাসের কারণে তারা বের হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করল। তখন তাদের অবস্থা ছিল এই যে,) তারা তাদের বাড়ীঘর নিজেরদের হাতে এবং মুসলমানদের হাতে ধ্বংস করছিল। (অর্থাৎ কড়িকাঠ, তক্তা ইত্যাদি নিয়ে যাওয়ার জন্য নিজেরাও গৃহ ধ্বংস করছিল এবং মুসলমানরাও তাদের অন্তর ব্যথিত করার জন্য ঘরবাড়ী বিধ্বস্ত করছিল।) অতএব হে চক্ষুমান ব্যক্তিগণ, (এ অবস্থা দেখে) শিক্ষা গ্রহণ কর। (আল্লাহ্ ও রসূলের বিরুদ্ধাচরণের পরিণতি মাঝে মাঝে দুনিয়াতেও শোচনীয় হয়ে থাকে)। আল্লাহ্ যদি তাদের ভাগ্যে নির্বাসন অবধারিত না করতেন তবে তাদেরকে দুনিয়াতেই (হত্যার) শাস্তি দিতেন (যেহেতন তাদের পরে বনী কোরায়যার

কেন্দ্রে তাই হয়েছে। দুনিয়াতে যদিও তারা শান্তির কবল থেকে বেঁচে গেছে, কিন্তু) পরকালে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব। এ কারণে যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তার জন্যা উচিত যে, আল্লাহ্ কর্তার শাস্তিদাতা (তাদের এই বিরুদ্ধাচরণ দ্বিবিধ প্রকারে হয়েছে। এক, চুক্তি ভঙ্গ করা, যে কারণে নির্বাসনদণ্ড হয়েছে এবং দুই, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করা। এটা পরকালীন আযাবের কারণ। ইহদীরা বলেছিল : হুক্ম কর্তন করা ও হুক্মে অগ্নি সংযোগ করা অসমর্থের শাসিল। অনর্থ নিন্দনীয়। এ ছাড়া কিছুসংখ্যক মুসলমান মনে করেছিল যে, এসব হুক্ম ভবিষ্যতে মুসলমানদেরই হলে যাবে। কাজেই এগুলো কর্তন না করাই উত্তম। সেমতে তারা কর্তন করেনি। আবার কেউ কেউ ইহদীদের অন্তর ব্যথিত করার উদ্দেশ্যে কর্তন করেছে। অতঃপর এসব বিষয়ের জওয়াব দেওয়া হচ্ছে। জওয়াবের সাথে উভয় কাজকে সঠিক বলা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে : তোমরা যে কতক খর্জুর হুক্ম কেটে দিয়েছ (এমনিভাবে যে কিছু পুড়িয়ে দিয়েছে) এবং কতক না কেটে কাণ্ডের উপর দাঁড়ানো ছেড়ে দিয়েছ, তা তো (অর্থাৎ উভয় কাজই) আল্লাহর আদেশ (-ও সন্তুষ্টি) অনুযায়ীই, তাতে তিনি কাফিরদেরকে লাক্ষিত করেন। (অর্থাৎ উভয় কাজের মধ্যে উপযোগিতা আছে। ছেড়ে দেওয়ার মধ্যেও মুসলমানদের এক সাফল্য এবং কাফিরদেরকে বিক্লুখ করার ফায়দা আছে। কারণ, এগুলো মুসলমানরা ভোগ করবে। পক্ষান্তরে কর্তন করা ও পুড়িয়ে দেওয়ার মধ্যে মুসলমানদের অপর সাফল্য অর্থাৎ তাদের প্রাধান্য প্রকাশ পাওয়া এবং কাফিরদেরকে বিক্লুখ করার ফায়দা আছে। অতএব উভয় কাজ প্রজাতিভিত্তিক হওয়ার কারণে এগুলোতে কোন দোষ নেই।

আনুমানিক ভাটব্য বিষয়

সূরা হাশরের বৈশিষ্ট্য ও বন্ নুযায়ের গোত্রের ইতিহাস : সমগ্র সূরা হাশর ইহদী বন্ নুযায়ের গোত্র সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।—(ইবনে ইসহাক) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এই সূরার নামই সূরা বন্ নুযায়ের বলতেন।—(ইবনে কাসীর) বন্ নুযায়ের হযরত হারুন (আ)—এর সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে একটি ইহদী গোত্র। তাদের পিতৃপুরুষগণ তওরাতের পণ্ডিত ছিলেন। তওরাতে খাতামুল আখিয়া মুহাম্মদ (সা)—এর সংবাদ, হলিয়া ও আলামত বর্ণিত আছে এবং তাঁর মদীনায় হিজরতের কথাও উল্লিখিত আছে। এই পরিবার শেষ নবী (সা)—র সাহচর্যে থাকার আশায় সিরিয়া থেকে মদীনায় স্থানান্তরিত হয়েছিল। তাদের বর্তমান লোকদের মধ্যেও কিছুসংখ্যক তওরাতের পণ্ডিত ছিল এবং রসুলুল্লাহ (সা)—র মদীনায় আগমনের পর তাঁকে আলামত দেখে চিনেও নিয়েছিল যে, ইনিই শেষ নবী (সা)। কিন্তু তাদের ধারণা ছিল যে, শেষ নবী হযরত হারুন (আ)—এর বংশধরদের মধ্যে তাদের পরিবার থেকে আবির্ভূত হবেন। তা না হয়ে শেষ নবী প্রেরিত হয়েছেন বনী ইসরাইলের পরিবারে বনী ইসরাইলের বংশে। এই প্রতিহিংসা তাদেরকে বিশ্বাস স্থাপনে বাধা দিল। এতদসত্ত্বেও তাদের অধিকাংশ লোক মনে মনে জানত এবং চিনত যে, ইনিই শেষ নবী। বদর যুদ্ধে মুসলমানদের বিশ্ময়কর বিজয় এবং মুরিকদের শোচনীয় পরাজয় দেখে তাদের বিশ্বাস আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। এর স্বীকারোক্তি তাদের মুখে শোনাও গিয়েছিল,

কিন্তু এই বাহ্যিক জয়-পরাজয়কে সত্য ও বিশ্বাস চেনার মাপকাঠি করাটাই ছিল অসার ও দুর্বল ভিত্তি। ফলে ওহদ যুদ্ধের প্রথমদিকে যখন মুসলমানদের বিপর্য্য দেখা মিলে এবং কিছু সাহাবী শহীদ হলেন, তখন তাদের বিশ্বাস টকটকান্বয় হতে গেল। এরপরই তারা মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব শুরু করে দিল।

এর আগে ঘটনা এই হয়েছিল যে, রসুলুল্লাহ (সা) মদীনা পৌঁছে রাজনৈতিক দূর-দর্শিতার কারণে সর্বপ্রথম মদীনায় ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী ইহুদী গোত্র-সমূহের সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, ইহুদীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে না এবং কোন আক্রমণকারীকে সাহায্য করবে না। তারা আক্রান্ত হলে মুসলমানগণ তাদেরকে সাহায্য করবে। শান্তি চুক্তিতে আরও অনেক ধারা ছিল। ‘সীরত ইবনে হিশামে’ এর বিস্তারিত বর্ণনা আছে। এমনভাবে বনু নুযায়েরসহ ইহুদীদের সকল গোত্র এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। মদীনা থেকে দুই মাইল দূরে বনু নুযায়েরের বসতি, দুর্ভেদ্য দুর্গ এবং বাগবাগিচা ছিল।

ওহদ যুদ্ধ পর্ব্বত তাদেরকে বাহ্যত এই শান্তিচুক্তির অনুসারী দেখা যায়। কিন্তু ওহদ যুদ্ধের পর তারা বিশ্বাসঘাতকতা ও গোপন দুরভিসন্ধি শুরু করে দেয়। এই বিশ্বাস-ঘাতকতার সূচনা এভাবে হয় যে, বনু নুযায়েরের অনেক সর্দার কা’ব ইবনে আশরাফ ওহদ যুদ্ধের পর আরও চল্লিশজন ইহুদীকে সাথে নিয়ে মক্কা পৌঁছে এবং ওহদ যুদ্ধ ক্ষেত্রত কোরাযশী কাকিরদের সাথে সাক্ষাৎ করে। দীর্ঘ আলোচনার পর রসুলুল্লাহ (সা) ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার চুক্তি উভয় পক্ষের মধ্যে চূড়ান্ত হয়। চুক্তিটি পাকাপোক্ত করার উদ্দেশ্যে কা’ব ইবনে আশরাফ চল্লিশজন ইহুদীসহ এবং প্রতিপক্ষের আবু সুফিয়ান চল্লিশজন কোরাযশী নেতাসহ কা’বা গৃহে প্রবেশ করে এবং বাস্তুল্লাহর গিলাফ স্পর্শ করে পারস্পরিক সহযোগিতা ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অঙ্গীকার করে।

চুক্তি সম্পাদনের পর কা’ব ইবনে আশরাফ মদীনায় ফিরে এলে জিবরাঈল (জা) রসুলুল্লাহ (সা)-কে আদ্যোপাধ্যত ঘটনা এবং চুক্তির বিবরণ বলে দেন। অতঃপর রসুলুল্লাহ (সা) কা’ব ইবনে আশরাফকে হত্যার আদেশ জারি করেন এবং সাহাবী মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা) তাকে হত্যা করেন।

এরপর বনু নুযায়েরের আরও অনেক চক্রান্ত সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (সা) অবহিত হতে থাকেন। তন্মধ্যে একটি উপরে শানে-নুযুলে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা স্বয়ং রসুলুল্লাহ (সা)-কে হত্যার চক্রান্ত করে। যদি ওহীর মাধ্যমে রসুলুল্লাহ (সা) তাৎক্ষণিকভাবে এই চক্রান্ত সম্পর্কে অবহিত না হতেন, তবে তারা হত্যার এই ষড়যন্ত্রে সফলকাম হয়ে যেত। কেননা, যে গৃহের নীচে তারা রসুলুল্লাহ (সা)-কে বসিয়েছিল তার ছাদে চড়ে একটি প্রকাণ্ড ভারী পাথর তাঁর মাথায় ছেড়ে দেওয়ার পরিকল্পনা প্রায় সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। যে ব্যক্তি এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিয়োজিত হয়েছিল, তার নাম ওয়র ইবনে জাহ্‌হাশ। ‘আল্লাহ তা’আলার হিকমতের কারণে এই পরিকল্পনা ব্যর্থতার পর্য্যবসিত হয়।

একটি শিক্ষা : আশ্চর্যের বিষয়, পরবর্তী পর্যায়ে বনু নুযায়েরের সবাই নির্বাসিত হয়ে মদীনা ছেড়ে চলে গেল। কিন্তু তাদের মধ্যে যাত্রা দুই ব্যক্তি মুসলমান হয়ে মদীনাতোঁ

নিরাপদ জীবন যাপন করতে থাকে। তাদের একজন ছিল এই ওমর ইবনে আব্বাস, দ্বিতীয় জন তার পিতৃব্য ইয়ামীন ইবনে আমর ইবনে কা'ব।—(ইবনে কা'সীর)

আমর ইবনে উমাইয়া যমরীর ঘটনা : শানে-নুযলের ঘটনায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, আমর ইবনে উমাইয়া যমরীর হাতে দু'টি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা) এই হত্যাকাণ্ডের রক্ত বিনিময় সংগ্রহের চেষ্টা করছিলেন। এ ব্যাপারেই বন্ নুযায়েরের চাঁদা আদায়ের জন্য তিনি তাদের জনপদে গমন করেছিলেন। এর পটভূমি বর্ণনা প্রসঙ্গে ইবনে কা'সীর লিখেন : মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফিরদের যত্নময় ও উৎপীড়নের কাহিনী নাতিদীর্ঘ। তন্মধ্যে বীরে-মাউনার ঘটনাটি ইসলামের ইতিহাসে সুবিদিত। একবার কিছুসংখ্যক মুনাফিক ও কাফির তাদের জনপদে ইসলাম প্রচারের জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে একদল সাহাবী প্রেরণ করার আবেদন করে। তিনি সত্তরজন সাহাবীর একটি দল তাদের সাথে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু পরে জানা যায় যে, এটা নিছক একটি চক্রান্ত ছিল। কাফিররা মুসলমানগণকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে এবং এতে তারা সফলও হয়ে যায়। সাহাবীগণের মধ্যে একমাত্র আমর ইবনে যমরী (রা) কোনরূপে পলায়ন করতে সক্ষম হন। যিনি এই মাত্র কাফিরদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং তাঁর উনসত্তর জন সঙ্গীর নৃশংস হত্যাকাণ্ড স্বচক্ষে দেখে এসেছিলেন, কাফিরদের মুকাবিলায় তাঁর মনোবৃত্তি কি হবে, তা অনুমান করা কারও পক্ষে কঠিন হওয়ার কথা নয়। ঘটনাক্রমে যদীনায় ফিরে আসার সময় পথিমধ্যে তিনি দুইজন কাফিরের মুখোমুখি হন। তিনি কালবিলম্ব না করে উভয়কে হত্যা করে দেন। পরে জানা যায় যে, তারা ছিল বনী আমের গোত্রের লোক, যাদের সাথে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র শান্তি চুক্তি ছিল।

আজকালকার রাজনৈতিক চুক্তিসমূহে প্রথমেই চুক্তিভঙ্গের পথ খুঁজে নেওয়া হয়। কিন্তু রসূলে করীম (সা)-এর চুক্তি এরূপ ছিল না। এখানে থাকিছু মুখ অথবা কলম দিয়ে বের হয়ে যেত, তা ধর্মীয় ও আল্লাহর নির্দেশের মর্যাদা রাখত এবং তা যথাযথ পালন করা অপরিহার্য হয়ে যেত। আমরের এই ব্রাভি সম্পর্কে অবগত হয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা) শরীয়তের আইনানুযায়ী নিহত ব্যক্তিদের রক্ত বিনিময় দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এজন্য তিনি মুসলমানদের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করেন এবং চাঁদার ব্যাপারে তাঁকে বন্ নুযায়ের গোত্রও গমন করতে হয়।

ইসলাম ও মুসলমানদের উদারতা বর্তমান রাজনীতিকদের জন্য একটি শিক্ষাগ্রস্ত ব্যাপার : আজকালকার বড় বড় রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার মানবাধিকার সংরক্ষণকাজে সার-গর্ভ বক্তৃতা দেন, এর জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন এবং বিশেষ মানবাধিকারের হর্তাকর্তা কথিত হন। কিন্তু পাঠক, উপরোক্ত ঘটনার প্রতি একবার লক্ষ্য করুন। বন্ নুযায়েরের উপযুক্ত পরিচক্রান্ত, বিশ্বাসঘাতকতা, রসূল হত্যার পরিকল্পনা ইত্যাদি ঘটনা একের পর এক রসূলে করীম (সা)-এর পোচের আসতে থাকে। যদি এসব ঘটনা আজকালকার কোন যন্ত্রী ও রাষ্ট্রপ্রধানের গোচরীকৃত হত তবে ইনসাফের সাথে বলুন তারা এহেন লোকদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করতেন? আজকাল তো জীবিত লোকদের উপর পেট্রোল চেলে মরদান পরিকার করে দেওয়া কোন রাষ্ট্রীয় শক্তিরও মুখাপেক্ষী নয়। কিছু ওণা, দুজতকারী

সংঘবদ্ধ হয়ে অনার্সাসে এ কাজ সমাধা করে ফেলে। রাজকীয় রাগ ও গোসার লীলাখেলা এর চাইতে বেশীই হয়ে থাকে।

কিন্তু এই রাষ্ট্র আক্রমণ ও তাঁর রসূল (সা)-এর বনু নুযায়েরের বিশ্বাসঘাতকতা যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তখনও তিনি তাদের গণহত্যার সংকল্প করেন নি। তাদের মাল ও আসবাবপত্র হিন্দির নেওয়ার কোন পরিকল্পনা করা হয়নি; বরং তিনি—(১) সব আস-বাবপত্র নিয়ে কেবল শহর খালি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, (২) এর জন্যও তাদেরকে দশ দিনের সময় দেন, যাতে অনার্সাসে সব আসবাবপত্র সাথে নিয়ে অন্যত্র স্থানান্তরিত হতে পারে। বনু নুযায়ের এরপরেও যখন ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করল, তখন জাতীয় পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়, তাই (৩) কিছু খজুর বুদ্ধ কাটা হয় এবং কিছু বুদ্ধ অগ্নি সংযোগ করা হয়, যাতে তারা প্রভাবান্বিত হয়। কিন্তু দুর্গে অগ্নি সংযোগ অথবা গণহত্যার নির্দেশ তখনও জারি করা হয়নি; (৪) অতঃপর তারা যখন বেগতিক হয়ে শহর ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল, তখন সামরিক অভিযান সত্ত্বেও এক ব্যক্তি এক উটের পিঠে যে পরিমাণ আসবাবপত্র নিয়ে যেতে পারে সে পরিমাণ আসবাবপত্র নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা তাদেরকে দেওয়া হল। ফলে তারা গৃহের কড়িকঠ, তক্তা এবং দরজার কপাট পর্যন্ত উটের পিঠে তুলে নিল; (৫) তারা সব আসবাবপত্র সাথে নিয়ে যাকিল, কিন্তু কোন মুসলমান তাদের প্রতি বক্র দৃষ্টিতে তাকান নি। শান্ত ও মুক্ত পরিবেশে সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ অবস্থায় তারা আসবাবপত্র নিয়ে বিদায় হয়।

রসূলুল্লাহ (সা) যে সময় শত্রুর কাছ থেকে মোল আনা প্রতিশোধ গ্রহণ করার মত শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, সেই সময় বনু নুযায়েরের প্রতি তিনি এহেন উদারতা প্রদর্শন করেন। এই বিশ্বাসঘাতক, কুচক্রী শত্রুদের সাথে তাঁর এহেন উদার ব্যবহার, সেই ব্যবহারের নবী, যা তিনি মক্কা বিজয়ের পর তাঁর পুরাতন শত্রুদের সাথে করেছিলেন।

لَا وَلَ الْكَشِر — বনু নুযায়েরের এই নির্বাসনকে কোরআন পাক ‘আউয়ালে হাশর’

তথা প্রথম সমাবেশ আখ্যা দিয়েছে। এর এক কারণ তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রাচীনকাল থেকে তারা এক জায়গায় বসবাস করত। স্থানান্তর ও নির্বাসনের ঘটনা তাদের জীবনে এই প্রথমবার সংঘটিত হয়েছিল।* এর আরও একটি কারণ এই যে, ইসলামের ভবিষ্যৎ প্রকৃত নির্দেশ ছিল আরব উপদ্বীপকে অমুসলিমদের থেকে মুক্ত করতে হবে, যাতে এটা ইসলামের এক দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত হয়। এর ফলে নির্বাসনের আকারে দ্বিতীয় সমাবেশ হওয়া অবশ্যাব্যী ছিল। এটা হযরত ফারুককে আযম (রা)-এর খিলাফতকালে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে এবং নির্বাসিত হয়ে যারা খায়বরে বসতি স্থাপন করেছিল তাদেরকে আরব উপদ্বীপ ছেড়ে বাইরে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। এদিক দিয়ে বনু নুযায়েরের এই নির্বাসন প্রথম সমাবেশ এবং হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকালে সংঘটিত নির্বাসন দ্বিতীয় সমাবেশ নামে অভিহিত হয়।

فَاتَا هُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا—এর শাব্দিক অর্থ এই যে, আল্লাহ

তা'আলা তাদের কাছে এমনভাবে আগমন করলেন, যা তারা কল্পনাও করেনি। বলা বাহুল্য, আল্লাহর আগমন করার অর্থ তাঁর নির্দেশ ও নির্দেশবাহক ফেরেশতা আগমন করা।

يُخْرِجُوْنَ بَنُوْهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِى الْمُؤْمِنِيْنَ—গৃহের দরজা, কপাট

ইত্যাদি নিয়ে যাওয়ার জন্য তারা নিজেদের হাতে নিজেদের গৃহ ধ্বংস করছিল। পক্ষান্তরে তারা যখন দুর্গের অভ্যন্তরে ছিল, তখন তাদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করার জন্য মুসলমানগণ তাদের গৃহ ও গাছপালা ধ্বংস করছিল।

مَا تَقْعُطُمْ مِّنْ لِّهْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلٰى اَمْوَالِهَا فَبِاٰذِنِ اللّٰهِ

لِهْنَةٍ—শব্দের অর্থ খজুর বৃক্ষ। বনু নুযায়েরের খজুর

বাগান ছিল। তারা যখন দুর্গের ভেতরে অবস্থান গ্রহণ করল, তখন কিছু কিছু মুসলমান তাদেরকে উত্তেজিত ও ভীত করার জন্য তাদের কিছু খজুর বৃক্ষ কর্তন করে অথবা অগ্নি সংযোগ করে খতম করে দিল। অপর কিছুসংখ্যক সাহাবী মনে করলেন, ইনশাআল্লাহ বিজয় তাদের হবে এবং পরিণামে এসব বাগবাগিচা মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হবে। এই মনে করে তাঁরা বৃক্ষ কর্তনে বিরত রইলেন। এটা ছিল মতের পরমিল। পরে যখন তাঁদের মধ্যে কথাবার্তা হল, তখন বৃক্ষ কর্তনকারীরা এই মনে করে চিড়িত হলেন যে, যে বৃক্ষ পরিণামে মুসলমানদের হবে, তা কর্তন করে তারা অন্যায় করেছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হল। এতে উভয় দলের কার্যক্রমকে আল্লাহর ইচ্ছার অনুকূলে প্রকাশ করা হয়েছে।

রসূলের নির্দেশ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই নির্দেশ : হাদীস অস্বীকারকারীদের প্রতি হ'নি-রারি : এই আয়াতে বৃক্ষ কর্তন, গোড়ান ও অঙ্কত ছেড়ে দেওয়ার উভয় প্রকার কার্যক্রমকে আল্লাহর ইচ্ছার অনুকূলে প্রকাশ করা হয়েছে। অথচ কোরআনের কোন আয়াতে এতদু-ভয়ের মধ্য থেকে কোন কর্মের আদেশ উল্লেখ করা হয়নি। অতএব বাহ্যত বোঝা যায় যে, উভয় দল নিজ নিজ ইজতিহাদের মাধ্যমে এ কাজ করেছে। বেশীর বেশী তারা হয় তো রসূলুল্লাহ (সা)-র কাছ থেকে এর অনুমতি নিয়ে থাকবে, কিন্তু কোরআন এই অনুমতি তথা হাদীসকে আল্লাহর ইচ্ছা প্রতিপন্ন করে ব্যক্ত করেছে যে, রসূলুল্লাহ (সা)-কে আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশ জারি করার ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে এবং তিনি যে আদেশ জারি করবেন, তা আল্লাহরই আদেশ বলে গণ্য হবে। এই আদেশ পালন করা কোরআনের আয়াত পালন করার মত করণীয়।

ইজতিহাদী মতভেদে কোন পক্ষকে সেনাহু বলা হবে না : এই আয়াত থেকে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিধান এই জানা গেল যে, যারা ইজতিহাদ করার যোগ্যতা রাখেন, কোন ব্যাপারে

তাদের ইজতিহাদ ভিন্নমুখী হলে অর্থাৎ একদলে জায়েয ও অন্যদলে নাজায়েয বললে আল্লাহর কাছে উভয়টিই শুদ্ধ হবে। উভয় ইজতিহাদের মধ্যে কোনটিকে গোনাহ্ বলা যাবে না। এ কারণে তাদের উপর দৃষ্টের দমন আইন প্রযোজ্য হবে না। কেননা, তাদের মধ্যে কোন এক পক্ষও শরীয়তানুযায়ী অশিল্ট নয়। وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ বাক্যে বৃদ্ধ কর্তন ও অগ্নি সংযোগের কারণে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এটা অনর্থ সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং কাফিরদেরকে লাঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে এটা সওয়াবের কাজ।

মাস'আলা : মুছাবহায় কাফিরদের গৃহ বিধ্বস্ত করা, অগ্নি সংযোগ করা এবং বৃদ্ধ ও শস্যক্ষেত্র ধ্বংস করা জায়েয কি না, এ সম্পর্কে ফিকহবিদগণের উক্তি বিভিন্ন রূপ। ইমাম আযিম আবু হানীফা (র) বলেন : মুছাবহায় এসব কাজ জায়েয। কিন্তু শায়খ ইবনে হমায় (র) বলেন : এটা তখন জায়েয, যখন এই পদ্ধতি অবলম্বন করা ব্যতীত কাফিরদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করা সুদূর পরাহত হয় অথবা যখন মুসলমানদের বিজয় অনিশ্চিত হয়। কাফিরদের শক্তি চূর্ণ করার উদ্দেশ্যে অথবা বিজয় অর্জিত না হলে তাদের ধনসম্পদ বিনষ্ট করে তাদেরকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে তখন এসব কাজ জায়েয হবে।—(মাসহারা)

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلْيَنكِحُوا لِنِسَائِهِم مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَأَتُوا صُدُورَهُمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ

خَصَاصَةً وَمَنْ يُوَقِّ شَرَّ نَفْسِهِ فَلَوْلَيْكَ هُمْ الْمَفْلُحُونَ ۝ وَالَّذِينَ
جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ
سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا
إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ۝

(৬) আল্লাহ্ বনু নুযায়েরের কাছ থেকে তাঁর রসুলকে যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন, তজ্জন্য তোমরা ঘোড়ার কিংবা উটে চড়ে যুদ্ধ করনি, কিন্তু আল্লাহ্ যার উপর ইচ্ছা, তাঁর রসুলগণকে প্রাধান্য দান করেন। আল্লাহ্ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। (৭) আল্লাহ্ জনগদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রসুলকে যা দিয়েছেন, তা আল্লাহ্, রসুলের, তাঁর আত্মীয়-স্বজনের, ইয়াতীমদের, অতাবপ্রস্তুদের এবং মুসাফিরদের জন্য, যাতে ধনৈশ্বর্য কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়। রসুল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহ্কে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ কঠোর শাস্তিদাতা। (৮) এই ধনসম্পদ দেশত্যাগী নিঃস্বদের জন্য, যারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি লাভের অন্বেষণে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের সাহায্যার্থে নিজদের বাণুভিটা ও ধনসম্পদ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। তারা ই সত্যবাদী। (৯) যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে মদীনায় বসবাস করেছিল এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তারা মুহাজিরদেরকে ভালবাসে, মুহাজিরদেরকে যা দেওয়া হয়েছে, তজ্জন্য তারা অন্তরে ইর্ষা গোষণ করে না এবং নিজেরা অতাবপ্রস্তু হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার দান করে। যারা যনের কার্ণগ্য থেকে মুক্ত, তারা ই সফলকাম। (১০) আর এই সম্পদ তাদের জন্য, যারা তাদের পরে আগমন করেছে। তারা বলে : হে আমাদের পালনকর্তা ! আমাদেরকে এবং ইমানে অগ্রণী আমাদের স্নাতাপগকে ক্ষমা কর এবং ইমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের পালনকর্তা ! নিশ্চয় আপনি দয়ালু, পরম করুণাময়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(উপরে বনু নুযায়েরের জীবন সম্পর্কিত ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। এখন তাদের মাল সম্পর্কিত ব্যাপারে আলোচনা করা হচ্ছে :) আল্লাহ্ বনু নুযায়েরের কাছ থেকে তাঁর রসুলকে যা কিছু দিয়েছেন, (তাতে তোমাদের কোনরূপ কণ্ঠ স্বীকার করতে হয়নি) তোমরা তজ্জন্য (অর্থাৎ তা হাসিল করার জন্য) ঘোড়া ও উটে চড়ে যুদ্ধ করনি। [উদ্দেশ্য এই যে, মদীনা থেকে দুই মাইল দূরে অবস্থিত হওয়ার কারণে সফরও করতে হয়নি এবং যুদ্ধ করারও প্রয়োজন দেখা দেয়নি। মুকাবিলা যা হয়েছে, তা নেহায়েত অনুল্লেখযোগ্য।— (রাহল-মা'আনী) তাই এই মালে তোমাদের বন্টন ও মালিকানার অধিকার নেই—

গনীমতের মাল্যে যেরূপ হয়ে থাকে]। কিন্তু (আল্লাহর রীতি এই যে) তিনি তাঁর রসূলগণকে (শত্রুদের মধ্য থেকে) যার উপর ইচ্ছা, কর্তৃত্ব দান করেন (অর্থাৎ শত্রুকে হ্রাসের মাধ্যমে পরাস্ত করে দেন, যাতে কোন রকম কষ্ট স্বীকার করতে না হয়। সেমতে রসূলগণের মধ্য থেকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রসূল মুহাম্মদ (সা)-কে বনু নুযায়েরের ধনসম্পদের উপর এমনিভাবে কর্তৃত্ব দান করেছেন। কাজেই এতে তোমাদের কোন অধিকার নেই; বরং একে মালিকসুলভ ব্যবহার করার পূর্ণ ক্ষমতা রসূলেরই আছে)। আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। (সুতরাং তিনি যেভাবে ইচ্ছা, শত্রুদেরকে পরাস্ত করবেন এবং যেভাবে ইচ্ছা, তাঁর রসূলকে ক্ষমতা দেবেন। বনু নুযায়েরের ধনসম্পদের ক্ষেত্রে যেমন এই বিধান, তেমনিভাবে) আল্লাহ্ তা'আলা (এই পন্থায়) অন্যান্য জনপদের (কাফির) অধিবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রসূলকে যা দিয়েছেন, (যেমন ফদকের বাগান এবং খায়বরের অংশ বিশেষ এই পন্থায়ই করতলগত হয়েছিল, তাতেও তোমাদের কোন মালিকানার অধিকার নেই; বরং) তা আল্লাহর হুক, (তিনি যেভাবে ইচ্ছা, তা ব্যয় করার আদেশ দেবেন) রসূলের (হুক; আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে নিজ বিবেচনা অনুযায়ী এই মাল ব্যয় করার ক্ষমতা দিয়েছেন) এবং (তাঁর) আশ্বীয়-স্বজনের (হুক) এবং ইয়াতীমদের (হুক) এবং নিঃস্বদের (হুক) এবং মুনাফিকদের [হুক অর্থাৎ তারা সবাই রসূলের বিবেচনা অনুসারে এই মাল ব্যয় করার পার। শুধু তারাই নয় রসূলুল্লাহ্ (সা) নিজের মতে যাকেই দিতে চান, সে-ও তাদের অন্তর্ভুক্ত। জিহাদে অংশগ্রহণকারীদের যখন এই মাল কোন অধিকার নেই, তখন উপরোক্ত প্রকার লোকগণ, যারা জিহাদে অংশগ্রহণ করেনি তাদেরও এই মাল কোন অধিকার থাকবে না—এই সম্পদ নিরসনের জন্য সম্ভবত উপরোক্ত প্রকার লোকদের বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আল্লাতে ইয়াতীম, নিঃস্ব, মুসাফির ইত্যাদি বিশেষ গুণসহ তাদের উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তারা এসব গুণের কারণে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ইচ্ছাক্রমে এই মাল পেতে পারে। জিহাদে যোগদান করার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আশ্বীয়-স্বজন হওয়াও উপরোক্ত গুণসমূহের অন্যতম। তাঁদেরকে এই মাল দেওয়ার কারণ এই যে, তাঁরা সবাই রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাহায্যকারী ছিলেন এবং বিপদ মুহূর্তে কাজে লাগতেন। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ওফাতের সাথে সাথে তাঁদের এই অংশ রহিত হয়ে যায়। সূরা আনকালের আয়াতে তা বর্ণিত হয়েছে। এই বিধান এ জন্য] যাতে তা (অর্থাৎ এই ধনসম্পদ) কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়ে যায়; (যেমন স্বর্খতা মুগে গনীমতের মাল ও মুজলশ্ব সম্পদ সব বিত্তবানরা হজম করে ফেলত এবং অভাবগ্রস্তরা বঞ্চিত থাকত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বিষয়টি রসূলের মতামতের উপর ন্যস্ত করেছেন এবং ব্যয় করার খাতও বলে দিয়েছেন। যাতে মালিক হওয়া সত্ত্বেও তিনি অভাবগ্রস্তদের মধ্যে এবং উপযোগিতার মূল ব্যয় করবেন। যখন জানা গেল যে, রসূলের ইচ্ছাতির্যারে থাকাই মজলজনক, তখন) রসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর এবং যা (নিতে) নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক (অন্যান্য) যাবতীয় ক্রিয়াকর্মও তাই বিধান এবং আল্লাহ্কে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ (বিরুদ্ধাচরণের কারণে) কঠোর শাস্তিদাতা। (উপরোক্ত ধনসম্পদে এখনিতে সব অভাবগ্রস্তরই হুক আছে, কিন্তু) মুহাজির অভাবগ্রস্তদের (বিশেষভাবে) এতে হুক আছে; যাদেরকে তাদের বান্ধুগণ ও

ধনসম্পদ থেকে (জোরজবরে অন্যায়ভাবে) বহিষ্কার করা হয়েছে, (অর্থাৎ কাফিরদের নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে তারা বাস্তবিকভাবে ছেড়ে হিজরত করতে বাধ্য হয়েছে। এই হিজরত দ্বারা) তারা আল্লাহর অনুগ্রহ (অর্থাৎ জামাত) ও সমুষ্টি অন্বেষণ করে, (কোন পাখিব স্বার্থ হাসিলের জন্য হিজরত করেনি) এবং তারা আল্লাহ ও রসুলের (ধর্মের) সাহায্য করে। তা'রাই (ইমানে) সত্যবাদী (এই সম্পদ তাদের জন্যও) যারা দারুল-ইসলামে (অর্থাৎ মদীনায়) ও ইমানে মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে স্থিতিশীল ছিল। (এখানে আনসারগণকে বোঝানো হয়েছে। তাঁরা ছিলেন মদীনায় বাসিন্দা। তাই তাঁরা পূর্বেই মদীনায় স্থিতিশীল ছিলেন। ইমানের পূর্বে স্থিতিশীল হওয়ার অর্থ এই নয় যে, সব আনসারের ইমান সব মুহাজিরের ইমানের অগ্রে ছিল। বরং অর্থ এই যে, মুহাজিরগণের মদীনায় আগমনের পূর্বেই তাঁরা ইমান গ্রহণ করেছিলেন)। তাঁরা মুহাজিরগণকে ভালবাসে এবং মুহাজিরগণকে (গনীমতের মাল ইত্যাদি) যা দেওয়া তজ্জিয়া তাঁরা (আনসাররা) অস্তরে কোন ইরখা'পোষণ করেনা। (বরং আরও বেশী ভালবাসে) নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও (পানাহার ইত্যাদিতে) তাঁদেরকে অগ্রাধিকার দান করে। (অর্থাৎ মাঝে মাঝে নিজেরা না খেয়ে মুহাজির ভাইকে খাইয়ে দেয়। বাস্তবিকই) যারা মনের কাপণ্য থেকে মুক্ত (যেমন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে লোভ-লালসা ও তদনুযায়ী কাজ করা থেকে মুক্ত রেখেছেন), তা'রাই সফলকাম। (আর এই সম্পদ তাদের জন্যও) যারা (দারুল ইসলাম অথবা হিজরতে অথবা দুনিয়াতে) তাদের (অর্থাৎ উপরোক্ত মুহাজিরদের) পরে আগমন করেছে, (কিংবা আগমন করবে)। তা'রা দোয়া করে : হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এবং ইমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাপণকে রুমা কর (শুধু ইমানে অগ্রণী কিংবা হিজরতের উপর নির্ভরশীল কামিল ইমানে অগ্রণী যাই হোক না কেন)। এবং আমাদের অস্তরে ইমানদারদের বিরুদ্ধে কোন হিংসা বিদ্বেষ রেখো না। (এই দোয়ার সমসাময়িকগণও शामिल রয়েছে)। হে আমাদের পালনকর্তা! নিশ্চয় আপনি দয়ালু, পরম করুণাময়।

আনুমানিক ভাষ্য বিষয়

শব্দটি **فِي** থেকে উদ্ভূত। এর

অর্থ প্রত্যাবর্তন করা। দুপুরের পরবর্তী পূর্বদিকে প্রত্যাবর্তনকারী ছায়াকেও **فِي** বলা হয়। কাফিরদের কাছ থেকে মুক্তলব্ধ সম্পদের স্বরূপ এই যে, কাফিররা বিদ্রোহী হওয়ার কারণে তাদের ধনসম্পদ সরকারের পক্ষে বাজেয়াপ্ত হয়ে যায় এবং তাদের মালিকানা থেকে বের হয়ে প্রকৃত মালিক আল্লাহ তা'আলার দিকে ফিরে যায়। তাই এগুলো অর্জনকে **أَفَاء**

শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। এর অর্থ তো এই ছিল যে, কাফিরদের কাছ থেকে অজিত সকল প্রকার ধনসম্পদকেই **فِي** বলা হত। কিন্তু মুক্ত ও জিহাদের মাধ্যমে যে ধনসম্পদ অজিত হয়, তাতে মানুষের কর্ম ও অধ্যবসায়েরও এক প্রকার দখল থাকে। তাই এই প্রকার ধনসম্পদকে 'গনীমত' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে এক আয়াতে বলা হয়েছে :

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ—কিন্তু যে খনসম্পদ অর্জনে যুদ্ধ ও জিহাদের

প্রয়োজন পড়ে না, তাকে **فِي** শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের সারমর্ম এই যে, যে খনসম্পদ যুদ্ধ ও জিহাদ ব্যতিরেকে অর্জিত হয়েছে, তা মুজাহিদ ও যোদ্ধাদের মধ্যে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের আইনানুযায়ী বন্টন করা হবে না। বরং তা পুরোপুরিভাবে রসূল-জাহ্ (সা)-র ইচ্ছাতিয়ায়ে থাকবে। তিনি যাকে যতটুকু ইচ্ছা করবেন, দেবেন অথবা নিজের জন্য রাখবেন। তবে যে কয়েক প্রকার হকদার নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তাদের মধ্যেই এই সম্পদের বন্টন সীমিত থাকতে হবে। এ প্রসঙ্গে পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে :

أَهْلَ قَرْيٍ—এখানে **مَا آتَاكَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ** বলে

বনু নুযায়ের এবং তাদের মত বনু কোরায়শ ইত্যাদি গোত্র বোঝানো হয়েছে, যাদের খনসম্পদ যুদ্ধ ব্যতিরেকেই অর্জিত হয়েছিল। এরপর পাঁচ প্রকার হকদারদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে।

এসব আয়াতে উপরোক্ত প্রকার খনসম্পদের বিধান, হকদার ও হকদারদের মধ্যে বন্টন করার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা আনফালের শুরুতে গনীমতের মাল ও ফায়-এর মালের মধ্যে পার্থক্য, তা সম্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও জিহাদের ফলশ্রুতিতে যে খনসম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হয়, তাই গনীমতের মাল এবং যুদ্ধ ও জিহাদ ব্যতিরেকে যা অর্জিত হয়, তা ফায়-এর মাল। কাফিররা যে খনসম্পদ লেখে পলায়ন করে কিংবা যা সম্মতিক্রমে জিযিয়া, খারাজ কিংবা বাণিজ্যিক ট্যাক্সের আকারে প্রদান করে, সবই ফায়-এর অন্তর্ভুক্ত।

এর ক্রিষ্টিত বিবরণ মা'আরেফুল-কোরআনের চতুর্থ খণ্ডে সূরা আনফালের শুরুতে এবং আরও কিছু বিবরণ সূরা আনফালের ৪১ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, সূরা আনফালের ৪১ নং আয়াতে গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ সম্পর্কে যে ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে, এখানে ফায়-এর সম্পর্কে প্রায় একই ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। সূরা আনফালে বলা হয়েছে :

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَآلِهَا وَمِصْرَتَيْنِ وَابْنِ السَّبِيلِ—

উক্ত আয়াতে ছয় প্রকার হকদারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে—আল্লাহ, রসূল, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, মুসাফির। বলা বাহুল্য, আল্লাহ তা'আলা তো ইহকাল, পরকাল এবং সমগ্র সৃষ্ট জগতের আসল মালিক। অংশ বর্ণনায় তাঁর নাম নিছক বরকতের জন্য উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে এর মাধ্যমে ইঙ্গিত হয়ে যায় যে, এই খনসম্পদ অভিজাত, হালাল ও পুত-পবিত্র। এক্ষেত্রে অধিকাংশ তক্ষসীরবিশের বক্তব্য তাই।—(মাহহারী)

আল্লাহ্ তা'আলার নাম উল্লেখ করার ফলে এই ধনসম্পদের আভিজাত্য, শ্রেষ্ঠত্ব ও পবিত্র হওয়ার দিকে কিভাবে ইঙ্গিত হল, এর বিস্তারিত বিবরণ সূরা আনফালের তফসীরে প্রদান করা হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা পয়গম্বরগণের জন্য মুসলমানদের কাছ থেকে অর্জিত সদকার মাল হালাল করেন নি। ফায় ও গনীরমতের মাল কাফিরদের কাছ থেকে অর্জিত হয়। কাজেই প্রশ্ন দেখা দেয় যে, এই মাল পয়গম্বরগণের জন্য কিরূপে হালাল হল? এ স্থলে আল্লাহ্ তা'আলার নাম উল্লেখ করে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক বস্তুর মালিক আল্লাহ্ তা'আলা। তিনি কৃপাবশত বিশেষ আইনের অধীনে মানুষকে মালিকানা দান করেছেন। কিন্তু যে মানুষ বিদ্রোহী হয়ে যায়, তাদেরকে সঠিক পথে আনার জন্য প্রথমে পয়গম্বরগণকে ঐশী নির্দেশসহ প্রেরণ করা হয়েছে। যারা এতেও সঠিক পথে আসে না, তাদেরকে কমপক্ষে ইসলামী আইনের বশ্যতা স্বীকার করে নিখারিত জিমিয়া, খারাজ ইত্যাদি আদায় করে বসবাস করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। যারা এর বিরুদ্ধেও বিদ্রোহের পতাকা উড়তীন করে, তাদের স্বকাবিলায় জিহাদ ও যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ এই যে, তাদের জ্ঞান ও মাল সম্মানার্থ নয়। তাদের ধনসম্পদ আল্লাহর সরকারে বাজেয়াপ্ত। জিহাদ ও যুদ্ধের মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে যে ধনসম্পদ অর্জিত হয়, তা কোন মানুষের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন নয়—বরং তা সরাসরি আল্লাহর মালিকানায় ফিরে যায়। 'ফায়' শব্দের মধ্যে এই ফিরে যাওয়ার দিকে ইঙ্গিতও আছে। কারণ, এর আসল অর্থ ফিরে যাওয়া। সত্যিকার মালিক আল্লাহ্ তা'আলার মালিকানায় ফিরে যাওয়ার কারণেই এই সম্পদকে 'ফায়' বলা হয়। এখন এতে মানুষের মালিকানার কোন দখল নেই। যেসব হকদারকে এ থেকে অংশ দেওয়া হবে, তা সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া হবে। কাজেই এই ধনসম্পদ আকাশ থেকে বর্ষিত পানি এবং ষড়ঈদগত ঘাসের ন্যায় আল্লাহর দান হিসাবে মানুষের জন্য হালাল ও পবিত্র হবে।

সারমর্ম এই যে, এ স্থলে আল্লাহর নাম উল্লেখ করার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, এসব ধনসম্পদ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার। তাঁর পক্ষ থেকে হকদারদেরকে প্রদান করা হয়। এটা ফায় ও সদকা খয়রাত নয়।

এখন সর্বমোট হকদার পাঁচ রয়ে গেল—রসূল, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাক্কির। গনীরমতের পক্ষমাংশের হকদারও তাঁরাই, যা সূরা আনফালে বর্ণিত হয়েছে। গনীরমত ও ফায় উত্তর প্রকারের বিধান এই যে, এসব ধনসম্পদ প্রকৃতপক্ষে রসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর পরবর্তী খোলাফায়ে রাশেদীনের সম্পূর্ণ ইচ্ছতিয়ারে থাকবে। তাঁরা ইচ্ছা করলে এগুলো কাউকে না দিয়ে মুসলিম জনগণের স্বার্থে ব্যয়তুলমালে জমা করতে পারেন এবং ইচ্ছা করলে বণ্টনও করতে পারেন। তবে বণ্টন করলে তা উপরোক্ত পাঁচ প্রকার হকদারের মধ্যে সীমিত থাকতে হবে।—(কুরতুবী)

খোলাফায়ে রাশেদীন ও অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামের কর্মখারাদৃষ্টে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)—র আমলে তো ফায়—এর মাল তাঁর ইচ্ছতিয়ারে ছিল। তিনি যেখানে ভাল বিবেচনা করতেন ব্যয় করতেন। তাঁর ওফাতের পর এই মাল খলীফাগণের ইচ্ছতিয়ারে ছিল।

এই মালে রসূলুজ্জাহ্ (সা)-র যে অংশ ছিল তা তাঁর ওফাতের পর মওকুফ হয়ে যায়। তাঁর আশীন্নবর্ণকে এই মাল থেকে অংশ দেওয়ার দ্বিবিধ কারণ ছিল। এক. তাঁরা ইসলামী কর্মকাণ্ডে রসূলুজ্জাহ্ (সা)-র সাহায্য করতেন। তাই বিত্তশালী আশীন্নবর্ণকেও এ থেকে অংশ দেওয়া হত।

দুই. রসূলুজ্জাহ্ (সা)-র স্বজনদের জন্য সদকার মাল হারাম করা হয়েছিল। তাই তাঁদের নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্তগণকে ফায়-এর মাল থেকে এর পরিবর্তে অংশ দেওয়া হত। রসূলুজ্জাহ্ (সা)-র ওফাতের পর সাহায্য খতম হয়ে যায়। ফলে বিত্তশালী স্বজনদের অংশও রসূল (সা)-এর অংশের ন্যায় মওকুফ হয়ে যায়। তবে অভাবগ্রস্ত আশীন্ন-স্বজনের অংশ অভাবগ্রস্ততার কারণে অব্যাহত রয়েছে। তারা অন্য অভাবগ্রস্তদের মুকাবিলায় অগ্রগণ্য হবেন।—(হিদায়া)

كَيْلَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ—যে সম্পদ পরস্পরে আদান-প্রদান

হয়, তাকে دُولَةٌ বলা হয়।—(কুরতুবী) আয়াতের অর্থ এই যে, উপরোক্ত ধনসম্পদের হকদার নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, যাতে এই সম্পদ কেবল তোমাদের ধনী ও বিত্তশালী-দের মধ্যকার পুঞ্জীভূত সম্পদ না হয়ে যায়। এতে মূর্খতা যুগের একটি কু-প্রথা যুগোৎপাটনের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। কু-প্রথা ছিল এই যে, এ ধরনের সকল ধন-সম্পদ কেবল বিত্তশালীরাই কুক্ষিগত করে নিত এবং এতে নিঃস্ব ও দরিদ্রদের কোন অংশ থাকত না।

সম্পদ পুঞ্জীভূত করার প্রতি ইসলামী আইনের মরণাচ্ছাত : আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্ব পালক। তাঁর সৃজিত হওয়ার দিক দিয়ে মানবিক প্রয়োজনের সম্পদরাজিতে সকল মানুষের সমান অধিকার আছে। এতে মু'মিন ও কাকিরের মধ্যেও কোন পার্থক্য রাখা হয়নি। অতএব পরিবারগত ও ব্রেনীগত এবং ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য রাখার তো প্রম্মই উঠে না। বায়ু, শূন্যমণ্ডল, সূর্য, চন্দ্র ও বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহের আলো, শূন্যমণ্ডলে স্ফট মেঘমালা, রশ্মি—এগুলো মানুষের সহজাত ও আসল প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী। এগুলো বাতীত মানুষ সামান্যক্ষণও জীবিত থাকতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা এগুলো ব্রহ্মস্ত্রে রেখে এভাবে বন্টন করেছেন, যাতে প্রতি স্তর ও প্রতি ভূখণ্ডের দুর্বল ও সবল মানুষ এগুলো স্বাভাবিক সমভাবে উপকৃত হতে পারে। এ ধরনের দ্রব্য সামগ্রীকে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় প্রজ্ঞা বলে সাধারণ মানুষের ধরা-ছোঁয়া ও একচ্ছত্র অধিকারের উর্ধ্বে রেখেছেন। ফলে এগুলোর উপর ব্যক্তিগত দখল প্রতিষ্ঠা করার সাধ্য কারও নেই। এগুলো ওয়াক্ফে আম। কোন ব্রহ্মত্বের সরকার ও পরাক্রান্তি এগুলোকে কুক্ষিগত করতে সক্ষম নয়। স্ফট জীব সর্বস্বই এগুলো সমভাবে লাভ করে।

প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর দ্বিতীয় কিস্তি হচ্ছে ভূগর্ভ থেকে উদগত পানি ও আহায বস্তু। এগুলো যদিও সাধারণ ওয়াক্ফ নয়, কিন্তু ইসলামী আইনে পাহাড়, অনাবাদী জঙ্গল ও প্রাকৃতিক জলস্রোতকে সাধারণ ওয়াক্ফ রেখে এগুলোর কতকাংশের উপর বিশেষ বিশেষ লোকের বৈধ মালিকানার অধিকারও দেওয়া হয়। অপরদিকে অবৈধ দখল প্রতিষ্ঠা-কারীরাও ভূমির উপর দখল প্রতিষ্ঠা করে নেয়। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে কোন ব্রহ্মত্বের পুঞ্জিগতি

ও দরিদ্র, কৃষক ও শ্রমিকদেরকে সাথে না নিয়ে ভূগর্ভে নিহিত সম্পদস্বাক্ষি অর্জন করতে পারে না। কাজেই দখল প্রতিষ্ঠা করা সত্ত্বেও পুঁজিপতিরা অপরূপ দরিদ্রদেরকে অংশীদার করতে বাধ্য থাকে।

তৃতীয় কিস্তি হচ্ছে স্বর্ণ, রৌপ্য ও টাকা-পয়সা। এগুলো আসল প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর তালিকাভুক্ত নয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এগুলোকে সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী অর্জনের উপায় করেছেন। খনি থেকে উত্তোলন করার পর বিশেষ আইনের অধীনে এগুলো উত্তোলনকারীর মালিকানাধীন হয়ে যায়। এরপর বিভিন্ন পন্থায় অন্য লোকদের দিকে মালিকানা স্থানান্তরিত হতে থাকে। যদি সমগ্র মানব সমাজের মধ্যে এগুলো যথাযথ পন্থায় আবর্তিত হয়, তবে কোন মানুষ ক্ষুধার্ত ও উলঙ্গ থাকার কথা নয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে মানুষ এগুলো দ্বারা কেবল নিজেই উপকৃত হতে চায়, অন্যান্য লোকও উপকৃত হোক, তা চায় না। এই কাপার্পা ও লালসা দুনিয়াতে সম্পদ ও পুঁজি আহরণের নতুন ও পুরাতন অনেক পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে, যার ফলে সম্পদের আবর্তন কেবল পুঁজিপতি ও বিভ্রাটীদের মধ্যেই সীমিত হয়ে পড়েছে এবং সাধারণ দরিদ্র ও নিঃস্বদেরকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। এর অন্তর্ভুক্ত প্রতিক্রিয়াই আজ দুনিয়াতে কমিউনিজম ও সোশ্যালিজমের মত অমৌক্তিক মতবাদের জন্ম দিয়েছে।

ইসলামী আইন একদিকে ব্যক্তি মালিকানার প্রতি এতটুকু সন্মান প্রদর্শন করেছে যে, এক ব্যক্তির সম্পদকে তার প্রাণের সমান এবং প্রাণকে বায়তুল্লাহর সমান গুরুত্ব দান করেছে। এর উপর কারও অবৈধ হস্তক্ষেপকে কঠোরভাবে বাধা দিয়েছে। অপরদিকে যে হাত অবৈধ পন্থায় এই সম্পদের দিকে অগ্রসর হয় সেই হাত কেটে দিয়েছে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে দ্রব্যসামগ্রীর উপর কোন বিশেষ ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠী কর্তৃক একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠা করার সকল দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

অর্থোপার্জনের প্রচলিত পন্থাসমূহের মধ্যে সুদ সইটী ও জুয়ার মাধ্যমে সম্পদ সংকুচিত হয়ে কতিপয় ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মধ্যে সীমিত হয়ে যায়। ইসলাম এগুলোকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে ব্যবসা-বাণিজ্য, ইজারা ইত্যাদি কাজ-কায়বারে এগুলোর মূল কেটে দিয়েছে। যে অর্থ-সম্পদ কোন ব্যক্তির কাছে বৈধ পন্থায় সঞ্চিত হয়, তাতেও হাকাত, ওশর, ফিতরা, কাফ্ফারা ইত্যাদি ফরয কর্মের আকারে এবং অতিরিক্ত স্বেচ্ছামূলক দানের আকারে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছে। এসব ব্যয়বহনের পরও মৃত্যুর সময় ব্যক্তির কাছে যে অর্থ-সম্পদ অবশিষ্ট থেকে যায়, তা এক বিশেষ প্রভাভিত্তিক নীতিমালা অনুযায়ী মৃতের নিকট থেকে নিকটতম স্বজনদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছে। ইসলাম এই ত্যাজ্য সম্পদ সাধারণ দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করার আইন রচনা করেনি। কারণ, এরূপ করলে মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর পূর্বেই তার সম্পদ অস্বাভাবিক পন্থায় নিঃশেষ করে দিতে স্বভাবসত্য কারণেই আগ্রহী হত। এখন তারই আত্মীয় ও প্রিয়জন পাবে দেখে তার অন্তরে এই প্রেরণা জালিত হবে না।

অর্থোপার্জনের অপর পন্থা হচ্ছে যুদ্ধ ও জিহাদ। এই পন্থায় অর্জিত ধনসম্পদ সুদূর বন্টনের জন্য ইসলাম যে নীতিমালা অবলম্বন করেছে, তার কিসদংশ সূরা আনকালে এবং

কিয়দংশ এই সূরায় বর্ণিত হয়েছে। কেমন ভানপানী তারা, যারা ইসলামের এহেম ন্যায়-
নুগ ও প্রজ্ঞাভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ছেড়ে নতুন ইজম অবলম্বন করে বিশ্ব শান্তির
পায়ে কুঠারাত্যাত করছে।

إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَ مَا نَهَأُكُمْ عَنْهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ

আম্নাত ফায়-এর মাল বণ্টন সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এবং এর উপযুক্ত অর্থ এই যে, ফায়-
এর মাল সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা হকদারদের শ্রেণী বর্ণনা করেছেন ঠিক, কিন্তু তাদের
মধ্যে কাকে কতটুকু দেওয়া হবে, তা নির্ধারণ করা রসূলজাহ্ (সা)-র সুবিবেচনার উপর
রেখে দিয়েছেন। তাই এই আম্নাতে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তিনি যাকে
যে পরিমাণ দেন, তা সম্বল্ট হয়ে গ্রহণ কর এবং যা দেন না, তা পেতে চেষ্টা করো না।

অতঃপর **اتَّقُوا اللَّهَ** বলে এই নির্দেশকে জোরদার করা হয়েছে। অর্থাৎ এ ব্যাপারে
ব্রাহ্ম ছলচাতুরির মাধ্যমে অতিরিক্ত আদায় করে নিলেও আল্লাহ তা'আলা সব খবর রাখেন।
তিনি এজন্য শাস্তি দেবেন।

রসূলের নির্দেশ কোরআনের নির্দেশের ন্যায় অবশ্য পালনীয় : কিন্তু আম্নাতের
ভাষা ধন সম্পদের সাথেই বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়; বরং শরীয়তের বিধি-বিধানও
এতে দাখিল আছে। তাই ব্যাপক ভঙ্গিতে আম্নাতের অর্থ এই যে, যে কোন নির্দেশ অথবা
ধনসম্পদ অথবা অন্য কোন বস্তু তিনি কাউকে দেন, তা তার গ্রহণ করা উচিত এবং তদনু-
যায়ী কাজ করতে সম্মত হওয়া উচিত। পক্ষান্তরে তিনি যে বিষয় নিষেধ করেন, তা থেকে
বিরত থাকা দরকার।

অনেক সাহাবায়ে কিরাম আম্নাতের এই ব্যাপক অর্থ অবলম্বন করে রসূলজাহ্
(সা)-র প্রত্যেক নির্দেশকে কোরআনের নির্দেশের অনুরূপ অবশ্য পালনীয় সাব্যস্ত করে-
ছেন। কুরতুবী বলেন : আম্নাতে **أَنَّى** শব্দের বিপরীতে **نَهَى** শব্দ ব্যবহার করার
বোকা যায় যে, এখানে **أَنَّى** শব্দের অর্থ **أَمَرَ** অর্থাৎ যা আদেশ করেন। কারণ এটাই
نَهَى এর বিপক্ষ বিপরীত শব্দ। তবে কোরআন পাক এর পরিবর্তে **أَنَّى** শব্দ এজন্য
ব্যবহার করেছে যাতে 'ফায়'-এর মাল বণ্টন সম্পর্কিত বিষয়বস্তুও এতে शामिल থাকে। কারণ,
এ প্রসঙ্গেই আম্নাতটি আনা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) জনৈক ব্যক্তিকে ইহরাম অবস্থায় সেলাই করা
কাপড় পরিধান করতে দেখে তা খুলে ফেলতে আদেশ করেন। লোকটি বলল : আপনি
এ সম্পর্কে কোরআনের কোন আম্নাত বলতে পারেন কি, যাতে সেলাই করা কাপড় পরিধান
করতে নিষেধ করা হয়েছে? তিনি বললেন : হ্যাঁ, এ সম্পর্কে আম্নাত আছে, অতঃপর তিনি

وَمَا أَنَا إِلَّا رَسُولُ আম্নাতটি পাঠ করে দিলেন। ইমাম শাফেয়ী একবার

উপস্থিত লোকজনকে বললেন : আমি তোমাদের প্রত্যেক প্রত্যেকের জওয়াব কোরআন থেকে দিতে পারি। জিজ্ঞাসা কর যা জিজ্ঞাসা করতে চাও। এক ব্যক্তি আরম্ভ করল : এক ব্যক্তি ইহ্রাম অবস্থায় প্রজাগতি মেরে ফেলল, এর বিধান কি? ইমাম শাফেরী (র) এই আয়াত তিলাওয়াত করে হাদীস থেকে এর বিধান বর্ণনা করে দিলেন।—(কুরতুবী)

لِلْفُقَرَاءِ الثَّمَا جَرِيءٍ — রুক্ব শেষ পর্যন্ত এই কয়েকটি আয়াতে দরিদ্র

মুহাজির, আনসার ও তাঁদের পরবর্তী সাধারণ উচ্চতম সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। ব্যাক-রনিক দিক দিয়ে لَذِي الْقُرْبَى لِلْفُقَرَاءِ থেকে بدل হয়েছে, যা পূর্বের আয়াতে আছে।—(মাহহারী) আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, পূর্বের আয়াতে সাধারণ ইম্মাতীয়, মিসকীন ও মুসাফিরগণকে অভাবগ্রস্ততার কারণে ফায়-এর মালের হকদার পণ্য করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে এর অতিরিক্ত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, যদিও সকল দরিদ্র ও মিসকীন এই মালের হকদার, কিন্তু তাদের মধ্যে দরিদ্র মুহাজির ও আনসারগণ অগ্রগণ্য। কারণ, তাঁদের ধর্মীয় খিদমত এবং ব্যক্তিগত গুণ-গরিমা সুবিদিত।

সদকার মালে ধর্মপরায়ণ ও দীনের খিদমতে নিয়োজিত অভাবগ্রস্তদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত : এ থেকে বোঝা গেল যে, সদকার মাল বিশেষত ফায়-এর মাল সাধারণ অভাবগ্রস্তদের অভাব দূর করার জন্য হলেও তাদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ, ধার্মিক, বিশেষত দীনের খিদমতে নিয়োজিত তালিবে-ইলম ও আলিম, তাদেরকে অন্যদের চাইতে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। এ কারণেই ইসলামী রাষ্ট্রসমূহে শিক্ষা, প্রচার ও জন-সংস্কারের কাজে নিয়োজিত আলিম, মুফতী ও বিচারকগণকে ফায়-এর মাল থেকে খোর-গোশ দেওয়ার প্রচলন ছিল। কেননা, আলোচ্য আয়াতসমূহে সাহাবায়ে কিরামকেও প্রথমে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। এক, মুহাজির, যারা সর্বপ্রথম ইসলাম ও রসুলুল্লাহ (সা)-র জন্য অক্লান্তপূর্ব ত্যাগ স্বীকার করেন এবং ইসলামের জন্য ঘোরতর বিপদাপদ হাসিমুখে বরণ করেন। অবশেষে সহায়-সম্পত্তি স্বদেশ ও আত্মীয়-স্বজনের মায়া কাটিয়ে মদীনার দিকে হিজরত করেন। দুই, আনসার যারা রসুলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সঙ্গী-সাথী মুহাজিরগণকে মদীনায় ভেঁকে এনে সারা দুনিয়ার মানুষকে নিজেদের শত্রুতে পরিণত করেন এবং তাঁদের এমন আতিথেয়তা করেন, যার নজীর বিশ্বের ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। এই দুই শ্রেণীর পর তৃতীয় শ্রেণী সেসব মুসলমানের সাব্যস্ত করা হয়েছে, যারা সাহাবায়ে কিরামের পর ইসলাম গ্রহণ করে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত আগ-মনকারী সব মুসলমান এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তী আয়াতসমূহে এই তিন শ্রেণীর কিছু প্রের্ত্ব, গুণ গরিমা ও দীনের খিদমত বর্ণনা করা হয়েছে।

মুহাজিরদের প্রের্ত্ব : اَلَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالُهُمْ يَبْتَغُونَ

نَفْلًا مِّنْ اِلٰهٍ وَرِفْوًا نَّا وَيَنْصُرُونَ اِلٰهًا وَرَوْوَلًا اَوْ لَا يَكُ هُمُ الْمَادِتُونَ

এতে মুহাজিরগণের প্রথম ৩৭ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তাঁরা স্বদেশ ও সহায়-সম্পত্তি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন। তাঁরা মুসলমান এবং রসূলুল্লাহ (সা)-র সমর্থক ও সাহায্যকারী। শুধু এই অপরাধে মক্কার কাফিররা তাঁদের উপর অকথ্য নির্বাতন চালায়। শেষ পর্যন্ত তাঁরা মাতৃভূমি, ধনসম্পদ ও বাসভিটা ছেড়ে হিজরত করতে বাধ্য হন। তাঁদের কেউ কেউ ক্ষুধার তাড়নায় অতিষ্ঠ হয়ে পেটে পাথর বেঁধে নিতেন এবং কেউ কেউ শীতবস্ত্রের অভাবে গর্ত খনন করে তাতে শীতের দাপট থেকে আশ্রয় রক্ষা করতেন।—(মাযহারী, কুরতুবী)

মুসলমানদের ধনসম্পদের উপর কাফিরদের দখল সম্পর্কিত বিধান : আল্লাহ তায়ালা মুহাজিরগণকে ফকীর বলা হয়েছে। ফকীর সেই ব্যক্তি, যার মালিকানায় কিছু না থাকে অথবা নিসাব পরিমাণ কোন কিছু না থাকে। মক্কার তাঁদের অধিকাংশই ধন-সম্পদ ও সহায়-সম্বলের অধিকারী ছিলেন। হিজরতের পরও যদি সেই ধনসম্পদ তাঁদের মালিকানায় থাকত, তবে তাঁদেরকে ফকীর ও নিঃস্ব বলা ঠিক হত না। কোরআন পাক তাঁদেরকে ফকীর বলে ইঙ্গিত করেছে যে, হিজরতের পর তাঁদের মক্কার পরিত্যক্ত বিষয়-সম্পত্তি তাঁদের মালিকানা থেকে বের হয়ে কাফিরদের দখলে চলে গেছে।

এ কারণেই ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম মালেক (র) বলেন : যদি মুসলমান কোন জায়গায় হিজরত করে চলে যায় এবং তাদের পরিত্যক্ত বিষয়-সম্পত্তি কাফিররা দখল করে নেয় অথবা আল্লাহ না করুন কোন দারুল-ইসলাম কাফিররা অধিকার করে মুসলমানদের ধনসম্পদ ছিনিয়ে নেয়, তবে এসব ধনসম্পদ কাফিরদের পুরোপুরি দখলের পর তাদের মালিকানায় চলে যায়। এগুলো বেচা-কেনা ইত্যাদি কার্যকলাপ আইনসিদ্ধ হয়। বিভিন্ন হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। এ স্থলে তফসীলে মাযহারীতে সেসব হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে।

মুহাজিরগণের দ্বিতীয় ৩৭ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : **يُهَيِّئُونَ فَلَاحًا مِنَ اللَّهِ**

وَرِضْوَانًا অর্থাৎ তাঁরা কোন জাগতিক স্বার্থের বশবর্তী হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন নি

এবং হিজরত করে মাতৃভূমি ও ধনসম্পদ ত্যাগ করেন নি বরং কেবলমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টিই তাঁদের কাম্য ছিল। এ থেকে তাঁদের পূর্ণ আন্তরিকতা বোঝা যায়। **فَلَاحٌ** শব্দটি প্রায়শ পাখির নিয়ামতের জন্য এবং **وَرِضْوَانٌ** শব্দটি পারলৌকিক নিয়ামতের জন্য ব্যবহৃত হয়। কাজেই অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তাঁরা তাঁদের সাবেক ঘরবাড়ী, বিষয় সম্পত্তি ইত্যাদি ছেড়ে দিয়ে এখন ইসলামের ছায়াতলে সাংসারিক প্রয়োজন এবং পরকালের নিয়ামত কামনা করছেন।

মুহাজিরগণের তৃতীয় ৩৭ এই বর্ণিত হয়েছে : **وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ**

অর্থৎ আলাহ্ ও রসুলকে সাহায্য করার জন্য তাঁরা উপরোক্ত সবকিছু করেছেন। আলাহ্কে সাহায্য করার অর্থ তাঁর দীনকে সাহায্য করা। এ ক্ষেত্রে তাঁদের ভ্যাগ ও ভিত্তিক বিশ্বাস্যকর।

তাঁদের চতুর্থ গুণ হচ্ছে **وَلَا تَكُفُّهُمْ الْمَادُّونَ** অর্থাৎ তাঁরাই কথা ও

কাজে সত্যবাদী। ইসলামের কলমে পাঠ করে তাঁরা আলাহ্ ও রসুলের সাথে যে অসীকারে আবদ্ধ হয়েছিলেন, তা অকুরে অকুরে পালন করেছেন। এই আয়াত সকল মুহাজির সাহাবী সত্যবাদী বলে দৃষ্টকর্মে ঘোষণা করেছে। অতএব, যে ব্যক্তি তাঁদের কাউকে মিথ্যাবাদী বলে, সে এই আয়াত অসীকার করার কারণে মুসলমান হতে পারে না। নাউশ্বিজাহ্। রাক্ষসী সম্প্রদায় তাঁদেরকে মুনাফিক আখ্যা দেয়। এটা এই আয়াতের সুস্পষ্ট লংঘন। রসুলে করীম (সা) এই ফকীর মুহাজিরগণের ওসীলা দিয়ে আলাহর কাছে দোয়া করতেন। এতেই বোঝা যায় যে, হযুরের কাছে তাঁদের কি মর্যাদা ছিল।—(মাহহারী)

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ

আনসারগণের প্রেষ্ঠত্ব : **تَبَوَّءُوا** শব্দের অর্থ অবস্থান গ্রহণ করা। **دَار** বলে হিজরতের স্থান তথা মদীনা তাইয়েবা বোঝানো হয়েছে। এ কারণেই হযরত ইমাম মালিক (র) মদীনাকে দুনিয়ার সকল শহর অপেক্ষা প্রেষ্ঠ বলতেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, দুনিয়ার যেসব শহরে ইসলাম পৌঁছেছে ও প্রসার লাভ করেছে, সেগুলো জিহাদের মাধ্যমে বিজিত হয়েছে; এমনকি, মক্কা যোকাররমাও। একমাত্র মদীনা শহরই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ইমান ও ইসলামকে বুক ধারণ করেছে।—(কুরতুবী)

আয়াতে **وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا** ক্রিয়াগদের পর **دَار** এর সাথে ইমানও উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ অবস্থান গ্রহণ কোন স্থান ও জায়গায় হতে পারে। ইমান কোন জায়গা নয় যে, এতে অবস্থান গ্রহণ করা হবে। তাই কেউ কেউ বলেন : এখানে **وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا** অথবা **وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا** ক্রিয়াগদ উহা আছে। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁরা মদীনায় অবস্থান গ্রহণ করেছেন, ইমানে খাঁটি ও পাকাপোক্ত হয়েছেন। এখানে এরূপও হতে পারে যে, ইমানকে রূপক ভঙ্গিতে জায়গা

ধরে নিয়ে তাতে অবস্থান গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। **وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا** অর্থাৎ মুহাজির-

গণের পূর্বে। এতে আনসারগণের একটি প্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। তা এই যে, যে শহর আলাহর কাছে 'দারুল-হিজরত' ও 'দারুল-ইমান' হওয়ার ছিল, তাতে তাঁদের অবস্থান ও বসতি মুহাজিরগণের পূর্বেই ছিল। মুহাজিরগণের এখানে স্থানান্তরিত হওয়ার পূর্বেই তাঁরা ইমান কবুল করে পাকাপোক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। আনসারগণের দ্বিতীয় গুণ-বর্ণনা

প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : **يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ** অর্থাৎ তাঁরা তাদেরকে ডাকবাসেন

যারা হিজরত করে তাঁদের শহরে আগমন করেছেন। এটা দুনিয়ার সাধারণ মানুষের রুটির পরিপন্থী। সাধারণত লোকেরা এহেন ভিটা-মাটিহীন দুর্গত মানুষকে স্থান দেওয়া পছন্দ করে না। সর্বত্রই দেশী ও ভিন্নদেশীর প্রর উঠে। কিন্তু আনসারগণ কেবল তাঁদেরকে স্থানই দেন নি, বরং নিজ নিজ গৃহে আবাদ করেছেন, নিজেদের ধনসম্পদে অংশীদার করেছেন এবং অভাবনীয় ইয়ুত ও সন্তোষের সাথে তাঁদেরকে স্বাগত জানিয়েছেন। এক একজন মুহাজিরকে জারগা দেওয়ার জন্য এক সাথে কয়েকজন আনসারী আবেদন করেছেন। ফলে শেষ পর্যন্ত লটারীর মাধ্যমেও এর নিষ্পত্তি করতে হয়েছে।—(মাহহারী)

وَلَا يَجِدُونَ فِي مَدُونِهِمْ حَاجَةً
 তাঁদের তৃতীয় গুণ এই বর্ণিত হয়েছে :

وَمَا أَوْتُوا
 এই বাক্যের সম্পর্ক একটি বিশেষ ঘটনার সাথে, যা বনু নুযায়েরের নির্বাসন এবং তাদের বাগান ও গৃহের উপর মুসলমানদের দখল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় সংঘটিত হয়েছিল।

বনু নুযায়েরের ধনসম্পদ বন্টনের ঘটনা : যে সময় বনু নুযায়ের গোত্রের কায়-এর ধনসম্পদ মুসলমানদের মধ্যে বন্টনের ইচ্ছার কারণে রসুলুল্লাহ (সা)-কে দেওয়া হয়, তখন মুহাজিরগণ ছিলেন সম্পূর্ণ নিঃস্ব। তাঁদের না ছিল নিজস্ব কোন বাড়ী-ঘর এবং না ছিল বিষয়-সম্পত্তি। তাঁরা আনসারগণের গৃহে বাস করতেন এবং তাঁদেরই বিষয়-সম্পত্তিতে মেহনত মজদুরি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। কায়-এর সম্পদ হস্তগত হওয়ার পর রসুলুল্লাহ (সা) আনসারগণের সর্দার সাবেত ইবনে কায়স (রা)-কে ডেকে বললেন : তুমি আনসারগণকে আমার কাছে ডেকে আন। সাবেত জিজ্ঞাসা করলেন : ইয়া রসুলুল্লাহ! আমার নিজের গোত্র খায়রাজের আনসারগণকে ডাকব, না সব আনসারকে ডাকব? রসুলুল্লাহ (সা) বললেন : না, সবাইকে ডাকতে হবে। অতঃপর তিনি আনসারগণের এক সম্মেলনে ভাষণ দিলেন। হামদ ও সাজাতের পর তিনি মদীনার আনসারগণের ভূয়সী প্রশংসা করে বললেন : আপনারা আগনাদের মুহাজির ভাইদের সাথে যে ব্যবহার করেছেন, তা নিঃসন্দেহে অনন্য সাধারণ সাহসিকতার কাজ। অতঃপর তিনি বললেন : আল্লাহ তা'আলা বনু নুযায়েরের ধনসম্পদ আপনাদের করতলগত করে দিয়েছেন। যদি আপনারা চান, তবে আমি এই সম্পদ মুহাজির ও আনসার সবার মধ্যে বন্টন করে দেব এবং মুহাজিরগণ পূর্ববৎ আপনাদের গৃহেই বসবাস করবে। পক্ষান্তরে আপনারা চাইলে আমি এই সম্পদ কেবল গৃহহীন ও সহায়-সম্মলহীন মুহাজিরগণের মধ্যেই বন্টন করে দেব এবং এরপর তারা আপনাদের গৃহ ত্যাগ করে আল্লাদা নিজেদের গৃহ নির্মাণ করে নেবে।

এই বক্তৃতা শুনে আনসারগণের দুই জন প্রধান নেতা সা'দ ইবনে ওবাদা (রা) ও সা'দ ইবনে মুরায় (রা) দণ্ডায়মান হলেন এবং আরম্ভ করলেন : ইয়া রসুলুল্লাহ (সা)! আমাদের অভিমত এই যে, এই ধনসম্পদ আগনি সম্পূর্ণই কেবল মুহাজির ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দিন এবং তাঁরা এরপরও পূর্ববৎ আমাদের গৃহে বসবাস করুন। নেতাদের এই উক্তি

ওনে উপস্থিত আনসারগণ সম্বন্ধে বলে উঠলেন : আমরা এই সিদ্ধান্তে সম্মত ও আনন্দিত । তখন রসুলুল্লাহ (সা) সকল আনসার ও তাঁদের সন্তানগণকে দোয়া দিলেন এবং ধনসম্পদ মুহাজিরগণের মধ্যে বন্টন করে দিলেন । আনসারগণের মধ্যে মাত্র দুই ব্যক্তি অর্থাৎ সহল ইবনে হানীফ ও আবু দুজানাকে অত্যধিক অভাবগ্রস্ততার কারণে অংশ দিলেন । গোহনেতা সা'দ ইবনে মুয়ায (রা)-কে ইবনে আবী হাকীকের একটি বিখ্যাত তরবারি প্রদান করা হল ।—(মাযহারী)

উল্লিখিত আয়াতে **حَاجَةً** বলে প্রয়োজনের বস্তু এবং **وَتَوْأَمًا** এর সর্বনাম

দ্বারা মুহাজিরগণকে বোঝানো হয়েছে । আয়াতের অর্থ এই যে, এই বস্টনে যা কিছু মুজা-হিরগণকে দেওয়া হল, মদীনার আনসারগণ সানন্দে তা গ্রহণ করে নিলেন ; যেন তাঁদের এসব জিনিসের কোন প্রয়োজনই ছিল না । মুহাজিরগণকে দেওয়ার ক্ষেত্রে যত্ন নেওয়া অথবা অভিযোগ করার তো সামান্যতম কোন সন্দেহবশতই ছিল না । এর মুকাবিলায় যখন বাহ-রাইন বিজিত হল, তখন রসুলুল্লাহ (সা)-র প্রাপ্ত ধনসম্পদ সম্পূর্ণই আনসারগণের মধ্যে বিলি-বন্টন করে দিতে চাইলেন, কিন্তু তাঁরা তাতে রাজী হলেন না, বরং বললেন : আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুই গ্রহণ করব না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মুহাজির ভাইগণকেও এই ধনসম্পদ থেকে অংশ না দেওয়া হয় ।—(বুখারী, ইবনে কাসীর)

আনসারগণের চতুর্থ গুণ এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে : **وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ**

خِمَاةٍ—**أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ** শব্দের অর্থ দারিদ্র্য ও উপবাস ।

إِثَار—এর অর্থ অপরের বাসনা ও প্রয়োজনকে নিজের বাসনা ও প্রয়োজনের অগ্রে রাখা ।

আয়াতের অর্থ এই যে, আনসারগণ নিজেদের উপর মুহাজিরগণকে অগ্রাধিকার দিতেন । নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর আগে তাঁদের প্রয়োজন মেটাতেন, যদিও নিজেরাও অভাবগ্রস্ত ও দারিদ্র্য-প্রসীড়িত ছিলেন ।

সাহাবীগণের, বিশেষত আনসারগণের আত্মত্যাগের কয়েকটি ঘটনা : আয়াতের তফসীরের জন্য ঘটনাবলী বর্ণনা করা জরুরী নয়, কিন্তু এসব ঘটনা মানুষকে উৎকৃষ্ট মানবতা শিক্ষা দেয় এবং জীবনে বিপ্লব আনয়ন করে । তাই তফসীরবিদগণ এ স্থলে এসব ঘটনা বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন । এখানে তফসীরে কুরতুবী থেকে কয়েকটি ঘটনা উদ্ধৃত করা হল ।

তিরমিযীতে হযরত আবু হুরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত আছে, জনৈক আনসারীর গৃহে রাসুলুল্লাহ একজন মেহমান আগমন করল । তাঁর কাছে এই পরিচালনা খাদ্য ছিল, যা তিনি নিজে এবং তাঁর সন্তানগণ খেতে পারেন । তিনি স্ত্রীকে বললেন : বাচ্চাদেরকে কোনরূপে শুইয়ে দাও । অতঃপর বাতি নিভিয়ে দিয়ে মেহমানের সামনে

আহার্য রেখে কাছাকাছি বসে যাও, যাতে মেহমান মনে করে যে, আমরাও খাচ্ছি, কিন্তু আসলে আমরা খাব না। এভাবে মেহমান পেট ভরে খেতে পারবে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে

يُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ

আরাওখানি নাখিল হয়।

তিরমিযীতেই হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে আরো একটি ঘটনা বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ (সা)-র কাছে উপস্থিত হয়ে আরম্ভ করল : আমি ক্ষুধায় অভিষ্ট ! তিনি একজন বিবির কাছে সংবাদ দিলে জওয়াব আসল : আমার কাছে একপে পানি ব্যতীত কিছুই নেই। অন্য একজন বিবির কাছে সংবাদ দিলে সেখানে থেকেও তাই জওয়াব আসল। অতঃপর তৃতীয়, চতুর্থ এমনকি, সকল বিবির কাছে খোঁজ নেওয়া হলে সবার কাছ থেকে একই জওয়াব পাওয়া গেল যে, পানি ব্যতীত গৃহে কিছুই নেই। অগত্যা রসুলুল্লাহ (সা) উপস্থিত সাহাবীগণকে সম্বোধন করে বললেন : কে আহ, যে এই ব্যক্তিকে আজ রাত অতিথি করে নেবে? জনৈক আনসারী আরম্ভ করলেন : ইয়া রসুলুল্লাহ! আমি করব। অতঃপর তিনি লোকটিকে সাথে নিয়ে গেলেন এবং গৃহে পৌঁছে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন : কিছু খাবার আছে কি? উত্তর হল : আমাদের বাচ্চারা খেতে পারে, এই পরিমাণ খাদ্য আছে। আনসারী বললেন : বাচ্চাদেরকে গুইয়ে দাও। অতঃপর মেহমানের সাথে খাবার রেখে আমরাও সাথে বসে যাব। এরপর বাতি নিভিয়ে দেবে, যাতে মেহমান আমাদের না খাওয়ার বিষয় জানতে না পারে। সেমতে মেহমান আহার করল। সকালে আনসারী রসুলুল্লাহ (সা)-র কাছে উপস্থিত হলে তিনি বললেন : গতরাতে তুমি মেহমানের সাথে যে ব্যবহার করেছ, তা আল্লাহ তা'আলা অত্যধিক পছন্দ করেছেন।

মেহনতী হযরত সাবিত ইবনে কায়সের সাথে জনৈক আনসারীর এমনি ধরনের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। রেওয়ায়েতে প্রত্যেক ঘটনার সাথে একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, এই আয়াত এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে।

কুশায়রী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, জনৈক মান্যবর সাহাবীর কাছে এক ব্যক্তি একটি বকরীর মাথা উপঢৌকন পেশ করেন। সাহাবী মনে করলেন আমার অশুক ভাই ও তাঁর বাচ্চারা আমার চাইতে বেশী অভাবগ্রস্ত। সেমতে তিনি মাথাটি তার কাছে এবং তৃতীয় জন চতুর্থ জনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তিনিও এমনিভাবে তৃতীয় জনের কাছে এবং তৃতীয় জন চতুর্থ জনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। অবশেষে সাতটি গৃহে যাওয়ার পর মাথাটি আবার প্রথম সাহাবীর গৃহে ফিরে এল। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। সা'লাবী হযরত আনাস (রা) থেকেও এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

মুয়াত্তা ইমাম মালিকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি হযরত আয়েশা (রা)-র কাছে কিছু চাইল। তাঁর গৃহে তখন একটি মাত্র রুটি ছিল এবং তিনি সেদিন রোমা রেখেছিলেন। তিনি পরিচালিকাকে বললেন : এই রুটি তাকে দিয়ে দাও। পরিচালিকা বলল : এই রুটি দিয়ে দিলে আপনার ইফতার করার কিছু থাকবে না। হযরত আয়েশা (রা) বললেন : না থাক, তুমি দিয়ে দাও। পরিচালিকা বর্ণনা করে—যখন সন্ধ্যা হল, তখন উপঢৌকন

প্রেরণে অভ্যস্ত নয়—এমন এক ব্যক্তি হযরত আয়েশার কাছে একটি আন্ত ভাজা করা বকরী উপঢৌকন হিসাবে প্রেরণ করল। তার উপর মরদার আটার আবরণী ছিল। আরবে একে সর্বোত্তম খাদ্য মনে করা হত। হযরত আয়েশা (রা) পরিচারিকাকে ডেকে বললেন : খাও, এটা তোমার সেই রুটি থেকে উত্তম।

নাসারী বর্ণনা করেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর অসুস্থ অবস্থায় আতুর খাও-রার ইচ্ছা প্রকাশ করলে এক দিরহামের বিনিময়ে এক গুচ্ছ আতুর কিনে আনা হয়। ঘটনা-ক্রমে তখন এক মিসকীন এসে উপস্থিত হল এবং কিছু চাইল। অসুস্থ ইবনে ওমর বললেন : আতুরের গুচ্ছটি তাকে দিয়ে দাও। উপস্থিত লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি গোপনে মিসকীনের পেছনে পেছনে গেল এবং গুচ্ছটি তার কাছ থেকে কিনে হযরত ইবনে ওমরের সামনে পেশ করল। কিন্তু ডিক্কুটি আবার আসল এবং কিছু চাইল। হযরত ইবনে ওমর পুনরায় গুচ্ছটি তাকে দিয়ে দিলেন। আবার এক ব্যক্তি গোপনে ডিক্কুকের পেছনে পেছনে যয়ে এক দিরহামের বিনিময়ে গুচ্ছটি কিনে আনল এবং হযরত ইবনে ওমরের কাছে পেশ করল। ডিক্কুটি আবার ধরনা দিতে চাইলে সবাই তাকে নিষেধ করল। হযরত ইবনে ওমর যদি জানতে পারতেন যে, এটা সেই সদকা দেওয়া গুচ্ছ, তবে কিছুতেই তা খেতেন না। কিন্তু তিনি বাজার থেকে আনা হয়েছে ভেবে তা ব্যবহার করলেন।

ইবনে মুবারক নিজ সনদে বর্ণনা করেন, একবার খলীফা উমর ফারুক (রা) একটি থলিয়ায় চার শ' দীনার ভরে থলিয়াটি চাকরের হাতে দিয়ে বললেন : এটি আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহের কাছে নিয়ে যাও এবং বল : খলীফার পক্ষ থেকে এই হাদিয়া কবুল করে নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করুন। তিনি চাকরকে আরও বলে দিলেন : হাদিয়া পেশ করার পর তুমি কিছুক্ষণ দেরী করবে এবং দেখবে যে, আবু ওবায়দা কি করেন। চাকর নির্দেশ অনুযায়ী থলিয়াটি হযরত আবু ওবায়দা (রা)-র কাছে পেশ করে কিছুক্ষণ দেরী করল। আবু ওবায়দা (রা) থলিয়া হাতে নিয়ে দোয়া করলেন : আল্লাহ্ তা'আলা ওমরের প্রতি রহম করুন এবং তাকে উত্তম বিনিময় দিন। তিনি তৎক্ষণাৎ দাসীকে ডেকে বললেন : নাও, এই সাত অমুককে এবং পাঁচ অমুককে দিয়ে এস। এভাবে গোটা চার শ' দীনার তিনি তখনই বণ্টন করে দিলেন।

চাকর ফিরে এসে ঘটনা বর্ণনা করল। হযরত উমর (রা) এমনিভাবে আরও চার শ' দীনার অপর একটি থলিয়ায় ভর্তি করে চাকরের হাতে দিয়ে বললেন : এটি মুয়ায ইবনে জবলকে দিয়ে এস এবং কিছুক্ষণ দেরী করে লক্ষ্য কর তিনি কি করেন। চাকর নিয়ে গেল। হযরত মুয়ায ইবনে জবল থলিয়া হাতে নিয়ে হযরত উমর (রা)-র জন্য দোয়া করলেন। তিনিও থলিয়া খুলে কামবিলম্ব না করে বণ্টনে বসে গেলেন। তিনি দীনারগুলো অনেক ভাগে ভাগ করে বিভিন্ন গৃহে প্রেরণ করতে লাগলেন। তাঁর স্ত্রী ব্যাপার দেখে যাক্ষিলেন। অবশেষে বললেন : আমিও তো মিসকীনই। আমাকেও কিছু দিন না কেন? তখন থলিয়াতে যাত্র দৃষ্টি দীনার অবশিষ্ট ছিল। সেমতে তাই তাঁকে দিয়ে দিলেন। চাকর এই দৃশ্য দেখে ফিরে এল এবং খলীফার কাছে বর্ণনা করল। খলীফা বললেন : এরা সবাই ভাই ভাই। সবার স্বভাব একই রূপ।

হযরত আদভী বলেন : আমি ইরানবুক নুজে আমার চাচাত ভাইয়ের খোঁজে শহীদদের লাশ দেখার জন্য বের হলাম। সাথে কিছু পানি নিলাম, যাতে তার মধ্যে প্রাণের স্পন্দন দেখলে পানি করিয়ে দিতে পারি। তার নিকটে পৌঁছে দেখলাম যে, প্রাণের স্পন্দন এখনও নিঃশেষ হয়নি। আমি বললাম : আপনাকে পানি পান করাব কি? তিনি ইঙ্গিতে 'হ্যাঁ' বললেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ কাছে থেকে অন্য একজন শহীদদের আহ আহ শব্দ কানে এল। আমার ভাই বললেন : এই পানি তাকে দিয়ে দাও। আমি তার কাছে পৌঁছে পানি দিতে চাইলে তৃতীয় একজনের কাতরানোর আওয়াজ কানে এল। সে-ও এই তৃতীয়জনকে পানি দিয়ে দিতে বলল। এমনভাবে একের পর এক করে সাতজন শহীদদের সাথে একই ঘটনা সংঘটিত হল। আমি যখন সপ্তম শহীদদের কাছে পেলাম, তখন সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল। সেখান থেকে আমি আমার ভাইয়ের কাছে এসে দেখি তিনিও খতম হয়ে গেছেন।

কিছু আনসারগণের এবং কিছু মুহাজিরগণের মিলিয়ে এই কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হল। অধিকাংশ ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াত এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। এতে কোন বৈপরীত্য ও বিরোধ নেই। কারণ, যে ধরনের ঘটনা সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ হয় যদি সেই ধরনের অন্য কোন ঘটনা সংঘটিত হয়ে যায়, তবে বলে দেওয়া হয় যে, এই ঘটনা সম্পর্কে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। প্রকৃত সত্য এই যে, সবগুলো ঘটনাই আয়াত অবতরণের কারণ।

একটি সন্দেহ নিরসন : সাহাবায়ে কিরামের উপরোক্ত আত্মত্যাগের ঘটনাবলী সম্পর্কে হাদীসদৃষ্টে একটি সন্দেহ দেখা দেয়। তা এই যে, রসূলে করীম (সা) মুসলমানগণকে তাদের সম্পূর্ণ ধনসম্পদ সদকা করতে নিষেধ করেছেন। এক হাদীসে আছে জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সা)-র সামনে একটি ডিম্ব পরিমাণ স্বর্ণের টুকরা সদকার জন্য পেশ করলে তিনি তা লোকটির দিকে নিক্ষেপ করে বললেন : তোমাদের কেউ কেউ তার যথাসর্বস্ব সদকা করার জন্য নিয়ে আসে। এরপর অভাবগ্রস্ত হয়ে মানুষের কাছে ডিম্বার হাত পাতে।

এসব রেওয়াজেত থেকেই এই সন্দেহের জওয়াব পাওয়া যায় যে, মানুষের অবস্থা বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে। প্রত্যেক অবস্থার জন্য আলাদা বিধানও হয়ে থাকে। সম্পূর্ণ ধনসম্পদ দান করার নিষেধাজ্ঞা তাদের জন্য, যারা পরবর্তী সময়ে দারিদ্র্য ও উপবাস দেখা দিলে সবার করতে সক্ষম নয় এবং কৃতদানের জন্য আকসোস করে অথবা মানুষের কাছে ডিম্বার হাত প্রসারিত করতে বাধ্য হয়। পক্ষান্তরে যারা অসম সাহসিক ও দৃঢ়চেতা, সবকিছু ব্যয় করার পর দারিদ্র্য ও উপবাসের কারণে পেরেশান হয় না, বরং সাহসিকতার সাথে সবার করতে সক্ষম, তাদের জন্য সমস্ত ধনসম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে দেওয়া জায়েয। উদাহরণত এক জিহাদের সময় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) তাঁর যথা-সর্বস্ব চাঁদা হিসাবে পেশ করে দিয়েছিলেন। উপরোক্ত ঘটনাবলী এরই নমুনা। এহেন দৃঢ়চেতা লোকগণ তাদের সন্তান-সন্ততিকোও সবার ও দৃঢ়তার অভ্যস্ত করে রেখেছিলেন। ফলে এতে তাদেরও কোন অধিকার ক্ষুণ্ণ হত না। স্বয়ং সন্তানদের হাতে ধনসম্পদ থাকলে তারাও ভাই করত।—(কুরতুবী)

মুহাজিরগণের পক্ষ থেকে আনসারগণের ত্যাগের বিনিময় : দুনিয়াতে কোন সচ্ছ-বদ্ধ মহতী উদ্যোগ একতরফা উদারতা ও আত্মত্যাগ দ্বারা কাম্যে থাকতে পারে না, যে পর্যন্ত উভয় পক্ষ থেকে এমনি ধরনের ব্যবহার না হয়। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সা) যেমন মুসলমানদেরকে পরস্পরে উপচৌকন আদান-প্রদান করে পারস্পরিক সম্প্রীতি বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করেছেন, তেমনি যাকে উপচৌকন দেওয়া হয়, তাকেও উপচৌকন দাতার অনুগ্রহের প্রতিদান দেওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন : যদি আর্থিক স্বচ্ছন্দ্য থাকে, তবে আর্থিক প্রতিদান, নতুবা দোয়ার মাধ্যমেই তার অনুগ্রহের বিনিময় দান কর। অর্থা-তানের ন্যায় কারও অনুগ্রহের বোঝা মাথায় নিতে থাকা উত্তম ও সাধু চরিত্রের পরিপন্থী।

মুহাজিরগণের ব্যাপারে আনসারগণ অপূর্ব আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে-ছিলেন। নিজদের গৃহে, দোকানে, কাজ-কারবারে ও শস্যক্ষেত্রে তাঁদেরকে অংশীদার করে নিয়েছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা যখন মুহাজিরগণকে সচ্ছন্দ্যতা দান করলেন তখন তাঁরাও আনসারগণের অনুগ্রহের যথোপযুক্ত প্রতিদান দিতে কার্পণ্য করেন নি।

কুরতুবী হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন, মুহাজিরগণ যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন তাঁরা সম্পূর্ণ রিক্তহস্ত ছিলেন এবং মদীনায় আনসারগণ বিষয়সম্পত্তির মালিক ছিলেন। আনসারগণ তাঁদেরকে সব বস্তুই অর্ধেক অর্ধেক ভাগ করে দেন এবং বাগানের অর্ধেক ফল বাৎসরিক তাঁদেরকে দিতে থাকেন। হযরত আনাস (রা)-এর জননী উম্মে সুলায়ম নিজের কয়েকটি খজুর রুক্ক রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দিয়ে-ছিলেন। তিনি তা উসামা ইবনে যায়দের জননী উম্মে আয়মনকে দান করে দেন।

ইমাম যুহরী বলেন : আমাকে হযরত আনাস (রা) জানিয়েছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন খায়বার যুদ্ধ থেকে বিজয়ীবেশে মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন, তখন প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ মুসলমানগণ লাভ করেন। এ সময় সকল মুহাজিরই আনসারগণের দান হিসাব করে তাঁদেরকে প্রত্যর্পণ করেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) আমার জননীর খজুর রুক্ক উম্মে আয়মনের কাছ থেকে নিয়ে আমার জননীর হাতে প্রত্যর্পণ করেন। উম্মে আয়-মনকে এর পরিবর্তে নিজের বাগান থেকে রুক্ক দিলেন।

وَمَنْ يُّؤَقِّ شِمِّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ - আনসারগণের আত্ম-

ত্যাগ ও আল্লাহ্র গথে সবকিছু বিসর্জন দেওয়ার কথা বর্ণনা করার পর সাধারণ বিধি হিসাবে বলা হয়েছে যে, যারা মনের কার্পণ্য থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে, তারাই আল্লাহ্র কাছে সফলকাম। شِم্ম শব্দটির প্রায় সমার্থবোধক। তবে شِم্ম শব্দের মধ্যে কিঞ্চিৎ আভিশম্য আছে। ফলে এর অর্থ অতিশয় কৃপণতা। যাকাত, ফিতরা, ওশর, কুরবানী ইত্যাদি আল্লাহ্র ওয়াজিব হক আদায়ে অথবা সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণ, অভাবগ্রস্ত পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের ভরণ-পোষণ ইত্যাদি বান্দার ওয়াজিব হক আদায়ে কৃপণতা করা হলে তা নিশ্চিতরূপে হারাম। যে কৃপণতা মুস্তাহাব বিষয় ও দান খয়রাতের কবীলত অর্জনে প্রতিবন্ধক হয়, তা মকরুহ ও নিন্দনীয় এবং যা প্রথাগত কাজে প্রতিবন্ধক হয়, তা শরীয়তের আইনে কৃপণতা নয়।

কর্ণপা ও পরশ্রীকাতরতা খুবই নিন্দনীয় অভ্যাস। কোরআন ও হাদীসে জোরালো ভাষায় এসবের নিন্দা করা হয়েছে এবং যারা এসব বিষয় থেকে মুক্ত, তাদের জন্য সুসংবাদ বর্ণনা করা হয়েছে। উপরে আনসারগণের যে গুণাবলী উল্লিখিত হয়েছে, তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে তাঁরা কর্পণ ও পরশ্রীকাতরতা থেকে মুক্ত ছিলেন।

হিংসা-বিশেষ থেকে পবিত্র হওয়া জালাতী হওয়ার আলামত : ইমাম আহমদ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন :

আমরা একদিন রসুলুল্লাহ (সা)-র সাথে উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি বললেন : একপি তোমাদের সামনে একজন জালাতী ব্যক্তি আগমন করবে। সেমতে কিছুক্ষণ পরই জনৈক আনসারী আগমন করলেন। তাঁর দাড়ি থেকে ওষুর পানি উপকপে পড়ছিল এবং তাঁর বাম হাতে ভুতা জোড়া ছিল। দ্বিতীয় দিনও এমনি ঘটনা ঘটল এবং সেই ব্যক্তি একই অবস্থায় আগমন করলেন। তৃতীয় দিনও তাই হল এবং এই ব্যক্তি উল্লিখিত অবস্থায় প্রবেশ করলেন। এ দিন রসুলুল্লাহ (সা) যখন মজলিস ত্যাগ করলেন, তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) এই ব্যক্তির পেছনে লাগলেন (যাতে তাঁর জালাতী হওয়ার ভেদ জানতে পারেন)। তিনি আনসারীকে বললেন : পারিবারিক কলহের কারণে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে, তিন দিন নিজের গৃহে যাব না। আপনি যদি অসুবিধা মনে না করেন, তবে তিন দিন আমাকে নিজের বাড়ীতে থাকতে দিন। আনসারী সানন্দে এই প্রস্তাব মঞ্জুর করলেন। আবদুল্লাহ ইবনে আমর তিন রাত্রি তাঁর বাড়ীতে অতিবাহিত করলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, আনসারী রাত্রিতে তাহাজ্জুদের জন্য 'গাফ্লাতান' করেন না। তবে নিদ্রার জন্য শয্যা গ্রহণের পূর্বে কিছু আল্লাহর যিকির করেন। এরপর কজনের নামাযের জন্য উঠেন। আবদুল্লাহ ইবনে আমর বলেন : তবে এই সময়ের মধ্যে আমি তাঁর মুখে ভাল কথা ছাড়া কিছু শুনিনি। এভাবে তিন রাত্রি কেটে গেল। আমার অন্তরে যখন তাঁর আমল সম্পর্কে তাচ্ছিল্যের ভাব বন্ধমূল হওয়ার উপক্রম হল, তখন আমি তাঁর কাছে আমার আগমনের আসল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে দিলাম এবং বললাম : আমার গৃহে কোন কলহ-বিবাদ ছিল না। কিন্তু আমি রসুলুল্লাহ (সা)-র মুখে তিন দিন পর্যন্ত শুনলাম যে, তোমাদের কাছে এখন একজন জালাতী ব্যক্তি আগমন করবে। এরপর তিন দিনই আপনি আসলেন। তাই আমার ইচ্ছা হল যে, আপনার সাথে থেকে দেখব কি আমার কারণে আপনি এই ফযীলত অর্জন করলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমি আপনাকে কোন বড় আমল করতে দেখলাম না। অতএব, কি বিষয়ের দরুন আপনি এই স্তরে উন্নীত হয়েছেন? তিনি বললেন : আপনি যা দেখলেন, এছাড়া আমার কাছে অন্য কোন আমল নেই। আমি একথা শুনে প্রস্থানোদ্যত হলে তিনি আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন : হ্যাঁ, একটি বিষয় আছে। তা এই যে, আমি আমার অন্তরে কোন মুসলমানদের প্রতি জিয়াংসা ও কুখরিণা খুঁজে পাই না এবং এমন কারও প্রতি হিংসা-বিশেষ পোষণ করি না, যাকে আল্লাহ তা'আলা কোন কল্যাণ দান করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন : বাস, এ গুণটিই আপনাকে এই উচ্চ মর্যাদার আসীন করেছে।

ইবনে কাসীর এই রেওয়াজেতে উদ্ধৃত করে বলেন : ইমাম নাসারীও 'আমলুল ইয়াওমি ওয়াল্লাইলাহ্' অধ্যায়ে এটি বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদ বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ্ ।

মুহাজির ও আনসারগণের পর উম্মতের সাধারণ মুসলমান : **وَالَّذِينَ جَاءُوا**

مِنْ بَعْدِهِمْ এই আয়াতের অর্থে সাহাবায়ে কিরাম মুহাজির ও আনসারগণের পরে

কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মুসলমান শামিল আছে এবং এই আয়াত তাদের সবাইকে ক্বায়-এর মালে হকদার সাব্যস্ত করেছে। এ কারণেই খলীফা হযরত উমর ফারাক (রা) ইরাক, সিরিয়া, মিসর ইত্যাদি বড় বড় শহর অধিকার করার পর এদের সম্পত্তি যোদ্ধাদের মধ্যে বন্টন করেন নি, বরং এগুলো ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য সাধারণ ওয়াক্ফ হিসাবে রেখে দিয়েছেন, যাতে এসব সম্পত্তির আয়দানী ইসলামী বায়তুলমালে জমা হয় এবং তা দ্বারা কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী মুসলমানগণ উপকৃত হয়। কোন কোন সাহাবী তাঁর কাছে বিজিত সম্পত্তি বন্টন করে দেওয়ার আবেদন করলে তিনি এই আয়াতের বরাত দিয়ে জওয়াব দেন যে, আমার সামনে ভবিষ্যৎ বংশধরদের প্রর না থাকলে আমি যে দেশই অধিকার করতাম, তার সম্পত্তি যোদ্ধাদের মধ্যে বন্টন করে দিতাম; যেমন রসুল্লাহ্ (সা) খায়বরের সম্পত্তি বন্টন করে দিয়েছিলেন। এসব সম্পত্তি বর্তমান মুসলমানদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে গেলে ভবিষ্যৎ মুসলমানদের জন্য কি অবশিষ্ট থাকবে? —(মালিক, কুরতুবী)

সাহাবায়ে কিরামের ভালবাসা ও মাহাত্ম্য অন্তরে পোষণ করা মুসলমানদের সত্যপন্থী হওয়ার পরিচায়ক : এ স্থলে আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র উম্মতে মুহাম্মদীকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন—মুহাজির, আনসার ও অবশিষ্ট সাধারণ মুসলমান। মুহাজির ও আনসারগণের বিশেষ গুণাবলী ও প্রেষ্ঠত্বও এ স্থলে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু সাধারণ মুসলমানগণের প্রেষ্ঠত্ব ও গুণাবলীর মধ্য থেকে মাত্র একটি বিষয় এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা সাহাবায়ে কিরামের ঈমানে অগ্রগামিতা এবং তাদের কাছে ঈমান পৌঁছানোর মাধ্যম হওয়ার গুণটিকে সম্যক বুঝে এবং সবার জন্য আগফিরাতের দোয়া করে। এছাড়া নিজেদের জন্যও এরূপ দোয়া করে : আল্লাহ্ আমাদের অন্তরে কোন মুসলমানের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ রেখে না।

এ থেকে জানা গেল যে, সাহাবায়ে কিরামের পরবর্তী মুসলমানদের ঈমান ও ইসলাম কবুল হওয়ার শর্ত হচ্ছে সাহাবায়ে কিরামের মাহাত্ম্য ও ভালবাসা অন্তরে পোষণ করা এবং তাঁদের জন্য দোয়া করা। যার মধ্যে এই শর্ত অনুপস্থিত, সে মুসলমান কথিত হওয়ার যোগ্য নয়। এ কারণেই হযরত মুসাব ইবনে সা'দ (রা) বলেন : উম্মতের সকল মুসলমান তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। তাদের মধ্যে দুই শ্রেণী অতিক্রান্ত হয়ে গেছে অর্থাৎ মুহাজির ও আনসার। এখন সাহাবায়ে কিরামের প্রতি মহত্ত্ব পোষণকারী এক শ্রেণী বাকী

রয়ে গেছে। তোমরা যদি উম্মতের মধ্যে কোন আসন কামনা কর, তবে এই তৃতীয় প্রণীতে দাখিল হয়ে যাও।

হযরত হসাইন (রা)-কে জনৈক ব্যক্তি হযরত ওসমান (রা) সম্পর্কে (তঁার সাহাবাদের ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর) প্রশ্ন করেছিল। তিনি পাগ্গা প্রশ্নকারীকে জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কি মুহাজিরগণের অন্তর্ভুক্ত? সে নেতিবাচক উত্তর দিল। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন : তবে কি আনসারগণের একজন? সে বলল : না। হযরত হসাইন

(রা) বললেন : এখন তৃতীয় আয়াত **الَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ** বাকী রয়ে গেছে। তুমি যদি হযরত ওসমান গনী (রা) সম্পর্কে জনমনে সন্দেহ ও সংশয় স্থিতি করতে চাও, তবে এই তৃতীয় প্রণী থেকেও খারিজ হয়ে যাবে।

কুরতুবী বলেন : এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কিরামের প্রতি ভালবাসা রাখা আমাদের জন্য ওয়াজিব। ইমাম মালেক (র) বলেন : যে ব্যক্তি কোন সাহাবীকে মন্দ বলে অথবা তঁার সম্পর্কে মন্দ বিশ্বাস রাখে, মুসলমানদের ক্ষায়-এর যালে তঁার কোন অংশ নেই। এর প্রমাণস্বরূপ তিনি আলোচ্য আয়াত পেশ করেন। যেহেতু কায়-এর মানে প্রত্যেক মুসলমানের অংশ আছে, তাই যার অংশ বাদ পড়বে তার ইসলাম ও ইমানই সন্দেহযুক্ত হয়ে যাবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : আব্বাহ তা'আলা সকল মুসলমানকে সাহাবায়ে কিরামের জন্য ইস্তিগফার ও দোয়া করার আদেশ দিয়েছেন। অথচ আব্বাহ জানতেন যে, তাঁদের পরস্পরে মুহূ-বিগ্রহও হবে। তাই তাঁদের পারস্পরিক বাদানুবাদের কারণে তাঁদের মধ্য থেকে কারও প্রতি কুখারনা গোষণ করা কোন মুসলমানের জন্য জায়েয নয়।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন : আমি তোমাদের নবী (সা)-র মুখে শুনেছি—এই উম্মত ততদিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে না, যতদিন তাদের পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদেরকে অভিশাপ ও ভৎসনা না করে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন : তুমি যদি কাউকে দেখ যে, কেউ কোন সাহাবীকে মন্দ বলছে, তবে তাকে বল : যে তোমাদের মধ্য থেকে অধিক মন্দ তার উপর আব্বাহর লানত হোক। বলা বাহুল্য, অধিক মন্দ সাহাবী হতে পারেন না—যে তাঁকে মন্দ বলে সে-ই হবে। সালকথা এই যে, সাহাবীদের মধ্য থেকে কাউকে মন্দ বলা লানতের কারণ।

আওফাম ইবনে হাওশব বলেন : এই উম্মতের পূর্ববর্তিগণ মানুষকে সাহাবায়ে কিরামের প্রেতস্থ ও গুণাবলী বর্ণনা করতে উদ্বুদ্ধ করতেন, যাতে মানুষের অন্তরে তাঁদের ভালবাসা স্থিতি হয়। আমি এ ব্যাপারে তাঁদেরকে একনিষ্ঠভাবে ও দৃঢ়তার সাথে কাজ করতে দেখেছি। তাঁরা আরও বলতেন : সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যে যতবিরোধ ও বাদানুবাদ সংঘটিত হয়েছে সেগুলো বর্ণনা করো না, করলে মানুষের শৃঙ্খলা বেড়ে যাবে।

—(কুরতুবী)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
 أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا
 أَبَدًا ۖ وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝
 لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ ۖ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُوهُمْ ۖ وَلَئِنْ
 نَصَرُوهُمْ لَيُولِيَنَّ الْأُذْيَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ۝ لَا أَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً
 فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَٰلِكُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ۝ لَا
 يَقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَىٰ مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ
 بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ۚ ذَٰلِكُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ
 لَا يَعْقِلُونَ ۝ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاتُوا وَيَالِ أَعْرُسِهِمْ
 وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا
 كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ۝ فَكَانَ عَا
 قِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ وَذَٰلِكَ جَزَاُ الظَّالِمِينَ ۝

(১১) আগমি কি মুনাফিকদেরকে দেখেন নি? তারা তাদের কিতাবধারী কাফির
 ভাইদেরকে বলে: তোমরা যদি বহিষ্কৃত হও, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে দেশ
 থেকে বের হয়ে যাব এবং তোমাদের ব্যাপারে আমরা কখনও কারও কথা মানব না।
 আর যদি তোমরা আক্রান্ত হও, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করব। আজ্ঞা
 সাক্ষ্য দেন যে, তারা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী। (১২) যদি তারা বহিষ্কৃত হয়, তবে মুনাফিকরা
 তাদের সাথে দেশত্যাগ করবে না আর যদি তারা আক্রান্ত হয়, তবে তারা তাদেরকে সাহায্য
 করবে না। যদি তাদেরকে সাহায্য করে, তবে অবশ্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করবে।
 এরপর কাফিররা কোন সাহায্য পাবে না। (১৩) নিশ্চয় তোমরা তাদের অন্তরে আজ্ঞা
 অপেক্ষা অধিকতর ভয়বহ। এটা এ কারণে যে, তারা এক নির্বোধ সম্প্রদায়। (১৪)
 তারা সংঘবদ্ধভাবেও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে না। তারা যুদ্ধ করবে কেবল
 সুরক্ষিত জনপদে অথবা দুর্গ প্রাচীরের আড়ালে থেকে। তাদের পারস্পরিক যুদ্ধই প্রচণ্ড

হয়ে থাকে। আপনি তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ মনে করবেন; কিন্তু তাদের অন্তর শতধা বিভিন্ন। এটা এ কারণে যে, তারা এক কাণ্ডভানহীন সম্প্রদায়। (১৫) তারা সেই লোকদের মত, যারা তাদের নিকট পূর্বে নিজদের কর্মের শাস্তি ভোগ করেছে। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (১৬) তারা শত্রুতানের মত, যে মানুষকে কাকির হতে পারে। অন্তঃপর যখন সে কাকির হয়, তখন শত্রুতান বলে : তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি বিত্রপালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করি। (১৭) অন্তঃপর উভয়ের পরিণতি হবে এই যে, তারা আল্লাহ্মের কাছে এবং চিরকাল তথায় বসবাস করবে। এটাই আশিষদের শাস্তি।

তুফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি কি মুনাফিকদেরকে (অর্থাৎ আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই প্রমুখকে) দেখেন নি? ওরা তাদের (সহধর্মী) কিতাবধারী কাকির ভাইদেরকে বলে : (অর্থাৎ বলত। কেননা, এই সূরা বনু নুযায়েরের নির্বাসন ঘটনার পরে অবতীর্ণ হয়েছে)। আল্লাহর কসম, (আমরা সর্বাবস্থায় তোমাদের সাথে আছি)। যদি তোমরা (তোমাদের মাতৃভূমি থেকে জোর অবরে বহিষ্কৃত হও, তবে আমরাও) তোমাদের সাথে দেশত্যাগী হয়ে যাব এবং তোমাদের ব্যাপারে আমরা কখনও কারও কথা মানব না। অর্থাৎ তোমাদের সাথে আসার ব্যাপারে আমাদেরকে নিষেধ করে যে যতই বোঝাক না কেন, আমরা মানব না। আর যদি তোমরা আক্রান্ত হও, তবে আমরা তোমাদেরকে সাহায্য করব। আল্লাহ্ সাক্ষ্য দেন যে, তারা মিথ্যাবাদী। (এটা তাদের মিথ্যাবাদিতার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। অন্তঃপর বিস্তারিত বর্ণনা করা হচ্ছে :) আল্লাহর কসম, যদি কিতাবধারী কাকিররা বহিষ্কৃত হয় তবে মুনাফিকরা তাদের সাথে দেশত্যাগ করবে না। আর যদি তারা আক্রান্ত হয়, তবে ওরা তাদেরকে সাহায্যও করবে না। যদি (অসন্তুষ্টি ধরে নেওয়ার পর্যায়ে) তাদেরকে সাহায্যও করে (এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে) তবে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করবে। এরপর (তাদের পলায়নের পর) কিতাবধারী কাকিররা কোন সাহায্য পাবে না। (অর্থাৎ সাহায্যকারী যারা ছিল, তারা তো পলায়ন করেছে। অন্য কোন সাহায্যকারীও হবে না। সুতরাং অবশ্যই পরাজিত ও পরাস্ত হবে। মোটকথা, মুনাফিকদের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের সহধর্মী ভাইদের উপর কোন বিপদ আসতে না দেওয়া। এই উদ্দেশ্য অর্জনে তারা সর্বতোভাবে ব্যর্থ মনোরথ হবে। বাস্তবে তাই হয়েছিল। পরিশেষে যখন বনু নুযায়ের বহিষ্কৃত হয়, তখন মুনাফিকরা তাদের সাথে দেশত্যাগী হয়নি এবং প্রথম যখন তাদেরকে অবরোধ করা হয়, যাতে যুদ্ধের আশংকা ছিল, তখনও তারা কোন সাহায্য করেনি। ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পরে 'যদি বহিষ্কৃত হয়' ভবিষ্যৎ পদবাচ্য ব্যবহার করার এক কারণ অতীত ঘটনাকে উপস্থিত বিদ্যমান ধরে নেওয়া, যাতে অসীকার ভুল করা ও তাদের অসহায় থেকে যাওয়া দৃষ্টির সামনে ভাসমান হয়ে যায়। বিত্তীয় কারণ ভবিষ্যৎ সাহায্যের সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেওয়া। অন্তঃপর তাদের সাহায্য না করার কারণ বর্ণনা করা হচ্ছে :) নিশ্চয় তোমরা তাদের (অর্থাৎ মুনাফিকদের) অন্তরে, আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিকতর ভয়াল। (অর্থাৎ ইমান দাবী করে তারা আল্লাহর ভয় করে বলে প্রকাশ করে, এটা মিথ্যা। নতুবা তারা কুকরী

হেঁফে দিত। আর তোমাদেরকে ওরা বাস্তবিকই ভয় করে। এই ভয়ের কারণে তারা বনু নুযায়েরের সাথে সহযোগিতা করতে পারে না)। এটা (অর্থাৎ তোমাদেরকে ভয় করা এবং আল্লাহকে ভয় না করা) এ কারণে যে, তারা (কুরব্বের কারণে আল্লাহর মাহাত্ম্য হাদয়নম করায় ব্যাপারে) এক নির্বোধ সম্প্রদায়। (ইহুদী ও মুনাফিকরা আলাদা আলাদা-ভাবে তো তোমাদের মুকাবিলা করতেই পারে না) তারা সম্ভবত্বভাবেও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সক্ষম নয়। তারা যুদ্ধ করবে কেবল সুরক্ষিত জনপদে অথবা দুর্গ-প্রাচীরের আড়ালে থেকে। (পরিধা তারা সুরক্ষিত হোক কিংবা দুর্গ ইত্যাদি তারা। এতে অকরী হয় না যে, কখনও এরূপ ঘটনা ঘটেছে এবং মুনাফিকরা কোন সুরক্ষিত স্থান ও দুর্গ থেকে মুসলমানদের মুকাবিলা করেছে। কারণ, উদ্দেশ্য এই যে, যদি কোন সময় ইহুদী কিংবা মুনাফিকরা আলাদা আলাদা অথবা সম্ভবত্বভাবে তোমাদের মুকাবিলা করতে আসেও, তবুও তাদের মুকাবিলা সুরক্ষিত দুর্গে অথবা শহর-প্রাচীরের আড়ালে থেকে হবে। সেমতে বনী কুরায়যা ও খায়বরের ইহুদীরা এমনভাবে মুসলমানদের মুকাবিলা করেছে। কিন্তু মুনাফিকরা তাদের সাথে সহযোগিতা করেনি এবং প্রকাশ্যে মুসলমানদের মুকাবিলার আসতে কখনও সাহস করেনি। এতে মুসলমানদের মনোবলও বৃদ্ধি করা হয়েছে যে, তারা যেন ওদের পক্ষ থেকে কোন বিপদের আশংকা না করে। মুনাফিকদের কোন কোন গোত্র যেমন আউস ও খায়রাজের পারস্পরিক যুদ্ধ দেখে আশংকা করা উচিত নয় যে, তারা মুসলমানদের মুকাবিলার এমনভাবে আসতে পারবে। আসল ব্যাপার এই যে) তাদের যুদ্ধ পরস্পরের মধ্যেই প্রচণ্ড হয়ে থাকে। (মুসলমানদের মুকাবিলার তারা কিছুই নয়। তারা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুসলমানদের মুকাবিলা করতে পারবে—এরূপ আশংকা করাও ঠিক নয়। কেননা) তুমি তাদেরকে (বাহ্যত) ঐক্যবদ্ধ মনে করবে, অথচ তাদের অন্তর বিচ্ছিন্ন। (অর্থাৎ তারা মুসলমানদের শত্রুতায় অভিন্ন ঠিকই, কিন্তু তাদের মধ্যেও তো বিশ্বাসগত বিরোধের কারণে বিচ্ছিন্নতা ও শত্রুতা রয়েছে। সূরা মায়েদার বলা হয়েছে :

وَالَّذِينَ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْكَرْهُ—অতঃপর এই অনৈক্যের কারণ বর্ণনা করা হচ্ছে :

এটা (অর্থাৎ অন্তরের অনৈক্য) এ কারণে যে, তারা (ধর্মের ব্যাপারে) এক কাণ্ডজননহীন সম্প্রদায়। (তাই প্রত্যেকেই নিজ নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। আদর্শ ও লক্ষ্য বিভিন্ন হলে আন্তরিক বিচ্ছিন্নতা অবশ্য্যাব্যী হয়ে পড়ে। এখানে তাদের অনৈক্যের কারণ বর্ণনা করা উদ্দেশ্য, সামগ্রিক নীতি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়। ফলে বে-দীনদের মধ্যেও কোন কোন সময় ঐক্য হতে পারে। অতঃপর বনু নুযায়ের ও মুনাফিকদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হচ্ছে, যারা সাহায্যের ওয়াদা করে ধোঁকা দিয়েছে এবং যথাসময়ে সাহায্য করেনি। তাদের সমষ্টিগত দু'টি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে—একটি বনু নুযায়েরের ও অপরটি মুনাফিকদের। বনু নুযায়েরের দৃষ্টান্ত এই যে) তারা সেই লোকদের মত, যারা (দুনিয়াতে ও) তাদের নিকট পূর্বে নিজেদের কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করেছে এবং (পরকালেও) তাদের জন্য রয়েছে স্বত্ত্বাদায়ক শাস্তি। [এখানে বনু কারনুকার ইহুদী সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে। তাদের ঘটনা এই : বদর যুদ্ধের পর তারা দ্বিতীয় হিজরীতে চুক্তিভঙ্গ করে রসুলুল্লাহ (সা)-র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পরাজিত ও পশুদত্ত হয়। রসুলুল্লাহ (সা)-র আদেশে তারা দুর্গ

থেকে বের হয়ে এলে তাদেরকে আন্টেপুর্টে বেঁধে ফেলা হয়। এরপর আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের কাকুতি-মিনতির কারণে মদীনা ত্যাগ করে চলে যাওয়ার শর্তে তাদের প্রাণ রক্ষা করা হয়। সেমতে তারা সিরিয়ার আমরুয়াতে চলে যায় এবং তাদের ধনসম্পত্তি মুছ-লম্ব সম্পদ হিসাবে বন্টন করা হয়।—(যাদুল-মা'আদ) মুনাফিকদের দৃষ্টান্ত এই যে] তারা শয়তানের মত যে, (প্রথমে) মানুষকে কাকির হতে বলে অতঃপর যখন সে কাকির হয়ে যায়, (এবং দুনিয়াতে কিংবা পরকালে কুকরের শাস্তিতে পতিত হয়) তখন (পরিকার জওয়ার দিয়ে দেয় এবং) বলে : তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি তো বিশ্বপালনকর্তা আল্লাহকে ডর করি। (দুনিয়াতে এরূপ সম্পর্কহেদের কাহিনী সূরা আন-ফালে এবং পরকালে সম্পর্কহেদের কথা একাধিক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে)। অতঃপর উত্তরের (অর্থাৎ বনু নুযায়ের ও মুনাফিকদের) শেষ পরিণতি হবে এই যে, তারা জাহান্নামে যাবে, সেখানে চিরকাল বসবাস করবে। এটাই জালিমদের শাস্তি। (সূতরাং শয়তান যেমন প্রথমে মানুষকে বিভ্রান্ত করে, এরপর বিপদমুহূর্তে চম্পট দেয়, ফলে উত্তরেই বিপদগ্রস্ত হয়, তেমনি মুনাফিকরা প্রথমে বনু নুযায়েরকে কুপরামর্শ দিয়েছে যে, তোমরা দেশত্যাগ করো না। এরপর যখন বনু নুযায়ের বিপদের সম্মুখীন হল, তখন মুনাফিকদের পাতা পাওয়া গেল না। ফলে বনু নুযায়ের নির্বাসনের বিপদে এবং মুনাফিকরা অকৃতকার্যতার অগমানে পতিত হল)।

আনুমানিক আড্ডা বিষয়

أَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا إِلَىٰ

مَنْ قَبْلِهِمْ কারা? এ সম্পর্কে হযরত মুজাহিদ (র) বলেন : এরা হচ্ছে বদরের কাকির

মোকা এবং হযরত ইবনে আক্বাস (রা) বলেন : এরা ইহদী বনু কায়নুকা। উত্তরেরই অন্তত পরিণতি তথা নিহত, পরাজিত ও লাজ্জিত হওয়ার ঘটনা তখন জনসমক্ষে ফুটে উঠেছিল। কেননা, বনু নুযায়েরের নির্বাসনের ঘটনা বদর ও ওহদ যুদ্ধের পরে সংঘটিত হয় এবং বনু কায়নুকায় ঘটনাও বদরের পরে সংঘটিত হয়ে গিয়েছিল। বদরে মুশরিকদের সত্তরজন নেতা নিহত হয় এবং অবশিষ্টরা চরম লাজ্জিত অবস্থার প্রত্যাবর্তন করে।

অতএব, হযরত ইবনে আক্বাস (রা)-র উক্তি অনুযায়ী فَذَٰلِكَ قَوْلُ وَبَالَ أَمْرِهِمْ

বাক্যের উদ্দেশ্য সম্প্রদায় যে, তারা তাদের কৃতকর্মের শাস্তি আত্মদান করেছে। এটা পর-কালের আগে দুনিয়াতেই তারা ভোগ করেছে। পক্ষান্তরে হযরত মুজাহিদ (র)-এর উক্তি অনুযায়ী আয়াতের অর্থ ইহদী বনু কায়নুকা হলে তাদের ঘটনাও তেমনি শিক্ষাগ্রদ।

বনু কায়নুকায় নির্বাসন : রসূলে করীম (সা) মদীনায় আগমন করার পর মদীনায় পার্শ্ববর্তী সবগুলো ইহদী গোত্রের সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন। এর এক শর্ত ছিল এই

যে, তারা রসুলুল্লাহ্ (সা) ও মুসলমানদের কোন শত্রুকে সাহায্য করবে না। বনু কায়নুকাও এই শান্তিচুক্তির অধীনে ছিল। কিন্তু কয়েক মাস পরেই তারা চুক্তির বিপরীত কাজকর্ম শুরু করে দেয়। বদর যুদ্ধের সময় মক্কার কাফিরদের সাথে তাদের গোপন যোগসাজশ ও সাহায্যের কিছু ঘটনাও সামনে আসে। তখন কোরআন পাকের এই আয়াত অবতীর্ণ হয় :

وَمَا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ অর্থাৎ চুক্তি

সম্পাদনের পর যদি কোন সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার আশংকা দেখা দেয়, তবে আপনি তাদের শান্তিচুক্তি ভঙা করে দিতে পারেন। বনু কায়নুকা নিজেরাই বিশ্বাস-ঘাতকতা করে এই চুক্তি ভঙ্গ করে দিয়েছিল। তাই রসুলুল্লাহ্ (সা) তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করলেন এবং হযরত হামযা (রা)-র হাতে শতাকা দিলেন। মদীনা শহরে হযরত আবু লুবা (রা)-কে হুলাতিভিত্তি করে তিনি নিজেও জিহাদে রওয়ানা হলেন। মুসলমান সৈন্যবাহিনী দেখে বনু কায়নুকা দুর্গাভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করল। রসুলুল্লাহ্ (সা) দুর্গ অবরোধ করে নিলেন। পনের দিন অবরুদ্ধ থাকার পর আত্মাহ তা'আলা তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দিলেন—তাদের বুঝতে বাকী রইল না যে, মুকাবিলা ফলপ্রসূ হবে না। অগত্যা তারা দুর্গের ফটক খুলে দিয়ে বলল : আমাদের সম্পর্কে রসুলুল্লাহ্ (সা) যে সিদ্ধান্ত নেবেন, আমরা তাতেই সন্মত আছি।

রসুলুল্লাহ্ (সা) তাদের পুরুষকুলকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিতে চাইলেন; কিন্তু আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই মুনাক্কি বাদ সাধল। সে চূড়ান্ত কাকুতি-মিনতি সহকারে তাদের প্রাণভিকার আবেদন জানাল। অবশেষে রসুলুল্লাহ্ (সা) ঘোষণা করলেন : তারা বসতি ত্যাগ করে চলে যাবে এবং তাদের ধনসম্পত্তি যুদ্ধলব্ধ সম্পদরূপে পরিসংগিত হবে। এই সীমাংসা অনুযায়ী বনু কায়নুকা মদীনা ত্যাগ করে সিরিয়ার আমরুয়াত এলাকায় চলে গেল। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অধ্যাদেশ অনুযায়ী রসুলুল্লাহ্ (সা) তাদের ধনসম্পত্তি কটন করে এক ভাগ বায়তুলমালে এবং অবশিষ্ট চার ভাগ যোদ্ধাদের মধ্যে বিলি করে দিলেন।

বদর যুদ্ধের পর এই প্রথম বায়তুলমালে গনীমতের পাঁচ ভাগের এক ভাগ জমা হল। এই ঘটনা হিজরতের বিশ মাস পর ১৫-ই শাওয়াল তারিখে সংঘটিত হয়।

كَمَثَلَ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلنَّاسِ اكْفُرُوا—এটা মুনাক্কিদের দৃষ্টান্ত,

যারা বনু নুযাইরকে নির্বাসনের আদেশ অমান্য করতে এবং রসুলুল্লাহ্ (সা)-র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং তাদেরকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু মুসলমানগণ যখন তাদেরকে অবরোধ করে নেয়, তখন কোন মুনাক্কি সাহায্যার্থে অগ্রসর হয়নি। কোরআন পাক শরভানের একটি ঘটনা দ্বারা তাদের দৃষ্টান্ত দিয়েছে। শয়তান মানুষকে কুফর করতে প্ররোচিত করেছিল এবং তার সাথে মনো রকম ওয়াদা-অঙ্গীকার করেছিল। কিন্তু মানুষ যখন কুফরে লিপ্ত হল, তখন সে ওয়াদা ভঙ্গ করল।

আত্মাহ জানেন শরভানের এ ধরনের ঘটনা কত হয়ে থাকবে। তদ্বোধে একটি ঘটনা তো স্বয়ং কোরআনে সূরা আনফালের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে বলিত হয়েছে :

وَإِذْ زَيْنَ لِهْمُ الشُّوْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ
وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتْ الثِّغَتَانِ نَكَصَ عَلَى مَقْبِهِ وَقَالَ أَنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ

এটা বদর যুদ্ধের ঘটনা। এতে শয়তান অস্ত্রের কুমন্ত্রণার মাধ্যমে অথবা মানবাকৃতিতে সামনে এসে সুন্দরিকদেরকে মুসলমানদের মুকাবিলায় উৎসাহিত করে এবং সাহায্যের অনুরোধ দেয়। কিন্তু যখন বাস্তবিকই মুকাবিলা শুরু হয়, তখন সাহায্য করতে পরিচায় অব্যবহিত জানায়। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে উল্লিখিত হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে যদি এই ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়ে থাকে, তখন আপত্তি দেখা দেয় যে, এই ঘটনায় শয়তান বাহ্যিক কুফর করার আদেশ দেয়নি। তারা তো পূর্ব থেকেই কাফির ছিল। শয়তান কেবল তাদেরকে মুকাবিলায় একত্রিত হতে বোলেছিল। এই আপত্তির জওয়াব এই যে, কুফরে অটল থাকতে বলা এবং রসুলুল্লাহ (স)-র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলাও কুফর করতে বলায়ই অনুরূপ।

তরুসীরে মামহারী, কুরতুবী, ইবনে কাসীর ইত্যাদি গ্রন্থে শয়তানের এই দৃষ্টান্তের ঘটনাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে বনী ইসরাইলের কয়েকজন সম্মাসী ও যোগীকে শয়তান কর্তৃক বিপথস্বায়ী করে কুররী পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার কাহিনী বিধৃত হয়েছে। উদাহরণত বনী ইসরাইলের অনেক সম্মাসী যোগী সদাসর্বদা উপাসনালয়ে যোগসাধনার রত থাকত এবং দশ দিন অন্তর মাত্র একবার ইকতার করে রোযা রাখত। সত্তর বছর এমনভাবে অতি-বাহিত হওয়ার পর অতিশয় শয়তান তার পেছনে লাগে। সে তার সর্বাধিক ধৃত ও চালাক অনুচরকে তার কাছে সম্মাসী যোগী বেশে প্রেরণ করে। সে তার কাছে পৌঁছে তার চাইতেও বেশী যোগসাধনার পরাকর্ষ্য প্রদর্শন করে। এভাবে সম্মাসী তার প্রতি আত্মশীল হয়ে উঠে।

অবশেষে কৃত্রিম সম্মাসী আসল সম্মাসীকে এমন দোয়া শিখিয়ে দিল, যন্ত্রা জটিল রোগীও আরোগ্য লাভ করত। এরপর সে অনেক লোককে নিজের প্রভাব দ্বারা রোগগ্রস্ত করে আসল সম্মাসীর কাছে পাঠিয়ে দিল। যখন সম্মাসী রোগীদের উপর দোয়া পাঠ করত, তখন শয়তান তার প্রভাব সরিয়ে নিত। ফলে রোগীরা আরোগ্য লাভ করত। সুদীর্ঘ-কাল পর্যন্ত এই কারবার অব্যাহত রাখার পর সে অনেক ইসরাইলী সন্ন্যাসীর পরমা সুন্দরী কন্যার উপর নিজের প্রভাব বিস্তার করল এবং তাকে রোগগ্রস্ত করে সম্মাসীর কাছে যাওয়ার পরামর্শ দিল। শেষ পর্যন্ত সে বালিকাটিকে সম্মাসীর মন্দিরে পৌঁছে দিতে সক্ষম হল এবং কালক্রমে তাকে বালিকার সাথে ব্যক্তিচারে নিপ্ত করতেও কামিয়ার হয়ে গেল। এর ফলে বালিকা অসুস্থ হয়ে গেল। অপমানের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য শয়তান বালিকাকে হত্যা করার পরামর্শ দিল। হত্যার পর শয়তান নিজেই ব্যক্তিচার ও হত্যার কাহিনী ফাঁস করে জনগণকে সম্মাসীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলল। অতঃপর জনগণ মন্দির বিধ্বস্ত করে সম্মাসীকে শূণ্য চড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল। তখন শয়তান সম্মাসীর কাছে যেয়ে বলল : এখন তোমার প্রাণরক্ষার কোন উপায় নেই। তবে তুমি যদি আমাকে সিজদা

কর, তবে আমি তোমাকে বাঁচাতে পারব। সম্যাসী পূর্বেই অনেক পাপ কর্ম করেছিল। ফলে কুফরের পথ অবলম্বন করা তার জন্য মোটেই কঠিন ছিল না। সে শয়তানকে সিদ্ধান্ত করল। তখন শয়তান পরিকার বলে দিল : আমি তোমাকে কুফরীতে লিপ্ত করার জন্যই এসব অগকৌশল অবলম্বন করেছিলাম। এখন আমি তোমাকে কোন সাহায্য করতে পারি না।

তফসীরে কুরতুবী ও যামহারীতে এই ঘটনা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا
اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝ لَا يَسْتَوِي
أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۚ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ۝ لَوْ
أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْنَاَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ
خَشْيَةِ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَفَكَّرُونَ ۝ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ عَلِيمُ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ
الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهِيمُنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ
سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَلْ
سَمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

(১৮) হে মু'মিনগণ। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, আপামী-
কালের জন্য সে কি প্রেরণ করে, তা চিন্তা করা। আল্লাহকে ভয় করতে থাক। তোমরা
যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে খবর রাখেন। (১৯) তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা
আল্লাহকে ভুলে গেছে। ফলে আল্লাহ তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন। তারাই জবাব্দা।
(২০) আহাযামের অধিবাসী এবং জাহাভের অধিবাসী সমান হতে পারে না। যারা
জাহাভের অধিবাসী, তারাই সফলকাম। (২১) যদি আমি এই কোরআন পাহাড়ের উপর

অবতীর্ণ করতাম, তবে ভূমি দেখতে যে, পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহর ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে। আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্য বর্ণনা করি, যাতে তারা চিন্তাভাবনা করে। (২২) তিনিই আল্লাহ্ তিনি যাচীত কোন উপাস্য নেই; তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যকে জানেন। তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা (২৩) তিনিই আল্লাহ্, তিনি যাচীত কোন উপাস্য নেই। তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপাশ্রিত, মহা-জ্ঞানী। তারা যাকে অংশীদার করে, আল্লাহ্ তা থেকে পবিত্র। (২৪) তিনিই আল্লাহ্, দ্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, উত্তম নামসমূহ তাঁরই। নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত, প্রজামর।

তাকসীরের সার-সংক্ষেপ

মু'মিনগণ। (অবাধ্যদের পরিণাম তোমরা শুনে, অতএব) তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত আগামীকালের (অর্থাৎ কিয়ামতের) জন্য সে কি প্রেরণ করে, তা চিন্তা করা। (অর্থাৎ সৎ কর্ম অর্জনে দ্রুতী হওয়া বা পরকালের সম্পদ। সৎ কর্ম অর্জনে যেমন আল্লাহ্কে ভয় করতে বলা হয়েছে, তেমনি মন্দ কাজ ও গোনাহ্ থেকে আত্ম-রক্ষার ব্যাপারে তোমাদেরকে আদেশ করা হচ্ছে যে) আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক। তোমরা যা কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ সে সম্পর্কে খবর রাখেন। (সুতরাং গোনাহ্ করলে শাস্তির আশংকা আছে। প্রথমে **قَدْ مَتَّ لَعْدٍ** সৎ কর্ম সম্পর্কে এবং এর ইঙ্গিত হচ্ছে **اَللّٰهُ تَقْوَا** এবং

এবং দ্বিতীয় **اَللّٰهُ تَقْوَا** পাপ কর্ম সম্পর্কে এবং এর ইঙ্গিত হচ্ছে **خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ**)

তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা আল্লাহ্কে ভুলে গেছে। (অর্থাৎ তাঁর বিধি বিধান পালন কর না—আদেশের বিপরীত করে এবং নিষেধ মান্য করে না। ফলে আল্লাহ্ তাদেরকে আত্মভোলা করে দিয়েছেন অর্থাৎ তারা বুদ্ধি-বিবেকের এমন শব্দ হয়ে গেছে যে, নিজেদের সত্যিকার স্বার্থ বুঝেওনা এবং তা অর্জনও করে না)। তারাই অবাধ্য। (এবং অবাধ্যদের শাস্তি ভোগ করবে। উপরোক্তিখিত আল্লাহ্ভীতি অবলম্বনকারী ও বিধানাবলী অমান্যকারী দুই দলের মধ্য থেকে একদল জাহান্নামের অধিবাসী এবং এক দল জাহান্নামের অধিবাসী) জাহান্নামের অধিবাসী ও জাহান্নামের অধিবাসী সমান নয়, (বরং) যারা জাহান্নামের অধিবাসী তারা ই সফলকাম। (পক্ষান্তরে জাহান্নামীরা অকৃতকার্য, যেমন **اُولٰٓئِكَ**

هُمْ اُلْفَا سَقُوْنَ তারা জানা যায়। অতএব তোমাদের জাহান্নামের অধিবাসী হওয়া

উচিত—জাহান্নামের অধিবাসী হওয়া উচিত নয়। যে কোরআনের মাধ্যমে তোমাদেরকে এসব উপদেশ শোনানো হয়, তা এমন যে) যদি আমি এই কোরআন পাহাড়ের

উপর অবতীর্ণ করতাম (এবং তাতে বোধশক্তি রাখতাম এবং খেয়াল-খুশি অনুসরণের শক্তি না রাখতাম) তবে তুমি দেখতে যে, পাহাড় যিনীত হয়ে আল্লাহর ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে। (অর্থাৎ কোরআন এমন প্রভাবশালী ও ক্রিয়াশীল, কিন্তু মানুষের মধ্যে কুপ্ররতি প্রবল হওয়ার কারণে মানুষের সে যোগ্যতা বিনষ্ট হয়ে গেছে। ফলে সে প্রভাবান্বিত হয় না। অতএব সং কর্ম অর্জন ও পাপ কর্ম বর্জনের মাধ্যমে প্ররতিকে দমন করা উচিত, যাতে মানুষ কোরআনী উপদেশাবলী দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় এবং বিধানাবলী পালনে দৃঢ়তা অর্জিত হয়)। আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের (উপকারের) জন্য বর্ণনা করি, যাতে তারা চিন্তাভাবনা করে (এবং উপকৃত হয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার ওপাবলী বর্ণনা করা হচ্ছে, যাতে তাঁর মাহাত্ম্য অন্তরে বদ্ধমূল হওয়ার কারণে বিধানাবলী পালন করা সহজ হয়। ইরশাদ হয়েছে :) তিনিই আল্লাহ তিনি ব্যতীত কোন (যোগ্য) উপাস্য নেই; তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যকে জানেন, তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা। (তওহীদ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিধায় তাকীদার্থে পুনঃ বলা হচ্ছে :) তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন (যোগ্য) উপাস্য নেই; তিনি বাদশাহ, (সকল দোষ থেকে) পবিত্র, মুক্ত, (অর্থাৎ অতীতেও তাঁর মধ্যে কোন দোষ ছিল না এবং ভবিষ্যতেও এর সম্ভাবনা নেই। বান্দাদেরকে ভয়ের বিষয় থেকে) নিরাপত্তাদাতা, (বান্দাদেরকে ভয়ের বিষয় থেকে) আশ্রয়দাতা (অর্থাৎ বিপদও আসতে দেন না এবং আগত বিপদও দূর করেন) পরাক্রান্ত, প্রভাপান্বিত, মাহাত্ম্যশীল। মানুষ যে নিরাক করে, আল্লাহ তা থেকে পবিত্র। তিনিই (সত্য) আল্লাহ, স্রষ্টা, সঠিক উদ্ভাবক, (অর্থাৎ সবকিছু রহস্য অনুযায়ী তৈরী করেন) রূপ (আকৃতি)-দাতা, উত্তম নামসমূহ তাঁরই। (এসব নাম উত্তম ওপাবলীর পরিচায়ক)। নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সবই (কথার মাধ্যমে অথবা অবস্থার মাধ্যমে) তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত, প্রভাময়। (সুতরাং এমন মহান সত্তার নির্দেশাবলী অবশ্য পালনীয়)।

আনুযয়িক ভাষ্য বিষয়

সূরা হাশরে গুরু থেকে কিতাবী, কাফির, মুশরিক ও মুনাসিকদের অবস্থা, কাজ-কারবার ও তাদের ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক শাস্তি বর্ণনা করার পর সূরার শেষ পর্বত মু'মিনদেরকে হুঁশিয়ারি ও সং কর্মপরায়ণতার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উল্লিখিত প্রথম আয়াতে বর্ণিত ভঙ্গিতে পরকালের চিন্তা ও তজ্ঞা প্রস্তুতি গ্রহণের

নির্দেশ আছে। বল হয়েছে: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالتَّنْظُرُ نَفْسٍ**

مَا قَدْ مَنَّ اللَّهُ

অর্থাৎ হে মু'মিনগণ, আল্লাহকে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত

পরকালের জন্য সে কি প্রেরণ করেছে, তা চিন্তা করা।

এখানে কয়েকটি বিষয় প্রাধান্যযোগ্য। এক আয়াতে ক্রিয়ামত বোঝাতে গিয়ে

শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ আগামীকাল। এতে তিনটি ইঙ্গিত রয়েছে।

প্রথম. সমগ্র ইহকাল পরকালের মুকাবিলায় স্বল্প ও সংক্ষিপ্ত অর্থাৎ এক দিনের সমান। হিসাব করলে একদিনের সমান হওয়াও কঠিন। কেননা, পরকাল চিরন্তন, যার কোন শেষ ও অন্ত নেই। মানব-বিশ্বের বয়স তো কয়েক হাজার বছরই বলা হয়। যদি আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি থেকে হিসাব করা হয়, তবে কয়েক লাখ বছর হয়ে যাবে। তবুও এটা সীমিত সময়কাল। অসীম ও অশেষ সময়কালের সাথে এর কোন তুলনাই হয় না।

এক হাদীসে আছে **الدنيا يوم وليلة**—সারা দুনিয়া একদিন এবং এই দিনে আমাদের রোযা আছে। মানব সৃষ্টি থেকে শুরু করা হোক কিংবা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি থেকে, চিন্তা করলে উভয়টিই মানুষের জন্য গুরুত্ববহ নয়, বরং প্রত্যেক ব্যক্তির দুনিয়া তার বয়সের বছর ও দিনগুলোই। এই বছর ও দিনগুলো পরকালের তুলনায় কত যে তুচ্ছ ও নগণ্য, তা প্রত্যেকেই অনুমান করতে পারে।

দ্বিতীয় ইঙ্গিত এই যে, কিয়ামত সুনিশ্চিত, যেমন আজকের পর আগামীকালের আগমন সুনিশ্চিত। কেউ এতে সন্দেহ করতে পারে না। এমনিভাবে দুনিয়ার পরে কিয়ামত ও পরকালের আগমনে কোন সন্দেহ নেই।

তৃতীয় ইঙ্গিত এই যে, কিয়ামত অতি নিকটবর্তী। আজকের পর আগামীকাল যেমন দূরে নয়—খুব নিকটবর্তী, তেমনি দুনিয়ার পর কিয়ামতও খুব নিকটবর্তী।

কিয়ামত দুই প্রকার—সমগ্র বিশ্বের কিয়ামত ও ব্যক্তি বিশেষের কিয়ামত। প্রথমোক্ত কিয়ামতের অর্থ আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের ধ্বংসপ্রাপ্তি। এটা লাখো বছর পরে হলেও পারলৌকিক সময়কালের তুলনায় নিকটবর্তীই। শেষোক্ত কিয়ামত ব্যক্তি বিশেষের মৃত্যুর সাথে সাথে সংঘটিত হয়। তাই বলা হয়েছে : **من مات فقد مات قلبه** অর্থাৎ যে ব্যক্তি মারা যায়, তার কিয়ামত তখনই কান্নেম হয়ে যায়। কারণ, কবর থেকেই পরজগতের ক্রিয়াকর্ম শুরু হয়ে যায় এবং আযাব ও সওয়াবের নমুনা সামনে এসে যায়। কবরজগৎ যার অপর নাম বরযখ, এটা দুনিয়ার ‘ওয়েটিং রুম’ (বিভ্রায়াগার) সদৃশ। ‘ওয়েটিং রুম’ ফাল্ট রাস থেকে নিয়ে খার্ড রাসের যাত্রীদের জন্য বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে। অপরাধীদের ওয়েটিং রুম হচ্ছে হাজত ও জেলখানা। এই বিভ্রায়াগার থেকেই প্রত্যেক ব্যক্তি তার স্তর ও মর্যাদা নির্ধারণ করতে পারে। তাই মৃত্যুর সাথে সাথেই প্রত্যেকের নিজস্ব কিয়ামত এসে যায়। আল্লাহ তা‘আলা মানুষের মৃত্যুকে একটি ধী-ধীর রূপ দিয়ে রেখেছেন। ফলে বড় বড় দার্শনিক ও বিজ্ঞানীগণও এর নিশ্চিত সময় নিরূপণ করতে পারে না, বরং প্রতিটি মুহূর্তেই মানুষ আশংকা করতে থাকে যে, পরের ঘণ্টাটি তার জীবদ্দশায় অভিযোজিত নাও হতে পারে, বিশেষত বর্তমান বৈজ্ঞানিক উন্নতির মূগে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনাবলী একে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত করে দিয়েছে।

সারকথা এই যে, আলোচ্য আয়াতে কিয়ামতকে আগামীকাল বলে উদাসীন মানুষকে সাবধান করা হয়েছে যে, কিয়ামতকে বেশী দূরে মনে করো না। কিয়ামত আগামীকালের মত নিকটবর্তী, এমনকি আগামীকালের পূর্বেও এসে যাওয়া সম্ভবপর।

আয়াতে দ্বিতীয় প্রাধান্যোপ্য বিষয় এই যে, আল্লাহ তা‘আলা এতে মানুষকে

চিন্তা-ভাবনা করার দাওয়াত দিয়েছেন যে, নিশ্চিত ও নিকটবর্তী কিয়ামতের জন্য তুমি কি সম্বল প্রেরণ করছ, তা ডেবে দেখ। এ থেকে জানা গেল যে, মানুষের আসল বাসস্থান হচ্ছে পরকাল। দুনিয়াতে সে মুসাফিরদের ন্যায় বসবাস করে। আসল বাসস্থানে অন্তর্কাল অবস্থান করার জন্য এখানে থেকেই কিছু সম্বল প্রেরণ করা জরুরী। দুনিয়াতে আসার আসল উদ্দেশ্যই এই যে, এখানে থেকে কিছু উপার্জন করবে, এরপর তা পরকালের দিকে পাঠিয়ে দেবে। বজা বাহালা, এখানে থেকে দুনিয়ার আসবাববন্দ, খন্দোলত ইত্যাদি কেউ সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে না। বরং তা পাঠাবার একটি বিশেষ পদ্ধতি আছে। দুনিয়াতে এক দেশ থেকে অন্য দেশে টাকা-পয়সা নিয়ে যাওয়ার প্রচলিত পদ্ধতি এই যে, এই দেশের ব্যাংকে টাকা জমা দিয়ে অন্য দেশে প্রচলিত মুদ্রা অর্জন করতে হয়। পরকালের ব্যাপারেও একই পদ্ধতি চালু আছে। দুনিয়াতে যা কিছু আল্লাহর পথে ও আল্লাহর আদেশ পালনে ব্যয় করা হয়, তা আসমানী সরকারের ব্যাংকে (স্টেট ব্যাংক) জমা হয়ে যায়। এরপর সওয়াবের আকারে পরকালের মুদ্রা তার নামে লিখে দেওয়া হয়। পরকালে পৌঁছার পর দাবী-দাওয়া ব্যতিরেকেই এই সওয়াব তার হস্তগত হয়ে যায়।

مَا قَدْ مَنَّ اللَّهُ — বলে সৎ ও অসৎ উভয় প্রকার কর্ম বোঝানো হয়েছে। যে

বাড়ি সৎ কর্ম প্রেরণ করে, সে সওয়াবের আকারে পরকালের মুদ্রা পেয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যে অসৎ কর্ম প্রেরণ করে, সে সেখানে অপরাধের দারে অভিযুক্ত হবে। এরপর **اَتَّقُوا اللَّهَ** বাক্যটি পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে। এর এক কারণ তাক্বীদ করা এবং অপর সম্ভাব্য কারণ তরসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে।

এছাড়া এটাও সম্ভবপর যে, প্রথমে **اَتَّقُوا اللَّهَ** বলে আল্লাহর নির্দেশাবলী

পালন করে পরকালের জন্য সম্বল প্রেরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং দ্বিতীয় বার **اَتَّقُوا اللَّهَ** বলে নির্দেশ করা হয়েছে যে, যে সম্বল প্রেরণ কর, তা কৃত্রিম ও পরকালে অচল

কি না, তা দেখে নাও। পরকালে অচল সম্বল তাই, যা দৃশ্যত সৎ কর্ম, কিন্তু তা খাঁটিভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয় না, বরং নাম-যশ অথবা কোন মানসিক স্বার্থের বশবর্তী হয়ে করা হয় অথবা সেই আমল, যা দৃশ্যত ইবাদত হলেও ধর্ম তার কোন প্রমাণ না থাকার কারণে বিদ'আত ও পথভ্রষ্টতা। অতএব দ্বিতীয় **اَتَّقُوا اللَّهَ** বাক্যের সারমর্ম এই যে, পরকালের জন্য কেবল দৃশ্যত সৎ সম্বল যথেষ্ট নয়, বরং তা অচল কিনা তা দেখে প্রেরণ কর।

فَاَنفُسَهُمْ — অর্থাৎ তারা আল্লাহকে ভুলে গিয়ে প্রকৃতপক্ষে নিজেরাই

আত্মভোলা হয়ে গেছে। কলে ভাল-মন্দের ভান হারিয়ে কেলছে।

لَوْ أَنزَلْنَاهَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ—এটা একটা দৃষ্টান্ত অর্থাৎ যদি কোর-

আন পাহাড়ের ন্যায় কঠিন ও ভারী জিনিসের উপর অবতীর্ণ করা হত এবং পাহাড়কে মানুষের ন্যায় জানবুদ্ধি ও চেতনা দেওয়া হত, তবে পাহাড়ও কোরআনের মাহাত্ম্যের সামনে নড়—বরং ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। কিন্তু মানুষ খেলাস-খুনি ও স্বার্থপরতার লিপ্ত হয়ে তার স্বভাবজাত চেতনা হারিয়ে ফেলেছে। সে কোরআন দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় না। অতএব এটা যেন এক কাল্পনিক দৃষ্টান্ত। কারণ, বাস্তবে পাহাড়ের মধ্যে চেতনা নেই। ফেটু কেউ বলেন : পাহাড়, বৃক্ষ, ইত্যাদি বস্তুর মধ্যে চেতনা ও অনুভূতি বিদ্যমান আছে। কাজেই এটা কাল্পনিক নয়—বাস্তবভিত্তিক দৃষ্টান্ত।—(মাহহারী)

পরকালের চিন্তা ও কোরআনের মাহাত্ম্য বর্ণনা করার পর উপসংহারে আল্লাহ তা'আলার কতিপয় পূর্ণত্ববোধক গুণ উল্লেখ করে সূরা সমাপ্ত করা হয়েছে।

مَا لِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ—অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক দৃশ্য-অদৃশ্য

ও উপস্থিত-অনুপস্থিত বিষয় পুরোপুরি জানেন।

أَلْقُدُّوسُ—এমনি সত্তা, যিনি

প্রত্যেক দোষ থেকে মুক্ত এবং অনাজান বিষয়াদি থেকে পবিত্র।

وَالْمُؤْمِنِ—এই শব্দটি

মানুষের জন্য ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হয় আল্লাহ ও রসুলে বিশ্বাসী। আল্লাহর জন্য ব্যবহার করলে অর্থ হয় নিরাপত্তা বিধায়ক অর্থাৎ তিনি ইমানদারগণকে সর্বপ্রকার আঘাব ও বিপদ থেকে শান্তি এবং নিরাপত্তা দান করেন।

وَالْمُهَيْمِنِ—এর অর্থ দেখাশোনাকারী। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) মুজাহিদ ও

কাতাদাহ (রা) তাই বলেছেন।—(মাহহারী, কামুস)

وَالْجَبَّارِ—প্রভাপালী মহান। এই শব্দটি جَبَر থেকে উদ্ভূত হতে পারে,

যার অর্থ ভাঙা হাড় ইত্যাদি সংযোগ করা। এ কারণেই ভাঙা হাড় জোড়া দেওয়ার পর যে পল্লি বাঁধা হয়, তাকে جَبَر বলা হয়। অতএব অর্থ এই যে, তিনি প্রত্যেক ভাঙা ও অকেজো বস্তুর সংস্কারক।—(মাহহারী)

وَالْمُتَكَبِّرِ—এটা تَكَبَّر থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ বড়ত্ব, প্রত্যেক বড়ত্ব

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার জন্য নিদিশ্ট। তিনি কোন বিষয়ে কারও মুখাপেক্ষী নন। যে মুখাপেক্ষী, সে বড় হতে পারে না। তাই আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যের জন্য এই শব্দটি দোষ ও পোনাহ। কারণ, সত্যিকার বড় না হয়ে বড়ত্ব দাবী করা মিথ্যা এবং আল্লাহর বিশেষ গুণে শরীক হওয়ার দাবী। তাই এটা আল্লাহর জন্য পূর্ণত্বের গুণ এবং অন্যের জন্য মিথ্যা দাবী।

الْمُؤَرَّ

অর্থঃ রূপ দানকারী। উদ্দেশ্য এই যে, সমগ্র সৃষ্ট বস্তুকে আল্লাহ

তা'আলা বিশেষ বিশেষ আকার ও আকৃতি দান করেছেন, যদ্বারা এক বস্তু অপর বস্তু থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র হয়েছে। আকাশস্থ ও পৃথিবীস্থ সকল সৃষ্ট বস্তু বিশেষ আকারের মাধ্যমেই পরিচিতি হয়। সৃষ্ট বস্তুর অসংখ্য প্রকারের আলাদা আলাদা আকার-আকৃতি। মানুষের একই শ্রেণীর মধ্যে পুরুষ ও নারীর আকার-আকৃতিতে পার্থক্য, কোটি কোটি নারী ও পুরুষের চেহারায় এমন স্বাতন্ত্র্য যে, একজনের মুখাবয়ব অন্যজনের সাথে মিলে না—এটা একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই অপর শক্তির কারসাজি। এতে অন্য কেউ তাঁর অংশীদার নয়। বড়ই যেমন আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য বৈধ নয় এবং এটা একমাত্র তাঁরই গুণ, তেমনি চিত্র ও আকার-আকৃতি নির্মাণ অন্যের জন্য বৈধ নয়। এটাও আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণে তাঁর সাথে অংশীদারিত্ব দাবী করার নামান্তর।

لَا إِلَهَ إِلَّا سَمَاءُ الْعَصْنَى

অর্থঃ আল্লাহ তা'আলার উত্তম উত্তম নাম আছে।

কোরআন পাকে এসব নামের সংখ্যা নির্দিষ্ট নেই। সহীহ হাদীসসমূহে ৯৯-টি নাম বর্ণিত আছে। তিরমিযীর এক হাদীসে সবগুলোই উল্লিখিত হয়েছে।

يُسَبِّحُ لَكَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

অবস্থার মাধ্যমে হলে তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। কেননা, সমগ্র সৃষ্ট জগৎ ও তার অন্তর্নিহিত কান্নিগ্নি এবং আকার-আকৃতি নিজ নিজ অবস্থার মাধ্যমে অহনিশ স্রষ্টার প্রশংসা ও গুণ-কীর্তনে মগ্নগল আছে। সত্যিকার উক্তির মাধ্যমে তসবীহ পাঠও হতে পারে। কেননা, সূচিভিত্তি অভিযত এই যে, প্রত্যেক বস্তুই নিজ নিজ সীমায় চেতনা ও অনুভূতিসম্পন্ন। জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনার সর্বপ্রথম দাবী হচ্ছে স্রষ্টাকে চিনা ও তাঁর কৃতজ্ঞ হওয়া। অতএব, প্রত্যেক বস্তুর সত্যিকার তসবীহ পাঠ করা অসম্ভব নয়। তবে আমরা নিজ কানে তা শুনি না। এ কারণেই কোরআন পাকের এক জায়গায় বলা হয়েছে : وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ

تَسْبِيحَهُمْ

অর্থঃ তোমরা তাদের তসবীহ শোন না, বুঝ না।

সূরা হাশরের সর্বশেষ আয়াতসমূহের উপকারিতা ও কল্যাণ : তিরমিযীতে হযরত মা'কাল ইবনে ইয়্যাসার (রা)-এর বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : যে ব্যক্তি সন্ধ্যাবেলা তিনবার **أَمُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ** পাঠ করার পর সূরা হাশরের **هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ** থেকে শেষ পর্যন্ত সর্বশেষ তিন আয়াত

পাঠ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য সত্তর হাজার কেরেশতা নিশ্চয় করে দেবেন। তারা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য রহমতের দোয়া করবে। সেদিন সে মারা গেলে শহীদদের মৃত্যু হাসিল হবে। যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এভাবে পাঠ করবে, সে-ও এই মর্যাদা লাভ করবে। —(মামহারী)

কুরআন অধ্যয়ন
প্রতিযোগিতা
২০২৩

সূরা মুনাফিকুন

আয়োজনে



মাউন ফাউন্ডেশন

www.maunfoundation.org

سورة المائدة

मूसा मुनासिकुन

मदीनाह अवतीर, ११ आमात, २ रक'.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا جَاءَكَ الْمُتَّقُونَ قَالُوا شَهِدْ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ
لَرَسُولُهُ ۚ وَاللَّهُ يَشْهَدُ أَنَّ الْمُتَّقِينَ لَكَذِبُونَ ۖ إِتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ
جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ۝ وَإِذَا
رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۚ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمِعْ لِقَوْلِهِمْ ۚ كَانَتْهُمْ
خُشُبٌ مُسْنَدَةٌ ۚ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۚ هُمُ الْعَادُوْنَ فَاخْذِرْهُمْ ۚ
فَتَنَلَهُمُ اللَّهُ نَآئِي يَوْمَئِذٍ يُؤْفَكُونَ ۝ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ
رَسُولُ اللَّهِ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ وَسَمِعُوا رَأَيْتَهُمْ يَقْصِدُونَ ۚ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ۝
سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۚ كُنْ يُغْفَرُ
لِلَّهِ لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ
لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُوا ۚ وَاللَّهُ خَزَائِنُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُتَّقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ۝ يَقُولُونَ لِمَ
رُجِعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ۚ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ
وَلِرَسُولِهِ ۚ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُتَّقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) মুনাফিকরা আপনাদের কাছে এসে বলে : আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রসূল। আল্লাহ জানেন যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। (২) তারা তাদের শপথসমূহকে চাক্ষুসে ব্যবহার করে। অতঃপর তারা আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে। তারা যা করছে, তা খুবই মন্দ। (৩) এটা এজন্য যে, তারা বিশ্বাস স্থাপন করার পর পুনরায় কাফির হয়েছে। ফলে তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেওয়া হয়েছে। অতএব তারা বুঝে না। (৪) আপনি যখন তাদেরকে দেখেন, তখন তাদের দেহাবয়ব আপনাদের কাছে প্রীতিকর মনে হয়। আর যদি তারা কথা বলে, তবে আপনি তাদের কথা শুনে। তারা প্রাচীরে ঠেকানো কাঠসদৃশ। প্রত্যেক শোরগোলকে তারা নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে। তারাই শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে সতর্ক হোন। ধ্বংস করুন আল্লাহ তাদেরকে। তারা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছে? (৫) যখন তাদেরকে বলা হয় : তোমরা এস, আল্লাহর রসূল তোমাদের জন্য ক্রমা প্রার্থনা করবেন, তখন তারা মাথা ঘুরিয়ে নেয় এবং আপনি তাদেরকে দেখেন যে, তারা অহংকার করে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৬) আপনি তাদের জন্য ক্রমা প্রার্থনা করুন অথবা না করুন, উভয়ই সমান। আল্লাহ কখনও তাদেরকে ক্রমা করবেন না। আল্লাহ পাগাচারী সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না। (৭) তারাই বলে : আল্লাহর রসূলের সাহচর্যে যারা আছেন, তাদের জন্য ব্যয় করা না, পরিণামে তারা আপনা আপনি সার হয়ে যাবে। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের ধন-ভাণ্ডার আল্লাহরই, কিন্তু মুনাফিকরা তা বুঝে না। (৮) তারা বলে : আমরা যদি মদীনার প্রত্যাভর্তন করি, তবে সেখান থেকে সবল অবশ্যই দুর্বলকে বহিষ্কৃত করবে। শক্তি তো আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মু'মিনদেরই, কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।

তকসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন মুনাফিকরা আপনাদের কাছে আসে, তখন বলে : আমরা (মনেপ্রাণে) সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রসূল (স)। আল্লাহ তো জানেন যে, আপনি অবশ্যই তাঁর রসূল। (এ ব্যাপারে তাদের উক্তিকে মিথ্যা বলা যায় না) এবং (এতদসত্ত্বেও) আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা (এ কথায়) অবশ্যই মিথ্যাবাদী (যে, তারা মনেপ্রাণে সাক্ষ্য দিচ্ছে। কারণ, তাদের এই সাক্ষ্য নিছক মৌখিক—আন্তরিক নয়)। তারা তাদের শপথসমূহকে (জান ও মাল বাঁচানোর জন্য) চাক্ষুসে ব্যবহার করে। (কেমনা, কুফর প্রকাশ করলে তাদের অবস্থাও অন্যান্য কাফিরের মত হত—তারাও জিহাদের সম্মুখীন হত, নিহত ও লুণ্ঠিত হত)। অতঃপর (এই অনিশ্চয়ের সাথে একটি সংক্রামক অনিশ্চয় রয়েছে। তা এই যে) তারা (অপরকেও) আল্লাহর পথ থেকে নিরুত্তর করে। তারা যা করছে, তা খুবই মন্দ। এটা (অর্থাৎ তাদের কর্ম খুবই মন্দ বললাম) এজন্য যে, তারা (প্রথমে বাধ্যত) বিশ্বাস করেছে, অতঃপর (তাদের শরতানদের কাছে যেয়ে

—إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ
—এই কুফরী বাক্য বলে) কাফির হয়ে গেছে। (উদ্দেশ্য এই যে, তাদের কপটতার কারণে

তাদের কর্মকে মন্দ বলা হয়েছে। কারণ, কপটতা জঘন্যতম কৃষ্ণকর্ম)। ফলে তাদের অন্তরে মোহর মেলে দেওয়া হয়েছে। অতএব তারা (সত্য বিষয়) বুঝে না। (তারা বাহ্যত এমন চটপট যে,) আপনি তাদেরকে দেখলে (বাহ্যিক শান-শওকতের কারণে) তাদের দেহাবয়ব আপনার কাছে প্রীতিকর মনে হবে আর (কথায় এমন যে) যদি কথা বলে, তবে আপনি তাদের কথা (প্রাজ্ঞ ও মিষ্টি হওয়ার কারণে) শুনে, (কিন্তু যেহেতু অন্তঃসারশূন্য, তাই বাহ্যিক অঙ্গসৌন্দর্যের সাথে অভ্যন্তরীণ গুণাবলী থেকে যুক্ত হওয়ার কারণে তাদের দৃষ্টান্ত এই যে) তারা প্রাচীরে ঠেকানো কাঠসদৃশ। (এই কাঠ দৈর্ঘ্য প্রসঙ্গে বিশাল বপু, কিন্তু নিষ্প্রাণ। সাধারণ রীতি এই যে, যে কাঠ আপাতত কাজে লাগে না, তা দেয়ালে ঠেকিয়ে রেখে দেওয়া হয়। এরূপ কাঠ মোটেই উপকারী নয়। এমনভাবে মুনাফিকরা দেখতে বেশ শানদার, কিন্তু ভেতর থেকে সম্পূর্ণ বেকার। ঈমান ও আন্তরিকতার অভাব হেতু তারা সর্বদা এই আশংকায় থাকে যে, মুসলমানরা কোন সময় আডাসে-ইজিতে অথবা ওহীর মাধ্যমে তাদের অবস্থা জেনে ফেলবে এবং অন্যান্য কাফিরের ন্যায় তাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধাভিযান পরিচালিত হবে। এই ধারণায় তারা এতটুকু শংকিত থাকে যে,) প্রত্যেক শোরগোলকে (তা যে কারণেই হোক) তারা নিজেদের বিরুদ্ধেই মনে করতে থাকে। (প্রকৃতপক্ষে) তারাই (তোমাদের প্রকৃত) শত্রু। অতএব আপনি তাদের সম্পর্কে সতর্ক হোম। (অর্থাৎ তাদের কোন কথায় আস্থা স্থাপন করবেন না)। ধ্বংস করুন আল্লাহ তাদেরকে। তারা (সত্য ধর্ম থেকে) কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছে? (অর্থাৎ রোজই দূরে সরে যাচ্ছে)। এবং (তাদের অহংকার ও দুষ্টুমির অবস্থা এই যে) যখন তাদেরকে বলা হয় : [রসূলুল্লাহ (সা)-র কাছে] এসো, আল্লাহর রসূল (সা) তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন তারা মাথা হুরিয়ে নেয় এবং আপনি তাদেরকে দেখেন যে, তারা দড়ভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (তাদের কৃষ্ণকর্মের যখন এই অবস্থা, তখন) আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন অথবা না করুন, উভয়ই সমান। আল্লাহ কখনও তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। (উদ্দেশ্য এই যে, তারা যদি আপনার কাছে আসতও এবং আপনি তাদের বাহ্যিক অবস্থাদৃষ্টে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনাও করতেন, তবুও তাদের কোন উপকার হত না। তাদের ভবিষ্যৎ অবস্থা এই যে) আল্লাহ তা'আলা এহেন পাপাচারী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না। তারাই বলে : যারা আল্লাহর রসূল (সা)-এর সাহচর্যে আছে, তাদের জন্য কিছুই ব্যয় করেন না। পরিশ্রমে তারা আপনা-আপনি স্নেহ যাবে। (তাদের এই উক্তি নিরোক্ত মূর্খতা, কেননা) নতীমশুল ও ভূমণ্ডলের ধন-ভাণ্ডার আল্লাহ তা'আলারই কিন্তু মুনাফিকরা তা বুঝে না। (তারা শহরবাসীদের দান-খয়রাতকেই স্মিতিকের একমাত্র পথ মনে করে)। তারা বলে : আমরা যদি এখন মদীনায় প্রত্যাবর্তন করি, তবে সেখান থেকে সবল অবশ্যই দুর্বলকে বহিষ্কৃত করবে। (অর্থাৎ আমরা সেই প্রবাসী লোকদেরকে বহিষ্কার করব। এটা তাদের নিবৃদ্ধিতা যে, তারা নিজেদেরকে সবল এবং মুসলমানদেরকে দুর্বল মনে করে; বরং) শক্তি তো আল্লাহর (সরাসরিভাবে) তাঁর রসূল (সা)-এর (আল্লাহর সাথে সম্পর্কের মাধ্যমে) এবং মু'মিনদেরই (আল্লাহ ও রসূলের সাথে সম্পর্কের মাধ্যমে)। কিন্তু মুনাফিকরা জানে না। (তারা ধ্বংসশীল বিষয়সমূহকে শক্তির উৎস মনে করে)।

আনুমানিক জাতব্য বিষয়

সূরা মুনাফিকুন অবতরণের বিস্তারিত ঘটনা : এই ঘটনা মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র)-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ষষ্ঠ হিজরীতে এবং কাতাদাহ ও ওরওয়া (র)-র রেওয়ায়েত অনুযায়ী পঞ্চম হিজরীতে ‘বনি-মুস্তালিক’ যুদ্ধের সময় সংঘটিত হয়।—(মাহহারী) ঘটনা এই : রসুলুল্লাহ্ (সা) সংবাদ পান যে, ‘মুস্তালিক’ গোত্রের সরদার হারেস ইবনে যেরার তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই হারেস ইবনে যেরার হযরত জুহায়রিয়া (রা)-র পিতা, যিনি পরে ইসলাম গ্রহণ করে রসুলুল্লাহ্ (সা)-র বিবিসের অন্তর্ভুক্ত হন। হারেস ইবনে যেরারও পরে মুসলমান হয়ে যান।

সংবাদ পেয়ে রসুলে করীম (সা) একদল মুজাহিদসহ তাদের মুকাবিলা করার জন্য বের হন। এই জিহাদে গমনকারী মুসলমানদের সঙ্গে অনেক মুনাফিকও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অংশীদার হওয়ার লোভে রওয়ানা হয়। কারণ, তারা অন্তরে কাকির হলেও বিশ্বাস করত যে, আজাহর সাহায্যে তিনি এই যুদ্ধে বিজয়ী হবেন।

রসুলুল্লাহ্ (সা) যখন মুস্তালিক গোত্রে পৌঁছলেন, তখন ‘মুরাইসী’ নামে খ্যাত একটি কূপের কাছে হারেস ইবনে যেরারের বাহিনীর সম্মুখীন হলেন। এ কারণেই এই যুদ্ধকে মুরাইসী যুদ্ধও বলা হয়। উভয় পক্ষ সারিবদ্ধ হয়ে তীর বর্ষণের মাধ্যমে মুকাবিলা হল। মুস্তালিক গোত্রের বহু লোক হতাহত হল এবং অবশিষ্টরা পলায়ন করতে লাগল। আজাহর তা’আলা রসুলুল্লাহ্ (সা)-কে বিজয় দান করলেন। প্রতিপক্ষের কিছু ধনসম্পদ এবং কয়েকজন পুরুষ ও নারী মুসলমানদের হাতে বন্দী হল। এভাবে এই জিহাদের সমাপ্তি ঘটল।

দেশ ও বংশগত জাতীয়তার ভিত্তিতে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা কুফর ও মূর্থতা যুগের শ্লোগান : কিন্তু এরপর যখন মুসলমান মুজাহিদ বাহিনী মুরাইসী কূপের কাছে সমবেত ছিল, তখন একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেল। একজন মূহাজির ও একজন আনসারীর মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়ে হাতাহাতির সীমা অতিক্রম করে পারস্পরিক যুদ্ধের পর্যায়ে পৌঁছে গেল। মূহাজির ব্যক্তি সাহায্যের জন্য মূহাজিরগণকে এবং আনসারী ব্যক্তি আনসার সম্প্রদায়কে ডাক দিল। উভয়ের সাহায্যার্থে কিছু লোক তৎপরও হয়ে উঠল। এভাবে ব্যাপারটি মুসলমানদের পারস্পরিক সংঘর্ষের কাছাকাছি পৌঁছে গেল। রসুলুল্লাহ্ (সা) সংবাদ পেয়ে অনতিবিলম্বে অকুস্থলে পৌঁছে গেলেন এবং ভীষণ রুষ্ট হয়ে বললেন :

مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ — অর্থাৎ এ কি মূর্থতা যুগের আহ্বান। দেশ ও

বংশগত জাতীয়তাকে ভিত্তি করে সাহায্য ও প্রতিরক্ষার কারবার হচ্ছে কেন? তিনি আরও বললেন :

دَعْوَاهَا نَافَا مَنَنْتَ — এই শ্লোগান বন্ধ কর। এটা দুর্গন্ধময় শ্লোগান।

তিনি বললেন : প্রত্যেক মুসলমানের উচিত অপর মুসলমানদের সাহায্য করা—সে জালিম হোক অথবা মজলুম। মজলুমকে সাহায্য করার অর্থ তো জানাই যে, তাকে জুলুম থেকে রক্ষা করা। জালিমকে সাহায্য করার অর্থ তাকে জুলুম থেকে নিরুত্ত করা। এটাই তার প্রকৃত সাহায্য। উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক ব্যাপারে দেখা উচিত কে জালিম ও কে মজলুম :

এরপর মুহাজির, আনসারী, গোত্র ও বংশ নিবিশেষে প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য মজলুমকে জুলুম থেকে রক্ষা করা এবং জাতিমের হাত চেপে ধরা—সে আগন সহোদর ভাই হোক অথবা পিতা হোক। এই দেশ ও বংশগত জাতীয়তা একটা মূর্খতাসূলভ দুর্গন্ধময় স্রোত। এর ফল অজান বাড়ানো ছাড়া কিছুই হয় না।

রসূলুল্লাহ (সা)-র এই বক্তৃতা শোনামাত্রই ঝগড়া মিটে গেল। এ ব্যাপারে মুহাজির জাহ্‌জাহের ঝড়োবাড়ি প্রমাণিত হল। তার মুকাবিলায় সিনান ইবনে ওবরা আনসারী (রা) আহত হয়েছিলেন। হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা) তাকে বুঝিয়ে-গুনিয়ে মাফ করিয়ে নিলেন। ফলে ঝগড়াকারী জালাম ও মজলুম উভয়ই পুনরায় ভাই ভাই হয়ে গেল।

মুনাফিকদের যে দলটি মুজলুম সম্পদের লালসায় মুসলমানদের সাথে আগমন করেছিল, তারা মনে মনে রসূলুল্লাহ (সা) ও মুসলমানদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করত কিন্তু পাখিব স্বার্থের খাতিরে নিজেদেরকে মুসলমান জাহির করত। তাদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই যখন মুহাজির ও আনসারীর পারস্পরিক সংঘর্ষের খবর পেল, তখন সে একে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার একটি সুবর্ণ সুযোগ মনে করে নিল। সে মুনাফিকদের এক মজলিসে, যাতে মু'মিনদের মধ্যে কেবল যারয়েদ ইবনে আরকাম উপস্থিত ছিলেন, আনসারকে মুহাজিরগণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যে বলল : তোমরা মুহাজিরদেরকে দেশে ডেকে এনে মাথা চড়িয়েছ, নিজেদের ধনসম্পদ ও সহায়-সম্পত্তি তাদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছ। তারা তোমাদের রুটি খেয়ে লালিত হয়ে এখন তোমাদেরই মাড় মটকাচ্ছে। যদি তোমাদের এখনও ভান করে না আসে, তবে পরিণামে এরা তোমাদের জীবন দুবিষহ করে তুলবে। কাজেই তোমরা ভবিষ্যতে টাকা পয়সা দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করো না। এতে তারা আপনা-আপনি হতভম্ব হয়ে চলে যাবে। এখন তোমাদের কর্তব্য এই যে, মদী-নায় ফিরে গিয়ে সবলরা দুর্বলদেরকে বহিষ্কার করে দেবে।

সবল বলে তার উদ্দেশ্য ছিল নিজের দল ও আনসার এবং দুর্বল বলে রসূলুল্লাহ (সা) ও মুহাজির সাহায্যে কিরাম। হযরত যারয়েদ ইবনে আরকাম (রা) একথা শোনা মাত্রই বলে উঠলেন : আল্লাহর কসম, তুই-ই দুর্বল, লালিত ও ঘৃণিত। পক্ষান্তরে রসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহ প্রদত্ত শক্তিবলে এবং মুসলমানদের ভালবাসার জোরে সফলকাম।

আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের ইচ্ছা ছিল যে বিপদ দেখলে সে তার কপটতার উপর পর্দা ফেলে দেবে। তাই সে স্পষ্ট ভাষা ব্যবহার করেনি। কিন্তু যারয়েদ ইবনে আরকামের ক্রোধ দেখে তার সন্ধিৎ করে এল। পাছে তার কুফর প্রকাশ হয়ে পড়ে, এই আশংকায় সে হযরত যারয়েদের কাছে ওয়রপেশ করে বলল : আমি তো এ কথাটি হাসির ছলে বলেছিলাম। আমার উদ্দেশ্য রসূলুল্লাহ (সা)-র বিরুদ্ধে কিছু করা ছিল না।

যারয়েদ ইবনে আরকাম (রা) মজলিস থেকে উঠে সোজা রসূলুল্লাহ (সা)-র কাছে গেলেন এবং আদ্যোপান্ত ঘটনা তাঁকে বলে শোনালেন। রসূলুল্লাহ (সা)-র কাছে সংবাদটি শুই গুরুতর মনে হল। মুখমণ্ডলে পরিবর্তনের রেখা ফুটে উঠল। যারয়েদ ইবনে আরকাম (রা) অল্প বয়স্ক সাহাবী ছিলেন। তিনি তাঁকে বললেন : বৎস! দেখ, তুমি মিথ্যা বলছ না তো? যারয়েদ কসম খেয়ে বললেন : না, আমি নিজ কানে এসব কথা শুনেছি। রসূলুল্লাহ

(সা) আবার বললেন : তোমার কোনরূপ বিভ্রান্তি হয়নি তো? যারোদ উত্তরে পূর্বের কথাই বললেন। এরপর মুনাফিক সন্দেহের এই কথা গোটা মুসলমান বাহিনীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। তাদের মধ্যে এ ছাড়া আর কোন আলোচনাই রইল না। এদিকে সব আনসার যারোদ ইবনে আব্বাকাম (রা)-কে তিরস্কার করতে লাগলেন যে, তুমি সম্প্রদায়ের নেতার বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করেছ এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করেছ। যারোদ (রা) বললেন : আল্লাহর কসম, সমগ্র খায়রাজ গোত্রের মধ্যে আমার কাছে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই অপেক্ষা অধিক প্রিয় কেউ নেই। কিন্তু যখন সে রসুলুল্লাহ (সা)-র বিরুদ্ধে এসব কথাবার্তা বলেছে, তখন আমি সহ্য করতে পারিনি। যদি আমার পিতাও এমন কথা বলত তবে আমি তাও রসুলুল্লাহ (সা)-র গোচরীভূত করতাম।

অপরদিকে হযরত ওমর (রা) এসে আরম্ভ করলেন : ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দিই। কোন কোন রেওয়াজে আছে হযরত ওমর (রা) এ কথা বলেছিলেন : আপনি ওস্বাদ ইবনে বিশরকে আদেশ করুন, সে তার মন্তক কেটে আপনার সামনে উপস্থিত করুক।

রসুলুল্লাহ (সা) বললেন : ওমর, এর কি প্রতিকার যে, মানুষের মধ্যে খ্যাতি হয়ে যাবে আমি আমার সাহাবীকে হত্যা করি। অন্তঃপর তিনি ইবনে উবাইকে হত্যা করতে বারণ করে দিলেন। হযরত ওমর (রা)-এর এই কথা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর পুত্র জানতে পারলেন। তাঁর মামও আবদুল্লাহ ছিল। তিনি খাঁটি মুসলমান ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ রসুলুল্লাহ (সা)-র কাছে উপস্থিত হয়ে আরম্ভ করলেন : যদি আপনি আমার পিতাকে এসব কথাবার্তার কারণে হত্যা করার ইচ্ছা রাখেন, তবে আমাকে আদেশ করুন, আমি তার মন্তক কেটে আপনার কাছে এই মজলিস ত্যাগ করার পূর্বে হাযির করব। তিনি আরও আরম্ভ করলেন : সমগ্র খায়রাজ গোত্র সাক্ষী, তাদের মধ্যে কেউ আমা অপেক্ষা অধিক পিতামাতার সেবা ও আনুগত্যকারী নেই। কিন্তু আল্লাহ ও রসুলের বিরুদ্ধে তাদেরও কোন বিষয় সহ্য করতে পারব না। আমার আশংকা যে, আপনি যদি অন্য কাউকে আমার পিতাকে হত্যা করার আদেশ দেন এবং সে তাকে হত্যা করে, তবে আমি আমার পিতৃ-হত্যাকে চোখের সামনে চলাফেরা করতে দেখে আত্মসম্মানবোধের বশবর্তী হয়ে হত্যা করে দিতে পারি। এটা আমার জন্য আযাবের কারণ হবে। রসুলুল্লাহ (সা) বললেন : তাকে হত্যা করার ইচ্ছা আমার নেই এবং আমি কাউকে এ বিষয়ে আদেশও করিনি।

এই ঘটনার পর রসুলুল্লাহ (সা) সাধারণ অভ্যাসের বিপরীতে অসময়ের সফর শুরু করার কথা ঘোষণা করে দিলেন এবং নিজে 'কসওয়া' উক্টুরি পিঠে সওয়ার হয়ে গেলেন। যখন সাহাবায়ে কিরাম রওয়ানা হয়ে গেলেন, তখন তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে ডেকে এনে বললেন : তুমি কি বাস্তবিকই এরূপ কথা বলেছ? সে অনেক কসম খেয়ে বলল : আমি কখনও এরূপ কথা বলিনি। এই বালক (যারোদ ইবনে আব্বাকাম) মিথ্যাবাদী। স্বগোষ্ঠে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের মথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। তারা সবাই ছিন্ন করল যে, সন্তবত যারোদ ইবনে আব্বাকাম (রা) ভুল বুঝেছে। আসলে ইবনে উবাই একথা বলেনি।

মোটকথা, রসুলুল্লাহ্ (সা) ইবনে উবাইয়ের কসম ও ওয়র কবুল করে নিলেন। এদিকে জনগণের মধ্যে যারুদ ইবনে আরকাম (রা)-এর বিরুদ্ধে ক্রোধ ও তিরস্কার আরও তীব্র হয়ে গেল। তিনি এই অপমানের ভয়ে পা-চাকা দিয়ে থাকতে লাগলেন। অতঃপর রসুলুল্লাহ্ (সা) সমগ্র মুজাহিদ বাহিনীসহ সারাদিন ও সারারাত সফর করলেন এবং পরের দিন সকালেও সফর অব্যাহত রাখলেন। অবশেষে যখন সূর্যকিরণ প্রখর হতে লাগল, তখন তিনি কাফেকাকে এক জামপান খামিয়ে দিলেন। পূর্ণ এক দিন এক রাত সফরের ফলে ক্লান্ত-স্তম্ভিত সাহাবায়ের কিরাম মনমিলে অবস্থানের সাথে সাথে নিদ্রার কোলে চলে পড়লেন।

রাবী (বর্ণনাকারী) বলেন : সাধারণ অভ্যাসের বিপরীতে তাত্ক্ষণিক ও অসময়ে সফর করা এবং সুদীর্ঘকাল সফর অব্যাহত রাখার পেছনে রসুলুল্লাহ্ (সা)-র উদ্দেশ্য ছিল আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের ঘটনা থেকে উদ্ভূত জ্ঞানা-কল্পনা হতে মুজাহিদদের দৃষ্টি অন্য-দিকে সরিয়ে নেওয়া, যাতে এ সম্পর্কিত চর্চার অবসান ঘটে।

এরপর রসুলুল্লাহ্ (সা) পুনরায় সফর করলেন। ইতিমধ্যে ওবাদা ইবনে সায়েত (রা) আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইকে উপদেশ দিয়ে বললেন : তুই এক কাজ কর। রসুলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হয়ে অপরাধ স্বীকার করে নে। তিনি তোর জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। এতে তোর মুক্তি হয়ে যেতে পারে। ইবনে উবাই এই উপদেশ শুনে মাথা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল। হয়রত ওবাদা (রা) তখনই বললেন : আমার মনে হয়, তোর এই বিমুখতা সম্পর্কে অবশ্যই কোরআনের আয়াত নাযিল হবে।

এদিকে সফর চলাকালে যারুদ ইবনে আরকাম (রা) বারবার রসুলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে আসতেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এই মুনাফিক লোকটি আমাকে মিথ্যাবাদী বলে গোটা সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন করেছে। অতএব, আমার সত্যায়ন ও এই বাস্তব মিথ্যাস্ব মুখোশ উন্মোচন সম্পর্কে অবশ্যই কোরআন নাযিল হবে। হঠাৎ যারুদ ইবনে আরকাম (রা) দেখলেন যে, রসুলুল্লাহ্ (সা)-র মধ্যে ওহী অবতরণকালীন লক্ষণাদি ফুটে উঠছে। তাঁর হাস ফুলে উঠছে, কপাল ঘর্মাক্ত হয়ে যাচ্ছে এবং তাঁর উদ্ভূত বোঝার ভারে নুয়ে পড়ছে। যারুদ (রা) আশাবাদী হলেন যে, এখন এ সম্পর্কে কোন ওহী নাযিল হবে। অবশেষে রসুলুল্লাহ্ (সা)-র এই অবস্থা দূর হয়ে গেল। যারুদ (রা) বলেন : আমার সওয়ারী রসুলুল্লাহ্ (সা)-র কাছ ঘেঁষে যাচ্ছিল। তিনি নিজের সওয়ারীর উপর থেকেই আমার কান ধরলেন এবং বললেন :

يا غلام صدق الله حديثك ونزلت سورة المنة فقهني في ابن أبي من
اولها الى اخرها -

অর্থঃ হে বালক, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার কথার সত্যায়ন করেছেন এবং সম্পূর্ণ সূরা মুনাফিকুন ইবনে উবাইয়ের ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

এই রেওয়াজেতে থেকে জানা গেল যে, সূরা মুনাফিকুন সফরের মধ্যেই নাযিল হয়েছে। কিন্তু বগভী (র)-র রেওয়াজেতে আছে, রসুলুল্লাহ্ (সা) যখন মদীনার পৌঁছে যান এবং

যারোদ ইবনে আরকাম (রা) অপমানের ডগে গৃহে আত্মগোপন করেন, তখন এই সূরানামিল হয়েছে।

এক রেওয়াজেতে আছে, রসূলুজ্জাহ্ (সা) যখন মদীনার নিকটবর্তী আকীক উপত্যকায় পৌঁছেন, তখন ইবনে উবাইয়ের মু'মিন পুত্র আবদুল্লাহ্ (রা) সম্মুখে অগ্রসর হন এবং খুঁজতে খুঁজতে পিতা ইবনে উবাইয়ের কাছে পৌঁছে তার উষ্ট্রীকে বসিয়ে দেন। তিনি উষ্ট্রীর হাঁটুতে পা রেখে পিতাকে বললেন : আব্বাহর কসম, তুমি মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না, যে পর্যন্ত 'সবল দুর্বলকে বহিষ্কৃত করবে'—এ কথাই ব্যাখ্যান কর। এই বাক্যে 'সবল' কে?—রসূলুজ্জাহ্ (সা), না তুমি? পুত্র পিতার পথ রুদ্ধ করে দাঁড়িয়েছিল এবং যারা এ পথ অতিক্রম করছিল তারা পুত্র আবদুল্লাহ্‌কে তিরস্কার করছিল যে, পিতার সাথে এমন দুর্বাবহার করছ কেন? অবশেষে যখন রসূলুজ্জাহ্ (সা)-র উষ্ট্রী তাদের কাছে আসল, তখন তিনি ব্যাপার জিজ্ঞাসা করলেন। লোকেরা বলল : আবদুল্লাহ্ এই বলে তার পিতার পথ রুদ্ধ করে রেখেছে যে, রসূলুজ্জাহ্ (সা) অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত তুমি মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না। রসূলুজ্জাহ্ (সা) দেখলেন যে, মুনাফিক ইবনে উবাই বেগতিক হয়ে পুত্রের কাছে বলে যাচ্ছে : আমি তো ছেলেপিলে ও নারীদের চাইতেও অধিক লাজ্জিত। একথা শুনে রসূলুজ্জাহ্ (সা) পুত্রকে বললেন : তার পথ ছেড়ে দাও, তাকে মদীনায় যেতে দাও।

সূরা মুনাফিকুন অবতরণের পটভূমি এতটুকুই। এই কাহিনীর শুরুতে সংক্ষেপে একথাও বলা হয়েছে যে, বনি-মুস্তালিক যুদ্ধের জন্য আসলে উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুয়ায়রিয়া (রা)-র পিতা হারেস ইবনে যেরার দাসী ছিলেন। পরবর্তীকালে আব্বাহ তা'আলা হযরত জুয়ায়রিয়া (রা)-কে ইসলাম গ্রহণ এবং রসূলুজ্জাহ্ (সা)-র পত্নী হওয়ার গৌরব দান করেন। তাঁর পিতা হারেসও পরে মুসলমান হয়ে যান।

এ ঘটনা মসনদে আহমদ, আবু দাউদ ইত্যাদি কিতাবে এভাবে বর্ণিত আছে যে, মুস্তালিক গোল্ল পরাজিত হলে তাদের কিছুসংখ্যক যুদ্ধবন্দীও মুসলমানদের করতলগত হয়। ইসলামী আইন অনুযায়ী সব কয়েদী ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ মুজাহিদগণের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হয়। কয়েদীদের মধ্যে হারেস ইবনে যেরারের কন্যা জুয়ায়রিয়াও ছিলেন। তিনি সাবেত ইবনে কায়েস (রা)-এর ভাগে পড়েন। সাবেত (রা) জুয়ায়রিয়াকে কিতাবতের প্রথম মুক্ত করে দিতে চাইলেন। এর অর্থ এই যে, দাস অথবা দাসী মেহনত-মজুরি করে অথবা ব্যবসায়ের মাধ্যমে নিদিষ্ট পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে মালিককে দিলে সে মুক্ত হয়ে যেত।

জুয়ায়রিয়ার যিশ্মায় মোটা অংকের অর্থ নির্ধারণ করা হয়েছিল, যা পরিশোধ করা সহজসাধ্য ছিল না। তিনি রসূলুজ্জাহ্ (সা)-র খেদমতে উপস্থিত হয়ে আবেদন করলেন : আমি মুসলমান হয়ে গেছি। আমি সাক্ষ্য দিই যে, আব্বাহ এক। তাঁর কোন অংশীদার নেই এবং আপনি আব্বাহর রসূল। অতঃপর নিজের ঘটনা শুনােলেন যে, সাবেত ইবনে কায়েস (রা) আমার সাথে কিতাবতের চুক্তি করেছে। কিন্তু কিতাবতের অর্থ পরিশোধ করার সাধ্য আমার নেই। আপনি এ ব্যাপারে আমাকে কিছু সাহায্য করুন।

রসূলুজ্জাহ্ (সা) তাঁর আবেদন মঞ্জুর করলেন এবং সাথে সাথে তাঁকে মুক্ত করে

বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। জুরায়রিয়ার জন্য এর চাইতে বড় সৌভাগ্য আর কি হতে পারত। তিনি সানন্দে প্রস্তাব মেনে নিলেন। এ ভাবে তিনি পূণ্যময়ী বিবিগণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন। উম্মুল-মু'মিনীন হযরত জুরায়রিয়া (রা) বর্ণনা করেন : “রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বনিজ-মুস্তালিক যুদ্ধে পয়নের তিন দিন পূর্বে আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম, ইয়াসরিবের (মদীনার) দিক থেকে চাঁদ রওয়ানা হয়ে আমার কোলে এসে লুটিয়ে পড়েছে। তখন আমি এই স্বপ্ন কারও কাছে বর্ণনা করিনি। কিন্তু এখন তার ব্যাখ্যা স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি।”

তিনি ছিলেন গোরুপতির কন্যা। তিনি যখন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পূণ্যময়ী বিবিদের কাতারে शामिल হয়ে গেলেন, তখন এর শুভ প্রতিক্রিয়া তাঁর পোস্তের উপরও প্রতিফলিত হয়। তাঁর সাথে বন্দিরা অন্য নারীরাও এই শুভ বিবাহের উপকারিতা লাভ করল। কেননা, এই বিবাহের কথা জানাজানি হওয়ার পর যে যে মুসলমানের কাছে তাঁর আত্মীয় কোন বন্দিরা ছিল, তারা সবাই তাদেরকে মুক্ত করে দিল। এভাবে একশ বন্দিরা তাঁর সাথে মুক্ত হয়ে গেল। এরপর তাঁর পিতাও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র একটি মো'জেবাহে মুসলমান হয়ে গেলেন।

এই ঘটনার গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশ : উপরোক্ত ঘটনা সূরা মুনাফিকুনের তফসীর বোঝার পক্ষে যেমন সহায়ক, তেমনি এতে প্রসঙ্গত নৈতিক চরিত্র, রাজনীতি ও সামাজিকতা সম্পর্কিত অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশ এবং সমস্যার সমাধানও নিহিত রয়েছে। তাই এখানে ঘটনার পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা সম্ভব মনে করা হচ্ছে। দিকনির্দেশগুলো এই :

ইসলামে বর্ণ, বংশ, ভাষা এবং দেশী ও বিদেশীর পার্থক্য মূল্যহীন : বনিজ মুস্তালিক যুদ্ধে সংঘটিত একজন আনসার ও একজন মুহাজিরের খগড়া এবং উভয় পক্ষ থেকে আনসার ও মুহাজির সম্প্রদায়কে আহ্বান করার সমগ্র ব্যাপারটি ছিল বিলীয়মান জাহিলিয়াত যুগের একটি প্রভাব বিশেষ। রসূলুল্লাহ্ (সা) এই অপপ্রভাবের মূলে কুঠারাত করেছিলেন এবং যে কোন স্থানের অধিবাসী, যে কোন বর্ণ, ভাষা, বংশ ও সম্প্রদায়ের মুসলমানদেরকে পরস্পরের মধ্যে নিবিড় ভ্রাতৃত্ববন্ধনের অনুভূতিতে উদ্বেলিত করে দিয়েছিলেন। তিনি আনসার ও মুহাজিরগণের মধ্যে নিরামিত ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে তাদেরকে অভিন্ন ইসলামী সমাজে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু শয়তান তার চিরচরিত্র জালে মানুষকে আবদ্ধ করে পারস্পরিক খগড়া-বিবাদের সময় সম্প্রদায়, দেশ, ভাষা, বর্ণ ইত্যাদিকে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সাহায্যের ভিত্তিরূপে প্রকট করে তোলে। এর অবশ্যস্বার্থী পরিণতি এই দাঁড়ায় যে, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সাহায্যের ইসলামী আপকৃতি ন্যায় ও সুবিচার মানুষের চিন্তাধারা থেকে উধাও হয়ে যায় এবং শুধু গোষ্ঠী ও জাতীয়তার ভিত্তিতে একে অপরকে সাহায্য করার নীতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এভাবে শয়তান মুসলমানকে মুসলমানের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত করে। উপরোক্ত খগড়ার ঘটনায়ও এমনি পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছিল। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা) যথাসময়ে অবস্থানে পৌঁছে এই অনর্থের অবসান ঘটান এবং বলেন যে, এটা মূর্খতা ও কুফরের দুর্ভাগ্যবশত অনুভূতি। এ থেকে বিরত হও। অতঃপর তিনি সবাইকে কোরআনী সহযোগিতা নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করে দেন। এই নীতি হচ্ছে :

تَعَا وَنُؤَا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَا وَنُؤَا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

অর্থাৎ মুসলমানদের জন্য কাউকে সাহায্য করা ও কারও কাছ থেকে সাহায্য নেওয়ার মাপকাঠি এই যে, যে ব্যক্তি ন্যায় ও সুবিচারে অবিচল, তাকে সাহায্য কর, যদিও সে বংশ, পরিবার, ভাষা ও দেশগতভাবে তোমা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন পাপ ও অন্যায় কাজে লিপ্ত থাকে, তাকে কখনও সাহায্য করো না, যদিও সে তোমার পিতা ও ভ্রাতা হয়। এই যৌক্তিক ও ন্যায়ভিত্তিক মাপকাঠিই ইসলাম কালোঁম করেছে এবং রসুলুল্লাহ (সা) প্রতি পদক্ষেপে এ নীতির প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন ও সবাইকে এর অনুসরণ করতে বলেছেন। তিনি বিদায় হজ্জের সর্বশেষ ভাষণে ঘোষণা করেন : মুখতা যুগের সকল কুপ্রথা আমার পদতলে পিষ্ট হয়েছে। এখন আরব, অনারব, কৃষকায়, শ্রমিকায় এবং দেশী ও বিদেশীর প্রতিমা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। পারস্পরিক সহযোগিতা ও সাহায্যের ইসলামী ভিত্তি একমাত্র ন্যায় ও ইনসাক। সবাইকে এর অনুগামী হতে হবে।

এই ঘটনা আমাদেরকে এ শিক্ষাও দিয়েছে যে, ইসলামের শত্রুরা আজ থেকে নয় ---আদিকাল থেকেই মুসলমানদের ঐক্য বিনষ্ট করার জন্য গোষ্ঠীগত ও দেশগত জাতীয়তার অস্ত্র ব্যবহার করেছে। তারা যখন ও যে মুহর্তে সুযোগ পায়, এই অস্ত্র ব্যবহার করে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে।

পরিতাপের বিষয়, দীর্ঘকাল থেকে মুসলমানরা আবার এই শিক্ষা ভুলে গেছে এবং বিজাতীয় শত্রুরা মুসলমানদের ইসলামী ঐক্য খণ্ড-বিখণ্ড করার কাজে আবার সে শয়তানী চক্রান্ত জাল বিস্তার করেছে। ধর্ম ও ধর্মীয় মূলনীতির প্রতি উদাসীনতার কারণে আজকের যুগের মুসলমানরা এই জালে আবদ্ধ হয়ে পারস্পরিক গৃহযুদ্ধের শিকার হয়ে গেছে এবং কৃষক ও ধর্মপ্রাণিতার মুকাবিলায় তাদের একক শক্তি বহুধা বিভক্ত হয়ে পড়েছে। কেবল আরব ও অনারবই নয়, মিসরীয়, সিরীয়, হেজাজী, ইয়ামানীও আজ পরস্পরে ঐক্যবদ্ধ নয়। এ উপমহাদেশেও পাজাবী, বাঙ্গালী, সিন্ধী, হিন্দী, পাঠান এবং বেলুচরাও পারস্পরিক কলহের শিকার হয়ে গেছে। ইসলামের শত্রুরা আমাদের মধ্যকার তুচ্ছ বৈষয়িক কলহ-বিবাদ নিয়ে খেলায় মেতেছে। এর ফলশ্রুতিতে তারা প্রতি ক্ষেত্রেই আমাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে এবং আমরা সর্বত্রই পরাজিত ও দাসসুলভ চিন্তাধারার নিগড়ে আবদ্ধ হয়ে তাদের কাছেই আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছি। আল্লাহ করুন, আজও যদি মুসলমানরা কোরআনের মূলনীতি ও রসুলুল্লাহ (সা)-র দিকনির্দেশ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে, বিজাতির ভরসায় জীবন ধারণ করার পরিবর্তে স্বয়ং ইসলামী সমাজকে সুসংহত করে এবং বর্ণ, বংশ, ভাষা ও স্ব স্ব ভৌগোলিক সীমারেখার প্রতিমাকে আবার একবার ভেঙ্গে মিসমার করে দেয়, তবে আজও তারা আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ও সমর্থন খোঁসা চোখেই প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হবে।

ইসলামী মূলনীতিতে সাহায্যে কিরামের অপূর্ব দৃষ্টি : উপরোক্ত ঘটনা এ কথাও ব্যক্ত করেছে যে, যদিও শয়তান সাময়িকভাবে কিছু লোককে মুখতা যুগের মোগামে লিপ্ত করে দিয়েছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেকের অন্তর ইমানে পরিপূর্ণ ছিল। সামান্য হ'নিয়ারি পেয়ে সবাই ভ্রাতা ধারণা থেকে তওবা করে নেন। তাদের অন্তরে আল্লাহ ও রসুলের মহব্বত

এবং সন্তম এমনই বন্ধমূল ছিল, যাতে আত্মীয়তা ও জাতীয়তা সম্পর্কে কোনরূপ অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারেনি। এর প্রমাণ এই ঘটনায় প্রথমে যারেসদ ইবনে আরকাম (রা)-এর বিরতি থেকে ফুটে উঠেছে। তিনি নিজেও ছিলেন খায়রাজ গোত্রের লোক এবং ইবনে উবাই ছিল গোত্রের সরদার। যারেসদ ইবনে আরকাম (রা)-ও তার সম্প্রদায় ও সন্তমের প্রবক্তা ছিলেন। কিন্তু যখন মাননীয় সরদারের মুখে মু'মিন, মুহাজির ও স্বয়ং রসুলুজাহ্ (সা)-র বিরুদ্ধে কথাবার্তা উচ্চারিত হল, তখন তিনি সহ্য করতে পারলেন না। সেই মজলিসেই সরদারকে দাঁতভাঙা জওয়াব দিলেন। এরপর রসুলুজাহ্ (সা)-র কাছে অভিযোগ করলেন। আজ-কালকার গোষ্ঠী প্রীতি হলে তিনি কখনও আপন গোত্র সরদারের এই কথা রসুলুজাহ্ (সা)-র কাছে পৌছাতেন না।

এই ঘটনায় স্বয়ং ইবনে উবাইয়ের পুত্র আবদুল্লাহ্ (রা)-র আচরণ এ বিষয়টিকে অত্যন্ত উজ্জ্বল করে ফুটিয়ে তুলেছে যে, তার মহত্ত্ব ও সন্তম কেবল আল্লাহ্ ও রসুলের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। তিনি যখন পিতার মুখে বিরুদ্ধাচরণের কথাবার্তা শুনলেন, তখন রসুলুজাহ্ (সা)-র কাছে হাযির হয়ে নিজ হাতে পিতার মস্তক কেটে আনার প্রস্তাব রাখলেন। রসুলুজাহ্ (সা) নিষেধ করে দিলে মদীনায় সন্নিবর্তিত পৌছে পিতার সওয়ারী বসিয়ে দিলেন এবং মদীনায় প্রবেশের পথ রুদ্ধ করে পিতাকে এ কথা স্বীকার করে নিতে বাধ্য করলেন যে, সম্প্রদায়ের অধিকারী একমাত্র রসুলুজাহ্ (সা) এবং সে নিজে হের ও লাজিত। অতঃপর রসুলুজাহ্ (সা)-র অনুমতি লাভের পূর্বে পিতার পথ খুলে দিলেন না। এই দৃশ্য দেখে স্বতঃ-স্ফূর্তভাবে মুখে উচ্চারিত হয় :

تَوْنُخْلُ خَوْشِ ثَمْرِكَيْسَتِي كَ سَرُو وَسْمِنِ
هَمَّةَ زَخْوِيشِ بَرِيدِنْدِ وَبَا تَوِپُو سَقْنَدِ

এ ছাড়া বদর, ওহদ ও আহমাবের যুদ্ধগুলো তো তরবারির মাধ্যমে এই সম্প্রদায় প্রীতি ও স্বদেশ প্রীতির প্রতিমাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে উড়িয়ে দিয়েছে এবং এ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, যে কোন সম্প্রদায়, দেশ, বর্ণ ও ভাষার মুসলমান পরস্পরে ভাই ভাই। যারা আল্লাহ্ ও রসুলকে মানে না, তারা সত্যিকার ভাই ও পিতা হলেও দূশমন।

هَزَارْ خَوْشِ كَ بِيگَا نَهْ اَزْ خُذَا بَاشْدِ
خُذَا تَهْ پَكِ تَنِ بِيگَا نَهْ كَا شْنَا بَاشْدِ

মুসলমানদের সাধারণ স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং তাদেরকে ভুল বোঝাবুঝি থেকে রক্ষা করার গুরুত্ব : এই ঘটনা আমাদেরকে আরও শিক্ষা দিয়েছে যে, যে কাজ স্বত্ত্ব দৃষ্টিতে বৈধ, কিন্তু তা বাস্তবায়নে মুসলমানদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির আশংকা থাকে অথবা শত্রুরা ভুল বোঝাবুঝি প্রচার করার সুযোগ লাভ করে, সেই কাজ না করাই কর্তব্য। উদাহরণত রসুলুজাহ্ (সা) মুনাক্কি সরদার ইবনে উবাইয়ের কপটতা মূর্ত হয়ে ফুটে উঠার পরও হযরত ওমর (রা)-এর এই পরামর্শ গ্রহণ করেন নি যে, তাকে হত্যা করা হোক।

কেননা, এতে আশংকা ছিল যে, শত্রুরা সাধারণ মানুষের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি প্রচার করার সুযোগ লাভ করবে এবং বলবে : রসুলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সাহাবীদেরকেও হত্যা করেন।

কিন্তু অন্যান্য রেওয়াজেও থেকে প্রমাণিত আছে যে, যে সব কাজ শরীয়তের মূল উদ্দেশ্য নয়, সে সব কাজ মোস্তাহাব হলেও ভুল বোঝাবুঝির আশংকার কারণে বর্জন করা যায়। কিন্তু শরীয়তের মূল উদ্দেশ্যকে এ ধরনের আশংকার কারণে ত্যাগ করা যায় না; বরং এরূপ ক্ষেত্রে আশংকা অবসানের চেষ্টা করতে হবে এবং কাজটি বাস্তবায়ন করতে হবে। এখন সূরার বিশেষ বিশেষ বাক্যের ব্যাখ্যা দেখুন :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ

ইবনে উবাইয়ের ব্যাগারে সূরা মুনাফিকুন নামিল হয়েছে। এতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তার কসম সবই মিথ্যা। এই মুনাফিক সরদারের হিতাকাঙ্ক্ষায় কেউ কেউ তাকে বলল : তুই জানিস কোরআনে তোরা সম্পর্কে কি নাযিল হয়েছে? এখনও সময় আছে, তুই রসুলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে হাযির হয়ে অপরাধ স্বীকার করে নে। রসুলুল্লাহ্ (সা) তাঁর জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। সে উত্তরে বলল : তোমরা আমাকে বিশ্বাস স্থাপন করতে বলেছিলে, আমি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। এরপর তোমরা আমাকে অর্থ-সম্পদের যাকাত দিতে বলেছিলে, আমি তাও দিতেছি। এখন আর কি বাকী রইল? আমি কি মুহাম্মদ (সা)-কে সিজদা করব? এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। এতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, যখন তার অন্তরে ইমানই নেই, তখন তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা উপকারী হতে পারে না।

এই ঘটনার পর ইবনে উবাই মদীনার পৌছে বেশীদিন জীবিত থাকেনি—শীঘ্রই মৃত্যুখে পতিত হয়।—(মামহারী)

هُمْ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تَنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُوا

আহজাহ্ মুহাজির ও মিনান আনসারীর ঋণভার সময় ইবনে উবাই-ই একথা বলেছিল। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এর এই জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, নির্বোধরা মনে করে মুহাজিরগণ তাদের দান-খয়রাতের মুখাপেক্ষী এবং ওরাই তাদের অন্ন যোগায়। অথচ সমগ্র নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের ধনভাণ্ডার আল্লাহর হাতে। তিনি ইচ্ছা করলে মুহাজিরগণকে তোমাদের কোন সাহায্য ছাড়াই সবকিছু দিতে পারেন। ইবনে উবাইয়ের এরূপ মনে করা নিবুদ্ধিতা ও বোকামির পরিচায়ক। তাই কোরআন পাক এ স্থলে لَا يَفْقَهُونَ বলে ব্যক্ত করেছে যে, যে এরূপ মনে করে, সে বেওকুব ও নির্বোধ।

يَقُولُونَ لَنَنْ رَّجِعَنَّ إِلَى الْمَدِينَةِ لَنُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ

এটাও ইবনে উবাইয়ের উক্তি। এই উক্তির ভাষা অস্পষ্ট হলেও উদ্দেশ্য অস্পষ্ট ছিল না যে, সে নিজেকে এবং মদীনার আনসারগণকে শক্তিশালী ও ইয়যতদার এবং এর বিপরীতে রসূলুল্লাহ (সা) ও মুহাজির সাহাবায়ে কিরামকে দুর্বল ও হেয় বলে প্রকাশ করেছিল। সে মদীনার আনসারগণকে উত্তেজিত করেছিল, যাতে তারা এই দুর্বল ও 'হেয়' লোকদেরকে মদীনা থেকে বহিষ্কৃত করে দেয়। আল্লাহ তা'আলা এর জওয়াবে তার কথা তারই দিকে উল্টে দিয়েছেন যে, যদি ইয়যত ওয়ালারা 'হেয়' লোকদেরকে বের করেই দেয়, তবে এর কুফল তোমাদেরকেই ভোগ করতে হবে। কেননা, ইয়যত তো আল্লাহর, তাঁর রসূলের এবং মু'মিনদের প্রাণ্য। কিন্তু মূখতার কারণে তোমরা এ সম্পর্কে বেখবর। এখানে কোরআন لَا يَعْلَمُونَ

এবং এর আগে لَا يَفْقَهُونَ শব্দ ব্যবহার করেছে। এই পার্থক্যের কারণ এই যে, কোন মানুষ নিজেকে অন্যের রিয়াকদাতা মনে করলে এটা নিরেট জ্ঞান বুদ্ধির পরিপন্থী এবং নিবুদ্ধিতার আলামত। পক্ষান্তরে ইয়যত ও অপমান দুনিয়াতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনে লাভ করে। তাই এতে বিভ্রান্তি হলে সেটা বেখবর ও অনভিজ্ঞ হওয়ার প্রমাণ। তাই এখানে لَا يَعْلَمُونَ বলা হয়েছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۖ فَأَصَّدَّقَ ۚ وَ أَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ ۝ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

(৯) হে মু'মিনগণ! তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে। যারা এ কারণে গাফেল হয়, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। (১০) আমি তোমাদেরকে যা দিচ্ছি, তা থেকে মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় কর। অন্যথায় সে বলবে: হে আমার পালনকর্তা! আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি সদকা করতাম এবং সংকামীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ কাউকে অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে খবর রাখেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মু'মিনগণ। তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি (অর্থাৎ দুনিয়ার সবকিছু) যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ (ও আনুগত্য অর্থাৎ গোটা দীন) থেকে গাফেল না করে (অর্থাৎ তোমরা দুনিয়াতে এমন মগ্ন হয়ে না যাতে দীনের ক্ষতি হয়)। যারা এরাপ করবে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (কারণ দুনিয়ার উপকার তো ধ্বংস হয়ে যাবে; পরকালের ক্ষতি দীর্ঘ অথবা চিরস্থায়ী থেকে যাবে।

لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ

এর ব্যাপক বিষয়বস্তু থেকে

একটি বিশেষ আর্থিক ইবাদত অর্থাৎ সদকার আদেশ করা হচ্ছে :) আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে (জরুরী প্রাপ্য) মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় কর। অন্যথায় সে (পরিতাপ করে) বলবে : হে আমার পালনকর্তা! আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি সদকা করতাম এবং সৎ কর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। (তার এই বাসনা ও পরিতাপ মোটেই উপকারী হবে না। কারণ) প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময় যখন (খতম হয়ে) আসে, তখন আল্লাহ কাউকে অবকাশ দেন না। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত (কাজেই যেমন করবে, তেমনি ফল পাবে)।

আনুমানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ

মুনাফিকদের মিথ্যাশপথ ও চক্রান্ত উল্লেখ করা হয়েছিল। দুনিয়ার মহক্বতে পরাভূত হওয়াই ছিল এ সব কিছুর সারমর্ম। এ কারণেই তারা একদিকে মুসলমানদের কবল থেকে আত্ম-রক্ষা এবং অপরদিকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদে ভাগ বসাবার উদ্দেশ্যে বাহ্যত নিজেদেরকে মুসলমান বলে প্রকাশ করত। মুহাজির সাহাবীদের পেছনে ব্যয় করার ধারা বন্ধ করার যে চক্রান্ত তারা করেছিল, এর পশ্চাতেও এ কারণই নিহিত ছিল। এই দ্বিতীয় রুকুতে খাঁটি মু'মিনদেরকে সঙ্কোচন করে সতর্ক করা হয়েছে যে, তোমরা মুনাফিকদের ন্যায় দুনিয়ার মহক্বতে মগ্ন হয়ে যেয়ো না। যেসব বিষয় মানুষকে দুনিয়াতে আল্লাহ থেকে গাফেল করে, তন্মধ্যে দুটি সর্ব-বৃহৎ—ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি। তাই এই দুটির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। নতুবা দুনিয়ার যাবতীয় ভোগ-সন্তারই উদ্দেশ্য। আয়াতের সারমর্ম এই যে, ধনসম্পদ ও সন্তান সন্ততির মহক্বত সর্বাবস্থায় নিন্দনীয় নয়। বরং এগুলো নিয়ে ব্যাপৃত থাকা এক পর্যায়ে কেবল জায়েযই নয়—ওম্মাজিবও হয়ে যায়। কিন্তু সর্বদা এই সীমানার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এসব বস্তু যেন মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে দেয়। এখানে 'আল্লাহর স্মরণের' অর্থ কোন কোন তফসীরবিদের মতে পাঞ্জগানা নামায, ক্বারও মতে হজ ও যাকাত এবং কারও মতে কোরআন। হযরত হাসান বসরী (র) বলেন : স্মরণের অর্থ এখানে যাবতীয় আনুগত্য ও ইবাদত। এই অর্থ সব কিছুতে পরিব্যাপ্ত।—(কুরতুবী)

সারকথা এই যে, আল্লাহর স্মরণ তথা ইবাদত থেকে মানুষকে গাফেল করে না, এতটুকু পর্যন্ত সাংসারিক বিষয়াদিতে ব্যাপৃত থাকার অনুমতি আছে। সাংসারিক বিষয়াদিতে

এতটুকু ভূষে যাওয়া উচিত নয় যে, ফরয ও ওয়াজিব কর্মে বিল দেয়া দেয় অথবা হারাম ও মকরুহ কাজে লিপ্ত হওয়া অস্বীকার করে পড়ে। যারা সাংসারিক কাজে এরূপ

যত্ন করে পড়ে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে : **أُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ** অর্থাৎ

ভারাই কতিপয়। কারণ, তারা পরকালের মহান ও চিরন্তন নিয়ামতসমূহের পরিবর্তে দুনিয়ার নিকৃষ্ট ও ক্ষণস্থায়ী নিয়ামত অবলম্বন করে। এর চাইতে বড় ক্ষতি আর কি হবে।

এ—**وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ**

আয়াতে মৃত্যু আসার অর্থ মৃত্যুর লক্ষণাদি প্রকাশ পাওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, মৃত্যুর লক্ষণাদি সামনে আসার আগেই স্বাস্থ্য ও শক্তি অটুট থাকা অবস্থায় তোমাদের ধনসম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে পরকালের পুঁজি করে নাও। নতুবা মৃত্যুর পর এই ধনসম্পদ তোমাদের কোন কাজে আসবে না। পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, 'আল্লাহর স্মরণের' অর্থ যাবতীয় ইবাদত ও শরীয়াতের আদেশ-নিষেধ পালন করা। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ধনসম্পদ ব্যয় করাও এর অন্তর্ভুক্ত। এরপর এখানে অর্থ ব্যয় করাকে পৃথকভাবে বর্ণনা করার দুটি কারণ হতে পারে। এক. আল্লাহ ও তাঁর আদেশ-নিষেধ পালনে মানুষকে গাফেলকারী সর্বস্বহৎ বশু হুচ্ছে-ধন সম্পদ। তাই স্বাকাত, ওশর, হজ্ব ইত্যাদি আর্থিক ইবাদত স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে। দুই. মৃত্যুর লক্ষণাদি দৃষ্টির সামনে আসার সময় কারও সাধ্য নেই এবং কেউ কল্পনাও করতে পারে না যে, কামা নামাযগুলো পড়ে নেবে, কামা হজ্ব আদায় করবে অথবা কামা রোযা রাখবে। কিন্তু ধনসম্পদ সামনে থাকে এবং এ বিশ্বাস হয়েছেই যায় যে, এখন এই ধন তার হাত থেকে চলে যাবে। তখনও তাড়াতাড়ি ধনসম্পদ ব্যয় করে আর্থিক ইবাদতের স্তুতি থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করে। এছাড়া দান-খয়রাত যাবতীয় আপদ-বিপদ দূর করার ব্যাপারেও কার্যকর।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করল : কোন্ সদকা সর্বাধিক সওয়াব পাওয়া যায়? তিনি বললেন : যে সদকা সূস্থ অবস্থায় এবং ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য করে — অর্থ ব্যয় করে ফেললে নিজেই দরিদ্র হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকা অবস্থায় করা হয়। তিনি আরও বললেন : আল্লাহর পথে ব্যয় করাকে সেই সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করো না, যখন আত্মা তোমার কণ্ঠ-নালীতে এসে যায় এবং তুমি মরতে থাক আর বল : এই পরিমাণ অর্থ অমুককে দিয়ে দাও, এই পরিমাণ অর্থ অমুক কাজে ব্যয় কর।

—**فَيَقُولُ رَبِّ تَوَلَّأْ خَرَّتْنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ** হযরত ইবনে আব্বাস (রা)

এই আয়াতের তফসীরে বলেন : যে ব্যক্তির যিম্মায় স্বাকাত ফরয ছিল কিন্তু আদায় করেনি অথবা হজ্ব ফরয ছিল কিন্তু আদায় করেনি, সে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে বাসনা প্রকাশ করে বলবে : আমি আমার দুনিয়াতে ফিরে যেতে চাই

অর্থাৎ মৃত্যু আস্তে কিছু বিলম্বে আসুক যাতে আমি সদকা-খয়রাত করে নেই এবং ফরয কর্ম থেকে মুক্ত হয়ে যাই।

— اَكُنْ مِنَ الْمُنِيعِينَ

এমন সৎ কর্ম করে নেব, যম্ভারা সৎ কর্ম পরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। যেসব ফরয বাদ পড়েছে, সেগুলো পূর্ণ করে নেব এবং যেসব হারাম ও মকরাহ কাজ করেছি, সেগুলো থেকে তওবা করে নেব। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা বলে দিয়েছেন যে, মৃত্যু আসার পর কাউকে অবকাশ দেওয়া হয় না। সুতরাং এই বাসনা নিরর্থক।

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৩

সূরা মূলক

আয়োজনে



মাউন ফাউন্ডেশন

www.maunfoundation.org

سورة الملك

अज्ञा मूलक

महाभारत अथर्व, ७० अध्याय, २ अक्षर

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمَوْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ الَّذِي

خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ

الْفُورُ ۝ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۚ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ

مِن تَفَوُّتٍ فَأَرْجِعِ الْبَصَرَ ۚ هَلْ تَرَىٰ مِنْ فُطُورٍ ۝ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ

كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ۝ وَلَقَدْ زَيَّنَّا

السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ

عَذَابَ السَّعِيرِ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ۖ وَبِئْسَ

الْمَصِيرُ ۝ إِذَا الْفُؤَادُ مِنْ أَرْجَائِهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ۖ تَكَادُ تَمَيَّزُ

مِنَ الْغَيْظِ ۖ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلْتَهُمْ خَزَنَتُهُمْ أَمْ يَأْتِيكُمْ

نَذِيرٌ ۖ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ ۚ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ

اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ۖ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ۖ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ

أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ۖ فَاعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ ۖ

فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ۖ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ

مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۖ وَأَسِرُوا قُلُوبُكُمْ أَوْ أَجْهَرُوا بِهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمُ

يَذَاتِ الصُّدُورِ ۝ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ۚ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ۝ هُوَ
 الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن
 رِزْقِهِ ۚ وَالْيَوْمِ النَّشُورِ ۚ ءَاْمِنْتُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ
 الْاَرْضَ فَاِذَا هِيَ تَمُورُ ۚ ءَاْمَنْتُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ
 حَاصِبًا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيرٍ ۝ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِن قَبْلِهِمْ
 فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرٍ ۚ اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ طَافَتْ وَّيَقْبِضَنَّ
 مَا يَشَاءُنَّ اِلَّا اِلَ الرَّحْمٰنِ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيْرٌ ۝ اٰمَنَ هَٰذَا
 الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمۥ يَتَصَرَّحُكُمۥ مِّنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ ۚ اِنْ الْكَافِرُوْنَ
 اِلَّا فِيْ غُرُورٍ ۝ اٰمَنَ هَٰذَا الَّذِي يَزْعُمُكُمۥ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهُ ۚ بَلْ
 لَّجُوْا فِيْ عُتُوٍّ وَّ نُفُوْرٍ ۚ اٰمَنَ يَّتَشَّىٰ مَكِيَّا عَلَٰ وَجْهٍ اَهْدَىٰ
 اٰمَنَ يَّتَشَّىٰ سَوِيَّا عَلَٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝ قُلْ هُوَ الَّذِي اَنْشَأَكُمْ
 وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ ۚ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۝
 قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْاَرْضِ وَالْيَوْمِ تُحْشَرُوْنَ ۝ وَيَقُولُوْنَ
 مَعَهُ هَٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ
 وَاِنَّمَا اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝ فَلَمَّا رَاوْهُ زُلْفَةً سِيَّتُ وَجْهَهُ الَّذِيْنَ
 كَفَرُوْا وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُوْنَ ۝ قُلْ اَرَاَيْتُمْ
 اِنْ اَهْلَكَنِي اللّٰهُ وَمَنْ مَّعِيَ اَوْ رَحِمَنَا ۚ فَمَنْ يُجِزُّ الْكَافِرِيْنَ مِنْ
 عَذَابِ الْيَوْمِ ۝ قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۚ

فَسَخَّلُونَا مِنْ هَوَا فِي مَالِي مُبِينٍ ۝ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مُوَبِّقٍ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) পুণ্যময় তিনি, যার হাতে রাজত্ব। তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। (২) যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন—কে তোমাদের মধ্যে কর্মে স্রেষ্ঠ? তিনি পরাক্রমশালী, জ্ঞানাময়। (৩) তিনি সন্ত আকাশ ভরে ভরে সৃষ্টি করেছেন। তুমি করুণাময় আল্লাহর সৃষ্টিতে কোন তুচ্ছ দেখতে পাবে না। আবার দৃষ্টি কিরাও কোন ফাটল দেখতে পাও কি? (৪) অতঃপর তুমি বারবার ডাকিয়ে দেখ—তোমার দৃষ্টি বার্থ ও পরিভ্রান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে। (৫) আমি সর্বনিম্ন আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুসজ্জিত করেছি; সেগুলোকে শরতানদের জন্য রূপপাত্র করছি এবং প্রস্তুত করে রেখেছি তাদের জন্য স্বলভ অগ্নির শাবি। (৬) যারা তাদের পালনকর্তাকে অস্বীকার করেছে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাবি। সেটা কত মিক্রুস্ত স্থান। (৭) যখন তারা তথ্য নিষ্কিন্ত হবে, তখন তার উৎকিন্ত গর্জম শুনেতে পারে। (৮) কোণে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে। যখনই তাতে কোন সম্পদায় নিষ্কিন্ত হবে তখন তাদেরকে তার সিপাহীরা জিজ্ঞাসা করবে: তোমাদের কাছে কি কোন সতর্ককারী আগমন করেনি? (৯) তারা বলবে: হ্যাঁ, আমাদের কাছে সতর্ককারী আগমন করেছিল, অতঃপর আমরা মিথ্যারোপ করেছিলাম এবং বলেছিলাম: আল্লাহ কোন কিছু নাখিল করেন নি। তোমরা মহা বিম্বাধিতে পড়ে রওয়ে। (১০) তারা আরও বলবে: যদি আমরা ওনতায় অথবা বুদ্ধি খাটাতাম, তবে আমরা জাহান্নামবাসীদের মধ্যে থাকতাম না। (১১) অতঃপর তারা তাদের অগরাধ স্বীকার করলে। জাহান্নামীরা দূর হোক। (১২) নিশ্চয় যারা তাদের পালনকর্তাকে না দেখে উন্ন কড়ে, তাদের জন্য রয়েছে জন্ম ও মহাপুরকার। (১৩) তোমরা, তোমাদের স্বাধা পোপনে বল অথবা প্রকাশে বল, তিনি তো অস্তরের বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক অবগত। (১৪) যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি করে জানবেন না? তিনি সুস্ব জানী সম্যক জ্ঞাত। (১৫) তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে সুগম করেছেন, অতএব তোমরা তাঁর কাঁধে বিচরণ কর এবং তাঁর দেয় দিখিক জাহান্নাম কর+ ফাঁদই কাছে পুনরাব্রাজন হবে। (১৬) তোমরা কি জুবনা-মুক্ত হয়ে গেছ যে, আকাশে যিনি জাহান্নাম, তিনি তোমাদেরকে তুচ্ছত বিলীন করে দেবেন, অতঃপর কাঁপতে থাকবে। (১৭) না, তোমরা নিশ্চিত হয়ে গেছ যে আকাশে যিনি জাহান্নাম, তিনি তোমাদের উপর প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, অতঃপর তোমরা জানতে পারবে কেমন ছিল জাহান্নাম সতর্কশালী। (১৮) তাদের পূর্ববর্তীরা মিথ্যারোপ করেছিল, অতঃপর কৃত কঠোর হয়েছিল আমার অস্বীকৃতি। (১৯) তারা কি লজ্জা করে না তাদের মাথার উপর উত্ত পক্ষীকুলের প্রতি—পাখা বিস্তারকারী ও পাখা সংকোচনকারী? রহমান আল্লাহ—ই তাদেরকে স্থির রাখেন। তিনি সর্ববিষয় দেখেন। (২০) রহমান আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন

সৈন্য আছে কি, যে তোমাদেরকে সাহায্য করবে? কাফিররা বিজ্ঞাতিতেই পতিত আছে। (২১) তিনি যদি রিষিক বন্ধ করে দেন, তবে কে আছে, যে তোমাদেরকে রিষিক দেবে? বলং তারা জবাবীতা ও বিমুখতার ভাবে রয়েছে। (২২) যে ব্যক্তি উপুড় হয়ে মুখে তর দিয়ে চলে, সে-ই কি সং পথে চলে, না সেই ব্যক্তি যে সোজা হয়ে সরল পথে চলে? (২৩) বলুন, তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং দিয়েছেন কর্ণ, চক্ষু ও জন্তর। তোমরা অজ্ঞই রুতভতা প্রকাশ কর (২৪) বলুন, তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে বিস্তৃত করেছেন এবং তীরই কাছে তোমরা সমবেত হবে। (২৫) কাফিররা বলে : এই প্রতিশ্রুতি কবে হবে। যদি তোমরা সত্যবাদী হও? (২৬) বলুন, এর জ্ঞান আল্লাহর কাছেই আছে। আমি তো কেবল প্রকাশ্য সতর্ককারী। (২৭) যখন তারা সেই প্রতিশ্রুতিকে আসন্ন দেখবে তখন কাফিরদের মুখমণ্ডল মলিন হয়ে পড়বে এবং বলা হবে : এটাই তো তোমরা চাইতে। (২৮) বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ—যদি আল্লাহ আমাকে ও আমার সংপীদদেরকে ধ্বংস করেন অথবা আমাদের প্রতি দয়া করেন, তবে কাফিরদেরকে কে যত্নপাদায়ক শান্তি থেকে রক্ষা করবে? (২৯) বলুন, তিনি পরম করুণাময়, আমরা তাতে বিশ্বাস রাখি এবং তারই উপর ভরসা করি। সত্যরই তোমরা জনহিত পারবে কে প্রকাশ্য পথদলিতার আছে। (৩০) বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি যদি তোমাদের পানি ভূগর্ভের গভীরে চলে যায় তবে কে তোমাদেরকে সরবরাহ করবে পানির স্রোতধারা।

তকসীরের সার-সংক্ষেপ

পুণ্যময় (আল্লাহ) তিনি, যার কক্ষার সমস্ত রাজত্ব। তিনি সবকিছুর উপর সর্ব-শক্তিমান। যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন—কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম। (কর্ম সুন্দর হওয়ার মধ্যে মৃত্যুর প্রভাব এই যে, মৃত্যু চিন্তার কারণে মানুষ দুনিয়াকে ধ্বংসশীল এবং ক্রিয়ামতের বিশ্বাসের ফলে পরকালকে অজ্ঞান মনে করতে পারে এবং পরকালের সওয়াব অর্জন ও পরকালের শান্তি থেকে আত্মরক্ষার্থে কর্ম-ভংগর হতে পারে। জীবনের প্রভাব এই যে, জীবন-না হলে কর্ম কখন করবে। অতএব কর্ম সুন্দর হওয়ার জন্য মৃত্যু-যেন শর্ত এবং জীবন-যেন পাত্র। নিছক না থাকাই স্নেহেতু মৃত্যু মরণ তাই এটা সৃজিত হতে পারে।) তিনি পরাক্রমশালী, ক্রমাময়। (কাজেই অসুন্দর কর্মের শান্তি এবং সুন্দর কর্মের জন্য ক্ষমা ও সওয়াব দান করেন)। তিনি ক্রান্ত আকাশ দ্বারে ভরে সৃষ্টি করেছেন। (সহীহ হাদীসে আছে, এক আকাশের উপরে অনেক দূরত্বে দ্বিতীয় আকাশ অবস্থিত। এমনভাবে আরও আকাশ রয়েছে। অতঃপর আকাশের মজবুতী বর্ণনা করা হচ্ছে যে হে দর্শক) তুমি আল্লাহর সৃষ্টিতে কোন তফাৎ দেখতে পাবে না। আবার দৃষ্টিগত কর—কোন ফাটল দেখতে পাও কি? (অর্থাৎ অগভীর দৃষ্টিতে তো অনেকবার দেখেছ। এবার গভীর দৃষ্টিতে দেখ) অতঃপর তুমি বারবার তাকিয়ে দেখ—তোমার দৃষ্টি কার্য ও পরিলাভ হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে। (কিন্তু কোন-টিও দৃষ্টিগোচর হবে না। সূর্য্য আল্লাহ যেভাবে ইচ্ছা সৃষ্টি করতে পারেন। আকাশকে এমন মজবুত করে সৃষ্টি

করেছেন যে, দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পরও এতে কোন দ্রুতি দেখা যায় না। মোট কথা তাঁর সব স্বকম ক্ষমতা আছে। আমার শক্তি-সামর্থ্যের প্রমাণ এই যে) আমি সর্বমিশন আকাশকে প্রদীপমালা (অর্থাৎ নক্ষত্ররাজি) দ্বারা সুশোভিত করেছি, এগুলোকে (অর্থাৎ নক্ষত্ররাজিকে) পরতানের জন্য ক্ষেপণ করছি (সূরা হাজের এর স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে) এবং আমি তাঁদের (অর্থাৎ শত্রুতানের) জন্য (দুনিয়ার এই ক্ষেপণস্থল ছাড়া পরকালে কুফরের কারণে) জাহান্নামের শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। যারা তাদের পালনকর্তাকে (অর্থাৎ তাঁর তওহীদ) অস্বীকার করে তাঁদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। সেটা কত নিকৃষ্ট স্থান। যখন তারা তথায় নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তার উৎক্ষিপ্ত গর্জন শুনে পাবে। ক্রোধে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে। (হয় আল্লাহ তার মধ্যে উপলব্ধি ও ক্রোধ সৃষ্টি করে দেবেন, ফলে সে-ও কাফিরদের প্রতি ক্রোধান্বিত হবে, না হয় দৃষ্টান্তস্বরূপ এ কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ যেমন কেউ ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে যায়, তেমনি জাহান্নাম তাঁর উদ্বেজনাবশত জোশ মারতে থাকবে।) যখনই তাতে কোন (কাফির) সম্প্রদায় নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তাদেরকে তার স্রষ্টার জিজ্ঞাসা করবে : তোমাদের কাছে কি কোন সন্তর্ককারী (পঙ্গগছর) আগমন করেনি? (যে তোমাদেরকে এই শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করত এবং ফলে তোমরা এ থেকে আত্মরক্ষার উপকরণ সংগ্রহ করতে?) এই প্রশ্ন শাসানোর উদ্দেশ্যে করা হবে। অর্থাৎ পঙ্গগছর তো অবশ্যই আগমন করেছিল। প্রত্যেক নবাগত সম্প্রদায়কে এই প্রশ্ন করা হবে। কেননা, কুফর ভেদে কাফিরদের সব সম্প্রদায় একের পর এক জাহান্নামে যাবে। তারা (অপরাধ স্বীকার করে) বলবে : হ্যাঁ, আমাদের কাছে সন্তর্ককারী (পঙ্গগছর) আগমন করেছিল। অতঃপর (দুর্ভাগ্যক্রমে) আমরা মিথ্যারোপ করেছিলাম এবং বলেছিলাম : আল্লাহ (বিধি-বিধান ও কিতাব ধরনের) কোন কিছু নাথিক করেন নি। তোমরা বিভ্রান্তিতে পড়ে রয়েছে। তারা (ফেরেশতাদের কাছে) আরও বলবে : যদি আমরা সত্যবাদী অথবা বুদ্ধি ষাটাতাম, তবে আমরা জাহান্নামীদের মধ্যে থাকতাম না। মোট কথা, তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। জাহান্নামীদের প্রতি অভিলাপ। নিশ্চয় যারা তাদের পালনকর্তাকে না দেখে ভয় করে, (ঈমান ও আনুগত্য অবলম্বন করে) তাদের জন্য (নির্ধারিত) রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। তোমরা গোপনে কথা বল অথবা প্রকাশ্যে (তিনি সব জানেন। কেননা) তিনি তো জব্বরের বিষয়াদি সম্পর্কেও সম্যক অবগত। যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি করে জানবেন না? তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক জ্ঞাত। এই সৃষ্টির সারমর্ম এই যে, তিনি প্রত্যেক বস্তুর নিয়ন্ত্রণ-প্রক্টার। অতএব তোমাদের কর্ম এবং কথাবার্তারও প্রক্টার। তান স্বাতীত কোন বস্তু সৃষ্টি করা যায় না। তাই আল্লাহর জন্য প্রত্যেক বস্তুর তান অপরিহার্য। এখানে কেবল কথাবার্তা সম্পর্কিত তানই উদ্দেশ্য নয়, বরং কর্মও এতে দাখিল আছে। তবে কর্মের তুলনায় কথাবার্তা বেশী বিধায়-বিশেষ করে কথাবার্তা উল্লেখ করা হয়েছে। মোট কথা, তিনি সব জানেন এবং প্রত্যেককে উপযুক্ত প্রতিদান দেবেন। তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে সুগম করেছেন। (ফলে তোমরা প্রকৃতপক্ষে যত্নভর গমনাগমন করতে পার) অতএব তোমরা তার বুকের উপর বিচরণ কর এবং (পৃথিবীতে সৃষ্টি) আল্লাহর রযিক আহ্বার কর (পান কর) এবং (পানাহার করে তাঁকে স্মরণ কর। কেননা) তাঁরই কাছে পুনরুজ্জীবন হবে। (মৃতদের তাঁর নিয়ন্ত্রণতসমূহের শোকর আদায়, যা ঈমান ও আনুগত্য)। তোমরা কি ভাবনাবৃত্ত হয়ে গেছ যে, তিনি আকাশে

(সর্বময় ক্ষমতা নিয়ে) আছেন, তিনি তোমাদেরকে (কারানের দ্বারা) ভূমিতে নিখিল করে দেবেন, অতঃপর তা কীপতে থাকবে (ফলে তোমরা আরও নীচে চলে যাবে এবং ভূমি তোমাদের উপরে এসে যাবে) না তোমরা নিশ্চিত হয়ে গেছ যে, যিনি আকাশে (সর্বময় ক্ষমতা নিয়ে) আছেন, তিনি তোমাদের উপর (আদ সম্প্রদায়ের ন্যায়) বন্যাবাহু প্রেরণ করবেন (ফলে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে)। অর্থাৎ তোমাদের কুফরের উপযুক্ত শাস্তি এটাই। অতএব (কোন উপযোগিতাবশত দুনিয়ার শাস্তি টলে গেলেই কি) সম্বরই (যুদ্ধের পরই) তোমরা জানতে পারবে (আসাব থেকে) আমার সতর্কবাণী কেমন (নিখিল) ছিল। (যদি দুনিয়ার শাস্তি ব্যক্তি বাতীত তারা কুফরের অপকারিতা বুঝতে সক্ষম না হয়, তবে এর নমুনাও বিদ্যমান আছে। সেমতে) তাদের পূর্ববর্তীরা (সত্য ধর্মের প্রতি) মিথ্যা অঙ্গরোপ করেছিল। অতএব (দেখে নাও তাদের প্রতি) আমার শাস্তি কেমন হয়েছিল। (এ থেকে পরিকল্পনা বোঝা যায় যে কুফর গম্ভীর। সুতরাং কোন কারণে দুনিয়াতে শাস্তি না হলেও পরভূগতে শাস্তি হবে। خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ আয়াতে আকাশ সম্পর্কিত তওহীদের

প্রমাণাদি বর্ণিত হয়েছে এবং هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ আয়াতে পৃথিবী সম্পর্কিত

প্রমাণাদি ব্যক্ত হয়েছে। অতঃপর শূন্যমণ্ডল সম্পর্কিত প্রমাণাদি ব্যক্ত করা হচ্ছে :) তারা কি লক্ষ্য করে না তাদের মাথার উপর উত্তম পক্ষীকূলের প্রতি—পাখা বিস্তারকারী ও পাখা সংকোচনকারী ? (উভয় অবস্থাতে ভারী ও ওজনবিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও আকাশ এবং পৃথিবীর মধ্যবর্তী শূন্যমণ্ডলে অবশ্যে বিচরণ করে—যাচিতে পতিত হয় না)। সন্ধ্যায় আল্লাহ্ বাতীত কেউ তাদেরকে স্থির রাখে না। তিনি সবকিছু দেখেন। (যেভাবে ইচ্ছা পরিচালনা করেন। আল্লাহর ক্ষমতা তো শুনলে, এখন বল) রহমান আল্লাহ্ বাতীত কে তোমাদের সৈন্য-বাহিনী হয়ে (বিপদাপদ থেকে) তোমাদেরকে রক্ষা করবে ? কাকিররা (যারা তাদের উপাস্য সম্পর্কে একপ ধারণা গোষণ করে তারা) তো নিরেট বিভ্রান্তিতে পতিত রয়েছে। (আরও বল) তিনি যদি রিমিক বন্ধ করে দেন, তবে কে আছে, যে তোমাদেরকে রিমিক দেবে ? (কিন্তু তারা এতেও প্রভাবান্বিত হয় না) বরং তাঁরা অবাধ্যতা ও (সত্যের প্রতি) বিশ্বস্ততার ভূবে রয়েছে। (সারকথা এই যে, তোমাদের মিথ্যা উপাস্যরা কেমন অনিশ্চয় পূর্ণ করতে সক্ষম নয়, فَلَمْرُكُم আয়াতে তাই বলা হয়েছে এবং কোন উপকার

দেওয়াতেও সমর্থ নয়, هُزِزْتُمْ আয়াতে তাই ব্যক্ত করা হয়েছে। এমতাবস্থায় তাদের আরাধনা করা নিরেট বোকামি। উপরে বর্ণিত কাকিরদের অবস্থা শুনে এখন চিন্তা কর যে) যে ব্যক্তি (অসমতুল্য ক্ষমতার কারণে হেঁচকি খেলে-খেলে) ঊপড় হয়ে মুখে তর দিয়ে চলে, সে-ই কি গম্ভীরভাবে দৌঁদবে, না সে ব্যক্তি, যে সোজা হয়ে সমতল সড়কে চলে ? (যুমিন ও কাকিরের অবস্থা ভদ্রপাই। যুমিনের চলার পথ সরল ধর্ম এবং সে চলেও সোজা হয়ে দৃঢ়তা ও বাহ্যিক থেকে আশ্রয় চায়। পক্ষান্তরে কাকিরের চলার পথ বক্রতা এবং পথভ্রষ্টতা পূর্ণ এবং চলার মধ্যেও সর্বদা বিপদাপদে পতিত হয়। এমতাবস্থায়

সে পথকাছেরে ফিরিয়ে পৌছবে? উপরে তওহীদের অগত সম্প্রকিত প্রমাণাদি বর্ণিত হয়েছে, অতঃপর আত্মা সম্প্রকিত প্রমাণাদি বর্ণনা করা হচ্ছে :) বলুন, তিনিই (এমন সক্ষম ও নিরামতদাতা যিনি) তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর দিয়েছেন (কিন্তু) তোমরা অতীত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (আরও) বলুন, তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে বিস্তৃত করেছেন এবং (কিয়ামতের দিন) তোমরা তাঁরই কাছে সমবেত হবে। কাকিররা (যখন কিয়ামতের কথা শুনে, তখন) বলে : এই প্রতিশ্রুতি কবে হবে, যদি তোমরা (অর্থাৎ পরসম্মত ও তাঁর অনুসারীরা) সত্যবাদী হও, (তবে বল) বলুন : এর (নিদিশ্টি) ভান-আজাহর কাছেই আছে। আমি তো কেবল (সংক্ষেপে কিন্তু) প্রকাশ্য সত্যবাক্যী। অতঃপর যখন তারা একে (অর্থাৎ কিয়ামতের আশ্রয়কে) আসন্ন দেখবে, তখন (দুঃখপ্রিয়ম্ভো) কাকিরদের মুখমণ্ডল স্ফাণ-হয়ে পড়বে (অন্য আশ্রয়ে আছে,
 ﴿وَجُوهُهُمْ مَلْفُوفَةٌ﴾ এবং (তাদেরকে বলা হবে : এটাই তো

তোমরা চাইতে। [তোমরা বলতে আশ্রয় আন, আশ্রয় আন। কাকিররা তওহীদ, পুনরুত্থান ইত্যাদি বিষয়বস্তু শুনে এমন কথাবার্তা বলত, যা ছিল প্রকারান্তরে রসুলুল্লাহ (সা)-র মৃত্যু কামনা এবং তাঁকে পথভ্রষ্ট বলে আখ্যায়িত করা। তাই অতঃপর এর জুওয়াব শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। এতে কাকিরদের আশ্রয় এবং অন্যান্য বিষয়বস্তুও সংস্কৃত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে :] বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখছ—যদি আজাহ্ আমাকে ও আমার সংগীদেরকে (জেহাদে কামনা অনুযায়ী) ধ্বংস করেন অথবা (আমাদের আশা ও স্বীয় ওয়াদা অনুযায়ী) আমাদের প্রতি দয়া করুন, তবে তোমাদের কি, তোমরা তো কাকিরই এবং) কাকিরদেরকে স্বত্বপাদায়ক শাস্তি থেকে কে রক্ষা করবে? (অর্থাৎ আমাদের যা হবে, দুনিয়াতে হবে এবং এর পরিণাম সর্বাবস্থায় শুভ। কিন্তু তোমরা নিজেদের ব্যাপারে চিন্তা কর। তোমাদের দিকে যে মহাবিপদ এলিরে আসছে তাকে কে প্রতিরোধ করবে? আমাদের পাখিব বিপদাপদ দ্বারা তোমাদের সেই মহাবিপদ টলে যাবে না। অতএব নিজের চিন্তা ছেড়ে আমাদের বিপদ কামনা করা অনর্থক বৈ নয়। আপনি আমাদেরকে আরও) বলুন, তিনি আমাদের প্রতি করুণাময়, আমরা (তাঁর আদেশ অনুযায়ী) তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখি এবং তাঁরই উপর ভরসা করি। (সুতরাং ঈমানের বরকতে তিনি আমাদেরকে পরকালের আশ্রয় থেকে মুক্তি দেবেন এবং ভরসার বরকতে তিনি আমাদেরকে পাখিব বিপদাপদ থেকে বাঁচাবেন অথবা সহজ করে দেবেন। অতএব সহজই তোমরা জানতে পারবে (যখন নিজেদেরকে আশ্রয়ে পতিত এবং আমাদেরকে মুক্ত দেখবে) প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় কে লিপ্ত আছে? (অর্থাৎ তোমরাই আছ না আমরা-আছি। উপরে বলা হয়েছে যে, কাকিরদেরকে স্বত্বপাদায়ক শাস্তি থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। যদি কাকিররা মনে করে যে, তাদের মিথ্যা উপাস্য তাদেরকে রক্ষা করবে, তবে জই ধারপার নিরসনকরে আপনি) বলুন, তোমরা ভেবে দেখছ কি, যদি তোমাদের (কূপের) পানি নিশ্চেন (নেই) অদৃশ্যই হয়ে যায়, তবে কে তোমাদেরকে সরবরাহ করবে স্রোতের পানি (অর্থাৎ কে কূপে স্রোত প্রবাহিত করবে এবং ভূগর্ভের গভীর থেকে পানি উপরে আমবে। কেউ যদি খনন করায় পানি দেখায়, তবে আজাহ্ তা'আলা পানি আরও নীচে গিয়েব করে দিতে সক্ষম। যখন

আল্লাহর মুকাবিলায় এতটুকু করতেও কেউ সক্ষম নয়, তখন পরকালে আযাব থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে কিরূপে)?

আনুমানিক আতব্য বিষয়

সূরা মুলকের কবীলাত : এই সূরাকে হাদীসে ওয়াকিয়া ও মুনজিয়া বলা হয়েছে। 'ওয়াকিয়া' শব্দের অর্থ রক্ষাকারী এবং 'মুনজিয়া' শব্দের অর্থ মুক্তিদানকারী। রসুলুল্লাহ (সা) বলেন : **هِيَ الْمَانِعَةُ الْمَلْحِيَةِ تَنْجِيهِ مِنَ عَذَابِ الْقَبْرِ** অর্থাৎ এই সূরা আযাব রোধ করে এবং আযাব থেকে মুক্তি দেয়। যে এই সূরা পাঠ করে, তাকে এই সূরা কবরের আযাব থেকে রক্ষা করবে।—(কুরতুবী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর রেওয়াজেতক্রমে রসুলুল্লাহ (সা) বলেন : আমার আন্তরিক বাসনা এই যে, সূরা মুলক প্রত্যেক মু'মিনের অন্তরে থাকুক। হযরত আবু হুরায়রা (রা)-র রেওয়াজেতক্রমে রসুলুল্লাহ (সা) বলেন : আল্লাহর কিতাবে একটি সূরা আছে, যার আয়াত তো মাত্র ত্রিশটি কিন্তু কিরামতের দিন এই সূরা এক এক ব্যক্তির পক্ষে সুপারিশ করবে এবং তাসেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আয়াতে দাখিল করবে সেটা সূরা মুলক।—(কুরতুবী)

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

শব্দটি **كُنْتَ** থেকে উদ্ভূত। এর শাব্দিক অর্থ বেশী হওয়া। এই শব্দটি আল্লাহর শানে ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হয় সর্বোচ্চ ও মহান। **بِيَدِهِ الْمُلْكُ**—আল্লাহর হাতে রয়েছে

রাজত্ব। কোরআন পাকের স্থানে স্থানে আল্লাহর জন্য হাত অর্থে **يَدٌ** শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্বয়ং উদ্ভব। তাই এটা একটা **بِأَمْرٍ** শব্দ। একে সত্য বলে বিশ্বাস করা ওয়াজিব। কিন্তু একই অবস্থা ও স্বরূপ স্বরূপে আমার বিষয় নয়। এর পিছনে পড়া অবৈধ। রাজত্ব বলে আকাশ ও পৃথিবী এবং ইহকাল ও পরকালের রাজত্ব বোঝানো হয়েছে। আয়াতে আল্লাহ তা'আলার জন্য চারটি গুণ দাবী করা হয়েছে। এক, তিনি বিদ্যমান আছেন, দুই, তিনি চরম পূর্ণত্ব ওপের অধিকারী এবং সবার উদ্ভব, তিন, তাঁর রাজত্ব আকাশ ও পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত এবং চার, তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। পরবর্তী আয়াতসমূহে এই দাবীর যুক্তি-প্রমাণ রয়েছে, যা আল্লাহর সৃষ্ট জীবের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করলেই কুটে উঠে। তাই পরের আয়াতসমূহে সমগ্র সৃষ্ট জগৎ ও সৃষ্ট বস্তুর বিভিন্ন প্রকার দ্বারা আল্লাহর অস্তিত্ব, তওহীদ এবং তাঁর জ্ঞান ও শক্তির সপ্রমাণ করা হয়েছে। সর্বপ্রথম সৃষ্টির সেরা মানুষের অস্তিত্ব আল্লাহর কুদরতের খোঁসব নিদর্শন রয়েছে, সেগুলোর প্রতি দৃষ্টি করে বলা হয়েছে : **خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ**—এরপর

কয়েক আয়াতে আকাশ সৃষ্টিতে চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে প্রমাণ এনে বলা হয়েছে: **الَّذِي**

থেকে **هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا**—এরপর **—خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ**

দুই আয়াতে পৃথিবী সৃজন ও তার উপকারিতা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা বর্ণিত হয়েছে। অবশেষে

শূন্যমণ্ডলে বসবাসকারী সৃষ্ট জীব পক্ষীদের উল্লেখ করে **أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ** বলা

হয়েছে। মোটকথা, সমগ্র সূরার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব, জ্ঞান-শরিফা ও শক্তি-সামর্থ্যের পক্ষে প্রমাণাদি উপস্থাপিত করা। প্রসঙ্গক্রমে কাফিরদের শাস্তি, মু'মিনদের প্রতিদান ইত্যাদি বিষয়বস্তুও বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ জ্ঞান ও শক্তির যেসব প্রমাণ মানুষের মধ্যে রয়েছে দুইটি শব্দের মাধ্যমে সেগুলো নির্দেশ করা হয়েছে।

مَرَدُّهُ ও **الْمَوْتُ وَالْحَيَاةُ**—অর্থাৎ তিনি মরণ ও

জীবন সৃষ্টি করেছেন। মানুষের অবস্থাসমূহের মধ্যে এখানে কেবল মরণ ও জীবন এই দুইটি অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা, এই দুইটি অবস্থাই মানব জীবনের যাবতীয় হাল ও ক্রিয়াকর্মে পরিব্যাপ্ত। জীবন একটি অস্তিত্বাত্মক বিষয়-বিধায় এর জন্য 'সৃষ্টি' শব্দ যথার্থই প্রযোজ্য। কিন্তু মৃত্যু বাহ্যত নাস্তিবাচক বিষয়। অতএব একে সৃষ্টি করার মানে কি? এই প্রশ্নের জওয়াবে বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। সর্বাধিক স্পষ্ট উক্তি এই যে, মৃত্যু নিশ্চয় নাস্তিকে বলা হয় না, বরং মৃত্যুর সংজ্ঞা হচ্ছে আত্মা ও দেহের সম্পর্ক ছিন্ন করে আত্মাকে অন্যত্র স্থানান্তর করা। এটা অস্তিত্বাত্মক বিষয়। মোটকথা, জীবন যেমন দেহের একটি অবস্থার নাম, মৃত্যুও তেমনি একটি অবস্থা। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ও অন্য কয়েকজন তরুসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে যে, মরণ ও জীবন দুইটি শরীরী সৃষ্টি। মরণ একটি ভেড়ার আকারে এবং জীবন একটি ঘোড়ার আকারে বিদ্যমান আছে। বাহ্যত একটি সহীহ হাদীসের সাথে সুর মিলিয়ে এই উক্তি করা হয়েছে। হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন যখন জাহান্নামীরা জাহান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে দাখিল হয়ে যাবে, তখন মৃত্যুকে একটি ভেড়ার আকারে উপস্থিত করা হবে এবং পূনর্জন্মের সম্বন্ধে যথাযথ বলাই করে ঘোষণা করা হবে। এখন যে যে অবস্থার আছে অমর্ত্যকাল সেই অবস্থায়ই থাকবে। এখন থেকে কারও মৃত্যু হবে না। কিন্তু এই হাদীস থেকে দুনিয়াতে মৃত্যুর শরীরী হওয়া অস্বীকারীয় নয়। বরং এর অর্থ এই যে, দুনিয়ার অনেক অবস্থা ও কর্ম যেমন কিয়ামতের দিন শরীরী ও সাকার হয়ে যাবে, যা অনেক সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, তেমনি মানুষের মৃত্যুরূপী অবস্থাও কিয়ামতে শরীরী হয়ে ভেড়ার আকার ধারণ করবে এবং তাকে বলাই করা হবে।—(কুরতুবী)

তরুসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, মৃত্যু নাস্তি হলেও নিশ্চয় নাস্তি নয়, বরং এমন বস্তুর নাস্তি, যা কোন সময় অস্তি লাভ করবে। এ ধরনের সকল নাস্তিবাচক বিষয়ের আকার

জড় অস্তিত্ব লাভের পূর্বে ‘আলমে মিহালে’ (সাদৃশ্য জগতে) বিদ্যমান থাকে। প্রাণলোকে ‘আ’ম্মানে সাবিতা’ তথা প্রতিষ্ঠিত বস্তুমিচয় বলা হয়। এসব আকারের কারণে এগুলোর অস্তিত্ব লাভের পূর্বেও এক প্রকার অস্তিত্ব আছে। এরপর তরুসীরে মাযহারীতে ‘আলমে মিহাল’ সপ্রমাণ করার উদ্দেশ্যে অনেক হাদীস থেকে প্রমাণাদি বর্ণনা করা হয়েছে।

মরণ ও জীবনের বিভিন্ন স্তর : তরুসীরে মাযহারীতে আছে, আল্লাহ্ তা‘আলা স্বীয় অপার শক্তি ও প্রভা দ্বারা সৃষ্টিকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে প্রত্যেককে এক প্রকার জীবন দান করেছেন। সর্বাধিক পরিপূর্ণ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন মানবকে দান করা হয়েছে। এতে একটি বিশেষ সীমা পর্যন্ত আল্লাহ্ তা‘আলার সত্তা ও গুণাবলীর পরিচয় লাভ করার যোগ্যতাও নিহিত রেখেছেন। এই পরিচয়ই মানুষকে আল্লাহর আদেশ-নিষেধের অধীন করার ডিঙ্গি এবং এই পরিচয়ই সেই আমানতের গুরুভার, যা বহন করতে আক্ষিপ, পৃথিবী ও পর্বতমালা অক্রমতা প্রকাশ করে এবং মানব আল্লাহ প্রদত্ত যোগ্যতার কারণে বহন করতে সক্ষম হয়। এই জীবনের বিপরীতে আসে সেই মৃত্যু, যার উল্লেখ কোরআন পাকের নিম্নোক্ত আয়াতে রয়েছে।

أَلَمْ يَكُنْ لَنَا مَوْلَانَا حَيَاتًا ۖ — অর্থাৎ কাফিরকে মৃত্র এবং মু‘মিনকে জীবিত

আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কারণ, কাফির তার উপরোক্ত পরিচয় বিনষ্ট করে দিয়েছে। সৃষ্টির কোন কোন প্রকারের মধ্যে জীবনের এই স্তর নেই, কিন্তু চেতনা ও গতিশীলতা বিদ্যমান আছে। এই জীবনের বিপরীতে আসে সেই মৃত্যু, যার উল্লেখ নিম্নোক্ত আয়াতে আছে :

كُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ — এখানে জীবনের অর্থ

অনুভূতি ও গতিশীলতা এবং মৃত্যুর অর্থ তা নিঃশেষ হয়ে যাওয়া। কোন কোন সৃষ্টির মধ্যে এই অনুভূতি ও গতিশীলতাও নেই, কেবল রুদ্ধ পাওয়ার যোগ্যতা আছে, যেমন সাধারণ বৃক্ষ ও উদ্ভিদ এ ধরনের জীবনের অধিকারী। এই জীবনের বিপরীতে আসে সেই

মৃত্যু, যার উল্লেখ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا আয়াতে আছে। এই তিন প্রকার

জীবন মানব, জন্তু-জানোয়ার ও উদ্ভিদের মধ্যে সীমিত। এগুলো ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর মধ্যে এই প্রকার জীবন নেই। তাই আল্লাহ্ তা‘আলা প্রস্তর নিমিত্ত প্রতিমা সম্পর্কে বলেছেন :

أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ — কিন্তু এতদসঙ্গেও জড় পদার্থের মধ্যেও অস্তিত্ব জন্য অপরি-

হার্য বিশেষ এক প্রকার জীবন বিদ্যমান আছে। এই জীবনের প্রভাবই কোরআন পাকে ব্যক্ত হয়েছে :

وَأَن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يَحْيِيهِ بِحَمْدِ — অর্থাৎ এমন কোন বস্তু নেই, যা আল্লাহ্

তা'আলার প্রশংসা-কীর্তন করে না। উপরোক্ত বর্ণনা থেকে আয়াতে মৃত্যুকে অগ্রে উল্লেখ করার কারণও কুটে উঠেছে। মূলত মৃত্যুই অগ্রে। অস্তিত্ব লাভ করে—এমন প্রত্যেক বস্তুই পূর্বে মৃত্যুভগ্নত থাকে। পরে তাকে জীবন দান করা হয়। এ কথাও বলা যায় যে,

পরবর্তী **لِيَهْلُوكُمْ أَتَيْكُمْ أَحْسَنُ مِمَّا** আয়াতে মরণ ও জীবন হৃষ্টি করার

কারণ মানুষের পরীক্ষা নির্ভর করা হয়েছে। এই পরীক্ষা জীবনের তুলনায় মৃত্যুর মধ্যে অধিক। কেননা, যে ব্যক্তি নিজের মৃত্যুকে উপস্থিত জান করবে, সে নিয়মিত সংকল্প সম্পাদনে অধিকন্তর সচেষ্ট হবে। জীবনের মধ্যেও এই পরীক্ষা ঘ্রাহে। কারণ, জীবনের প্রতি পদক্ষেপে মানুষ এই অভিজ্ঞতা লাভ করতে থাকে যে, সে নিজে অকর্ম এবং আল্লাহ তা'আলা সর্বশক্তিমান। এ অভিজ্ঞতা মানুষকে সংকল্পে উদ্ধৃত করে। কিং মৃত্যুচিন্তা কর্ম সংশোধন ও সংকল্প সম্পাদনে সর্বাধিক কার্যকর।

হযরত আশ্মার ইবনে ইয়াসীর (রা) বর্ণিত হাদীসে রসুলুল্লাহ (সা) বলেন :
كُفَى بِالْمَوْتِ رَاضًا وَكُفَى بِالْهَقِيمِ غَنَى অর্থাৎ মৃত্যু উপদেশের জন্য এবং

বিয়াসই ধনাঢ্যতার জন্য যথেষ্ট।—(তিবরানী) উদ্দেশ্য এই যে, বন্ধ-বান্ধব ও স্বজনদের মৃত্যু প্রত্যক্ষকরণ সবচাইতে বড় উপদেশদাতা। যারা এই দৃশ্য দেখে প্রভাবান্বিত হয় না, অন্য কোন কিছু দ্বারা তাদের প্রভাবান্বিত হওয়া সুদূরপর্যায়ত। আল্লাহ যাকে ঈমান ও বিশ্বাসরূপী ধন দান করেছেন, তার সমতুল্য কোন ধনাঢ্য ও অমুখাপেক্ষী নেই। রবী ইবনে আনাস (র) বলেন : মৃত্যু মানুষকে সংসারের সাথে সম্পর্কহীন করা ও পরকালের প্রতি আগ্রহান্বিত করার জন্য যথেষ্ট।

أَخْسَنُ مِمَّا এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, মরণ ও জীবনের সাথে জড়িত

মানুষের পরীক্ষা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন : আমি দেখতে চাই তোমাদের মধ্যে কার কর্ম ভাল। একথা বলেন নি যে, কার কর্ম বেশী। এ থেকে বোঝা যায় যে, কারও কর্মের পরিমাপ বেশী হওয়া আল্লাহর কাছে আকর্ষণীয় ব্যাপার নয়, বরং কর্মটি ভাল, মিতুল ও মকবুল হওয়াই ধর্তব্য। এ কারণেই কিয়ামতের দিন মানুষের কর্ম গণনা করা হবে না, বরং ওজন করা হবে। এতে কোন কোন এক কর্মের ওজনই হাজারো কর্ম অপেক্ষা বেশী হবে।

ভাল কর্ম কি? হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন : রসুলুল্লাহ (সা) এই আয়াত তিলাওয়াত করে **أَخْسَنُ مِمَّا** পর্যন্ত পৌঁছে বললেন : সেই ব্যক্তি ভাল কর্মী, যে আল্লাহর হারামকৃত বিষয়াদি থেকে সর্বাধিক বেঁচে থাকে এবং আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য সদাসর্বদা উন্মুখ হয়ে থাকে।—(কুরতুবী)

فَارْجِعْ إِلَيْهِمْ هَلْ تَرَى مِنْ ظُورٍ—আয়াত থেকে বাহ্যত জানা যায়

যে, দুনিয়ার মানুষ আকাশকে চোখে দেখতে পারে এবং উপরে যে নীলাভ শূন্যমণ্ডল পরিস্ফুট হয়, তাই আকাশ হবে, এটা জরুরী নয়। বরং এটা সম্ভবপর যে, আকাশ আরও অনেক অনেক উপরে অবস্থিত হবে। উপরে যে নীলাভ রঙ দেখা যায়, এটা বায়ু ও শূন্য মণ্ডলের রঙ। দার্শনিকগণ তাই বলে থাকেন। কিন্তু এ থেকে এটাও জরুরী হয় না যে, আকাশ মানুষের দৃষ্টিগোচরই হবে না। এটা সম্ভবপর যে, এই নীলাভ শূন্যমণ্ডল কাঁচের মত স্বচ্ছ হওয়ার কারণে বহু উপরে অবস্থিত আকাশ দেখার পথে অন্তরায় নিয়। যদি এ কথা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, পৃথিবীতে থাকা অবস্থায় আকাশকে চোখে দেখা যেতে পারে না, তবে এই আয়াতে দেখার অর্থ হবে চিন্তা-ভাবনা করা।—(বয়ানুল কবীরজান)

وَلَقَدْ رَئَيْنَا الذَّنْهَابَ بِمَا بِهِمْ وَجَعَلْنَا هَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ

বলে নক্ষত্ররাজি বোঝানো হয়েছে। নিম্নতম আকাশকে নক্ষত্ররাজি দ্বারা সুশোভিত করার জন্য এটা জরুরী নয় যে, নক্ষত্ররাজি আকাশের গায়ে অথবা তার উপরে সংযুক্ত থাকবে, বরং নক্ষত্ররাজি আকাশের বহু নিম্নে মহাশূন্যে থাকা অবস্থায়ও এই আলোকসজ্জা হতে পারে। আধুনিক গবেষণায় এটাই প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে। নক্ষত্ররাজিকে শরতান বিভাজিত করার জন্য অজ্ঞানদের দেওয়ার অর্থ এরূপ হতে পারে যে, নক্ষত্ররাজি থেকে কোন আয়ের উপাদান শরতানদের দিকে নিক্ষেপ করা হয় এবং নক্ষত্ররাজি স্বস্থানেই থেকে যায়। সাধারণ দর্শকের দৃষ্টিতে এই অগ্নিস্থলিত নক্ষত্রের নাম গতিশীল দেখা যায়। তাই একে তারকা খসে যাওয়া এবং আরবীতে **انقضا من الكواكب** বলে দেওয়া হয়।—(কুরতুবী)

এ থেকে আরও জানা গেল যে, ঐশী সংবাদাদি চুরি করার জন্য শরতানরা যখন উর্ধ্ব গগনে আরোহণ করে, তখন তাদেরকে নক্ষত্ররাজির নীচেই বিভাজিত করে দেওয়া হয়।—(কুরতুবী) এ পর্যন্ত বিভিন্ন স্থিতির মধ্যে চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার

পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ শক্তির প্রমাণাদি বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর **وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ**

থেকে সাত আয়াত পর্যন্ত কাকিরদের শক্তি ও অনুগত মু'মিনদের সওয়াব বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর পুনরায় জ্ঞান ও শক্তির বর্ণনা আছে।

ذَٰلُولٌ—هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذِٰلُولًا

অনুগত। যে জন্তু আরোহণের সময় উচ্চতা প্রদর্শন করে না, তাকে **ذَٰلُول** বলা হয়। **مَنَاقِبُ** শব্দটি **مَنَاقِبُ** এর বহুবচন। এর অর্থ কীধ। যে কোন জন্তুর কীধ আরোহণের স্থান নয়, বরং কোমর অথবা ছাড় আরোহণের জায়গা হয়ে থাকে। যে জন্তু আরোহণের জন্য নিজের কীধও পেশ করে দেয়, সে খুবই বাধ্য, অনুগত ও বশীভূত হয়ে থাকে। তাই বলা হয়েছে, আমি ভূপৃষ্ঠকে তোমাদের জন্য এমন বশীভূত করে দিয়েছি

যে, তোমরা তার কাঁধে চড়ে অবাধে বিচরণ করতে পার। আল্লাহ তা'আলা ভূপৃষ্ঠকে এমন সুস্থম করেছেন যে, এটা পানির ন্যায় তরলও নয় এবং কৃষ্টি ও কর্ণমের ন্যায় চাপ সহ্যমসে নীচও নেমে যায় না। ভূপৃষ্ঠ এরূপ হলে তার উপর মানুষের বসবাস সম্ভবপর হত না। এমনভাবে ভূপৃষ্ঠকে লৌহ ও প্রস্তরের ন্যায় শক্তও করা হয়নি। এরূপ হলে তাতে রক্ত ও শ্মা বপন করা যেত না, কৃপ ও খাল খনন করা যেত না এবং খনন করে সুউচ্চ অট্টালিকার ভিত্তি স্থাপন করা যেত না। এর সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা ভূপৃষ্ঠকে স্থিরতা দান করেছেন, যাতে এর উপর দালান-কাঠা স্থির থাকে এবং চলাচলকারীরা হোঁচট না খায়।

وَلَا تَجْعَلُ الْوَقْرَ فِي الْأَرْضِ وَلَا تَجْعَلُ الْوَقْرَ فِي السَّمَاءِ ۚ وَاللَّهُ النُّشُورُ

আল্লাহ তা'আলা প্রথমে ভূপৃষ্ঠের অনাচে-কানাচে বিচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন, এরপর বলেছেন : আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক আহ্বার কর। এতে ইঙ্গিত হতে পারে যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ এবং পণ্যপ্রবাহের আমদানী-রফতানী আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক হাসিল করার দরজা।

وَاللَّهُ النُّشُورُ বাক্যে বলা হয়েছে যে, ভূপৃষ্ঠ থেকে পানাহার ও বসবাসের উপকারিতা লাভ করার অনুমতি আছে, কিন্তু যুত্ব ও পরকাল সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে যেয়ো না, পরিণামে তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে। ভূপৃষ্ঠে থাকা অবস্থায় পরকালের প্রস্তুতিতে লেগে থাক। পরবর্তী আয়াতে ইশিয়ার করা হয়েছে যে, পৃথিবীতে বসবাসরত অবস্থায়ও আল্লাহর আযাব আসতে পারে। ইরশাদ হয়েছে :

أَمْ مِّنْكُمْ مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ

তোমরা কি এ বিষয়ে ভাবনামুক্ত যে, আকাশে যিনি আছেন, তিনি তোমাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করে দেবেন এবং ভূগর্ভে তোমাদেরকে গিলে ফেলবে? অর্থাৎ যদিও আল্লাহ তা'আলা ভূপৃষ্ঠকে এমন সুস্থম করেছেন যে, খনন ব্যতীত কেউ এর অভ্যন্তরে যেতে পারে না, কিন্তু তিনি একে এরূপও করে দিতে সক্ষম যে, এই ভূপৃষ্ঠই তার উপরে বসবাসকারীদেরকে গ্রাস করে ফেলবে। পরের আয়াতে অন্য এক প্রকার আশ্বাস সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে।

أَمْ مِّنْكُمْ مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ

অর্থাৎ তোমরা কি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, আকাশে যিনি আছেন, তিনি তোমাদের উপর আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণ করবেন এবং তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন? তখন তোমরা এই সতর্কবাকীর পরিণতি জানতে পারবে। কিন্তু তখন জ্ঞান নিষ্কল হবে। আল্লাহ সুস্থ ও নিরাপদ অবস্থায় এ বিষয়ে চিন্তা কর। এরপর দুনিয়াতে আযাবপ্রাপ্ত জাতি সমূহের ঘটনাবলীর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য তাদের পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ।

وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَهَفَ كَانَ نَكِيرًا ۝

মর্মার্থ তাই। অতঃপর সূরার মূল বিষয়বস্তুর দিকে প্রত্যাবর্তন করে সৃষ্টির হাল-অবস্থা থেকে আল্লাহ তা'আলার তওহীদ, জ্ঞান ও শক্তির পক্ষে প্রমাণ আনা হয়েছে। স্বয়ং মানব-সত্তা, আকাশ, নক্ষত্র, পৃথিবী ইত্যাদির অবস্থা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর নূন্য পরিমণ্ডলে উদ্ভূত পক্ষীকুলের অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে :

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ ۝

না, যারা কখনও পাখা বিস্তার করে এবং কখনও সংকুচিত করে। এসেয় ব্যাপারে চিন্তা কর, এরা ভারী দেহবিশিষ্ট। সাধারণ নিয়মদুস্টে ভারী বস্তু উপরে ছাড়া হলে তা মাটিতে পড়ে যাওয়া উচিত। বায়ু সাধারণভাবে তা আটকাতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা পক্ষীকুলকে বায়ুমণ্ডলে স্থির থাকার মত করে সৃষ্টি করেছেন। বাতাসে ভর দেওয়া এবং তাতে সম্বরণ করে বিচরণ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পাখা বিস্তার ও সংকোচনের মাধ্যমে বায়ু নিয়ন্ত্রণ করার নৈপুণ্য শিক্ষা দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, বায়ুর মধ্যে এই যোগ্যতা সৃষ্টি করা মেরুপ পাখা তৈরী করা এবং পাখার মাধ্যমে বায়ু নিয়ন্ত্রণ করার নৈপুণ্য শিক্ষা দেওয়া—এগুলো সব আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তিরই ফলশ্রুতি।

এ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকার সৃষ্টির হাল-অবস্থা নিয়ে চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব, তওহীদ এবং নজীরবিহীন জ্ঞান ও শক্তির পক্ষে প্রমাণাদি সম্মিলিত করা হয়েছে। যে ব্যক্তি এগুলো নিয়ে সামান্যও চিন্তা-ভাবনা করে, তার জন্য আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। অতঃপর সূরার শেষ পর্যন্ত কাকির ও পাগাচারীদেরকে আল্লাহর আয়াব সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। প্রথমে হ'শিয়ান করা হয়েছে যে, যদি আল্লাহ তা'আলা কোন সম্প্রদায়ের উপর আয়াব নাখিল করতে চান, তবে পৃথিবীর কোন শক্তি তার গতিরোধ করতে পারে না। তোমাদের সৈন্যবাহিনী, সিপাই-সাত্তী তোমাদেরকে সেই আয়াব থেকে রক্ষা করতে পারবে না। ইরশাদ হচ্ছে :

أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَمُرُّكُمْ مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِن

الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ۝

এবং তুমি থেকে শস্য ও উদ্ভিদ উৎপন্ন করার মাধ্যমে তোমরা আল্লাহ তা'আলার যে রিম্বিক পাল্টা, এটা তোমাদের ব্যক্তিগত জায়গীর নয়, বরং আল্লাহর দান ও বরদাস।

أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِن أَمْسَكَ رِزْقَهُ ۝

আল্লাহের উদ্দেশ্য তাই। অতঃপর কাকিরদের জন্য পরিতাপ করা হয়েছে, যারা নিজেরাও

আল্লাহর নির্দেশাবলী সম্পর্কে চিন্তা করে না এবং বর্ণনাকর্মীর বর্ণনও শুনে না।

بَلْ تَجْأَوِي إِلَىٰ عُتْرَةٍ وَنَفَرٍ — অর্থাৎ তারা অবধাতা ও সত্যবিমুখতার বেড়েই চলেছে।

অতঃপর কিরামতের মাঠে কাকির ও মু'মিনের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, কিরামতের মাঠে কাকিররা উপড় হয়ে মন্তকের উপর ভর দিয়ে চলেবে। বুখারী ও মুসলিমের রেওয়াজে আছে যে, সাহাবায়ে কিরাম জিহাদসা করলেন—কাকিররা মুখে ভর দিয়ে কিরামে চলেবে? রসুল্লাহ (সা) বললেন : যে আল্লাহ তাদেরকে পাল্ল ভর দিয়ে চালনা করেছেন, তিনি কি মুখমণ্ডল ও মন্তকের উপর ভর দিয়ে চালাতে সক্ষম নন? বিশেষতঃ আয়াতে তাই বলা হয়েছে :

أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ

مُسْتَقِيمٍ — অর্থাৎ যে ব্যক্তি মুখমণ্ডলে ভর দিয়ে চলে, সে বেশী হিদায়তপ্রাপ্ত, না যে সোজা চলে? যেমোক্ত ব্যক্তিই মু'মিন। সে-ই হিদায়ত পথে পারে। অতঃপর আবার মানব হৃষ্টিতে আল্লাহ তা'আলার শক্তি ও ডানের কতিপয় বিকাশ বর্ণনা করা হয়েছে :

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا

مَا تَشْكُرُونَ — অর্থাৎ আপনি বলুন, আল্লাহ তা'আলাই তোমাদেরকে হৃষ্টি করেছেন এবং

তোমাদের কণ, চক্ষু ও অন্তর বানিয়েছেন, কিন্তু তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না।

কণ, চক্ষু ও অন্তরের বৈশিষ্ট্য : আয়াতে মানুষের অঙ্গসমূহের মধ্যে তিনটি অঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলোর উপর তান, অনুভূতি ও চেতনা নির্ভরশীল। দার্শনিকগণ তান ও অনুভূতির পাঁচটি উপায় বর্ণনা করেছেন। এগুলোকে পঞ্চ ইন্ড্রিয় বলা হয়। এগুলো হচ্ছে প্রবণ, দর্শন, ঘ্রাণ, আশ্বাদন ও স্পর্শ। ঘ্রাণের জন্য নাক আশ্বাদনের জন্য জিহবা তৈরী করা হয়েছে এবং স্পর্শজ্ঞি সমস্ত দেহে নিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা প্রবণ করার জন্য কণ এবং দেখার জন্য চক্ষু সৃষ্টি করেছেন। এখানে আল্লাহ তা'আলা পঞ্চ ইন্ড্রিয়ের মধ্য থেকে মাত্র দু'টি উল্লেখ করেছেন—কণ ও চক্ষু। কারণ এই ঘ্রাণ, আশ্বাদন ও স্পর্শের মাধ্যমে খুব-কম বিষয়ের তান মানুষ অর্জন করতে পারে। মানুষের জানা বিষয়সমূহের বিরাট অংশ প্রবণ ও দর্শনের মধ্যে সীমিত। এতদূতরের মাধ্যমে প্রবণকে অগ্রে জানা হয়েছে। চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, মানুষ সারাজীবনে যেসব বিষয়ের তান অর্জন করে, তন্মধ্যে শোনা বিষয়সমূহের সংখ্যা দেখা বিষয়সমূহের তুলনায় বহুগুণ বেশী। অতএব, মানুষের অধিকাংশ জানা বিষয় এই দুই পথে অর্জিত হয় বিধান এখানে

শুক ইজিরের মধ্য থেকে মাত্র দু'টি উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয় বস্তু অন্তর হচ্ছে আসল ভিত্তি ও জানের কেন্দ্র। কানে শোনা ও চোখে দেখা বিশ্বরসমূহের জান ও অন্তরের উপর নির্ভরশীল। অন্তর যে জানের কেন্দ্র এক নক্ষত্র কোরআন পাকের অনেক আয়াত সাক্ষ্য দেয়। এর বিপরীতে দার্শনিকগণ মস্তিষ্ককে জানের কেন্দ্র মনে করেন।

এরপর আবার কাফিরদের প্রতি হুঁশিয়ারী ও শঙ্কিতাবী বর্ণিত হয়েছে। সূরার উপসংহারে বলা হয়েছে : : তোমরা হারা পৃথিবীতে বসবাস কর, ভূপৃষ্ঠকে খনন করে কুপ তৈরী কর এবং সেই পানি হারা নিজেদের পান ও শস্য উৎপাদনের কাজ কর, তোমরা ভুলে যেয়ো না যে, এতদূর তোমাদের ব্যক্তিগত জায়গীর নয়, আল্লাহর দান। তিনিই পানি বর্ষাস করেছেন এবং সেই পানিকে বরফের সাগরে পরিণত করে পঁচন রোধ করার জন্য পর্বতশৃঙ্গে রেখে দিয়েছেন। অতঃপর এই বরফকে জ্বালা জ্বালা গজিয়ে পর্বতের শিরা-উপশিরার মধ্যে ভূগর্ভের অভ্যন্তরে নামিয়ে দিয়েছেন। এরপর কোন পাইপলাইনের সাহায্য ব্যতিরেকে সেই পানিকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছেন। এখন তোমরা যেহী ইচ্ছা যাটি খনন কর পানি বের করতে পার। তিনি এই পানি সৃষ্টিকার উপরের স্তরেই রেখে দিয়েছেন যা করেক-দুই মাটি খনন করেই বের করা যায়। এটা দ্রষ্টার দান। তিনি ইচ্ছা করলে একে নিম্নের স্তরে ডোমাসের নাসাজের বাইরে নিয়ে যেতে পারেন।

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْحَحَ مَا يُكْفَرُونَ فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ -

অর্থাৎ তারা ভেবে দেখুক, তারা কে পানি কুপের মাধ্যমে অনায়াসে বের করে পান করছে, তা যদি ভূগর্ভের গভীরে চলে যায়, তবে কোন শক্তি পানির এই স্রোতধারাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে? হাদীসে আছে, এই আয়াত তিজাওয়াত করার পর বলা উচিত **اللَّهُ رَبِّ** **الْعَالَمِينَ** বিশ্ব পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলাই পুনরায় এই পানি আনতে পারেন—
আল্লাহের শক্তি নেই।

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৩

সূরা বালাদ থেকে সূরা আলাকু

আয়োজনে



মাউন ফাউন্ডেশন

www.maunfoundation.org

সورة البلد

অব্রা হামাদ

মক্কার অবতীর্ণ : ২০ আয়াত।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا أَقِيمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ۝ وَأَنْتَ حَلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ۝ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ۝
لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ۝ أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ۝
يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَا لَا لَبَدًا ۝ أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ۝ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ
عَيْنَيْنِ ۝ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۝ وَهَدَيْنَاهُ النَّهْدَيْنِ ۝ فَلَا اقْتَحَمَ
العَقَبَةَ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۝ فَكَّ رِقَبَتِهِ ۝ أَوِ اطَّعِمْ فِي يَوْمِ
رُؤْيَى مَسْغَبَتِهِ ۝ يَتَّبِعُمَا ذَا مَقْرَبَةٍ ۝ أَوْ سَكِنَا ذَا مَثْرَبَةٍ ۝ ثُمَّ كَانَ
مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالضَّيْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۝ أُولَئِكَ
أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَايَعْنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۝
عَلَيْهِمْ نَارُ مُؤَصَّدَةٍ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) আমি এই নগরীর শপথ করি (২) এবং এই নগরীতে আপনার উপর কোন প্রতিজ্ঞাকর্তা নেই। (৩) শপথ জনকর ও বা জনর দেয়, (৪) নিশ্চয় আমি মানুষকে প্রম-নির্ভররূপে সৃষ্টি করেছি। (৫) সে কি মনে করে যে, তার উপর কেউ ক্রমতাবান হবে না? (৬) সে বলে : আমি প্রচুর ধনসম্পদ ব্যয় করেছি। (৭) সে কি মনে করে যে, তাকে কেউ সেধেনি? (৮) আমি কি তাকে সেহিনি চক্ষুদর, (৯) জিহবা ও ওষ্ঠদর? (১০) যত্নত আমি তাকে সৃষ্টি পথ প্রদর্শন করেছি। (১১) জন্তুগণ সে ধর্মের ঘাঁটিতে প্রবেশ করেনি। (১২) আপনি জানেন, সে ঘাঁটি কি? (১৩) তা হচ্ছে দাসঘৃণি

(১৪) অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে অন্নদান (১৫) এতীম আত্মীয়কে (১৬) অথবা ধূলি-ধূসরিত ফিসকীনকে (১৭) অতঃপর তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া, যারা ইমান আনে এবং পরস্পরকে উপদেশ দেয় সবারের ও উপদেশ দেয় দলার। (১৮) তারা ই সৌভাগ্যশালী। (১৯) আর যারা আমার আরাতিসমূহ অত্মীকর করে তারা ই হতভাগ। (২০) তারা অগ্নিশরিবন্ডিত অবস্থায় বন্দী থাকবে।

উকসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি এই (মক্কা) নগরীর শপথ করি এবং [শপথের অওয়ার বলায় পূর্বে রসূলুল্লাহ (সা)-র জন্য একটি সুসংবাদ ঘোষণা করা হয়েছে যে] আপনাদের জন্য এ নগরীতে সুভবিষয় আরম্ভ হবে। (সেমতে মক্কা বিজয়ের দিন তাঁর জন্য হুজ্বা হালাল করে দেওয়া হয়েছিল। হেরেমের বিধানাবলী অগ্রযোজ্য করে দেওয়া হয়েছিল)। শপথ জনকের এবং যা জন্ম দেয় তার। [সমস্ত সন্তানের পিতা আদম (আ)। অতএব এভাবে আদম ও বনী-আদম সবারই শপথ হয়ে গেল। অতঃপর শপথের অওয়ার বলা হয়েছে] আমি মানুষকে খুব প্রমত্তিতর করে সৃষ্টি করেছি। (সেমতে মানুষ সারা জীবন অসুখে-বিসুখে, কন্টে ও চিন্তাভাবনায় অধিকাংশ সময় লিপ্ত থাকে। এর ফলে তার মধ্যে অজ্ঞতা ও অপারক মনোভাব থাকে উচিত ছিল। সে নিজেকে বিধি-সিগির বেড়াতে আরম্ভ মনে করত এবং আল্লাহর আদেশের অনুসারী হত। কিন্তু কাকির মানুষ সম্পূর্ণ ভ্রান্তিতে পড়ে রয়েছে। অতএব) সে কি মনে করে যে, তার উপর কেউ ক্ষমতাবান হবে না? (অর্থাৎ সে কি নিজেকে আল্লাহর কুদরতের বাইরে মনে করাই এমন ভ্রান্তিতে পড়ে রয়েছে?) সে বলে : আমি প্রচুর ধনসম্পদ ব্যয় করেছি। (অর্থাৎ একে তাঁর স্পর্ধা লেখার, তার উপর রসূলের শত্রুতা ও ইসলামের বিরোধিতার ধন-সম্পদ ব্যয় করাকে শর্বের বিষয় মনে করে। এরপর প্রচুর ধনসম্পদের ব্যয়-বিধাও বলে)। সে কি মনে করে যে, তাকে কেউ ঘোঁষনি? [অর্থাৎ আল্লাহ অবশ্যই দেখছেন এবং তিনি জানেন যে, পাপে কাকে ব্যয় করেছে। সুতরাং এজন্য শাস্তি-দেবেন। এছাড়া পরিমাণও দেখছেন যে, প্রচুর নয়। এটা যেকোন কাকিরের অবস্থা। তখন রসূলুল্লাহ (সা)-র শত্রুতা তাই বলত এবং করত। মোট কথা, কাকির রজিহ দুঃখ-কষ্টের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়নি এবং অনুরহ ও নিরামতের দ্বারাও হয়নি, যা অতঃপর বর্ণিত হয়েছে]। আমি কি তাকে চক্ষুধর, জিব্বা ও ঠাণ্ডা দেইনি? অতঃপর তাকে ভ্রম ও মগ্ন দু'টি পথই বলে দিয়েছি যাতে ক্ষতি-কর পথ থেকে বেঁচে থাকে এবং লাভের পথে চলে। এর পরিপ্রেক্ষিতেও আল্লাহর বিধানাবলীর অনুসারী হওয়া উচিত ছিল কিন্তু সে শর্বের বাঁটতে প্রবেশ করেনি। (শর্বের কাজ কন্ট্রোলবিধার একে বাঁটি বলতে হয়েছে)। আপনি কি জানেন, সে বাঁটি কি? তা হচ্ছে দাস-যুক্তি-করক দুর্ভিক্ষের দিনে অন্নদান, কোন আত্মীয় এতীমকে অথবা কোন ধূলি-ধূসরিত ফিসকীনকে। (অর্থাৎ আল্লাহর এসব-বিধান মেনে চলা উচিত ছিল)। অতঃপর (শর্বাপন্ন তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত ছিল) যারা ইমান আনে এবং পরস্পরকে উপদেশ দেয় সবারের এবং (উপদেশ দেয়) দলার। (অর্থাৎ জল্প না করার। ইমান সবার অস্ত, এরপর

সবরের উপদেশ উত্তম, এরপর জুলুম থেকে বেঁচে থাকা উত্তম, এরপর আসে **قَاتِلُوا** থেকে **مُشْرِكِينَ** পর্যন্ত বর্ণিত বিষয়াদির স্তর। অতএব **مُشْرِكِينَ** অর্থের মা'আরেকুল-কোরআন থেকে

বোঝাবার অর্থ ব্যবহৃত হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, ধর্মের যাবতীয় মূলনীতি ও শাখাগুলো যেনে চলা উচিত ছিল। অতঃপর মু'মিনদের প্রতিদানের বিষয় বর্ণিত হয়েছে।) তারাই তান-দিকহ লোক। (এর তফসীর সূরা ওয়াকিয়ায় বর্ণিত হয়েছে। এখানেও এ শব্দে সর্বস্তরের মু'মিনই অন্তর্ভুক্ত)। আর যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে (অর্থাৎ শাখা ত্রো দূরের কথা মূলনীতিই মানে না)। তারাই বামপার্শ্ব লোক। তারা অল্পপরিবেষ্টিত অবস্থায় বন্দী থাকবে। (অর্থাৎ আহাদ্দামীদেরকে আহাদ্দামে গুটি করে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। ফলে চিরকাল সেখানে থাকবে এবং বের হতে পারবে না।)

আনুমানিক ভাষ্য বিষয়

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ —এখানে **لَا** অক্ষরটি অতিরিক্ত এবং আরবী বাকপদ্ধতিতে

এক অতিরিক্ত ব্যবহার সুবিদিত। আরেক বিস্তৃত উক্তি এই যে; প্রতিপক্ষের দ্বন্দ্ব ধারণা খণ্ডন করার জন্য এই **لَا** শব্দ বাক্যের শুরুতে ব্যবহৃত হয়। উদ্দেশ্য এই যে, এটা কেবল তোমার খারশা নয় বরং আমি শপথ সহকারে যা বলছি, তাই বাস্তব সত্য। **البلد**

(নগরী) বলে এখানে মক্কা নগরীকে বোঝানো হয়েছে। সূরা বীনেও এমনভাবে মক্কা নগরীকে শপথ করা হয়েছে এবং তৎসঙ্গে **بِالْبَلَدِ الْمَكِّيِّ** বিশেষণও উল্লেখ করা হয়েছে।

মক্কা নগরীর শপথ ও কথা ভাবন করে যে, অন্যান্য নগরীর তুলনায় এটা আঁতড়াই ও সেরা নগরী। হয়ত আবদুল্লাহ ইবনে আব্দী থেকে বর্ণিত আছে যে, রসুলুল্লাহ (সা) হিজরতের সময় মক্কা নগরীকে সর্বাধীন করে বলেছিলেন: আজাহর কিসম, তুমি সেটা ভুলেই আজাহর কাছে অধিক প্রিয়। আমাকে যদি এখান থেকে বের হতে বাধ্য করা না হত, তবে আমি তোমাকে পরিত্যাগ করতাম না।—(মায়হারী)

وَأَنْتَ حَلٌّ لِهَذَا الْبَلَدِ —এক অর্থ এই যে, **حَلٌّ** শব্দের দুটি অর্থ হতে পারে—এক, এটা **حُلُولٌ**

থেকে উদ্ভূত। অর্থ কোন কিছুতে অবস্থান নেওয়া, থাকার ও আবাস করা। অতএব, **حَلٌّ**

এক অর্থ হতে অবস্থানকারী, বাসকারী। আজাহর অর্থ এই যে, মক্কা নগরী বিশেষতঃ সম্বন্ধিত ও পবিত্র, বিশেষত আপনিও এ নগরীতে বাসকাস করেন। বাসকাসকারীর প্রেরণের দরুনও বাসস্থানের প্রেরণ হতে পারে। ফলেই আপনার বাসকাসের কারণে এ নগরীর সাহায্য ও সম্মান বিত্তপ হয়ে গেছে। দুই এটা **خَلَّتْ** থেকে উদ্ভূত। অর্থ হাজান হওয়া। প্রদিক দিয়ে এক অর্থ এই যে, আপনাকে মক্কার কাফিররা হাজান মনে করে রেখেছে

এবং আপনাকে হত্যা করার ফিকিরে রয়েছে অথচ তারা নিজেরাও মক্কা নগরীতে কোন শিকারকেই হালাল মনে করে না। এমতাবস্থায় তাদের জুলুম ও অবাধ্যতা কতটুকু হবে, তারা আল্লাহর রসূলের হত্যাকে হালাল মনে করে নিয়েছে। অপর অর্থ এই যে, আপনার জন্য মক্কার হয়েই কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হালাল করে দেওয়া হবে। বস্তুত মক্কা বিজয়ের সময় একদিনের জন্য তাই করা হয়েছিল। তফসীরের সঙ্গ-সংক্ষেপে এ অর্থ অবলম্বনেই তফসীর করা হয়েছে। মায়হারীতে সন্ধ্যা তিনটি অর্থই উল্লেখ করা হয়েছে।

وَالِدٌ وَمَا وَلَدٌ—এখানে وَلِدٌ বলে মানব পিতা হয়রত আদম (আ) আর

وَلَدٌ বলে বনী-আদমকে বোঝানো হয়েছে। এভাবে এতে হয়রত আদম ও দুনিয়ার আদি থেকে অস্ত পর্বন্ত সব বনী-আদমের শপথ করা হয়েছে। অতঃপর শপথের জওয়াবে বলা হয়েছে :

كَيْدٌ—لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَيْدٍ—এর শাসনিক অর্থ প্রম ও কল্ট। অর্থাৎ

মানুষ সৃষ্টিগতভাবে আজীবন প্রম ও কল্টের মধ্যে থাকে। হয়রত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : মানুষ গঠাণয়ে আবদ্ধ থাকে, জন্মলাভে প্রম ও কল্ট স্বীকার করে, এরপর আসে জননার দুগ্ধ পান করার ও তা ছাড়ানোর প্রম। অতঃপর জীবিকা ও জীবনোপকরণ সংগ্রহের কল্ট, বার্ষিকের কল্ট, মৃত্যু, কবর ও হাশির এবং তাতে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি, প্রতিদান ও শাস্তি—এসমুদয় প্রমের বিভিন্ন পর্যায়, যা মানুষের উপর দিয়ে অভিহিত হয়। এ প্রম ও কল্ট শুধু মানুষেরই বিশেষ বৈশিষ্ট্য নয়, অন্যান্য জীব-জানোয়ারও প্রম শরীক করেছে। কিন্তু এখানে মানুষের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, প্রথমত মানুষ সব জীব-জানোয়ার অপেক্ষা অধিক চেতনা ও উপলব্ধির অধিকারী। পরিত্রয়ের কল্ট চেতনাভেদে কম-বেশী হয়ে থাকে। ভিত্তিস্ত সর্বশেষ ও সর্ববৃহৎ প্রম হচ্ছে হাশিরের মাঠে পুনরুজ্জীবিত হয়ে সারা জীবনের কাজকর্মের হিসাব দেওয়া। এটা অন্য জীব-জানোয়ারের মতো নয়।

কোন কোন আলাম বছেন : মানুষের ন্যায় অন্য কোন সৃষ্টজীব কল্ট সহ্য করে না অথচ সে শরীর ও দেহাবল্লবে অধিকাংশ জীবের তুলনায় দুর্বল। কিন্তু মানুষের মস্তিষ্ক-শক্তি অত্যন্ত বেশী। একারণেই বিশেষভাবে মানুষের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মক্কা মুকাররমা, আদম ও বনী-আদমের শপথ করে আল্লাহ তা'আলা এ সত্যটি বর্ণনা করেছেন যে, আমি মানুষকে কল্ট ও প্রমমিত্তরশীলরূপেই সৃষ্টি করেছি। এটা এ বিশ্বস্তের প্রমাণ যে, মানুষ আপনাপ্রাণি সৃষ্টিত হয়নি অথবা অন্য কোন মানুষ তাকে জন্ম দেননি বরং তার সৃষ্টিকর্তা এক সর্বশক্তিমান, যিনি প্রত্যেক সৃষ্টজীবকে বিশেষ বিশেষ সত্তা ও বিশেষ ক্রিয়াকর্মের যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। মানব-সৃষ্টিতে যদি মানুষের কোন প্রভাব থাকিত, তবে সে নিজের জন্ম কখনও এরূপ প্রম ও কল্ট পছন্দ করত না।—(কুরত্বী)

কল্ট স্বীকারের জন্য মানুষের প্রবৃত্ত থাকা উচিত : এ শপথ ও তার জওয়াবে মানুষকে বলা হয়েছে যে, তোমরা দুনিয়াতে জনাবিল সুখই কামনা কর এবং কোন কল্টের

অন্যকে স্বতন্ত্র রূপ দান করে। আরও একটি কারণ, সম্ভবত এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা জিহশকে একটি প্রকৃত কর্মসম্পাদনকারী মেশিন করেছেন। ফলে অর্থ মিনিটের মধ্যে তার দ্বারা এমন কথা বলা যায় যা, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে জাহান্নামে পৌঁছিয়ে দেয়। যেমন, ইমানের কলমে। অথবা দুনিয়াতে শত্রুর কাছেও প্রিয় করে দেয়। যেমন, বিগত অন্যান্য ক্রমা করা। এই জিহশ দ্বারাই ততটুকু সময়ে এমন কথাও বলা যায়, যা তাকে জাহান্নামে পৌঁছে দেয়। যেমন, কুফরের কলমে। অথবা দুনিয়াতে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুকেও তার শত্রুতে পরিণত করে দেয়। যেমন, গালিগালাজ ইত্যাদি। জিহশের উপকারিতা যেমন অসংখ্য, তেমনি এর ক্ষয়সংকারিতাও অগণিত। এটা যেন এক তরবারি, যা শত্রুর গর্দানও উড়াতে পারে এবং স্বয়ং তার গলাও বিচ্ছিন্ন করতে পারে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা এ তরবারিকে ওল্টঘরের চাদের দ্বারা আবৃত করে দিয়েছেন। এ স্থলে ওল্টঘরের উল্লেখ করার মধ্যে এলাপ ইঙ্গিতও থাকতে পারে যে, যে প্রভু মানুষকে জিহ্বা দিয়েছেন, তিনি তা বন্ধ রাখার জন্য ওল্টও দিয়েছেন। তাই একে বুঝে সুখে ব্যবহার করতে হবে এবং অস্থলে একে ওল্ট-ঘরের কোষ থেকে বের করা যাবে না। তৃতীয় নিয়ামত পথপ্রদর্শন করা দু'রকম। আল্লাহ্ তা'আলা ভাল ও মন্দে পরিচয়ের জন্য মানুষের মধ্যে এক প্রকার যোগাযোগ নিহিত রেখে-

ছেন। যেমন এক আয়াতে আছে **ثُمَّ لَهَا نُجُورٌهَا وَتَقَرُّهَا** অর্থাৎ মানুষের নফসের

মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা পাপচোর ও সদাচারের উপকরণ রেখে দিয়েছেন। এভাবে একটি প্রাথমিক পথ প্রদর্শন মানুষ তার বিবেকের কাছ থেকেই পায়। অতঃপর এর সমর্থনে পয়-গল্পগণ-ও ঐশী কিতাব আগমন করে। সারকথা এই যে, গাফিল ও অবিশ্বাসী মানুষ যদি তার নিজের অভিজ্ঞের কয়েকটি দেদীপমান বিষয় সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে, তবে সে আল্লাহর কুদরত ও হিকমত চাক্ষুষ দেখতে পাবে। চোখে দেখ, মুখে স্বীকার কর এবং পথ দু'টির মধ্য থেকে মঙ্গলজনক পথ অবলম্বন কর।

অতঃপর আবার গাফিল মানুষকে হুঁশিয়ার করে বলা হয়েছে—এসব উজ্জ্বল প্রমাণ দ্বারা আল্লাহর কুদরত, কিয়ামতে পুনরুজ্জীবন ও হিসাব-নিকাশের নিশ্চিত বিশ্বাস হওয়া উচিত ছিল এবং এ বিশ্বাসের ফলেই সৃষ্টজীবের উপকার করা, তাদের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় করা, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, নিজের সংশোধন করা এবং অপরের সংশোধনের চিন্তা করা দরকার ছিল, যাতে কিয়ামতে সে 'আসহাবে-ইমামীন' তথা জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেত। কিন্তু হতভাগা মানুষ তা করেনি বরং কুফরকেই জাঁকড়ে রয়েছে, তার পরিণাম জাহান্নামের আগুন। সূরার শেষ অবধি এ বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। এতে কতিপয় সং কর্ম অবলম্বন না করার বিষয়কে বিশেষ তুলিতে বর্ণনা করা হয়েছে।

فَلَا أَقْتَحُمُ الْعُقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعُقَبَةُ فَنُ رَقَبَةٍ

পাহাড়ের বিরাট প্রস্তর খণ্ডকে এবং দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী গিরিপথ তথা মাটিকে। শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার কাজে এ মাটি মানুষকে সহায়তা করে। পাহাড়ের শীর্ষদেশে

আরোহণ করে আশ্রয়লাভ করা যায় অথবা মাটিতে প্রবেশ করে অন্যত্র চলে যাওয়া যায়।
এখানে আত্মাহুত ইবাদতকে একটি মাটি রূপে ব্যক্ত করা হয়েছে। মাটি যেমন শত্রুর কবল
থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়, সংকর্যও তেমনি পরকালের আশাব থেকে মানুষকে রক্ষা করে।
এসব সং কর্মের মধ্যে প্রথমে **فَكَرِهَ** অর্থাৎ দাসমুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। এটা
খুব বড় ইবাদত এবং একজন মানুষের জীবন সুসংহত করার নামান্তর। দ্বিতীয় সং কর্ম
হচ্ছে ক্ষুধার্তকে অন্নদান। যে কাউকে অন্নদান করা সওয়াবমুক্ত নয় কিন্তু কোন কোন বিশেষ
প্রণীর লোককে অন্ন দান করলে তা আরও বিরাট সওয়াবের কাজ হয়ে যায়। তাই বলা
হয়েছে :

يَتِيهِمَا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ — অর্থাৎ বিশেষভাবে যদি আত্মীয়

ইরাতীমকে অন্নদান করা হয়, তবে তাতে দ্বিগুণ সওয়াব হয়। এক. ক্ষুধার্তের ক্ষুধা দূর
করার সওয়াব এবং দুই. আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা ও তার হক আদায় করার
সওয়াব। **فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ** — অর্থাৎ বিশেষভাবে ক্ষুধার দিনে তাকে অন্ন দান করা
অধিক সওয়াবের কারণ হয়ে যায়। এমনভাবে ধূলায় লুপ্তিস্ত মিসকীন অর্থাৎ নিরতিশয়
নিঃস্ব ব্যক্তিকে অন্নদান করাও অধিক সওয়াবের কাজ। এরূপ ব্যক্তি যত বেশী অভাবী হবে,
অন্নদাতার সওয়াবও ততই বৃদ্ধি পাবে।

অপরকেও সং কাজের নির্দেশ দেওয়া ইমানের দাবী : **ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ**

أَمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالرَّحْمَةِ এ আয়াতে ইমানের পর

মু'মিনের এই কর্তব্য ব্যক্ত করা হয়েছে যে, সে অপরপর মুসলমান ভাইকে সবার ও অনুকম্পার
উপদেশ দেবে। সবারের অর্থ নিজেকে মন্দ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখা ও সং কর্ম সম্পাদন
করা। **الرَّحْمَةِ** - এর অর্থ অপরদের প্রতি দয়াল্প হওয়া। অপরদের কষ্টকে নিজের কষ্ট মনে
করে তাকে কষ্টদান ও জুলুম করা থেকে বিরত হওয়া। এতে দীনের প্রায় সব নির্দেশই
অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

سورة الشمس

সূরা শামস

মক্কায় অবতীর্ণ : ১৫ আয়াত ॥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا ۝ وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّهَا ۝ وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّهَا ۝ وَاللَّيْلُ إِذَا غَشَّهَا ۝ وَالسَّمَاءَ وَمَا بَنَاهَا ۝ وَالْأَرْضَ وَمَا طَحَّهَا ۝ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۝ قَالَهْمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۝ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَزَاهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۝ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ۝ إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا ۝ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ۝ فَكَذَّبُوهُ فَفَقَرُوا مَا ۝ قَدِمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمُ بِذُنُوبِهِمْ فَسَوَّاهَا ۝ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) শগধ সূর্যের ও তার কিরণের, (২) শগধ চন্ড্রের যখন তা সূর্যের গল্গাতে আসে, (৩) শগধ দিবসের যখন সে সূর্যকে প্রধরভাবে প্রকাশ করে, (৪) শগধ রাত্রির যখন সে সে সূর্যকে আচ্ছাদিত করে, (৫) শগধ আকাশের এবং যিনি তা নির্মাণ করেছেন, তার, (৬) শগধ পৃথিবীর এবং যিনি তা বিস্তৃত করেছেন, তার, (৭) শগধ প্রাণের এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন, তার, (৮) অতঃপর তাকে তার অসৎ কর্ম ও সৎ কর্মের জ্ঞান দান করেছেন, (৯) যে নিজেকে গুহ্ব করে, সেই সফলকাম হয়। (১০) এবং যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ হয়। (১১) সামুদ সম্প্রদায় অবাধ্যতাবশত মিথ্যারোপ করেছিল (১২) যখন তাদের সর্বাধিক হতভাগ্য ব্যক্তি তৎপর হয়ে উঠেছিল, (১৩) অতঃপর আল্লাহর রসূল তাদেরকে বলেছিলেন : আল্লাহর উক্ত্রী ও তাকে পানি পান করানোর ব্যাপারে সতর্ক থাক। (১৪) অতঃপর ওরা তাঁর প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল এবং উক্ত্রীর পা কঠন করেছিল। তাদের পাপের কারণে তাদের পালনকর্তা তাদের উপর ধ্বংস নাযিল করে একাকার করে দিলেন। (১৫) আল্লাহ তা'আলা এই ধ্বংসের কোন বিরূপ পরিণতির আশংকা করেন না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

শপথ সূর্যের ও তার কিরণের, শপথ চন্ডের যখন তা সূর্যের (অন্ত যাওয়ার) পেছনে আসে (অর্থাৎ উদিত হয়। এখানে মধ্য-মাসের কয়েক রাত্রির চাঁদ বোঝানো হয়েছে। এ সময়ে সূর্য অন্ত যাওয়ার পর চন্দ্র উদিত হয়। একথা যোগ করার কারণ সম্ভবত এই যে, এটা পরিপূর্ণ নূরের সময়, যেমন ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ বলে সূর্যের পরিপূর্ণ নূরের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

অথবা এ সময় কুদরতের দু'টি নিদর্শন সূর্যাস্ত ও চন্দ্রোদয় মিলিতভাবে একের পর এক প্রকাশ পায়)। শপথ দিবসের যখন সে সূর্যকে প্রখরভাবে প্রকাশ করে, শপথ রাত্রির যখন সে সূর্যকে (ও তার প্রভাব ও আলোকে সম্পূর্ণরূপে) আচ্ছাদিত করে। (অর্থাৎ রাত্রি গভীর হয়ে যায়, তখন সূর্যের কোন প্রভাব অবশিষ্ট থাকে না। পরিপূর্ণ অবস্থার শপথ করার জন্য প্রত্যেকটির সাথে 'যখন কথাটি বারবার' যোগ করা হয়েছে)। শপথ আকাশের এবং তার,

যিনি তাকে নির্ধারণ করেছেন (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার। এমনিভাবে ﴿مَا مَلَأَهُ﴾ ও

﴿مَا سَوَّاهُ﴾-এর মধ্যেও বুঝতে হবে। হৃষ্টিয় শপথকে চন্ডটার শপথের পূর্বে উল্লেখ করার

কারণ এরূপ হতে পারে যে, এখানে চিত্তকে প্রমাণ থেকে দাবীর দিকে স্থানান্তর করা উদ্দেশ্য। চন্ডটা দাবী এবং হৃষ্টি তার প্রমাণ। সুতরাং এতে তওহীদের দলীল হওয়ারও ইঙ্গিত রয়েছে)। শপথ পৃথিবীর এবং তার যিনি একে বিস্তৃত করেছেন। শপথ (মানুষের) প্রাণের এবং তার, যিনি একে (সর্বপ্রকার আকার-আকৃতি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা) সুবিন্যস্ত করেছেন, অতঃপর তাকে তার অসৎ কর্ম ও সৎ কর্মের (উভয়ের) ভানদান করেছেন। (অর্থাৎ অন্তরে যে সৎ কর্ম ও অসৎ কর্মের প্রবণতা হৃষ্টি হয়, তার চন্ডটা আল্লাহ্ তা'আলা। অতঃপর অসৎ কর্মী ও সৎ কর্মীর পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে যে) যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সেই সকলকাম হয় (অর্থাৎ যে নিজেকে অসৎ কর্ম থেকে বাঁচিয়ে রাখে ও সৎ কর্ম অবলম্বন করে)। এবং যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ হয়। (এরপর শপথের জওয়ার উহা আছে। অর্থাৎ হে কাকির সম্প্রদায়, তোমরা যখন অসৎ কর্মে লিপ্ত রয়েছ, তখন অবশ্যই গযব ও ধ্বংসে পতিত হবে। পরকালে তো অবশ্যই, দুনিয়াতে মাঝে মাঝে, যেমন সামুদ পোন্ন এই অসৎ কর্মের কারণে আল্লাহ্‌র গযব ও আঘাতে পতিত হয়েছে। তাদের ঘটনা এইঃ) সামুদ সম্প্রদায় অবাধ্যতা-বশত (সালেহ্ পরগল্পের প্রতি) মিথ্যারোপ করেছিল, (এটা তখনকার ঘটনা) যখন তাদের সর্বাধিক হতভাগ্য বাড়ি (উষ্ট্রী হত্যার) তৎপর হয়ে উঠেছিল। (তার সাথে অন্যান্য লোকও শরীক ছিল)। অতঃপর আল্লাহ্‌র রসূল [সালেহ্ (আ) যখন তাদের হত্যার সংকল্প জানতে পারেন, তখন] তাদেরকে বলেছিলেনঃ আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী ও তাকে পানি পান করানোর ব্যাপারে সতর্ক থাক (অর্থাৎ উষ্ট্রীকে হত্যা করো না এবং তার পানি বঞ্চ করো না। হত্যা সংকল্পের আসল কারণও ছিল পানির পালা, তাই একে পরিষ্কার উল্লেখ করা হয়েছে। 'আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী' বলার কারণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা অলৌকিকরূপে একে হৃষ্টি করে নবুয়তের প্রমাণ হিসাবে কালেম করেছিলেন এবং এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন অকরূরী করে দিয়েছিলেন)।

অতঃপর তারা তাকে (অর্থাৎ নবুয়্যতের উল্লেখ্য প্রমাণকে) মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল (কেননা তারা তাঁকে রসূল গণ্য করত না) এবং উল্লেখ্যকে হত্যা করেছিল। অতএব তাদের পাপের কারণে তাদের পালনকর্তা তাদের উপর ধ্বংস নাযিল করে সেই ধ্বংসকে (সমগ্র সম্প্রদায়ের জন্য) ব্যাপক করে দিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা (কারও গুরু থেকে) এই ধ্বংসের কোন বিরূপ পরিণতির আশংকা করেন না (যেমন দুনিয়ার রাজা বাদশাহরা কোন সম্প্রদায়কে শাস্তি দিলে প্রায়ই ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও গণআন্দোলনের আশংকা করে থাকেন। সামুদ সম্প্রদায় ও উল্লেখ্য বিস্তারিত ঘটনা সূরা আ'রাকে বর্ণিত হয়েছে)।

আনুমানিক ভাষ্য বিষয়

এই সূরার শুরুতে সাতটি বস্তুর শপথ করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটির সাথে তার পরিপূর্ণ অবস্থা বোঝানোর উদ্দেশ্যে কিছু বিশেষণ যোগ করা হয়েছে। প্রথম শপথ وَالشَّمْسِ

এখানে فَضَى শব্দটি অর্ধগতভাবে شمس-এর বিশেষণ। অর্থাৎ শপথ সূর্যের যখন তা উর্ধ্বগমনে থাকে। সূর্য উদয়ের পর যখন কিছু উর্ধ্বে উঠে যায় এবং পৃথিবীতে তার কিরণ ছড়িয়ে পড়ে, সে সময়কে فَضَى বলা হয়। তখন সূর্য কাছেই দৃষ্টিগোচর হয় এবং তেমন প্রখরতা না থাকার কারণে তা পূর্ণরূপে দেখাও যায়।

দ্বিতীয় শপথ وَالْقَمَرَ إِذَا تَلَافَا—অর্থাৎ চন্দ্ৰের শপথ যখন তা সূর্যের পেছনে

আসে এবং এর এক অর্থ এই যে, যখন চন্দ্র সূর্যাস্তের পরেই উদিত হয়। মাসের মধ্যভাগে এরূপ হয়। তখন চন্দ্র প্রায় পরিপূর্ণ অবস্থায় থাকে। পেছনে আসার এরূপ অর্থও হতে পারে যে, কিছুটা উর্ধ্বগমনে থাকার সময় সূর্য যেমন পুরোপুরি দৃষ্টিগোচর হয়, তেমনই পরিপূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে চন্দ্র সূর্যের অনুগামী হয়। তৃতীয় শপথ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا

এখানে جَلَّاهَا-এর সর্বনাম দ্বারা পৃথিবী অথবা দুনিয়াও বোঝানো যেতে পারে। অর্থাৎ শপথ দিবসের দুনিয়া অথবা পৃথিবীর—মাকে দিন আলোকিত করে। এতেও ইঙ্গিত আছে যে, পূর্ণরূপে আলোকিত দিবসের শপথ করা হয়েছে। কিন্তু বাক্যের বাহ্যিক অবস্থা এই যে, এখানে সর্বনাম দ্বারা সূর্য বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, শপথ দিবসের, যখন সে সূর্যকে আলোকিত করে। অর্থাৎ যখন দিন শুরু হওয়ার কারণে সূর্য উজ্জ্বল দৃষ্টিগোচর হয়।

চতুর্থ শপথ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا—অর্থাৎ শপথ রাত্রির যখন সে সূর্যকে আচ্ছাদিত

করে। মানে সূর্যের কিরণকে ঢেকে দেয়।

পঞ্চম শপথ **مَدْرِيَّةٌ مَّا**—এখানে **مَدْرِيَّةٌ** অব্যয়কে ধরে এই

অর্থ নেওয়া সম্পূর্ণ যে, সে শপথ আকাশের ও তা নির্মাণের। কোরআনের অন্য এক আয়াতে এর নজির আছে **رَبِّیْ** এমনভাবে সপ্ত শপথ **طَحَهَا** বাক্যের

অর্থ এরূপ হবে যে, শপথ পৃথিবীর ও তাকে বিস্তৃত করার। এখানে আকাশের সাথে নির্মাণের এবং পৃথিবীর সাথে বিস্তৃত করার উল্লেখও এতদুভয়ের পরিপূর্ণ অবস্থা বোঝানোর জন্য। এই তফসীর হযরত কাভাদাহ্ (র) প্রমুখ তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে। কাশশাক, বারমাবী ও কুরতুবী একেই পছন্দ করেছেন। কোন কোন তফসীরবিদ এখানে **مَدْرِيَّةٌ** অব্যয়কে

مَدْرِيَّةٌ—এর অর্থে ধরে এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা বুঝিয়েছেন। কাজেই উপরোক্ত বাক্যদ্বয়ের অর্থ হবে শপথ আকাশের ও তাঁর, যিনি একে নির্মাণ করেছেন। শপথ পৃথিবীর ও তাঁর, যিনি একে বিস্তৃত করেছেন। কিন্তু এখানে সবগুলো শপথই সৃষ্টবস্তুর শপথ। যাবতখানে স্রষ্টার শপথ এসে যাওয়া ধারাবাহিকতার খিলাফ মনে হয়। প্রথমোক্ত তফসীর অনুযায়ী এ আপত্তিও দেখা দেয় না যে, সৃষ্টবস্তুর শপথ স্রষ্টার শপথের অপ্রে বর্ণিত হলে কেন?

সপ্তম শপথ : **وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا**—এখানেও দু'রকম অর্থ হতে পারে—এক.

শপথ মানুষের প্রাণের এবং তাকে সুবিন্যস্ত করার এবং দুই. শপথ নকসের এবং তাঁর, যিনি সেটাকে সুবিন্যস্ত করেছেন।

فَجُورًا—এর অর্থ নিকোপ করা এবং **فَجُورًا**

শব্দের অর্থ প্রকাশ্য গোনাহ্। এই বাক্য সপ্তম শপথের সাথে সম্পূর্ণ। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের নকস সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর অন্তরে অসৎ কর্ম ও সৎ কর্ম উভয়ের প্রেরণা জাহিত করেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, মানব সৃষ্টিতে আল্লাহ্ তা'আলা গোনাহ্ ও ইবাদত উভয় কর্মের যোগ্যতা রেখেছেন, অতঃপর তাকে বিশেষ এক প্রকার ক্ষমতা দিয়েছেন, যাতে সে ইচ্ছায় গোনাহের পথ অবলম্বন করে অথবা ইবাদতের পথ। যখন সে নিজ ইচ্ছায় ও ক্ষমতার এতদুভয়ের মধ্য থেকে কোন এক পথ অবলম্বন করে, তখন এই ইচ্ছা ও ক্ষমতার ভিত্তিতেই সে সওয়াব অথবা আযাবের যোগ্য হয়। এই তফসীর অনুযায়ী এরূপ প্রশ্ন তোলায় অবকাশ নেই যে, মানুষের সৃষ্টির মধ্যেই যখন পাপ ও ইবাদত নিহিত আছে, তখন সে তা করতে বাধ্য। এর জন্য সে কোন সওয়াব অথবা আযাবের যোগ্য হবে না। একটি হাদীস থেকে এই তফসীর গৃহীত হয়েছে। সহীহ মুসলিমে আছে যে, তফসীর সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জওয়াবে রসূলুল্লাহ্ (সা) আলোচ্য আয়াত তিলাওয়াত করেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের মধ্যে গোনাহ্ ও ইবাদতের যোগ্যতা গন্ধিত রেখেছেন,

কিন্তু তাকে কোন একটি করতে বাধ্য করেন নি বরং তাকে উভয়ের মধ্য থেকে যে কোন একটি করার ক্ষমতা দান করেছেন।

হযরত আবু হুরায়রা ও ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ (সা) যখন এই আয়াত তিলাওয়াত করতেন, তখন উচ্চস্বরে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করতেন :

—اللَّهُمَّ اِنِّیْ تَقَوَّیْتُهَا اَنْتَ وَلِیُّهَا وَمَوْلَاهَا وَاَنْتَ خَیْرُ مَنْزِلِهَا

—অর্থাৎ হে আল্লাহ্ আমাকে তাকওয়ার তওফীক দান কর, তুমিই আমার মুকুব্বী ও গুণটপোষক।

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ

نَسَّاهَا —অর্থাৎ সে ব্যক্তি সফলকাম, যে নিজের নফসকে শুদ্ধ করে।

প্রকৃত অর্থ অভ্যন্তরীণ শুদ্ধতা। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা অর্জন করে, সে সফলকাম। পক্ষান্তরে সে ব্যক্তি ব্যর্থ যে নিজের নফসকে পাপের পাকিলে নিমজ্জিত করে দেয়।

এক আয়াতে আছে : —اَمْ يَدُّسَلٰی فِی الْتَرَابِ —কোন কোন তফসীরবিদ এ আয়াতের

অর্থ করেছেন, সে ব্যক্তি সফলকাম হয়, যাকে আল্লাহ্ শুদ্ধ করেন এবং সে ব্যক্তি ব্যর্থ, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা গোনাহে ডুবিয়ে দেন। এ আয়াত সমগ্র মানবকে দু'ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে, সফলকাম ও ব্যর্থ। অতঃপর দ্বিতীয় প্রকার মানুষের একটি ঘটনা দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করে তাদের অন্তর্ভুক্ত পরিপত্তি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। সাহুদ পোতের ঘটনার প্রতি সংক্ষেপে ইঙ্গিত করে তাদের এই শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে :

فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَحَسَوْهُ

শাস্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, যা বারবার কোন ব্যক্তি অথবা জাতির উপর পতিত হয়ে তাকে সম্পূর্ণ নাস্তানাবুদ করে দেয়।

وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا —অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার বনিতা সবাইকে বেল্টন করে নেয়।

শাস্তিদান ও কোন জাতিকে নির্মূল করে দেওয়ার ব্যাপারকে দুনিয়ার ব্যাপারের মত মনে করেনা। দুনিয়াতে কোন রাজাধিরাজ ও প্রবল পরাক্রান্ত শাসকও কোন জাতির বিরুদ্ধে

ধ্বংসাত্মিয়ান পরিচালনা করলে সে জাতির অবশিষ্ট লোক অথবা তাদের সমর্থকদের প্রতি-
শোধমূলক কার্যক্রম ও গণবিদ্রোহের আশংকা করতে থাকে। এখানে যারা অপরকে হত্যা
করে, তারা নিজেরাও হত্যার আশংকা দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। যারা অপরকে আক্রমণ
করে তারা নিজেরাও আক্রান্ত হওয়ার ভয় রাখে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ নন।
কারণ পক্ষ থেকে কোন সময় তাঁর কোন বিপদাশঙ্কা নেই।

সূরা আল-হাশ্ব

সূরা মায়দা

মকায় অবতীর্ণ : ২১ আয়াত ॥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْيَلِ إِذَا يَفْثُ ۖ وَالتَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ۖ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ۚ إِنَّ
 سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ۚ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ۖ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ۖ فَسَنُيَسِّرُهُ
 لِلْيُسْرَى ۚ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ۖ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ۖ فَسَنُيَسِّرُهُ
 لِلْعُسْرَى ۚ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ۚ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى ۚ
 وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى ۚ فَأَنْذَرْنَاهُمْ نَارًا تَلَكَّطُ ۚ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا
 الْأَشْقَى ۚ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ۚ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ۚ الَّذِي يُؤْتِي
 مَالَهُ يَتَزَكَّى ۚ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ۚ إِلَّا
 ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ۚ وَلَسَوْفَ يَرْضَاهُ ۚ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) শপথ রাহিম, যখন সে আহ্বান করে, (২) শপথ দিনের, যখন সে আলোকিত হয় (৩) এবং তাঁর, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন, (৪) নিশ্চয় তোমাদের কর্ম প্রচেষ্টা বিভিন্ন ধরনের। (৫) অতএব, যে দান করে এবং আল্লাহ্‌তীক হয়, (৬) এবং উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে, (৭) আমি তাকে সুখের বিষয়ের জন্য সহজ পথ দান করব। (৮) আর যে কপপতা করে ও বেপরোয়া হয় (৯) এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা মনে করে, (১০) আমি তাকে কষ্টের বিষয়ের জন্য সহজ পথ দান করব। (১১) যখন সে অর্থ-পতিত হবে, তখন তার সম্পদ তার কোনই কাজে আসবে না। (১২) আমার দায়িত্ব পথ-প্রদর্শন করা। (১৩) আর আমি সালিক ইহকালের ও পরকালের। (১৪) অতএব,

আমি তোমাদেরকে প্রচলিত অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি। (১৫) এতে নিত্য হত-
তাপ্য ব্যক্তিই প্রবেশ করবে, (১৬) যে মিথ্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়। (১৭) এ
থেকে দূরে রাখা হবে আল্লাহ্‌ভীর ব্যক্তিকে, (১৮) যে আশুওজির জন্যে তার ধন-সম্পদ দান
করে (১৯) এবং তার উপর কারও কোন প্রতিদানযোগ্য অনুগ্রহ থাকে না। (২০) তার
মহান পালনকারীর সন্তুষ্টি আশ্রয় ব্যতীত। (২১) সে সত্বরই সন্তুষ্টি লাভ করবে।

তকসীরের সার-সংক্ষেপ

শপথ রাত্রির যখন সে (সূর্য ও পৃথিবীকে) আচ্ছন্ন করে, শপথ দিনের যখন সে
আলোকিত হয় এবং (শপথ) তার, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন (অর্থাৎ আল্লাহ্
তা'আলা)। অতঃপর অওয়াব এই যে) নিশ্চয় তোমাদের প্রচেষ্টা (অর্থাৎ কর্মসমূহ)
বিভিন্ন ধরনের। (এমনিভাবে এসব কর্মের ফলাফলও বিভিন্ন ধরনের)। অতএব, যে
(আল্লাহ্র পথে ধনসম্পদ) দান করে, আল্লাহ্‌ভীর হয় এবং উত্তম বিষয়কে (অর্থাৎ
ইসলামকে) সত্য মনে করে, আমি তাকে সুখের বিষয়ের জন্য সহজ পথ দান করব।
(‘সুখের বিষয়’ বলে সংকর্ম ও তার মধ্যস্থতার জায়াত বোঝানো হয়েছে। এটাই সহজ
পথের কারণ ও স্থান) এবং যে (ওয়াজিব প্রাপ্য সেওয়ার ব্যাপারে) কৃপণতা করে এবং
(আল্লাহ্‌কে ভয় করার পরিবর্তে আল্লাহ্র প্রতি) বেপরোয়া হয় এবং উত্তম বিষয়কে (অর্থাৎ
ইসলামকে) মিথ্যা মনে করে, আমি তাকে কষ্টের বিষয়ের জন্য সহজ পথ দান করব।
(‘কষ্টের বিষয়’ বলে কুকর্ম ও তার মধ্যস্থতায় জাহান্নাম বোঝানো হয়েছে। এটাই কষ্টের
কারণ ও স্থান। উত্তর জাহান্নাম সহজ পথ দান করার অর্থ এই যে, ভাল অথবা মন্দ কাজ তার
জন্য সহজ হয়ে যাবে এবং অকপটে প্রকাশ পাবে। হাদীসে এই বিষয়বস্তুর সমর্থন আছে।
অতঃপর শেষোক্ত প্রকার লোকের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে) যখন সে অধঃপতিত হবে, তখন
তার ধনসম্পদ তার কোন কাজে আসবে না। (অধঃপতিত হওয়ার অর্থ জাহান্নামে যাওয়া)।
নিশ্চয় আমার দায়িত্ব (ওয়াদা অনুযায়ী) পথপ্রদর্শন করা। (আমি এই দায়িত্ব পুরোপুরি পালন
করেছি। এরপর কেউ তো ঈমান ও আনুগত্যের পথ অবলম্বন করেছে, যা ^{أَطَى} مِنْ أَطَى বাকো

উল্লিখিত হয়েছে এবং কেউ কুকর্ম ও গোনাহের পথ ধরেছে, যা ^{بَطَل} مِنْ بَطَل বাকো বর্ণিত
হয়েছে। যে যেমন পথ অবলম্বন করবে, সে তেমনি ফলপ্রাপ্ত হবে। কেননা) আমারই
কলজার পরকাল ও ইহকাল। (অর্থাৎ উত্তম কালে আমারই রাজত্ব। তাই ইহকালে আমি
বিধি-বিধান জারি করেছি এবং পরকালে মান্য ও অমান্য করার কারণে প্রতিদান ও শাস্তি
দেব। অতঃপর বলা হয়েছে, আমি যে তোমাদেরকে বিভিন্ন কর্মের বিভিন্ন প্রতিফল বলে
দিয়েছি, এটা এজন্য যে) আমি তোমাদেরকে লেলিহান অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি,
(যা ^{فَسَوْفَ تَلْعَنُونَ} لَلْفَسْرِ বাক্য জাপন করে, যাতে তোমরা ঈমান ও আনুগত্য

অবলম্বন করে এ অগ্নি থেকে আত্মরক্ষা করে এবং কুকুর ও গোনাহ্ অবলম্বন করে আহাম্মামে না যাও। অতঃপর তাই বলা হয়েছে—) এতে নিভাত হতভাগ্য ব্যক্তিই প্রবেশ করবে, যে (সত্য ধর্মের প্রতি) মিথ্যারোগ করে এবং (তা থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়। এ থেকে দূরে রাখা হবে আল্লাহ্‌তীকর ব্যক্তিকে, যে (কেবল) আত্মশুদ্ধির জন্য তার ধনসম্পদ দান করে (অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টিই তার কাম্য হয়)। এবং তার উপর কারও কোন প্রতিদানযোগ্য অনুগ্রহ থাকে না তার মহান পালনকর্তার সন্তুষ্টি অব্যবহা ব্যতীত (কারণ, এটাই তার লক্ষ্য। এতে আন্তরিকতার চূড়ান্ত রূপ প্রকাশ করা হয়েছে। কেননা, কারও অনুগ্রহের প্রতিদান দেওয়াও মোস্তাহাব, উত্তম ও সওয়াবের কাজ। কিন্তু প্রাথমিক অনুগ্রহের সমান প্রেত নয়। এ ব্যক্তি প্রাথমিক অনুগ্রহ করে। তাই তার দান রিয়া, গোনাহ্ ইত্যাদির আশংকা থেকে উত্তমরূপে মুক্ত হবে। এটাই পরিপূর্ণ আন্তরিকতা)। সে সত্বরই সন্তুষ্টি লাভ করবে। (উপরে শুধু বলা হয়েছিল যে, তাকে আহাম্মাম থেকে দূরে রাখা হবে। এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, পরকালে তাকে এমন সব নিয়ামত দেওয়া হবে, যাতে সে বাস্তবিকই সন্তুষ্ট হয়ে যাবে)।

আনুযায়িক ভাষাতত্ত্ব বিবরণ

إِنَّا نَادِيْكَ إِلَىٰ رَبِّكَ —এ বাক্যটি সূরা ইনশিকাকের

كَذٰلِكَ বাক্যের অনুরূপ যার তফসীর সে সূরায় বর্ণিত হয়ে গেছে। মর্মার্থ এই যে, মানুষ সৃষ্টিগতভাবে কোন না কোন কাজের জন্য প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায়ে অস্ত্রান্ত কিন্তু কোন কোন লোক তার অধ্যবসায় ও পরিশ্রম দ্বারা চিরস্থায়ী সুখের ব্যবস্থা করে নেয়, আর কেউ কেউ এই পরিশ্রম দ্বারাই অনন্ত আশাব্রত কল্প করে। হাদীসে আছে, প্রত্যেক মানুষ সকাল বেলায় গাছোখান করে নিজেকে ব্যবসায়ে নিয়োজিত করে। অতঃপর কেউ এই ব্যবসায়ে সফলতা অর্জন করে এবং নিজেকে পরকালের আশাব থেকে মুক্ত করে। পক্ষান্তরে কারও ভ্রম ও প্রচেষ্টাই তার ধ্বংসের কারণ হয়ে যায়। কিন্তু বুদ্ধিমানের কাজ হল প্রথমে নিজের প্রচেষ্টা ও কর্মের পরিণতি চিন্তা করা এবং যে কর্মের পরিণতি সাময়িক সুখ ও আনন্দ হয়, তার কাছেও না যাওয়া।

কর্মপ্রচেষ্টার দিক দিয়ে মানুষের দু'সল : অতঃপর কোরআন পাক কর্মপ্রচেষ্টার ভিত্তিতে মানুষকে দু'ভাবে বিভক্ত করেছে এবং প্রত্যেকের তিনটি করে বিশেষণ বর্ণনা করেছে —প্রথমে সফলকাম দলের তিনটি বিশেষণ উল্লেখ করে বলা হয়েছে :

وَأَتَّقَىٰ وَوَدَّقَ بِالْعُسَىٰ —অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করে, আল্লাহকে ভয়

করে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে, তাঁর অনুশাসনের বিরুদ্ধাচরণ থেকে বঁচে থাকে এবং সে উত্তম কলেমাকে সত্য মনে করে। এখানে 'উত্তম কলেমা' বলে কলেমারে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'

বোঝানো হয়েছে।—(ইবনে আব্বাস, রাহুহাক) এই কলমাকে সত্য মনে করার অর্থ ইমান আনা। যদিও ইমান সব কর্মেরই প্রাপ এবং সবাই অপ্রবর্তী বিষয় কিন্তু এখানে পেছনে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, এখানে উদ্দেশ্য প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায় সম্পর্কে আলোচনা করা। এগুলো কর্মেরই অন্তর্ভুক্ত। ইমান হলো একটি অন্তরের বিষয় অর্থাৎ অন্তরে আল্লাহ ও রসুলকে সত্য জানা এবং কলমায় শাহাদতের মাধ্যমে মুখেও তা স্বীকার করা। বলাবাহুল্য, এই উভয় কাজে কোন শারীরিক শ্রম নেই এবং কেউ এগুলোকে কর্মের তালিকাভুক্ত গণ্য করে না।

দ্বিতীয় দলেরও তিনটি কর্ম উল্লেখ করা হয়েছে : **وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ**

وَكَذَّبَ بِالْعُسَىٰ—অর্থাৎ যে আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করার ব্যাপারে কুপনতা করে তথা যাকাত ও ওয়াজিব সদকাও দেয় না, আল্লাহকে ভয় করার পরিবর্তে তাঁর প্রতি বিমুখ হয় এবং উত্তম কলমা তথা ইমানের কলমাকে মিথ্যা মনে করে। এতদুভয়ের প্রথম দল সম্পর্কে বলা হয়েছে **يُسْرَىٰ—فَسُنْهِرُ لِّلْهٰسِرَىٰ**—এর শাব্দিক অর্থ সহজ ও আরামদায়ক

বিষয়, যাতে কোন কষ্ট নেই। এখানে জামাত বোঝানো হয়েছে। দ্বিতীয় দল সম্পর্কে বলা হয়েছে : **عُسْرَىٰ—فَسُنْهِرُ لِّلْعُسْرَىٰ**—এর শাব্দিক অর্থ কঠিন ও কষ্টদায়ক

বিষয়। এখানে জাহান্নাম বোঝানো হয়েছে। উভয় বাক্যের অর্থ এই যে, যারা তাদের প্রচেষ্টা ও শ্রম প্রথমোক্ত তিন কাজে নিয়োজিত করে, (অর্থাৎ আল্লাহর পথে ব্যয় করা, আল্লাহকে ভয় করা এবং ইমানকে সত্য মনে করা) তাদেরকে আমি জাহান্নামের কাজের জন্য সহজ করে দেই। পক্ষান্তরে যারা তাদের প্রচেষ্টা ও শ্রমকে শেষোক্ত তিন কাজে নিয়োজিত করে, আমি তাদেরকে জাহান্নামের কাজের জন্য সহজ করে দেই। এখানে বাহ্যাত এরূপ বলা সম্ভব ছিল যে, আমি তাদের জন্য জাহান্নামের অথবা জাহান্নামের কাজ সহজ করে দেই। কেননা কাজকর্মই সহজ অথবা কঠিন হয়ে থাকে—ব্যক্তি সহজ অথবা কঠিন হয় না। কিন্তু কোরআন পাক এভাবে ব্যক্ত করেছে যে, স্বয়ং তাদের সত্যকে এসব কাজের জন্য সহজ করে দেওয়া হবে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, প্রথম দলের জন্য জাহান্নামের কাজকর্ম তাদের মজ্জায় পরিণত হবে। আর এর বিপরীত কাজ করতে তারা কষ্ট অনুভব করবে। এমনভাবে দ্বিতীয় দলের জন্য জাহান্নামের কাজকর্ম মজ্জায় পরিণত করে দেওয়া হবে। ফলে তারা এজাতীয় কাজই পছন্দ করবে এবং এতেই শান্তি পাবে। উভয় দলের মজ্জায় এ অবস্থা সৃষ্টি করে দেওয়াকেই একথা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, স্বয়ং তাদেরকে এসব কাজের জন্য সহজ করে দেওয়া হবে। এক হাদীস এর সমর্থনে রসুল্লাহ (সা) বলেন :

اعملوا فكل مهمل لما خلق له ا ما من كان من اهل السعادر فسنهسر

لَعْمَلِ السَّعَادَةِ وَ أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَيَسِيرُ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ -

অর্থাৎ তোমরা নিজ নিজ কর্ম করে যাও। কারন, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সেকাজই সহজ করা হয়েছে, যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই যে ব্যক্তি সৌভাগ্যবান, সৌভাগ্যবানদের কাজই তার স্বভাব ও মজ্জার পরিণত হয়। আর যে হতভাগা, হতভাগাদের কাজই তার স্বভাব ও মজ্জার পরিণত হয়। এতদুভয় বিষয় আল্লাহ্‌প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করার ফলশ্রুতিতে অর্জিত হয়। তাই একারণে আযাব ও সওবাব দেওয়া হয়। অতঃপর হতভাগা জাহান্নামী দলকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে :

وَمَا يَغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى - অর্থাৎ যে ধনসম্পদের খাতিরে এ

হতভাগা ওয়াজিব হক দিতেও কৃপণতা করত, সে ধনসম্পদ আযাব আসার সময় তার কোন কাজে আসবে না। تَرَدَّى - এর শাব্দিক অর্থ গর্তে পতিত হওয়া ও ধ্বংস হওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, মৃত্যুর পরে কবরে অতঃপর কিয়ামতে যখন সে জাহান্নামের গর্তে পতিত হবে, তখন এই ধনসম্পদ কোন উপকারে আসবে না।

لَا يَمْلَهُهُ إِلَّا أَشَقَى النَّفْسُ كَذِبَ وَتَوَلَّى - অর্থাৎ এই জাহান্নামে নিভাত

হতভাগা ব্যক্তিই দাখিল হবে, যে আল্লাহ ও রসুলের প্রতি মিথ্যারোপ করে এবং তাঁদের আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। বলাবাহুল্য, এরূপ মিথ্যা আরোপকারী কাকিরই হতে পারে। এ থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, পাপী মু'মিন যে মিথ্যারোপের অপরাধে অপরাধী নয়, সে জাহান্নামে দাখিল হবে না। অথচ কোরআনের অনেক আয়াত ও হাদীস থেকে জানা যায় যে, মু'মিন ব্যক্তি গোনাহ করার পর যদি তওবা না করে অথবা কারও সুপারিশের বলে কিংবা বিশেষ রহমতে যদি তাকে ক্ষমা করা না হয়, তবে সেও জাহান্নামে যাবে এবং গোনাহের শাস্তি ভোগ করা পর্যন্ত জাহান্নামে থাকবে। অবশ্য শাস্তি ভোগ করার পর জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে ইমামের কল্যাণে তাকে জাহান্নামে দাখিল করা হবে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতের ভাষা বাহ্যত এর পরিপন্থী। অতএব এ আয়াতের অর্থ এমন হওয়া জরুরী, যা অন্যান্য আয়াত ও সহীহ হাদীসের খিলাফ নয়। এর একান্ত সহজ ব্যাখ্যা তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে যে, এখানে চিরকালের জন্য দাখিল হওয়া বোঝানো হয়েছে। এটা কাকিরেরই বৈশিষ্ট্য। মু'মিন কোন না কোন সময় গোনাহের শাস্তি ভোগ করার পর জাহান্নাম থেকে উদ্ধার পাবে। তফসীরবিদগণ এছাড়া আরও কিছু ব্যাখ্যা করেছেন। তফসীরে মামহারীতে আছে যে, আয়াতে اَشَقَى وَ تَوَلَّى শব্দদ্বয়ের অর্থ ব্যাপক নয় বরং এখানে তাদেরকেই বোঝানো হয়েছে যারা রসুলুল্লাহ (সা)-র আমলে বিদ্যমান ছিল। তাদের মধ্যে কোন মুসলমান গোনাহ করা সত্ত্বেও রসুলুল্লাহ (সা)-র সংসর্গের বরকতে জাহান্নামে যাবে না।

সাহাবায়ে কিরাম সবাই জাহান্নাম থেকে মুক্ত : কারন, প্রথমত তাঁদের দ্বারা গোনাহ

খুব কমই হয়েছে। তাছাড়া তাঁদের অবস্থা থেকে একথা অকুরীভাবে জানা যায় যে, তাঁদের কারও দ্বারা কোন গোনাহ্ হয়ে থাকলে তিনি তওবা করে নিয়েছেন। আরও বলা যায় যে, তাঁদের এক একটি গোনাহের মুকাবিলার সংকমের সংখ্যা এত বেশী যে, সে গোনাহ্ অনা-
রাসেই মাক হয়ে যেতে পারে। কোরআন পাকে বলা হয়েছে : **إِنَّ الْكُفْرَانَ يَرْفَعُ اللَّهُ فِي كُفْرَانِهِ**

إِنَّ الْكُفْرَانَ يَرْفَعُ اللَّهُ فِي كُفْرَانِهِ অর্থাৎ সংকর্ম অসংকর্মের কাকফরা হয়ে যায়। সন্তান রসুলে করীয়

(সা)-এর সন্তান এমন একটি সংকর্ম, যা সব সংকর্মের উপর প্রবল। হাদীসে সংকর্মশীল
বুর্গদের সম্পর্কে বলা হয়েছে : **هُمْ قَوْمٌ لَا يَشْفَعُونَ جَلِيسُهُمْ وَلَا يَخَافُ أُولِيَّهُمْ**

অর্থাৎ তাঁদের সাথে যারা উঠাবসা করে, তারা হতভাগা হতে পারে না এবং তাদের সাথে
যারা প্রীতির সম্পর্ক রাখে, তারা বঞ্চিত হতে পারে না।—(বুখারী, মুসলিম) সুতরাং
যে ব্যক্তি পরগম্বরকুল শিরামশি মুহাম্মাদ মুত্তফা (সা)-র সহচর হবে, সে কিরাপে হতভাগা
হতে পারে? এ কারণেই অনেক সহীহ হাদীসে পরিকার বলা হয়েছে যে, সাহাবায়ে কিরাম
সবাই জাহান্নামের আশাব থেকে মুক্ত। খোদ কোরআনে সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে বলা
হয়েছে : **وَلَا وَعَدَ اللَّهُ الْمُحْسِنِينَ** —অর্থাৎ তাঁদের প্রত্যেকের জন্য আলাহ তা'আলা

হসনা অর্থাৎ আশ্রিতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অন্য এক আয়াতে আছে : **إِنَّ الَّذِينَ**

سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ الْمُحْسِنِينَ أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُ جَنَّاتُ —অর্থাৎ যাদের

অন্য আশ্রিত পক্ষ থেকে হসনা (আশ্রিত) অবধারিত হয়ে গেছে, তাদেরকে জাহান্নামের
অগ্নি থেকে দূরে রাখা হবে। এক হাদীসে আছে, জাহান্নামের অগ্নি সে ব্যক্তিকে স্পর্শ
করবে না, যে আমাকে দেখেছে।—(তিরমিযী)

وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى —এতে সৌভাগ্যশালী

আলাহুজ্জীকদের প্রতিদান বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আলাহুর আনুগত্যে অত্যন্ত
এবং একমাত্র গোনাহ্ থেকে গুচ্ছ হওয়ার উদ্দেশ্যে ধনসম্পদ ব্যয় করে, তাকে জাহান্নামের
অগ্নি থেকে দূরে রাখা হবে।

আশ্রিতের ভাষা থেকে ব্যাপকভাবে বোঝা যায় যে, যে ব্যক্তিই ঈমানসহ আলাহুর
পথে ধনসম্পদ ব্যয় করে, তাকেই জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে। কিন্তু এ আশ্রিতের
নামে-মুশল সংক্রান্ত ঘটনা থেকে জানা যায় যে, এখানে **اتقى** বলে হয়রত আবু বকর

সিন্দীক (রা)-কে বোঝানো হয়েছে। হযরত ওরওয়া (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, সাতজন মুসলমানকে কাফিররা গোলাম বানিয়ে রেখেছিল এবং ইসলাম গ্রহণের কারণে তাদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালাত। হযরত আবু বকর (রা) বিরাট অংকের অর্থ দিয়ে তাদেরকে কাফির মালিকদের কাছ থেকে ক্রয় করে নেন এবং মুক্ত করে দেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাখিল হয়।—(মায়হারী)

এর সাথেই সম্পর্কশীল আয়াতের শেষ বাক্য বলা হয়েছে : وَمَا لَّاحِدٌ حِدًا

—مِنْ نِّعْمَةٍ تَجْزَى—অর্থাৎ যেসব গোলামকে হযরত আবু বকর (রা) প্রচুর অর্থ দিয়ে ক্রয় করে মুক্ত করে দেন, তাদের কোন সাবেক অনুগ্রহও তাঁর উপর ছিল না, যার প্রতিদানে এরাগ করা যেত; বরং —إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى—তাঁর লক্ষ্য মহান আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অন্বেষণ ব্যতীত কিছুই ছিল না।

মুত্তাদরাক হাকিমে হযরত সুবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু বকর (রা)-এর অভিযাস ছিল যে, তিনি কোন মুসলমানকে কাফির মালিকের হাতে বন্দী দেখলে তাকে ক্রয় করে মুক্ত করে দিতেন। এ ধরনের মুসলমান সাধারণত দুর্বল ও শক্তিহীন হত। একদিন তাঁর পিতা হযরত আবু কোহাফা বললেন : তুমি যখন গোলামদেরকে মুক্তই করে দাও, তখন শক্তিশালী ও সাহসী গোলাম দেখে মুক্ত করা উচিত, যাতে ভবিষ্যতে সে শত্রুর হাত থেকে তোমাকে হিফাজত করতে পারে। হযরত আবু বকর (রা) বললেন : কোন মুক্ত করা মুসলমান দ্বারা উপকার লাভ করা আমার লক্ষ্য নয়। আমি তো কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যই তাদেরকে মুক্ত করি।—(মায়হারী)

وَلَسَوْفَ يَرْضَى

—অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই তাঁর ধন-সম্পদ ব্যয় করেছে এবং পাখির উপকার চায়নি, আল্লাহ তা'আলাও পরকালে তাকে সন্তুষ্ট করবেন এবং আয়াতের মহা নিয়ামত তাকে দান করবেন। এই শেষ বাক্যটি হযরত আবু বকর (রা)-এর জন্য একটি বিরাট সুসংবাদ। আল্লাহ তাঁকে সন্তুষ্ট করবেন এ সংবাদ দুনিয়াতেই তাঁকে শোনানো হয়েছে।

سورة الضحى

সূরা ভোহা

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত ১১ ॥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالضُّحَىٰ
مِنَ الْأُولَىٰ ۖ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۚ
وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۖ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ۚ
فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۖ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۖ
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) শপথ পূর্বাহ্নের, (২) শপথ রাত্রির যখন তা গভীর হয়, (৩) আপনার পালন-কর্তা আপনাকে ডাণ করেননি এবং আপনার প্রতি বিরূপও হননি। (৪) আপনার জন্যে পরকাল ইহকাল অপেক্ষা প্রের। (৫) আপনার পালনকর্তা সত্বরই আপনাকে দান করবেন, অতঃপর আপনি সন্তুষ্ট হবেন। (৬) তিনি কি আপনাকে এতীমরূপে পাননি? অতঃপর তিনি আপনাকে পেরেছেন পথহারা, অতঃপর পথপ্রদর্শন করেছেন। (৭) তিনি আপনাকে পেরেছেন অভাবমুক্ত করেছেন। (৮) তিনি আপনাকে পেরেছেন নিঃশ্র, অতঃপর অভাবমুক্ত করেছেন। (৯) সূতরাং আপনি এতীমের প্রতি কঠোর হবেন না; (১০) গণ্ডালকারীকে ধমক দেবেন না (১১) এবং আপনার পালনকর্তার নিরামৃতের কথা প্রকাশ করুন।

তকসীরের সার-সংক্ষেপ

শপথ পূর্বাহ্নের এবং রাত্রির যখন তা গভীর হয়, (এর দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে— এক. আক্ষরিক অর্থাৎ পুরোপুরি অন্ধকারে আব্ধ হতে যাওয়া। কেননা, রাত্রিতে অন্ধকার আস্তে আস্তে বাড়়ে এবং কিছু রাত্রি অতিবাহিত হলে পর তা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। দুই. রূপক অর্থাৎ প্রাণীকুলের নিদ্রামগ্ন হয়ে যাওয়া এবং চলাফেরা ও কথাবার্তার আওয়ায থেমে যাওয়া। অতঃপর শপথের জওয়াব বলা হয়েছে) আপনার পালনকর্তা

আপনাকে ত্যাগ করেন নি এবং আপনার প্রতি বিরূপও হন নি। (কেননা, প্রথমত আপনি এরূপ কোন কাজ করেন নি। দ্বিতীয়ত পরগণ্যগণকে আজাহ্ তা'আলা এরূপ আচরণ থেকে মুক্ত রেখেছেন। সুতরাং আপনি কাফিরদের বাজে কথার বাধিত হবেন না। ওহীর আগমনে কয়েকদিন বিলম্ব দেখে তারা বলতে শুরু করেছে : আপনার পালনকর্তা আপনাকে ত্যাগ করেছেন। কাফিরদের এই প্রজাপোড়ির মুকাবিলায় আপনি পূর্ববৎ ওহীর সন্মান দ্বারা ভূষিত হবেন। এ সন্মান তো আপনার জন্য ইহকালে) আপনার জন্য পরকাল ইহকাল অপেক্ষা শ্রেয়। (সুতরাং সেখানে আপনি আরও বেশী সন্মান ও নিয়ামত পাবেন)। আপনার পালনকর্তা সত্ত্বরই আপনাকে (পরকালে প্রচুর নিয়ামত) দান করবেন, অতঃপর আপনি (এ দান পেয়ে) সন্তুষ্ট হবেন। [শপথের বিষয়বস্তুর সাথে এ সুসংবাদের সম্পর্ক এই যে, আজাহ্ তা'আলা যেমন বাহ্যত দিনের পর রাত্রি এবং রাত্রির পর দিন এনে তাঁর কুদরত ও হিকমতের বিভিন্ন নিদর্শন প্রকাশ করেন, অত্যন্তরূপ অবস্থাকেও তেমনি বদলে হবে। সূর্য-কিরণের পর রাত্রির আগমন যদি আজাহ্ তা'আলার রোষ ও অসন্তুষ্টির দলীল না হয় এবং এতে প্রমাণিত না হয় যে, এরপর কখনও দিবালোক আসবে না, তবে কয়েক দিন ওহীর আগমন বন্ধ থাকলে এটা কিরূপে বোঝা যায় যে, আজকাল আজাহ্ তাঁর মনোনীত পরগণ্যদের প্রতি রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হয়ে গেছেন। কবে ওহীর দরজা চিরতরে বন্ধ করে দিয়েছেন? এরূপ বক্তার অর্থ আজাহ্ তা'আলার সর্বব্যাপী জ্ঞান ও জগার রহস্য সম্পর্কে আপত্তি তোলা যে, তিনি পূর্বে জানতেন না তাঁর মনোনীত পরগণ্যর ভবিষ্যতে অযোগ্য প্রমাণিত হবে (নাউমু-বিলাহ্)। অতঃপর কতক নিয়ামত দ্বারা উপরোক্ত বিষয়বস্তুকে জোরদার করা হয়েছে]। আজাহ্ তা'আলা কি আপনাকে ইরাতীমরূপে পান নি? অতঃপর আপনাকে আশ্রয় দিয়েছেন। [যাতুগর্ভে থাকা অবস্থায়ই রসূলুল্লাহ্ (সা) পিতৃহীন হয়ে যান। এরপর আজাহ্ তা'আলা দাদাকে দিয়ে তাঁর জালন-পালন করান। আট বছর বয়সে মাতারও ইন্তেকাল হয়ে গেলে তিনি পিতৃব্যের জালন-পালনে আসেন। আশ্রয় দেওয়ার অর্থ এটাই]। আজাহ্ তা'আলা আপনাকে (শরীয়ত সম্পর্কে) বেখবর পান, অতঃপর (শরীয়তের) পথপ্রদর্শন করেছেন।

مَا كُنْتُ تَذَرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ —ওহীর
(যেমন অন্য জায়গাতে আছে :

পূর্বে-শরীয়তের উফসীল জানা না থাকা কোন দোষ নয়)। তিনি আপনাকে নিঃস্ব পেয়েছেন অতঃপর ধনশালী করেছেন। [খাদীজা (রা)-র অর্থ দ্বারা তিনি অংশীদারিত্বে ব্যবসা করেন এবং মুনাফা অর্জন করেন। অতঃপর খাদীজা (রা) তাঁর সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়ে সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি তাঁর হাতে তুলে দেন। উদ্দেশ্য এই যে, আপনি শুরু থেকেই নিয়ামত-প্রাপ্ত আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন। আমি যখন এসব নিয়ামত আপনাকে দিয়েছি, তখন] আপনি (এর কৃতজ্ঞতায়) ইরাতীমের প্রতি কঠোরতা করবেন না, সাহায্যপ্রার্থীকে ধমক দেবেন না (এটা কার্যগত কৃতজ্ঞতা)। এবং আপনার পালনকর্তার (উপরোক্ত) নিয়ামতের কথা প্রকাশ করতে থাকুন।

আনুশঙ্গিক অন্তঃস্থ বিষয়

এই সূরা অবতরণের কারণ সম্পর্কে বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযীতে হযরত জুনদুব ইবনে অবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার রসূলুল্লাহ্ (সা) একটি অংশলীতে আঘাত লেগে রক্ত বের হয়ে পড়লে বললেন :

أَنْتَ إِلَّا أَصْبَحَ دُمُوتَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ لَقِيتَ

অর্থাৎ তুমি তো একটি অংশলীই যা রক্তাক্ত হয়ে গেছে। তুমি যে কণ্ট পেয়েছ, তা আল্লাহর পথেই পেয়েছ। (কাজেই দুঃখ কিসের)। এ ঘটনার পর কিছু দিন জিবরাঈল ওহী নিয়ে আগমন করলেন না। এতে মুশরিকরা বলতে শুরু করে যে, মুহাম্মদকে তার আল্লাহ পরিত্যাগ করেছেন ও তার প্রতি কণ্ট হয়েছেন। এরই প্রেক্ষিতে এই সূরা যোহা অবতীর্ণ হয়। বুখারীতে বর্ণিত জুনদুব (রা)-এর রোগস্বারেতে দু'এক রাত্রিতে তাহাযুদের জন্য না উঠার কথা আছে—ওহী বিলম্বিত হওয়ার কথা নেই। তিরমিযীতে তাহাযুদের জন্য না উঠার উল্লেখ নেই, শুধু ওহী বিলম্বিত হওয়ার উল্লেখ আছে। বলাবাহুল্য, উভয় ঘটনাই সংঘটিত হতে পারে বিধায় উভয় রোগস্বারেতে কোন বিরোধ নেই। বর্ণনাকারী হয় তো এক সময়ে এক ঘটনা এবং অন্য সময়ে অন্য ঘটনা বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য রোগস্বারেতে আছে যে, আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিরুদ্ধে এই অপপ্রচার চালিয়েছিল। ওহী বিলম্বিত হওয়ার ঘটনা কয়েকবার সংঘটিত হয়েছিল। একবার কোরআন অবতরণের প্রথমভাগে, যাকে 'ফাতরাতে-ওহী'র কাল বলা হয়। এটাই ছিল বেশী দিনের বিলম্ব। দ্বিতীয়বার তখন বিলম্বিত হয়েছিল, যখন মুশরিকরা অথবা ইহুদীরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে রাসূলের স্বরূপ সম্পর্কে প্রশ্ন রেখেছিল এবং তিনি পরে জওরাব দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তখন 'ইনশাআল্লাহ্' না বলার কারণে ওহীর আগমন বেশ কিছুদিন বন্ধ ছিল। এতে মুশরিকরা বলাবলি শুরু করল যে, মুহাম্মদের আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে পরিত্যাগ করেছেন। যে ঘটনার প্রেক্ষিতে সূরা যোহা অবতীর্ণ হয়, সেটাও এমনি ধরনের। সবগুলো ঘটনা একই সময়ে সংঘটিত হওয়া জরুরী নয় বরং আগে-পিছেও হতে পারে।

أُولَىٰ وَآخِرَةٌ—এখানে وَآخِرَةٌ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ শব্দদ্বয়ের

প্রসিদ্ধ অর্থ পরকাল ও ইহকাল নেওয়া হলে এর ব্যাখ্যা তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে যে, মুশরিকরা আপনার বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার চালাচ্ছে, এর অসারতা তো তারা ইহকালে দেখে নিবেই, অধিকন্তু আমি আপনাকে পরকালে নিরাময়ত দান করারও ওয়াদা দিচ্ছি। সেখানে আপনাকে ইহকাল অপেক্ষা অনেক বেশী নিরাময়ত দান করা হবে। এখানে آخِرَةٌ

কে শাস্তিক অর্থে নেওয়াও অসম্ভব নয়। অতএব, এর অর্থ পরবর্তী অবস্থা, যেমন أُولَىٰ শব্দের অর্থ প্রথম অবস্থা। আরাতের অর্থ এই যে, আপনার প্রতি আল্লাহর নিরাময়ত দিন দিন বেড়েই যাবে এবং প্রত্যেক প্রথম অবস্থা থেকে পরবর্তী অবস্থা উত্তম ও শ্রেয় হবে। এতে

অনপরিমা ও আল্লাহর নৈকট্যে উন্নতিলাভসহ জীবিকা এবং পৃথিব প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদি সব অবস্থাই অন্তর্ভুক্ত।

وَلَوْ أَنَّكَ تَعْلَمُ الْغَيْبُاتَ لَأَخَذْتَهُنَّ بَوَاقٍ أَرْغَبُ عَنَّا—অর্থাৎ আপনার পালনকর্তা আপনাকে

এত প্রাচুর্য দেবেন যে, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। এতে কি দেবেন, তা নির্দিষ্ট করা হয়নি। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক কামাবত্তই প্রচুর পরিমাণে দেবেন। রসুলুল্লাহ (সা)-র কামাবত্তসমূহের মধ্যে ছিল ইসলামের উন্নতি, সারা বিশ্বে ইসলামের প্রসার, উম্মতের প্রয়োজনীয় উপকরণাদি, শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁর বিজয়লাভ, শত্রুদেশে ইসলামের কল্যাণ সমুন্নত করা ইত্যাদি। হাদীসে আছে, এ আয়াত নাখিল হলে পর রসুলুল্লাহ (সা) বলতেন : তাহলে আমি ততক্ষণ সন্তুষ্ট হব না, যতক্ষণ আমার উম্মতের একটি লোকও আহাম্মাকে থাকবে।—(কুরতুবী) হযরত আলী (রা) বর্ণিত এক রেওয়াজেতে রসুলুল্লাহ (সা) বলেন : আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মত সম্পর্কে আমার সুপারিশ কবুল করবেন এবং অবশেষে তিনি বলবেন : رَضِيتُ يَا مُحَمَّدُ হে মুহাম্মদ, এখন আপনি সন্তুষ্ট হয়েছেন কি? আমি আরম্ভ করব : يَا رَبِّ رَضِيتُ হে আমার পরওয়ারদিগার, আমি সন্তুষ্ট। সহীহ মুসলিমের রেওয়াজেতে হযরত আমর ইবনে আস (রা) বর্ণনা করেন : একদিন রসুলুল্লাহ (সা) হযরত ইবরাহীম (আ) সম্পর্কিত এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন : فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ صَانِي فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ—অন্তঃপর হযরত

ইসা (আ)-র উক্তি সম্বন্ধিত অপর একটি আয়াত তিলাওয়াত করলেন : اِنْ تَعَذَّلْتُمْ

فَاِنَّهُمْ مَبَاذِي—এরপর তিনি দু'হাত তুলে কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বারবার বলতে লাগলেন :

اللَّهُمَّ اَمْتِي اَمْتِي আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈলকে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করত

প্রশ্ন করলেন : (এবং বললেন, অবশ্য আমি সব জানি)। জিবরাঈলের জওয়াবে তিনি বললেন : আমি আমার উম্মতের আশঙ্কিতা চাই। আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈলকে বললেন : যাও, গিয়ে বল যে, আল্লাহ তা'আলা উম্মতের ব্যাপারে আপনাকে সন্তুষ্ট করবেন এবং আপনাকে দুঃখিত করবেন না।

উপরে কাফিরদের বলাবলির জওয়াবে রসুলুল্লাহ (সা)-র প্রতি ইহফাজে ও পরকালে আল্লাহর নিয়ামতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ছিল। অন্তঃপর তিনটি বিশেষ নিয়ামত উল্লেখ করে এর বিকিৎ বিবরণ দেওয়া হয়েছে : اَلَمْ يَجِدْ يَتِيْمًا قَالًا وَی—এটা প্রথম নিয়ামত।

অর্থাৎ আমি আপনাকে পিতৃহীন পেয়েছি। আপনার জন্মের পূর্বেই পিতা ইচ্ছাকৃত করে-
ছিল। পিতা কোন বিষয়-আশয়ও ছেড়ে যাননি, যশ্ধারা আপনার লালন-পালন হতে পারত।
অতঃপর আমি আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি। অর্থাৎ প্রথমে পিতামহ আবদুল মুত্তালিবের
ও পরে পিতৃব্য আবু তালিবের অন্তরে আপনার প্রতি অসামান্য ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছি।
ফলে তারা ঔরসজাত সন্তান অপেক্ষা অধিক যত্নসহকারে আপনাকে লালন-পালন করত।

দ্বিতীয় নিয়ামত : **فَالْوَجْدَ مَا لَا نَهْدَى** শব্দের অর্থ পথভ্রষ্টও হয়

এবং অনভিজ্ঞ, বেধবরও হয়। এখানে দ্বিতীয় অর্থই উদ্দেশ্য। নবুরত জন্মের পূর্বে তিনি
আল্লাহর বিধি-বিধান সম্পর্কে বেধবর ছিলেন। অতঃপর নবুরতের পদ দান করে তাঁকে
পথনির্দেশ দেওয়া হয়।

তৃতীয় নিয়ামত : **وَوَجْدَ مَا ثَلَاثًا غَنَى** অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা

আপনাকে নিঃস্ব ও রিক্তহস্ত পেয়েছেন। অতঃপর আপনাকে ধনশালী করেছেন। হযরত
খাদীজা (রা)-র ধনসম্পদ দ্বারা অংশীদারী কারবার করার মাধ্যমে এর সূচনা হয়, অতঃপর
খাদীজা (রা)-কে বিবাহ করার ফলে তাঁর সমস্ত সম্পত্তিই রসুলুল্লাহ (সা)-র জন্য উৎসর্গিত
হয়ে যায়।

এ তিনটি নিয়ামত উল্লেখ করার পর রসুলুল্লাহ (সা)-কে তিনটি বিষয়ের নির্দেশ

দেওয়া হয়েছে। প্রথম নির্দেশ **فَالْمَاهِرَاتِ لَا تَقْرَأْنَ** শব্দের অর্থ অবরদস্তিমূলক-

ভাবে অধিকারভুক্ত করা। উদ্দেশ্য এই যে, আপনি কোন পিতৃহীনকে অসহায় ও বেওয়ারিশ
মনে করে তার ধনসম্পদ অবরদস্তিমূলকভাবে নিজ অধিকারভুক্ত করে নেবেন না। একা-
রূপেই রসুলুল্লাহ (সা) ইয়াতীমের সাথে সহাদর ব্যবহার করার জোর আদেশ দিয়েছেন এবং
বেদনাদায়ক ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন : মুসলমানদের সে গৃহই
সর্বোত্তম যাতে কোন ইয়াতীম রয়েছে এবং তার সাথে সম্মানবাহার করা হয়। আর সে গৃহ
সর্বাধিক মন্দ, যাতে কোন ইয়াতীম রয়েছে কিন্তু তার সাথে অসম্মানবাহার করা হয়।—
(মায়হারী)

দ্বিতীয় নির্দেশ : **فَالْمَسَائِلَ لَا تَنْهَرْنَ** শব্দের অর্থ ধমক দেওয়া এবং

سَائِلَ-এর অর্থ সাহায্যপ্রার্থী। অর্থগত ও জ্ঞানগত উভয় প্রকার সাহায্যপ্রার্থী এর অন্তর্ভুক্ত।
উভয়কে ধমক দিতে রসুলুল্লাহ (সা)-কে নিষেধ করা হয়েছে। সাহায্যপ্রার্থীকে কিছু দিয়ে
বিদায় করা এবং দিতে না পারলে নরম ভাষায় অক্ষমতা প্রকাশ করা উত্তম। এমনভাবে
যে ব্যক্তি কোন শিক্ষণীয় বিষয় জানতে চায় তার জওয়াবেও কঠোরতা ও দুর্ব্যবহার করা
নিষেধ। তবে যদি কোন সাহায্যপ্রার্থী নাছোড়বান্দা হয়ে যায় তবে প্রয়োজনে তাকে ধমক
দেওয়াও জায়েয।

তৃতীয় নির্দেশ : تَحْدِثُ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ শব্দের অর্থ কথা

বলা। উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের সামনে আল্লাহ্‌র নিয়ামতসমূহ বর্ণনা করুন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এটাও এক পন্থা। এমনকি একজন অন্যজনের প্রতি যে অনুগ্রহ করে, তারও শোকর আদায় করার নির্দেশ রয়েছে। হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি অপরের অনুগ্রহের শোকর আদায় করে না, সে আল্লাহ্‌ তা'আলারও শোকর আদায় করে না।—(মায়হারী)

এক হাদীসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি তোমার প্রতি অনুগ্রহ করে তোমারও উচিত তার অনুগ্রহের প্রতিদান দেওয়া। যদি আর্থিক প্রতিদান দিতে অক্ষম হও, তবে মানুষের সামনে তার প্রশংসা কর। কেননা, যে জনসমক্ষে তার প্রশংসা করে, সে কৃতজ্ঞতার হুক আদায় করে দেয়।—(মায়হারী)

মাস'আলা : সবরকম নিয়ামতের শোকর আদায় করাই ওয়াজিব। আর্থিক নিয়ামতের শোকর হল তা থেকে কিছু খাঁটি নিয়ে দেয় করা। শারীরিক নিয়ামতের শোকর হল শারীরিক শক্তিকে আল্লাহ্‌র করণ্য কার্য সম্পাদনে ব্যয় করা। জ্ঞানগত নিয়ামতের শোকর হল অপরকে তা শিক্ষা দেওয়া।—(মায়হারী)

○ সূরা যোহা থেকে কোরআনের শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক সূরার সাথে তকবীর বলা সুন্নত। শায়েখ সালেহ মিসরীর মতে এই তকবীর হল : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ
—(মায়হারী)

ইকনে কাসীর প্রত্যেক সূরা শেষে এবং বগডী (র) প্রত্যেক সূরার শুরুতে তকবীর বলা সুন্নত বলেছেন।—(মায়হারী) উভয়ের মধ্যে যাই করা হবে, তাতে সুন্নত আদায় হয়ে যাবে।

সূরা যোহা থেকে শেষ পর্যন্ত অধিকাংশ সূরার রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র প্রতি আল্লাহ্‌ তা'আলার বিশেষ নিয়ামত ও তাঁর প্রেরণা বর্ণিত হয়েছে এবং কয়েকটি সূরার কিয়ামত ও তার অবস্থাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। কোরআন মহান এবং হাবতীর সন্দেহ ও সংশয়ের উর্ধ্বে। এই বিষয়বস্তু দ্বারাই কোরআন পাক গুরু করা হয়েছে এবং সেই সত্যের মহামায়া বর্ণনা দ্বারা শেষ করা হয়েছে, যার প্রতি কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে।

سورة الانشراح

সূরা ইন্শিরাহ

মক্কায় অবতীর্ণ : ৮ আয়াত ॥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْمَنْشُرُ لَكَ صَدْرُكَ ۖ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۚ
الَّذِي أَتَقَضَّىٰ ۖ فَكَانَ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۚ
يُسْرًا ۚ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۚ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ۚ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) আমি কি আপনার বক্ষ উন্মুক্ত করে দেইনি? (২) আমি লাঘব করেছি আপনার বোঝা, (৩) যা ছিল আপনার জন্য অতিশয় দুঃসহ। (৪) আমি আপনার আলোচনাকে সমুদ্র করেছি। (৫) নিশ্চয় কষ্টের সাথে ছাতি রয়েছে। (৬) নিশ্চয় কষ্টের সাথে ছাতি রয়েছে। (৭) অন্তঃপ্রব, যখন অবসর পান, পরিত্রা করুন। (৮) এবং আপনার পালনকর্তার প্রতি মনোনিবেশ করুন।

উচ্চসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি কি আপনার খাতিরে আপনার বক্ষ (জ্ঞান ও সহিষ্ণুতা দ্বারা) প্রশস্ত করে দেইনি? (অর্থাৎ জ্ঞান ও বিজ্ঞান দান করেছি এবং প্রচারকার্যে শত্রুদের বাধা দানের কারণে যে কষ্ট হয়, তা সহ্য করার ক্ষমতাও দিয়েছি।—দুরের-মনসুর) আমি আপনার বোঝা লাঘব করেছি, যা আপনার কোমর ভেঙ্গে দিচ্ছিল। [‘বোঝা’ বলে এখানে সেসব বৈধ বিষয় বোঝানো হয়েছে, যা কোন কোন সময় রহস্য ও উপযোগিতাবশত রসূলুল্লাহ (সা) সম্পাদন করতেন এবং পরে প্রমাণিত হত যে, এটা উপযোগিতা ও উত্তম নীতির বিরোধী। এতে তিনি উচ্চমর্যাদা ও চরম নৈকট্যের কারণে এমন চিন্তিত হতেন, যেন কোন গোনাহ করে ফেলেছেন! আয়াতে এ জাতীয় কাজের জন্য তাঁকে পাকড়াও করা হবে না বলে সুসংবাদ রয়েছে। একরূপ সুসংবাদ তাঁকে দু’বার দেওয়া হয়েছে—একবার মক্কায় এই সূরার মাধ্যমে এবং দ্বিতীয়বার মদীনার সূরা ফাত্হের মাধ্যমে। এতে প্রথম সুসংবাদের তাক্বীদ নবায়ন

ও তরসীল করা হয়েছে]। আমি আপনার আলোচনাকে সমুদ্রে স্থাপন করেছি। (অর্থাৎ পরীক্ষণের অধিকাংশ জায়গায় আল্লাহ্ নামের সাথে আপনার নাম যুক্ত হয়েছে। এক হাদীসে-কুদসীতে আল্লাহ বলেন : **اِذَا ذَكَرْتَ لَكَ مَعِيَ** অর্থাৎ যেখানে আমার আলোচনা হবে, সেখানে আমার সাথে আপনার আলোচনাও হবে। যেমন, খোতবায়, তালাহ-হুদে, আমানে ও ইকামতে। আল্লাহ্ নামের উচ্চতা ও খ্যাতি বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। সুতরাং আল্লাহ্ নামের সাথে যুক্ত নামও উচ্চ ও সুখ্যাত হবে। মজার তিনি ও মু'মিনগণ নানারকম কষ্ট ও বিপদাপদে প্রেক্ষতার ছিলেন। তাই অতঃপর সেসব কষ্ট দূর করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যে, আমি যখন আপনাকে আত্মিক সুখ দিয়েছি এবং আত্মিক কষ্ট দূর করে দিয়েছি.. তখন পাখিব সুখ ও প্রেমের ব্যাপারেও আমার দয়া এবং অনুগ্রহের আশা করা উচিত। সেমতে আমি ওয়াদা করছি) নিশ্চয় বর্তমান কলেক্টর সাথে (অর্থাৎ সত্ত্বরই) স্বস্তি হবে। (এসব বিপদাপদের প্রকার ও সংখ্যা অনেক ছিল। তাই তাকীদের জন্য পুনশ্চ ওয়াদা করা হচ্ছে) নিশ্চয় বর্তমান কলেক্টর সাথে স্বস্তি হবে। (সেমতে সব বিপদাপদ এক এক করে দূর হয়ে যায়। অতঃপর এসব নিয়ামতের কারণে শোকের আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—আমি যখন এসব নিয়ামত দিলাম, তখন) আপনি যখন (প্রচারকার্য থেকে) অবসর পাবেন, তখন (আপনার বিশেষ বিশেষ ইবাদতে) পরিশ্রম করুন (অর্থাৎ অধিক ইবাদত ও সাধনা করুন। এটাই আপনার শানের উপ-যুক্ত) এবং (যা কিছু চাইতে হয়, সে ব্যাপারে) আপনার পালনকর্তার দিকে মনোনিবেশ করুন। (অর্থাৎ তাঁর কাছেই চান। এতেও কষ্ট দূর করার এক ধরনের সুসংবাদ রয়েছে। কেননা, আবেদন করার নির্দেশ দান প্রকারান্তরে আবেদন পূর্ণ করার প্রতিশ্রুতি স্বরূপ)।

জানুয়ারি জাতীয় বিষয়

সূরা যোহার শেষে বর্ণিত হয়েছে যে, সূরা যোহা থেকে শেষ পর্যন্ত বাইশটি সূরায় বেশীর ভাগ রসুলুল্লাহ (সা)-র প্রতি নিয়ামত ও তাঁর মাহাত্ম্য সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। মাত্র কয়েকটি সূরায় কিয়ামতের অবস্থা ও অন্যান্য বিষয় আলোচিত হয়েছে। আলোচ্য সূরা ইন্শিরাহও রসুলুল্লাহ (সা)-কে প্রদত্ত বিশেষ বিশেষ অনুগ্রহ বর্ণিত হয়েছে এবং এ বর্ণনায়ও সূরা যোহার ন্যায় জিজ্ঞাসাবোধক ভঙ্গি অবলম্বন করা হয়েছে।

الَمْ نَشْرَحْ لَكَ مَدْرَى শব্দের অর্থ উন্মুক্ত করা। জ্ঞান, তত্ত্বকথা

ও উত্তম চরিত্রের জন্য বক্তাকে প্রশস্ত করে দেওয়ার অর্থে বক্ত উন্মুক্ত করা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অন্য এক আয়াতে আছে : **فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ مَدْرَهُ إِنَّ اللَّهَ لَهُ سُلْطَانٌ**

রসুলুল্লাহ (সা)-র পবিত্র বক্তকে আল্লাহ তা'আলা জ্ঞান-তত্ত্বকথা ও উত্তম চরিত্রের জন্য এমন বিস্তৃত করে দিয়েছিলেন যে, বড় বড় পণ্ডিত-দার্শনিকও তাঁর জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারে

কাছে পৌঁছতে পারেনি। এর ফলশ্রুতিতে স্থিতির প্রতি তাঁর মনোনিবেশ আলাহ্ তা'আলার প্রতি মনোনিবেশে কোন বিঘ্ন স্থিতি করত না। কোন কোন সহীহ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, ফিরিশতাপূর্ণ আলাহর আদেশে বাহ্যত ও তাঁর বন্ধ বিদায়ন করে পরিত্যক্ত করেছিল। কোন কোন তফসীরবিদ এখানে বন্ধ উন্মুক্ত করার অর্থ সে বন্ধ বিদায়নই নিয়েছেন। —(ইবনে কাসীর)

وَزَرَّوْهُمْ عَنْكَ وَزَرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَی —এর শাব্দিক

অর্থ বোঝা আর **نَقَضَ ظَهْرَی** —এর শাব্দিক অর্থ কোমর ভেঙ্গে দেওয়া। অর্থাৎ কোমরকে নুইয়ে দেওয়া। কোন বড় বোঝা কারও মাথায় তুলে দিলে যেমন তার কোমর নুয়ে পড়ে, তেমনি আয়াতে বলা হয়েছে যে, যে বোঝা আপনার কোমরকে নুইয়ে দিয়েছিল, আমি তাকে আপনার উপর থেকে অপসারিত করে দিয়েছি। সে বোঝা কি ছিল, তার এক ব্যাখ্যা তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে যে, এতে সে বৈধ ও অনুমোদিত কাজ বোঝানো হয়েছে, যা কোন কোন সময় রসূলুল্লাহ্ (সা) তাৎপর্য ও উপযোগিতাবশত সম্পাদন করেছেন কিন্তু পরে জানা গেছে যে, কাজটি উপযোগিতা ও উত্তম নীতির বিরোধী ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চ ছিল এবং তিনি আলাহর নৈকট্যের বিশেষ স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাই এ ধরনের কাজের জন্যও তিনি অতিশয় চিন্তিত, দুঃখিত ও ব্যথিত হতেন। আলাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে সুসংবাদ শুনিয়া সে বোঝা তাঁর উপর থেকে সরিয়ে দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, এ ধরনের কাজের জন্য আপনাকে পাকড়াও করা হবে না।

কোন কোন তফসীরবিদ এ ক্ষেত্রে বোঝার অর্থ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, নবুয়তের প্রথমদিকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উপর ওহীর প্রতিক্রিয়াও গুরুতররূপে দেখা দিত। তদুপরি সারা বিশ্বে ইসলাম প্রচার করা এবং কুফর ও শিরকের বিরোধ সাধন করে সমগ্র মানব জাতিকে তওহীদে একত্রিত করার দায়িত্বও তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল। এসব ব্যাপারে আদেশ ছিল :

فَاَسْتَقِمَّ كَمَا أَمَرْتُ —অর্থাৎ আপনি আলাহর আদেশ অনুযায়ী সরলপথে অটল থাকুন। রসূলুল্লাহ্ (সা) এই গুরুভার তিলে তিলে অনুভব করতেন। এক হাদীসে আছে, তাঁর দাড়ির কতক চুল সাদা হয়ে গেলে তিনি বলতেন :

فَاَسْتَقِمَّ كَمَا أَمَرْتُ —এই আয়াত আমাকে বুড়ো করে দিয়েছে।

এই বোঝাকেই তাঁর অন্তর থেকে সরিয়ে দেওয়ার সুসংবাদ এ আয়াতে উক্ত হয়েছে। একে সরানোর পছা পনের আয়াতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আপনার প্রত্যেক কণ্টের পর স্বস্তি আসবে। আলাহ্ তা'আলা বন্ধ উন্মুক্ত করার মাধ্যমে তাঁর মনোবল আকাশচুম্বী করে দেন। ফলে প্রত্যেক কঠিন কাজই তাঁর কাছে সহজ মনে হতে থাকে এবং কোন বোঝাই আর বোঝা থাকেনি।

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرِي —রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আলোচনা উন্নত করা এই যে,

ইসলামের বৈশিষ্ট্যমূলক কর্মসমূহে আব্রাহাম নামের সাথে তাঁর নাম উচ্চারণ করা হয়। সার্বিক বিশ্বের মসজিদসমূহের মিনারে ও মিন্বরে ‘আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহু’র সাথে সাথে ‘আশহাদু আল্লা মোহাম্মাদার রসূলুল্লাহ্’ বলা হয়ে থাকে। এ ছাড়া বিশ্বের কোন কোন জ্ঞানী মানুষ তাঁর নাম সন্মান প্রদর্শন ব্যতীত উচ্চারণ করে না, যদিও সে অমুসলমান হয়।

এখানে তিনটি নিয়ামত উল্লেখ করা হয়েছে—**شرح صدر** (বক্ষ উন্মোচন) **رفع ذكر** (আলোচনা উন্নতকরণ) ও **رفع وزر** (বোঝা লাঘবকরণ)। এগুলোকে তিনটি বাক্যে ব্যক্ত করা হয়েছে এবং প্রত্যেক বাক্যে কর্তা ও কর্মের মাঝখানে **لَكَ** অথবা **عَنْكَ** ব্যবহার করা হয়েছে। এতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ মাহাত্ম্যের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এসব কাজ আপনার খাতিরেই করা হয়েছে।

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا —আরবী ভাষার একটি নীতি

এই যে, আলিফ ও লাম যুক্ত শব্দকে যদি পুনরায় আলিফ ও লাম সহকারে উল্লেখ করা হয়, তবে উভয় জায়গায় একই বস্তুসত্তা অর্থ হয়ে থাকে এবং আলিফ ও লাম ব্যতিরেকে পুনরায় উল্লেখ করা হলে উভয় জায়গায় পৃথক পৃথক বস্তুসত্তা বোঝানো হয়ে থাকে। আলোচ্য আয়াতে **العسر** শব্দটি যখন পুনরায় **العسر** উল্লিখিত হয়েছে, তখন বোঝা গেল যে, উভয় জায়গায় একই **عسر** অর্থাৎ কষ্ট বোঝানো হয়েছে। পরোক্ষরূপে **يسرا** শব্দটি উভয় জায়গায় আলিফ ও লাম ব্যতিরেকে উল্লিখিত হয়েছে। এতে নিয়মানুযায়ী বোঝা যায় যে, দ্বিতীয় **يسر** তথা স্বস্তি প্রথম **يسر** তথা স্বস্তি থেকে ভিন্ন। অতএব আয়াতে **إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا** —এর পুনরাবৃত্তি থেকে জানা গেল যে, একই কষ্টের জন্য দু’টি স্বস্তির ওয়াদা করা হয়েছে। দু’-এর উদ্দেশ্যও এখানে বিশেষ দু’-এর সংখ্যা নয়, বরং উদ্দেশ্য অনেক। অতএব সারকথা এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র একটি কষ্টের সাথে তাঁকে অনেক স্বস্তিদান করা হবে।

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন : আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবান্নে কিরামকে এই আয়াত থেকে দু’টি সুসংবাদ শুনিয়েছেন এবং বলেছেন,

لَنْ يَغْلِبَ عُسْرُ يَسْرَيْنِ অর্থাৎ এক কষ্ট দুই স্বস্তির উপর প্রবল হতে পারে

না। সেযতে মুসলমান ও অমুসলমানদের লিখিত সব ইতিহাস ও সীরাতে প্রস্তুত সাক্ষ্য দেয় যে, যে কাজ কঠিন থেকে কঠিনতর বরং সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হত, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্য সে কাজ সহজতর হয়ে গিয়েছিল।

শিক্ষা ও প্রচারকার্যে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্য একান্তে যিকর ও আজাহর দিকে

মনোনিবেশ করা জরুরী : **فَاِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَآلِی رِبِّكَ فَاَرْغَبْ**

অর্থাৎ আপনি যখন দাওয়াত ও তবলীগের কাজ থেকে অবসর পান, তখন অন্য কাজের জন্য তৈরী হয়ে যান। আর তা হল এই যে, আজাহর যিকর, দোয়া ও ইস্তেগফারে আত্মনিবেশ করুন। অধিকাংশ তফসীরবিদ এ তফসীরই করেছেন। কেউ কেউ অন্য তফসীরও করেছেন কিন্তু এটাই অধিকতর বোধগম্য তফসীর। এর সারমর্ম এই যে, দাওয়াত, তবলীগ, মানুষকে পথপ্রদর্শন করা এবং তাদের সংশোধনের চিন্তা করা—এসবই ছিল রসুলুল্লাহ (সা)-র সর্ববৃহৎ ইবাদত। কিন্তু এটা হৃষ্টজীবের মধ্যস্থতায় ইবাদত। আয়তের উদ্দেশ্য এই যে, আপনি কেবল এজাতীয় পরোক্ষ ইবাদত করে ক্ষান্ত হবেন না বরং যখনই এ ইবাদত থেকে অবসর পাবেন, তখন একান্তে প্রত্যক্ষভাবে আজাহর দিকে মনোনিবেশ করুন। তাঁর কাছেই প্রত্যেক কাজে সাফল্য লাভের দোয়া করুন। আজাহর যিকর ও প্রত্যক্ষ ইবাদতই তো আসল উদ্দেশ্য। এর জন্যই মানুষকে হৃষ্টি করা হয়েছে। সম্ভবত এ কারণেই পরোক্ষ ইবাদত থেকে অবসর পাওয়ার কথা বলা হয়েছে। এটা এক প্রয়োজনের ইবাদত। এ থেকে অবসর পাওয়া সম্ভব। কিন্তু প্রত্যক্ষ ইবাদত তথা আজাহর দিকে মনোনিবেশ করা এমন বিষয়, যা থেকে মু'মিন ব্যক্তি কখনও অবসর পেতে পারে না, বরং তার জীবন ও সর্বশক্তি এতে ব্যয় করতে হবে।

এ থেকে জানা গেল যে, আলিম সমাজ, যার শিক্ষা, প্রচার ও জনসংশোধনের কাজে নিয়োজিত থাকেন, তাদের কিছু সময় আজাহর যিকর ও আজাহর দিকে মনোনিবেশে ব্যয়িত হওয়া উচিত। পূর্ববর্তী আলিমগণ এরূপই ছিলেন। এছাড়া শিক্ষা এবং প্রচারকার্যও কার্যকর হয় না এবং তাতে বরকতও হয় না। **نصب** শব্দটি **فَاَنْصَبْ**

থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ পরিত্রম ও ক্লান্তি। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইবাদত ও যিকর এতটুকু করা উচিত যে, তাতে কিছু কষ্ট ও ক্লান্তি অনুভূত হয়—আরাম পর্যন্তই সীমিত রাখা উচিত নয়। কোন ওয়িফা কিংবা নিয়মমেনে চলাও এক প্রকার কষ্ট ও ক্লান্তি, যদিও কাজ সামান্যই হয়।

سورة التين

সূরা তীন

মক্কায় অবতীর্ণ : ৮ আয়াত ॥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونِ ۝ وَطُورِ سِينِينَ ۝ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ۝ لَقَدْ
خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۝
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝ فَمَا
يَكْذِبُكَ بَعْدَ الْبَلَاءِ ۝ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) শপথ আঞ্জীর ফল (তথা ডুমুর) ও যম্বত্বনের, (২) এবং তুরে সিনীনের
(৩) এবং এই নিরাপদ নগরীর। (৪) আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতর অবস্থাবে
(৫) অতঃপর তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি নীচ থেকে নীচে (৬) কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে
ও সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য রয়েছে অশেষ পুরস্কার। (৭) অতঃপর কেন তুমি অবিশ্বাস
করছ কিয়ামতকে? (৮) আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে প্রেরিত্তম বিচারক নন?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

শপথ আঞ্জীর (ডুমুর) বৃক্ষের, যম্বত্বন বৃক্ষের, তুরে সিনীনের এবং এই নিরাপদ
নগরীর (অর্থাৎ মক্কা মোসাম্মায়ার)। আমি মানুষকে সুন্দরতর অবস্থাবে সৃষ্টি করেছি,
অতঃপর (তাদের মধ্যে যে লোক বৃদ্ধ হয়ে যায়) তাকে হীনভাগ্যবানদের মধ্যে হীনতর
করে দেই। (অর্থাৎ সৌন্দর্য কদাকারে এবং শক্তি দৌর্বল্যে পরিবর্তিত হয়ে যায়)।
কলে সে হীন থেকে হীনতর হয়ে যায়। (এতে পূর্ণ সম্মতা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। এর ফলে
আল্লাহ যে তাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম, তাই ফুটে উঠে। অন্য এক আয়াতে

আছে — اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ مَّعْبُودٍ

করতে ও জীবিত করতে সক্ষম—একথা সঙ্গমাপ করাই এ সূরার উদ্দেশ্য বলে মনে হয়।

فَمَا يَكْذِبُكَ بَعْدَ بِلَادَيْنِ -বাক্যে এরই প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। আলোচ্য আয়াতের

ব্যাপকতা থেকে জানা যায় যে, সব রুদ্ধই বিত্রী ও হীন হয়ে যায়। এই সন্দেহ নিরসনের জন্য অতঃপর আয়াতে ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে) কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার। (এতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, মু'মিন সৎকর্ম রুদ্ধ ও দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও পরিণতির দিক দিয়ে ভাল অবস্থায়ই থাকে, বরং তাদের ইয়মত পূর্বাপেক্ষা বেড়ে যায়। অতঃপর বলা হয়েছে যে, আল্লাহ যখন সৃষ্টি করতে ও অবস্থা পরিবর্তন করতে সক্ষম, তখন হে মানুষ) অতঃপর কিসে তোমাকে কিয়ামতে অবিশ্বাসী করে? (অর্থাৎ কোন্ যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে তুমি কিয়ামতকে মিথ্যা মনে কর?) আল্লাহ তা'আলা কি সব বিচারক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম বিচারক নন? (পাখিব, কাজকারবারে ও তন্মধ্যে মানবসৃষ্টি ও বার্বকো তার মধ্যে পরিবর্তন আনার কথা উপরে বর্ণিত হয়েছে এবং পারলৌকিক ব্যাপারাদিতেও—তন্মধ্যে কিয়ামত ও দান-প্রতিদান অন্যতম)।

আনুমানিক জাতব্য বিষয়

وَالْتَيْنِ وَالزَّيْتُونِ—এ সূরায় চারটি বস্তুর শপথ করা হয়েছে। এক. তীন

অর্থাৎ আজীর তথা ডুমুর রুদ্ধ। দুই. যয়তুন রুদ্ধ। তিন. তুরে সিনীন। চার. মক্কা মোকাররম। এই বিশেষ শপথের কারণ এই হতে পারে যে, তুর পর্বত ও মক্কা নগরীর ন্যায় ডুমুর ও যয়তুন রুদ্ধও বহল উপকরী। এটাও সন্তবপর যে, এখানে তীন ও যয়তুন উল্লেখ করে সে স্থান বোঝানো হয়েছে, যেখানে এ রুদ্ধ প্রচুর পরিমাণ উৎপন্ন হয়। আর সে স্থান হচ্ছে শাম দেশ, যা পয়গম্বরগণের আবাসভূমি। হযরত ইবরাহীম (আ)ও সে দেশে অবস্থান করতেন। তাঁকে সেখান থেকে হিজরত করিয়ে মক্কা মোকাররমায় আনা হয়েছিল। এভাবে উপরোক্ত শপথসমূহে সেসব পবিত্র ভূমি অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে, যেখানে বিশেষ বিশেষ পয়গম্বরগণ জন্মগ্রহণ করেছেন ও প্রেরিত হয়েছেন। শাম দেশ অধিকাংশ পয়গম্বরের আবাসভূমি। তুর পর্বত মুসা (আ)-র আল্লাহর সাথে বাক্যালাপের স্থান। সিনীন অথবা সীনা তুর পর্বতের অবস্থানস্থলের নাম। নিরাপদ শহর শেষ নবী (সা)-এর জন্মস্থান ও বাসস্থান।

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ : শপথের পর বলা হয়েছে :

—এর শাস্তিক অর্থ কোন কিছুই অবয়ব ও ডিক্টিকেটিক করা।

—এর উদ্দেশ্য এই যে, তার মজ্জা ও স্বভাবকেও অন্যান্য সৃষ্টি

জীবের তুলনায় উত্তম করা হয়েছে এবং তার দৈহিক অবয়ব এবং আকার-আকৃতিকেও দুনিয়ার সব প্রাণী অপেক্ষা সুন্দরতম করা হয়েছে।

সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে মানুষ সর্বাধিক সুন্দর : মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর করেছেন। ইবনে আব্বাসী বলেন : আল্লাহ্‌র সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে মানুষ অপেক্ষা সুন্দর কেউ নেই। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ডানী, শক্তিমান, বজ্রা, প্রোতা, দ্রুশ্টা, কুশলী এবং প্রজ্ঞাবান করেছেন। এগুলো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলী। সেমতে বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে : **ان الله خلق ادم على صورته** অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-কে নিজের আকারে সৃষ্টি করেছেন। এর অর্থ এটাই হতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলার কতিপয় গুণাবলী কোন কোন পর্যায়ে তাকেও দেওয়া হয়েছে। নতুবা আল্লাহ্ তা'আলার কোন আকার নেই।—(কুরতুবী)

মানব সৌন্দর্যের একটি জড়াবনীর ঘটনা : কুরতুবী এখানে বর্ণনা করেন, ইসা ইবনে মুসা হাশেমী খলীফা আবু জা'ফর মনসুরের একজন বিশেষ সভাসদ ছিলেন। তিনি খ্রীকে অত্যধিক ভালবাসতেন। একদিন জ্যোৎস্না রাত্রিতে খ্রীর সাথে বসে হাসি ভাষাশার হলে বলে ফেললেন : **انت طالع ثلاثا ان لم تكوني احسن من القمر** অর্থাৎ তুমি তিন তালাক, যদি তুমি চাঁদ অপেক্ষা অধিক সুন্দরী না হও। একথা বলতেই খ্রী উঠে পদাঘ চলে গেল এবং বলল : আপনি আমাকে তালাক দিয়েছেন। ব্যাপারটি যদিও হাসি ভাষাশার ছিল কিন্তু বিধান এই যে, পরিষ্কার তালাক শব্দ হাসি ভাষাশার হলে উচ্চারণ করলেও তালাক হয়ে যায়। ইসা ইবনে মুসা চরম অধিরতার মধ্যে রাত্রি অতিবাহিত করলেন। প্রত্যুষে খলীফা আবু জা'ফর মনসুরের কাছে উপস্থিত হয়ে তাকে সমস্ত রুডান্ত জানালেন। খলীফা শহরের রুতওয়াবিদ আলিমগণকে ডেকে হাস'আলা জিজ্ঞেস করলেন। সবাই এক উত্তর দিলেন যে, তালাক হয়ে গেছে। কেননা, তাদের মতে চন্দ্র অপেক্ষা সুন্দর হওয়া কোন মানুষের পক্ষে সম্ভবপরই নয়। কিন্তু ইমাম আবু হানীফার জনৈক শিষ্য আলিম চুপচাপ বসে ছিলেন। খলীফা জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি নিশ্চুপ কেন? তখন তিনি বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম পাঠ করে আলোচ্য সূরা তীন তিলাওয়াত করলেন এবং বললেন : আমিরুল মু'মিনীন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন যে, মানুষ যাকেরই অবয়ব সুন্দরতম। কোন কিছুই মানুষ অপেক্ষা সুন্দর নয়। একথা শুনে উপস্থিত আলিমগণ বিস্ময়াভিভূত হয়ে গেলেন এবং কেউ বিরোধিতা করলেন না। সেমতে খলীফা তালাক হরনি বলে রায় দিয়ে দিলেন।

এ থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ্ তা'আলার সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে মানুষ সর্বাধিক সুন্দর—রূপ ও সৌন্দর্যের দিক দিয়েও এবং শারীরিক গড়নের দিক দিয়েও। তার মস্তকে কেমন জ্ঞান কি কি আশ্চর্যজনক কাজ করছে—মনে হয় যেন একটি ফ্যাক্টরী, যাতে নামুক, সূক্ষ্ম ও সংকল্পিত মেশিন চালু রয়েছে। তার বন্ধ ও পেটের অবস্থাও তত্পূর্ণ। তার হস্তপদের গঠন ও আকার হাজারো উপযোগিতার উপর ভিত্তিহীন। এ কারণেই দার্শনিকগণ বলেন : মানুষ একটি ক্ষুদ্র জগৎ অর্থাৎ সমগ্র জগতের একটি মডেল। সমগ্র জগতে যেসব বস্তু ছড়িয়ে আছে, তা সবই মানুষের মধ্যে সমবেত আছে।—(কুরতুবী)

সূরী বুহুর্গগণও এ বিষয়ের সমর্থন করেছেন এবং কেউ কেউ মানুষের আপাদমস্তক বিশ্লেষণ করে তাতে জগতের সব বস্তুর নমুনা দেখিয়েছেন।

ثُمَّ رَدَّنَا إِلَى سَفَلٍ سَا فُلَيْنِ — পূর্বের আয়াতে মানুষকে সমগ্র হৃষ্টিয় মধ্যে

সুন্দরতম হৃষ্টি করার বর্ণনা ছিল। এ আয়াতে তার বিপরীতে বলা হয়েছে যে, সে যৌবনের প্রারম্ভে যেমন সমগ্র হৃষ্টিয় মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর ও ত্রেষ্ঠ ছিল, তেমনি পরিশেষে সে নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর এবং মন্দ থেকে মন্দতর হয়ে যায়। বলাবাহুল্য, এই উৎকৃষ্টতা ও নিকৃষ্টতা তার বাহ্যিক ও শারীরিক অবস্থার দিক দিয়ে বলা হয়েছে। যৌবন অন্তিমিত হয়ে গেলে তার আকার-আকৃতি বদলে যায়। বার্ধক্য এসে তাকে সম্পূর্ণ পাল্টে দেয়। সে কৃত্রী দৃষ্টিগোচর হতে থাকে এবং কর্মক্রমতা হারিয়ে অপরের উপর বোঝা হয়ে যায়। কারও কোন উপকারে আসে না। অন্যান্য জীবজন্তু এর বিপরীত। তারা শেষ পর্যন্ত কর্মক্রম থাকে। মানুষ তাদের কাছ থেকে দূশ, বোঝা বহন এবং অন্যান্য বহু রকম কাজ নেয়। তাদেরকে জবাই করা হলে অথবা তারা মারা গেলেও তাদের চামড়া, পশম, অস্থি মানুষের কাজে আসে। কিন্তু মানুষ যখন বার্ধক্যে অক্রম হয়ে যায়, তখন সে সাংসারিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণ বেকার হয়ে যায়। মৃত্যুর পরও তার কোন অংশ দ্বারা কোন মানুষ অথবা জন্তুর উপকার হয় না। সারি কথা, মানুষ যে নিকৃষ্টদের মধ্যে নিকৃষ্টতম, এর অর্থ তার বৈয়রিক ও শারীরিক অবস্থা। হযরত সাহাহাক প্রমুখ থেকে এ তকসীরই বর্ণিত রয়েছে।—(কুরতুবী)

এ তকসীর অনুযায়ী পরের আয়াতে মু'মিন সৎকর্মীর ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, মু'মিন সৎকর্মী বার্ধক্যে অক্রম ও অপারক হয় না। বরং উদ্দেশ্য এই যে, তাদের দৈহিক বেকারত্ব ও বৈয়রিক অকর্মণ্যতার ক্ষতি তাদের হয় না বরং ক্ষতি কেবল তাদের হয় যারা নিজেদের সমগ্র চিন্তা ও যোগ্যতা বৈয়রিক উন্নতিতেই ব্যয় করেছিল। এখন তা নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং পরকালে তাদের কোন অংশ নেই। কিন্তু মু'মিন সৎকর্মীর পুরস্কার ও সওয়াব কোন সময়ই নিঃশেষ হয় না। দুনিয়াতে বার্ধক্যের বেকারত্ব ও অপারকতার সম্মুখীন হলেও পরকালে তার জন্য উচ্চ মর্যাদা ও সুখই সুখ বিদ্যমান থাকে। বার্ধক্য-জনিত বেকারত্ব ও কর্ম হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও তাদের আমলনামার সেসব কর্ম লিখিত হয়, যা তারা শক্তিমান অবস্থায় করত। হযরত আনাসের রৈওয়াকেতে রসুলুজাহ্ (সা) বলেন : কোন মুসলমান অসুস্থ হয়ে পড়লে আল্লাহ্ তা'আলা আমল লেখক ফেরেশতাগণকে আদেশ দেন, সুস্থ অবস্থায় সে যেসব সৎ কর্ম করত, সেগুলো তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করতে থাক।—(বুখারী) এছাড়া এখানে মু'মিন সৎ কর্মীর প্রতিদান জাহ্নাম ও তার নিয়ামত বর্ণনা করার

পরিবর্তে বলা হয়েছে : لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ — অর্থাৎ তাদের পুরস্কার কখনও বিচ্ছিন্ন

ও কণ্ঠিত হবে না। এতে এদিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, তাদের এই পুরস্কার দুনিয়ার বৈয়রিক জীবন থেকেই শুরু হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রিয় বান্দাদের জন্য বার্ধক্যে এমন খাঁটি সহচর জুটিয়ে দেন, যারা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁদের কাছ থেকে আত্মিক উপকারিতা লাভ করতে থাকেন এবং তাদের সর্বপ্রকার সেবায়র করেন। এভাবে বার্ধক্যের যে ক্ষয়ে মানুষ বৈয়রিক ও দৈহিক দিক দিয়ে একেজো, বেকার ও অপরের উপর বোঝারূপে গণ্য হয়, সে ক্ষয়েও আল্লাহর প্রিয় বান্দাপণ বেকার থাকেন না। কোন কোন তকসীরবিদ অজোচ্য

আল্লাহের এরূপ তফসীর করেছেন যে, **رَدَّ دُنَاكَ أَسْفَلَ سَافِلِينَ**—সাধারণ

মানুষের জন্য নয় বরং কাফির ও পাপচাচারীদের জন্য বলা হয়েছে, যারা আল্লাহ প্রদত্ত সুন্দর অবসর, গুণগত উৎকর্ষ ও বিবেককে বৈষয়িক সুখ-স্বাদ্ধস্যের পেছনে বলবাদ করে দেয়। এই অকৃতজ্ঞতার শাস্তি হিসাবে তাদেরকে হীনতম পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়া হবে।

এমতাবছায় **إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا** বাক্যের ব্যতিক্রম বাহ্যিক অর্থেই বহাল থাকে। অর্থাৎ

যারা মু'মিন ও সৎকর্মী, তাদেরকে নিকৃষ্টতম পর্যায়ে পৌঁছানো হবে না। কেননা, তাদের পুণ্যের সব সময়ই অব্যাহত থাকবে।—(মাহহারী)

فَمَا يَكْذِبُكَ بَعْدَ بِلَادِنِي—এতে কিয়ামতে অবিহ্বাসীদেরকে হ'দিয়ার করা

হয়েছে যে, আল্লাহর কুদরতের উপরোক্ত দৃশ্য ও পরিবর্তন দেখার পরও তোমাদের জন্য পরকাল ও কিয়ামতকে মিথ্যা মনে করার কি অবকাশ থাকতে পারে। আল্লাহ তা'আলা কি সব বিচারকের মহা বিচারক নন ?

হযরত আবু হুরায়রা (রা)-র রেরওয়ানেতে রসূলজাহ্ (সা) বলেন : যে ব্যক্তি সূরা **وَأَنَا عَلَى** **الْأَيْمَنِ** **اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ** গর্ভে পাঠ করে, তার উচিত

ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ বলা। সেমতে ক্রিকাহবিদগণের মতেও এই বাক্যটি পাঠ

করা মোস্তাহাব।

سورة العلق

সূরা আলাক

মক্কায় অবতীর্ণ : ১৯ আয়াত ॥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ

الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝ كَلَّا إِنَّ

الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ ۝ إِنَّ رَأَاهُ اسْتَغْنَى ۝ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَى ۝ أَرَأَيْتَ الَّذِي

يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ۝ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَىٰ الْهُدَىٰ ۝ أَوْ أَمَرَ

بِالتَّقْوَىٰ ۝ أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۝ أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ ۝ كَلَّا لَئِنْ

أَمَرْنَاهُ ۝ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ۝ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۝ فليدع ناديه ۝

سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ۝ كَلَّا لَا تَطَعُهُ ۝ وَأَسْهَدْ أَفْثَرَب ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন (২) সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। (৩) পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালু, (৪) যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, (৫) শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না। (৬) সত্যি সত্যি মানুষ সীমালংঘন করে, (৭) একারণে যে, সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে। (৮) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার দিকেই প্রত্যাবর্তন হবে। (৯) আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে নিষেধ করে (১০) এক বান্দাকে যখন সে নাযায পড়ে? (১১) আপনি কি দেখেছেন যদি সে সৎ পথে থাকে (১২) অথবা আল্লাহ্‌ভীতি শিক্ষা দেয়। (১৩) আপনি কি দেখেছেন, যদি সে মিথ্যারোপ করে ও ঘৃণা ফিরিয়ে নেয়। (১৪) সে কি জানে না যে, আল্লাহ্‌ দেখেন? (১৫) কখনই নয়, যদি সে বিরত না হয়, তবে আমি মস্তকের সামনের কেশগুচ্ছ ধরে হেঁচড়াবই—(১৬) মিথ্যাচারী, পাপীর কেশগুচ্ছ। (১৭) অতএব, সে তার সভাসদদেরকে আহ্বান করুক। (১৮) আমিও আহ্বান করব আহাম্মাদের

প্রহরীদেরকে। (১৯) কখনই নয়, আপনি তার আনুগত্য করবেন না। আপনি সিজদা করুন ও আমার নৈকট্য অর্জন করুন।

তবসীরের সার-সংক্ষেপ

مَا لَمْ يَعْلَمْ اَقْرَأ (পক্ষ থেকে) পর্যন্ত আয়াতগুলো অবতরণের মাধ্যমে নবুয়তের

সূচনা হয়। বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে এর কাহিনী এভাবে বর্ণিত রয়েছে যে, নবুয়ত লাভের কিছু দিন পূর্বে রসুলুল্লাহ (সা) আপনাআপনি নির্জনতাপ্রিয় হয়ে যান। তিনি হেরা গিরিগুহায় গমন করে কয়েক রাত্রি পর্যন্ত অবস্থান করতেন। এক দিন হঠাৎ জিবরাঈল এসে উপস্থিত হলেন এবং বললেন : اِقْرَأ অর্থাৎ পাঠ করুন। রসুলুল্লাহ (সা) বললেন :

مَا اَنَا بِقَارِءٍ অর্থাৎ আমি যে পড়তে জানি না। জিবরাঈল তাঁকে সজোরে চেপে ধরলেন।

অতঃপর ছেড়ে দিয়ে বললেন : اِقْرَأ পাঠ করুন। তিনি আবারও সে জওয়াবই দিলেন।

এমনিভাবে তিন বার চেপে ধরলেন ও ছেড়ে দিয়ে বললেন : اِقْرَأ থেকে مَا لَمْ يَعْلَمْ পর্যন্ত)

হে পয়গম্বর (এ সময়কার আয়াতগুলোসহ আপনার প্রতি যে কোরআন নাযিল হবে, তা) আপনি আপনার পালনকর্তার নাম নিয়ে পাঠ করুন। [অর্থাৎ যখন পাঠ করেন,

তখন 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম' বলে পাঠ করুন। অন্য এক অম্মাতে : اِذَا قَرَأْتَ

اَلْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ বলে কোরআন পাঠের সাথে আউযুবিল্লাহ পড়ার আদেশ করা

হয়েছে। এ দু'টি আদেশের আসল উদ্দেশ্য আল্লাহর উপর ভরসা করা ও তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা। এটা মনে মনে বলা ওয়াজিব এবং মুখে উচ্চারণ করা সুন্নত। এ আয়াত নাযিল হওয়ার সময় রসুলুল্লাহ (সা)-র বিসমিল্লাহ জানা থাকা জরুরী নয়। কিন্তু কোন কোন রেওয়ায়েতে এ সূরার সাথে বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম নাযিল হওয়াও বর্ণিত আছে।

اٰخِرُهَا الْوَاحِدِي عَنْ عِكْرَمَةَ وَالْحَسَنِ اَنْهُمَا قَالَا اَوَّلُ مَا نَزَلَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَاَوَّلُ سُورَةٍ اِقْرَأْ وَاٰخِرُهَا اِبْنُ جَرِيْرٍ وَغَيْرُهُ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ اَنْهُ قَالَ اَوَّلُ مَا نَزَلَ جِبْرًا كُلُّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا مُحَمَّدُ اسْتَعِذْ ثُمَّ قُلْ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - كَذَا فِي رُوْحِ الْمَعَانِي -

আলোচ্য আয়াতে আলাহ্‌র নামে পাঠ করতে বলা হয়েছে। এ আয়াতে স্বয়ং এই আয়াতসমূহও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এটা এমন যেমন কেউ অপরকে বলে, আমি যা বলি শুন। এতে স্বয়ং এই বাক্যটি শুনার আদেশ করাও বস্তুর উদ্দেশ্য থাকে। অতএব সারকথা এই যে, এ আয়াতগুলো পাঠ করুন অথবা পরে যেসব আয়াত নামিল হবে, সেগুলো পাঠ করুন, সবগুলোর পাঠই আলাহ্‌র নামে হওয়া উচিত। রসুলুল্লাহ (সা) স্বতঃস্ফূর্তভাবে জানতে পেরেছিলেন যে, এটা কোরআন ও ওহী। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, তিনি ভীত হয়ে গিয়েছিলেন এবং ওয়ারাকার ইবনে নওফলের কাছে গমন করেছিলেন। অবশ্য সন্দেহের কারণে ছিল না বরং ওহীর ভীতির কারণে তিনি এরূপ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। বিষয়টি ওয়ারাকার কাছে বর্ণনা করা ছিল মানসিক শান্তি ও বিশ্বাস বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে, অবিশ্বাসের কারণে নয়। শিক্ষক ছাত্রকে অক্ষর শিক্ষাদান আরম্ভ করার সময় বলেন : পড়। একে কেউ অসাধ্য কাজের আদেশ বলে না। রসুলুল্লাহ (সা)-র ওয়র করার এক কারণ এই যে, তিনি কি পড়বেন, তা তাঁর কাছে নির্দিষ্ট ছিল না। এটা পয়গম্বরের শানের খেলাফ হয়। দ্বিতীয় কারণ এই যে, পাঠ করা অধিকাংশ সময় লিখিত বিষয় পড়ার অর্থে ব্যবহৃত নয়। তাঁর যেহেতু অক্ষরজ্ঞান ছিল না, তাই এই ওয়র করেছেন। রসুলুল্লাহ (সা)-র মধ্যে ওহীর গুরুভার বহন করার যোগ্যতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সম্ভবত জিবরাঈল তাঁকে চেপে ধরেছিলেন। (ب) (পালনকর্তা واللّه اعلم)

শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আমি আপনার পুরোপুরি পালন করব এবং নবুয়তের উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছে দেব। অতঃপর বলা হয়েছে যে, তিনি এমন পালনকর্তা যিনি (সবকিছু) সৃষ্টি করেছেন। (বিশেষভাবে এ গুণটি উল্লেখ করার তাত্ত্বিক কারণ এই যে, আলাহ্‌ তা'আলার নিয়ামতসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম এ নিয়ামতটিই প্রকাশ পায়। অতএব সর্বাগ্রে এরই উল্লেখ সমীচীন। এছাড়া সৃষ্টিকর্ম স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণ করে। স্রষ্টার জ্ঞান লাভ করাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রগণ্য কাজ। ব্যাপক সৃষ্টির কথা বলার পর এখন বিশেষ বিশেষ সৃষ্টির কথা বলা হচ্ছে—) যিনি (সব সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে বিশেষভাবে) মানুষকে জমাট রক্ত থেকে সৃষ্টি করেছেন। (এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সৃষ্টিরূপী নিয়ামতসমূহের মধ্যে সাধারণ সৃষ্ট বস্তুর তুলনায় মানুষের প্রতি অধিক নিয়ামত রয়েছে। তাকে অনেক উন্নত করেছেন, চমৎকার আকার-আকৃতি দিয়েছেন এবং জ্ঞান পরিসরায় সমৃদ্ধ করেছেন। সুতরাং মানুষের অধিক শোকর ও যিকর করা উচিত। বিশেষভাবে জমাট রক্ত উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, এটা একটা বরমখী অবস্থা। এর আগে রয়েছে বীর্ষ, খাদ্য ও উপাদান এবং এরপরে রয়েছে মাংসপিণ্ড, অস্থি গঠন ও আত্মাদান। সুতরাং জমাট রক্ত যেন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অবস্থা-সমূহের মধ্যবর্তী একটি অবস্থা। অতঃপর কোরআন পাঠ যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা সাব্যস্ত করার জন্য বলা হয়েছে :) আপনি কোরআন পাঠ করুন। (অর্থাৎ প্রথম আদেশ

اٰتْرًا بِاسْمِ رَبِّكَ থেকে এরূপ বোঝা উচিত নয় যে, এখানে আসল উদ্দেশ্য শুধু আলাহ্‌র নাম বরং পাঠ করাও উদ্দেশ্য। কেননা, পাঠ করাই তবলীগের উপায় এবং পয়গম্বরের

আসল কাজই তবলীপ। সুতরাং এই পুনরুজ্জীবন দ্বারা একথাও প্রকাশ পেয়েছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সা)-কে তবলীগের আদেশ করা হয়েছে। অতঃপর সে ওয়র দূর করার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, যা তিনি প্রথমে জিবরাঈলের কাছে পেশ করেছিলেন যে, তিনি পড়া জানেন না : বলা হয়েছে :) আপনার পালনকর্তা দয়ালু (যা ইচ্ছা দান করেন) যিনি (লেখাপড়া জানাদেরকে) কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন (এবং সাধারণভাবে) মানুষকে (অন্যান্য উপায়ে) শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না । [অর্থাৎ প্রথমত শিক্ষা লেখার মাধ্যমেই সীমাবদ্ধ নয় — অন্যান্য উপায়েও শিক্ষা হতে দেখা যায় । দ্বিতীয়ত উপায়াদি স্বতন্ত্রভাবে ক্রিয়ালীল নয় — প্রকৃত শিক্ষাদাতা আমি । সুতরাং আপনি লেখা না জানলেও আমি অন্য উপায়ে আপনাকে পড়া এবং ওয়র-জান সংরক্ষণের শক্তি দান করব । কারণ, আমি আপনাকে পাঠ করার আদেশ দিয়েছি । বাস্তবেও তাই হয়েছিল । সুতরাং এ আয়াতসমূহে নবুয়ত ও তার ভূমিকা এবং পরিপূরক বিষয়াদির বর্ণনা হয়ে গেছে । যেহেতু পয়গম্বরের বিরোধিতা চরম গোনাহ্ ও গহিত কাজ, তাই অনেক পরে অবতীর্ণ পরবর্তী আয়াতসমূহে রসুলুল্লাহ্ (সা)-র বিশিষ্টা বিরোধিতাকারী আবু জাহলের নিন্দা ব্যাপক ভাষায় করা হয়েছে । ফলে অন্যান্য বিরোধিতাকারীও এতে শামিল হয়ে গেছে । এসব আয়াত অবতরণের হেতু এই যে, একবার আবু জাহল রসুলুল্লাহ্ (সা)-কে নামায পড়তে দেখে বলল : আমি আপনাকে নামায পড়তে হারবার নিষেধ করেছি । রসুলুল্লাহ্ (সা) তাকে ধমক দিলে সে বলল : মক্কার অধিকাংশ লোকই আমার সাথে রয়েছে । যদি আপনাকে ভবিষ্যতে নামায পড়তে দেখি, তাহলে আপনার ঘাড়ে পা রেখে দেব (নাউযবিল্লাহ্) । সেমতে সে একবার নামায পড়ার সময় হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার মানসে এগিয়ে এল কিন্তু হযর (সা)-এর কাছাকাছি গিয়ে থেমে গেল এবং পেছনের দিকে সন্নতে লাগল । পরে এর কারণ জিজ্ঞাসিত হলে বলল : আমি সামনে একটি অগ্নিপূর্ণ গর্ত দেখেছি এবং তাতে পাখাবিশিষ্ট কিছু বস্তু দৃষ্টিগোচর হয়েছে । রসুলুল্লাহ্ (সা) একথা শুনে বলেন : তারা ছিল ক্ষেত্রেশতা । যদি আবু জাহল আরও সামনে এগোত, তবে ক্ষেত্রেশ-তারা তাকে টুকরা টুকরা করে দিত । এ ঘটনার প্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে । বলা হয়েছে] সত্যি সত্যি (কাফির) মানুষ সীমানাঘন করে । কারণ, সে নিজেকে

(অন্যদের থেকে) অমুখাপেক্ষী মনে করে । (অন্য আয়াতে আছে : **وَلَوْ بِمِطِّ اللَّهِ** —

الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبِقُوا — অর্থাৎ এই অমুখাপেক্ষিতার কারণে অবাধ্যতা করা নিবৃ-

দ্ধিতা । কেননা, কেউ যদি সৃষ্ট জীবের প্রতি কোন দিক দিয়ে অমুখাপেক্ষী হয়েও যায় কিন্তু স্রষ্টার প্রতি সে কোন অবস্থাতেই অমুখাপেক্ষী হতে পারে না । এমনকি পরিশেষে হে মানুষ) তোমার পালনকর্তার দিকেই সবার প্রত্যাবর্তন হবে । (কখনও জীবদ্দশার ন্যায় তাঁর কুদরত দ্বারা বেষ্টিত হবে এবং তখন অবাধ্যতার যে শাস্তি হবে, তা থেকেও কোথাও পালাতে পারবে না । সুতরাং অক্লম ব্যক্তি সঙ্কমের প্রতি কেমন করে অমুখাপেক্ষী হতে পারে ? অতঃপর নিজেকে অমুখাপেক্ষী মনে করা এবং তজন্য অবাধ্যতা করা বোকামিই বটে । অতঃপর জিজ্ঞাসার আকারে অবাধ্যতার জন্য বিপন্ন প্রকাশ করা হয়েছে —) হে মানুষ,

তুমি কি তাকে দেখেছ, যে (আমার) এক বান্দাকে নামাম পড়তে বারণ করে ? (অর্থাৎ এর চেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় আর নেই । নামামীকে নামাম পড়তে বারণ করা খুবই মন্দ ও বিস্ময়কর বিষয় । অতঃপর অধিকতর তাকীদ করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে) হে ব্যক্তি, তুমি কি দেখেছ, যদি সে বান্দা (যাকে বারণ করা হয়েছে) সৎ পথে থাকে (যা নিজস্ব গুণ) অথবা অপরকে আল্লাহুজীতি শিক্ষা দেয় (যা পরোপকার) ' অথবা' বলে সম্ভবত ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দু'টি গুণের মধ্যে একটি থাকলেও নিষেধকারীর নিন্দার জন্য যথেষ্ট হত । আর তার মধ্যে তো দু'টিই রয়েছে) । হে ব্যক্তি, তুমি কি দেখেছ, যদি সে (নিষেধকারী) বান্দা মিথ্যারোপ করে এবং (সত্যধর্ম থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় (অর্থাৎ বিশ্বাসও না রাখে এবং আমলও না করে) প্রথমে দেখ যে, নামাম পড়তে স্বাক্ষর করা কত মন্দ ! এরপর লজ্জা কর, বারণকারী একজন পথভ্রষ্ট এবং যাকে বারণ করছে সে একজন সৎ পথপ্রাপ্ত । সুতরাং এটা কেমন বিস্ময়কর ব্যাপার ! অতঃপর বারণকারীর উদ্দেশ্যে শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে—) সে কি জানে না যে, আল্লাহ্ তা'আলা (তার অবাধতা এবং তাঁ থেকে উৎপন্ন কার্যকলাপ) দেখছেন (এর জন্য) ত্রিনি শাস্তি দেবেন ? (তার কখনও এরূপ করে উচিত নয়) । যদি সে (এই কর্মকাণ্ড থেকে) বিরত না হয়, তবে আমি (তাকে) মস্তকেশ সামনের কেশগুচ্ছ ধরে মা, মিথ্যা ও পাপে আব্রূত কেশগুচ্ছ (জাহান্নামের দিকে) হেঁচড়াবই । (সে তার দলবলের স্পর্ধা দেখিয়ে আমার পয়গম্বরকে হুমকি দেয়—) অতএব সে তার সভাসদদেরকে আহ্বান করুক, (সে এরূপ করলে) আমিও জাহান্নামের প্রহরীদেরকে আহ্বান করব । [সে আহ্বান করেন বলে আল্লাহ্ তা'আলাও ফেরেশতাগণকে আহ্বান করেন নি । এক হাদীসে রসুলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আবু জাহ্ন এরূপ করলে জাহান্নামের প্রহরী ফেরেশতাগণ অবশ্যই প্রকাশ্যে তাকে পাকড়াও করত] । কখনও তার এরূপ করা উচিত নয় । আপনি (এই নাল্যেকের কোন্ পরওয়া করবেন না এবং) তার কথা মেনে চলবেন না (যেমন এ পর্যন্ত মেনে চলেছেন) এবং (পূর্ববৎ) সিজদা করুন এবং আমার নৈকট্য অর্জন করুন । [এতে ওয়াদা রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা রসুলুল্লাহ্ (সা)-কে তাদের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখবেন] ।

আনুযগিক আতব্য বিষয়

ওহীর সূচনা ও সর্বপ্রথম ওহী : বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত রয়েছে এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অধিকাংশ আলিম এ বিষয়ে একমত যে,

সূরা আলাক থেকেই ওহীর সূচনা হয় এবং এ সূরার প্রথম পাঁচটি আয়াত (**مَا مَعَهُ يَكْلَمُ**)

পর্যন্ত) সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছে । কেউ কেউ সূরা মুদাসসিরকে সর্বপ্রথম সূরা এবং কেউ কেউ সূরা ফাতিহাকে সর্বপ্রথম সূরা বলে অভিহিত করেছেন । ইমাম বগভী অধিকাংশ আলিমের মতকেই বিতর্ক বলেছেন । সূরা মুদাসসিরকে প্রথম সূরা বলার কারণ এই যে, সূরা আলাকের পাঁচ আয়াত নামিল হওয়ার পর দীর্ঘকাল কোরআন অবতরণ বন্ধ থাকে, যাকে ওহীর বিরতিকাল বলা হয়ে থাকে—এই বিরতির কারণে রসুলুল্লাহ্ (সা) ভীষণ মর্মবেদনা ও মানসিক অশান্তির সম্মুখীন হন । এরপর একদিন হঠাৎ জিবরাঈল (আ) সামান্য আসেন

এবং সূরা মুন্দাস্‌সির অবতীর্ণ হয়। এ সময়ও ওহী অবতরণ এবং জিবরাইলের সাথে সাক্ষাতের দরুন রসুলুজ্জাহ্ (সা)-এর মধ্যে সে পূর্বের মতই ভাবান্তর দেখা দেয়, যা সূরা আলাক অবতীর্ণ হওয়ার সময় দেখা দিয়েছিল। এভাবে বিরতিকালের পর সর্বপ্রথম সূরা মুন্দাস্‌সির প্রাথমিক আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। ফলে একেও প্রথম সূরা আখ্যা দেওয়া যায়। সূরা ফাতিহাকে প্রথম সূরা বলার কারণ এই যে, পূর্ণ সূরা হিসাবে একত্রে সূরা ফাতিহাই সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়। এর আগে কয়েকটি সূরার অংশবিশেষই অবতীর্ণ হয়েছিল।—(মায়হারী) বুখারী ও মুসলিমের একটি দীর্ঘ হাদীসে নবুয়ত ও ওহীর সূচনা সম্পর্কে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন : সর্বপ্রথম সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে রসুলুজ্জাহ্ (সা)-এর প্রতি ওহীর সূচনা হয়। তিনি স্বপ্নে যা দেখতেন, বাস্তবে হব্ব তাই সংঘটিত হত এবং তাতে কোনরূপ ব্যাখ্যার প্রয়োজন থাকত না। স্বপ্নে দেখা ঘটনা দিবালোকের মত সামনে এসে যেত।

এরপর রসুলুজ্জাহ্ (সা)-এর মধ্যে নির্জনতার ও একান্তে ইবাদত করার প্রবল ঝোঁক সৃষ্টি হয়। এজন্য তিনি হেরা গিরিগুহাকে পছন্দ করে নেন (এ গুহাটি মক্কার কবরস্থান জালাতুল মুয়াল্লা থেকে একটু সামনে জাবালুন্নুর নামক পাহাড়ে অবস্থিত। এর শৃঙ্গ দূর থেকে দৃষ্টিগোচর হয়)। হযরত আয়েশা (রা) বলেন : তিনি এ গুহায় রাক্বিতে গমন করতেন এবং ইবাদত করতেন। পরিবার-পরিজনের খবরাখবর নেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন দেখা না দিলে তিনি সেখানেই অবস্থান করতেন এবং প্রয়োজনীয় পাথের সঙ্গে নিয়ে যেতেন। পাথের শেষ হয়ে গেলে তিনি পত্নী খাদীজা (রা)-র কাছে ফিরে আসতেন এবং আরও কিছুদিনের পাথের নিয়ে গুহায় গমন করতেন। এমনভাবে গুহায় অবস্থানকালে হঠাৎ একদিন তাঁর কাছে ওহী আগমন করে। হেরা গুহায় নির্জনবাসের সময়কাল সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে আছে যে, তিনি পূর্ণ রমযান মাস এ গুহায় অবস্থান করেন। ইবনে ইসহাক ও যরকানী (র) বলেন : এর চেয়ে বেশী সময় অবস্থান করার প্রমাণ কোন রেওয়ায়েতে নেই। ওহী অবতরণের পূর্বে নামায ইত্যাদি ইবাদতের অস্তিত্ব ছিল না। সুতরাং হেরা গুহায় রসুলুজ্জাহ্ (সা) কিভাবে ইবাদত করতেন সে সম্পর্কে কোন কোন আলিম বলেন : তিনি নুহ, ইবরাহীম ও ইসা (আ)-র শরীয়ত অনুসরণ করে ইবাদত করতেন। কিন্তু কোন রেওয়ায়েতে এর প্রমাণ নেই এবং তিনি নিরঙ্কর ছিলেন বিধায় একে বিতর্কও মেনে নেওয়া যায় না। বরং বাহ্যত বোঝা যায় যে, তখন জনকোলাহল থেকে একান্তে গমন এবং আল্লাহ তা'আলার বিশেষ ধ্যানে মগ্ন হওয়াই ছিল তাঁর ইবাদত।—(মায়হারী)

ওহীর আগমন সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা) বলেন : হযরত জিবরাইল (আ)

রসুলুজ্জাহ্ (সা)-র কাছে আগমন করে বললেন : **اقْرَأْ** (পাঠ কর)। তিনি বলেন :

ما أنا بقارئ আমি পড়া জানি না। [কারণ, তিনি উম্মী ছিলেন। জিবরাইল (আ)-

এর উদ্দেশ্য কি, কিভাবে পড়াতে চান এবং কোন লিখিত বিষয় পড়তে হবে কিনা ইত্যাদি বিষয় তিনি স্পষ্টভাবে বুঝতে সক্ষম হননি। তাই ওষর পেশ করেছেন।] রেওয়ায়েতে রসুলুজ্জাহ্ (সা) বলেন, আমার এ জওয়াব শুনে জিবরাইল (আ) আমাকে বুকে জড়িয়ে

ধরলেন এবং সজোরে চাপ দিলেন। ফলে আমি চাপের কষ্ট অনুভব করি। অতঃপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন : **اقْرَأْ** (পাঠ করুন)। আমি আবার পূর্ববৎ জওয়াব দিলাম।

এতে তিনি পুনরায় আমাকে চেপে ধরলেন। চাপের কষ্ট অনুভব করলাম। অতঃপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে তৃতীয় বারের মত পাঠ করতে বললেন। আমি এবারও পূর্ববৎ জওয়াব দিলে তিনি তৃতীয়বারের মত আমাকে বুকে চেপে ধরলেন এবং ছেড়ে দিয়ে বললেন :

**اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ - خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ
الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝**

কোরআনের এই সর্বপ্রথম পাঁচখানি আয়াত নিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা) ঘরে ফিরলেন। তাঁর হৃদয় কাঁপছিল। খাদীজা (রা)-র কাছে গৌছে বললেন : **زملوني زملوني** আমাকে আবৃত কর, আমাকে আবৃত কর। খাদীজা (রা) তাঁকে বস্ত্র দ্বারা আবৃত করলে কিছুকণ পর ভীতি বিদূরিত হল। এ ভাবান্তর ও কম্পন জিবরাঈল (আ)-এর ডয়ে ছিল না। তাঁর শান এর চেয়ে আরও অনেক উর্ধ্বে বরং এই ওহীর মাধ্যমে নবুয়্যতের যে বিরাট দায়িত্ব তাঁকে অর্পণ করা হয়েছিল, তারই গুরুভার তিনি তিলে তিলে অনুভব করছিলেন। এছাড়া একজন ফেরেশতাকে তাঁর আসল আকৃতিতে দেখার কারণে তিনি স্বাভাবিকভাবেই ভীত হয়ে পড়েছিলেন।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন : সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সা) খাদীজা (রা)-কে হেরা ওহার সমুদয় হস্তান্তর গুলিয়ে বললেন : এতে আমার মধ্যে এমন ভাবান্তর দেখা দেয় যে, আমি জীবনের ব্যাপারে শংকিত হয়ে পড়ি। হযরত খাদীজা (রা) বললেন : না, এরূপ কখনও হতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে কখনও ব্যর্থ হতে দেবেন না। কেননা, আপনি আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করেন, বোঝাপড়া লোকদের বোঝা বহন করেন, বেকারকে কাজে নিয়োজিত করেন, অতিথি সেবা করেন এবং বিপদগ্রস্তদেরকে সাহায্য করেন। হযরত খাদীজা (রা) ছিলেন বিদূষী মহিলা। তিনি সম্ভবত তওরাত ও ইজিল থেকে অথবা এসব আস-নানী কিতাবের বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে জানতে পেরেছিলেন যে, উপরোক্ত চরিত্র-গুণে গুণাবিত ব্যক্তি কখনও ব্যর্থ ও ব্যর্থ হন না। তাই এভাবে তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন।

এরপর খাদীজা (রা) তাঁকে আপন পিতৃব্যপুত্র ওয়ারাক ইবনে নওফলের কাছে নিয়ে গেলেন। ইনি জাহিলিয়াত যুগে প্রতিমাপূজা বর্জন করে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন, যা ছিল তৎকালে একমাত্র সত্য ধর্ম। শিক্ষিত হওয়ার সুবাদে হিশ্রু ভাষায়ও তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। আরবী ছিল তাঁর মাতৃভাষা। তিনি হিশ্রু ভাষায়ও লিখতেন এবং ইজীল আরবীতে অনুবাদ করতেন। তখন তিনি অত্যধিক বয়োবৃদ্ধ ছিলেন। বার্ধক্যের কারণে তাঁর দৃষ্টিশক্তি লুপ্তপ্রায় ছিল। হযরত খাদীজা (রা) তাঁকে বললেন : ভাইজান, আপনি

তার কথাবার্তা একটু শুনুন। ওয়ান্নাহর জিজ্ঞাসার জওয়াবে রসুলুল্লাহ্ (সা) হেরা ওহার সমুদয় ব্রহ্মত বলে শোনালেন। শোনাযাই ওয়ান্নাহর বলে উঠলেন : ইনিই সে পবিত্র ফেরেশতা, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা মুসা (আ)-র কাছে প্রেরণ করেছিলেন। হায়, আমি যদি আপনার নবুয়তকালে শক্তিশালী হতাম। হায়, আমি যদি তখন জীবিত থাকতাম, যখন আপনার কণ্ঠ আপনাকে (দেখ থেকে) বহিষ্কার করবে। রসুলুল্লাহ্ (সা) বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন : আমার স্বজাতি কি আমাকে বহিষ্কার করবে? ওয়ান্নাহর বললেন : অবশ্যই বহিষ্কার করবে। কারণ, যখনই কোন ব্যক্তি সত্য পয়গাম ও সত্যধর্ম নিয়ে আগমন করে, যা আপনি নিয়ে এসেছেন, তখনই তার কণ্ঠ তার উপর নিপীড়ন চালায়। যদি আমি সে সময়কাল পাই, তবে আপনাকে যথাসাধ্য সাহায্য করব। ওয়ান্নাহর এর কয়েকদিন পরই ইহলোক ত্যাগ করেন। এই ঘটনার পরই ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে যায়।—(বুখারী, মুসলিম) সোহায়লী বর্ণনা করেন, ওহীর বিরতিকাল ছিল আড়াই বছর। কোন কোন রেওয়াজেতে তিন বছরও আছে।—(মায়হারী)

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ—এখানে اسم শব্দ যোগ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে

যে, যখনই কোরআন পড়বেন, আল্লাহর নাম অর্থাৎ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম দ্বারা শুরু করবেন। এতে রসুলুল্লাহ্ (সা)-র পেশকৃত ওযরের জওয়াবের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আপনি যদিও বর্তমান অবস্থায় উম্মী, লেখাপড়া জানেন না কিন্তু আপনার পালনকর্তা উম্মী ব্যক্তিকে উচ্চতর শিক্ষা, বক্তৃতা নৈপুণ্য, বিশুদ্ধতা ও প্রাজ্ঞতার এমন পরাকাষ্ঠা দান করতে পারেন, যার সামনে বড় বড় পণ্ডিত ব্যক্তিও স্বীয় অক্ষমতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। পরবর্তীকালে তাই প্রকাশ পেয়েছিল।—(মায়হারী) এ স্থলে বিশেষভাবে আল্লাহর 'রব' নামটি উল্লেখ করার এ বিষয়বস্তু আরও জোরদার হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলাই আপনার পালনকর্তা। তিনি সর্বতোভাবে আপনাকে পালন করেন। তিনি উম্মী হওয়া সত্ত্বেও আপনাকে পাঠ করাতে সক্ষম। আল্লাহর ওপাবলীর মধ্যে থেকে এ স্থলে বিশেষভাবে সৃষ্টি-গুণ উল্লেখ করার মধ্যে সজবত রহসা এই যে, সৃষ্টি তথা অস্তিত্ব দান করাই সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার সর্বপ্রথম অনুগ্রহ। এ স্থলে ব্যাপকতার দিকে ইঙ্গিত করার জন্য خلق ক্রিয়াপদের কর্ম উল্লেখ করা হয়নি। অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বজগতই এই সৃষ্টি কর্মের ফল।

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ—পূর্বের আয়াতে সমগ্র বিশ্বজগৎ সৃষ্টির বর্ণনা ছিল।

এ আয়াতে সেরা সৃষ্টি মানব সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। চিন্তা করলে দেখা যায় সমগ্র বিশ্বজগতের সার-নির্ধাস হচ্ছে মানুষ। জগতে যা কিছু আছে, তার প্রত্যেকটির নবীর মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। তাই মানুষকে রুদ্র জগৎ বলা হয়। বিশেষভাবে মানুষের উল্লেখ করার এক কারণ এরূপ হতে পারে যে, নবুয়ত, রিসালত ও কোরআন মাখিল করার লক্ষ্যে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালন করানো। এটা বিশেষভাবে মানুষেরই কাজ। خلق শব্দের অর্থ জন্ম। রক্ত, মানুষ সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর অতিক্রান্ত হয়। হৃতিকা ও উপাদান চতুষ্টয় দ্বারা এর সূচনা

হয়, এরপর বীর্ষ ও এরপর জমাত রক্তের পাল্লা আসে। অতঃপর মাংসপিণ্ড ও অস্থি ইত্যাদি সৃষ্টি করা হয়। এসবের মধ্যে জমাত রক্ত হচ্ছে একটি মধ্যবর্তী অবস্থা। এর উল্লেখ করায় এর পূর্বাগের অবস্থাসমূহের প্রতি ইঙ্গিত হয়ে গেছে।

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ — এখানে অক্র-আদেশের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এর

এক কারণ তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় কারণ এরূপও হতে পারে যে, সূর্য রসুলুল্লাহ (সা)-র পাঠ করার জন্য প্রথম اقْرَأ বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় اقْرَأ তবলীগ, দাওয়াত ও অপরকে পাঠ করানোর জন্য বলা হয়েছে। ক্রম বিশেষণে ইঙ্গিত রয়েছে যে, জগৎ সৃষ্টি ও মানব সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নিজের কোন স্বার্থ ও লাভ নেই বরং এগুলো সব দাননীলতার পরিপ্রেক্ষিতে করা হয়েছে। কাজে তিনি অস্বার্থভাবে সৃষ্ট-জগৎকে অস্তিত্বের মহান নিয়ামত দান করেছেন।

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ — মানব সৃষ্টির পর মানব-শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে। কারণ,

শিক্ষাই মানুষকে অন্যান্য জীবজন্তু থেকে স্বতন্ত্র এবং সৃষ্টির সেরা রূপে চিহ্নিত করে। শিক্ষার পদ্ধতি সাধারণত তিনবিধ। এক, মৌখিক শিক্ষা এবং দুই, কলম ও লেখার মাধ্যমে শিক্ষা। সূরার শুরুতে اقْرَأ শব্দের মধ্যে মৌলিক শিক্ষা রয়েছে। কিন্তু এ আয়াতে শিক্ষাদান সম্পর্কিত বর্ণনায় কলমের সাহায্যে শিক্ষাকেই অগ্রে বর্ণনা করা হয়েছে।

শিক্ষার সর্বপ্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ উপায় কলম ও লিখন : হযরত আবু হুরায়রা (রা)-র এক রেওয়াজেতক্রমে রসুলুল্লাহ (সা) বলেন :

لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ أَنْ

رَحِمَتِي غَلَبَتْ غَضَبِي — অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যখন আদিকালে সুবকিছু সৃষ্টি করেন, তখন আরশে তাঁর কাছে রক্ষিত কিতাবে একথা লিপিবদ্ধ করেন যে, আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর প্রবল থাকবে। হাদীসে আরও বলা হয়েছে :

أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ اكْتُبْ فَكُتِبَ مَا يَكُونُ إِلَى يَوْمِ لِقَائِهَا مِمَّا فَهُوَ عِنْدَهُ فِي الْكِتَابِ فَوْقَ عَرْشِهِ -

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেন এবং তাকে লেখার নির্দেশ দেন। সেমতে কলম কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে, সব লিখে ফেলে। এ কিতাব আল্লাহর কাছে আরশে রক্ষিত আছে। — (কুরতুবী)

কলম তিন প্রকার : আলিমগণ বলেন : জগতে তিনটি কলম আছে : এক, আল্লাহ তা'আলার স্বহস্তে সৃজিত সর্বপ্রথম কলম, যাকে তিনি তফসীর লেখার আদেশ করেছিলেন। দুই, ফেরেশতগণের কলম, যাদের দ্বারা ভবিষ্যৎ ঘটনা, তার পরিমাণ এবং মানুষের

আমলনাযা লিপিবদ্ধ করেন। তিন সাধারণ মানুষের কলম, যম্বারা তারা তাদের কথা-বার্তা লিখে এবং নিজেদের অভীষ্ট কাজে ব্যবহার করে। লিখন প্রকৃতপক্ষে এক প্রকার বর্ণনা এবং বর্ণনা মানুষের বিশেষ গুণ।—(কুরতুবী) তফসীরবিদ মুজাহিদ আবু আমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা সমগ্র সৃষ্ট জগতে চারটি বস্তু যহযে সৃষ্টি করেছেন। এগুলো বাতীত সব বস্তু 'কুন' তথা 'হয়ে যাও' আদেশের মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করেছে। সেই বস্তু চতুষ্টয় এই : কলম, আরশ, জামাতে আদন ও আদম (জা)।

লিখন জান সর্বপ্রথম দুনিয়াতে কাকে দান করা হয় : কেউ কেউ বলেন—সর্বপ্রথম এই জান মানবপিতা আদমকে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং তিনিই সর্বপ্রথম লেখা শুরু করেন।—(কা'বে আহবার) কেউ কেউ বলেন, হযরত ইদরীস (আ)—ই দুনিয়াতে সর্বপ্রথম লেখক।—(যাহ্‌হাক) কারও কারও মতে প্রত্যেক লেখকের শিক্ষাই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে।

অংকন ও লিখন আল্লাহর বড় নিয়ামত : হযরত কাতাদাহ (র) বলেন, কলম আল্লাহ তা'আলার একটি বড় নিয়ামত। কলম না থাকলে কোন ধর্ম প্রতিষ্ঠিত থাকত না এবং দুনিয়ার কাজকারবারও সঠিকভাবে পরিচালিত হত না। হযরত আলী (রা) বলেন : এটা আল্লাহ তা'আলার একটা বড় কৃপা যে, তিনি তাঁর বান্দাদেরকে অজান্তে বিষয়-সমূহের জান-দান করেছেন এবং তাদেরকে মুখতার অঙ্গকার থেকে জানের আলোর দিকে বের করে এনেছেন। তিনি মানুষকে লিখন বিদ্যায় উৎসাহিত করেছেন। কেননা, এর উপকারিতা অপরিসীম। আল্লাহ বাতীত কেউ তা গণনা করে শেষ করতে পারে না। যাবতীয় জান-বিজ্ঞান, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের ইতিহাস, জীবনালেখ্য ও উক্তি আল্লাহ তা'আলার অবতীর্ণ কিতাবসমূহ সমস্তই কলমের সাহায্যে লিখিত হয়েছে এবং পৃথিবীর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অক্ষয় হয়ে থাকবে। কলম না থাকলে ইহকাল ও পরকালের সব কাজকর্মই বিঘ্নিত হবে।

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলিমগণ সর্বদা লিখন কর্মের প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁদের অগণিত রচনাশৈলীই এর উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করে। পরিতাপের বিষয়, বর্তমান যুগে আলিম ও শিক্ষাযীদের মধ্যে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রতি চরম উদাসীনতা বিরাজমান রয়েছে। ফলে শত শত লোকের মধ্যে দু'চারজনই এ ব্যাপারে পণ্ডিত দৃষ্টিগোচর হয়।

রসুলুল্লাহ (সা)—কে লিখন শিক্ষা না দেওয়ার রহস্য : আল্লাহ তা'আলা শেষ নবী (সা)—র মর্যাদাকে মানুষের চিন্তা ও অনুমানের উর্ধ্বে রাখার জন্য তাঁর জন্মস্থান থেকে ব্যক্তিগত অবস্থা পর্যন্ত সবকিছুকে এমন করেছিলেন যে, কোন মানুষ এসব ব্যাপারে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও ভ্রম দ্বারা কোন উৎকর্ষ অর্জন করতে পারে না। তাঁর জন্মস্থানের জন্য আরবের মরুভূমি মনোনীত হয়েছে, যা সভ্য জগৎ ও জান-গরিমার পীঠভূমি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল এবং পথ ও যোগাযোগের দিক দিয়ে অত্যধিক দুর্গম ছিল। ফলে শাম, ইরাক, মিসর ইত্যাদি উন্নত নগরীর অধিবাসীদের সাথে সেখানকার লোকদের কোন সম্পর্ক ছিল না। এ

কারণেই আরবের সবাই উল্মী বলে কথিত হয়। এমন দেশ ও গোত্রের মধ্যে জন্মগ্রহণের পর আল্লাহ তা'আলা আরও কিছু ব্যবস্থা করলেন। তা এই যে, আরবদের মধ্যে যদিও বা খুব নগণ্য সংখ্যক লোক জ্ঞান-বিজ্ঞান, অঙ্কন ও লিখন বিদ্যা শিক্ষা করত, কিন্তু রসূলুল্লাহ (সা)-কে তা শিক্ষা করারও সুযোগ দেওয়া হয়নি। এহেন প্রতিকূল পরিবেশে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তির কাছ থেকে কে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও উন্নত চরিত্র আশা করতে পারত? হঠাৎ আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নবুয়তের অলংকারে ভূষিত করলেন এবং জ্ঞান ও প্রভার এক অশেষ ক্ষণ্ডখারা তাঁর মুখ দিয়ে প্রবাহিত করে দিলেন। বিস্ময়জনক ও প্রাজ্ঞতার আরবের বড় বড় কবি ও অলংকারবিদও তাঁর কাছে হার মেনে যায়। এই প্রোজ্বল মো'জেহাটি স্বচক্ষে দেখে এ প্রত্যয় না করে উপায়। নই যে, তাঁর এসব গুণ-গরিমা মানবীয় প্রচেষ্টা ও কর্মের ফলশ্রুতি নয় বরং আল্লাহ তা'আলার অদৃশ্য দান। অংকন ও লিখন শিক্ষা না দেওয়ার মধ্যে এ রহস্যই নিহিত ছিল।—(কুরতুবী)

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم — পূর্বের আয়াতে ছিল কলমের সাহায্যে শিক্ষা দানের

বর্ণনা। এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রকৃত শিক্ষাদাতা আল্লাহ তা'আলা তাঁর শিক্ষার মাধ্যম অসংখ্য, অগণিত—শুধু কলমের মধ্যেই সীমিত নয়। তাই বলা হয়েছে—আল্লাহ তা'আলা মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে পূর্বে জানত না। এতে কলম অথবা অন্য কোন উপায় উল্লেখ না করার মাঝে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার এ শিক্ষা-মানুষের জন্মলগ্ন থেকে অব্যাহত রয়েছে। তিনি মানুষকে প্রথমে বুদ্ধি দান করেন, যা জ্ঞান-লাভের সর্ববৃহৎ উপায়। মানুষ বুদ্ধির সাহায্যে কোন শিক্ষা ব্যতিরেকে অনেক কিছু শিখে নেয়। আল্লাহ তা'আলা মানুষের সামনে ও পেছনে স্বীয় অসীম কুদরতের বহু নিদর্শন রেখে দিয়েছেন। যাতে সে সেগুলো প্রত্যক্ষ করে তার সৃষ্টিকর্তাকে চিনতে পারে। এরপর ওহী ও ইলহামের মাধ্যমে অনেক বিষয়ের জ্ঞান মানুষকে দান করেছেন। এছাড়া আরও বহু বিষয়ে জ্ঞান মানুষের মস্তিষ্ক আপনা-আপনি জাগ্রত করে দিয়েছিলেন। এতে কোন ভাষা অথবা কলমের সাহায্যে শিক্ষার দখল নেই। একটি চেতনাহীন শিশু জননীর গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথেই তার খাদ্যের কেন্দ্র অর্থাৎ জননীর স্তন্যগলকে চিনে নেয়। স্তন থেকে দুগ্ধ বের করার জন্য মুখ চেপে ধরার কৌশল তাকে কে শিক্ষা দেয় এবং দিতে পারে? আল্লাহ তা'আলা শিশুকে ক্রন্দন করার কৌশল জন্মলগ্ন থেকেই শিখিয়ে দেন। তার এই ক্রন্দন তার অনেক প্রয়োজন মেটানোর উপায় হয়ে থাকে। তাকে ক্রন্দনরত দেখলে পিতামাতা তার কষ্টের কথা চিন্তা করে অস্থির হয়ে পড়েন। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, উত্তাপ, শৈত্য ইত্যাদি অভাব ক্রন্দনের দ্বারাই বিদূষিত হয়। সদ্যপ্রসূত শিশুকে এই ক্রন্দন কে শেখাতে পারত এবং কিভাবে শেখাত? এগুলো সবই আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান, যা আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক প্রাণী বিশেষত মানুষের মস্তিষ্কে সৃষ্টি করে দেন। এই জরুরী শিক্ষার পর মৌখিক শিক্ষা ও

অন্তরগত শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হতে থাকে। مَا لَمْ يَعْلَم (যা

সে জানত না) বলার বাহ্যত কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ, শিক্ষা স্বভাবত অজানা

বিষয়েরই হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে এজন্য বলা হয়েছে, যাতে মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান ও কৌশলকে তার ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠা মনে করেন না বসে। এতে আরও ইঙ্গিত রয়েছে যে, মানুষের উপর এমনও এক সময় আসে, যখন সে কিছুই জানে না, যেমন এক

আয়াতে বলা হয়েছে : **اِذَا خَرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا**

আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে জননীর গর্ভ থেকে এমতাবস্থায় বের করেছেন যে, তোমরা কিছুই জান না। অতএব বোঝা গেল যে, মানুষের জ্ঞান-পরিমা তার ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠা নয় বরং স্রষ্টা ও প্রভু আল্লাহ তা'আলারই দান।---(মায়হারী) কোন কোন তফসীলকার এ আয়াতে ইনসানের অর্থ নিয়েছেন হযরত আদম (আ) অথবা রসুলে করীম (সা)। হযরত আদমকেই আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম শিক্ষা দান করেছেন। বলা হয়েছে :

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا—এবং নবী করীম (সা)-ই সর্বশেষ পয়গম্বর, যার

শিক্ষায় পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের এবং লওহ ও কলমের শিক্ষা শামিল রয়েছে। বলা হয়েছে :

وَمِنْ عِلْمِهِ عِلْمُ الْوَحْيِ وَالْقَلَمِ

সূরা ইকরার উপরোক্ত পাঁচ আয়াত সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত। এর পরবর্তী আয়াতসমূহ অনেক দিন পরে অবতীর্ণ হয়। কেননা, সূরার শেষ অবধি অবশিষ্ট আয়াত-সমূহ আবু জাহলের ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। নবুয়ত ঘোষণার পূর্বে মক্কার রসুলুজাহ (সা)-র কোন বিরুদ্ধবাদী ছিল না বরং সবাই তাঁকে 'আল-আমীন' উপাধিতে ডিখিত করত, মনেপ্রাণে ভালবাসত ও সম্মান করত। আবু জাহলের বিরুদ্ধাচরণ ও শত্রুতা বিশেষত নামাযে নিষেধ করার ঘটনা বলা বাহুল্য তখনকার, যখন রসুলুজাহ (সা) নবুয়ত ও দাওয়াত ঘোষণা করেন এবং রজনীতে নামামের হুকুম অবতীর্ণ হয়।

كَلَّا اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ—আয়াতে রসুলুজাহ (সা)-র

প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শনকারী আবু জাহলকে দণ্ড করে বক্তব্য রাখা হলোও ব্যাপক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। এতে সাধারণ মানুষের একটি নৈতিক দুর্বলতা বিধৃত হয়েছে। মানুষ যতদিন অপরের প্রতি মুখাপেক্ষী থাকে, ততদিন সোজা হয়ে চলে। কিন্তু যখন সে মনে করতে থাকে যে, সে কারও মুখাপেক্ষী নয়, তখন তার মধ্যে অবাধ্যতা এবং অপরের উপর জুলুম ও নির্যাতনের প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। সাধারণত বিত্তশালী, শাসনক্রমভায় আসীন ব্যক্তিবর্গ এবং ধনজন, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের সমর্থনপুষ্ট এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে এই প্রবণতা, বহুল পরিমাণে প্রত্যক্ষ করা যায়। তারা ধনা-চ্যুতা ও দলবলের শক্তিতে মদমত্ত হয়ে অপরকে পরোয়াই করে না। আবু জাহলের অবস্থাও ছিল তথৈবচ। সে ছিল মক্কার বিত্তশালীদের অন্যতম। তার গোত্র এমনকি সমগ্র শহরের লোক তাঁকে সম্মিহ করত। সে এমনই অহংকারে ভুজ্জ্বল হয়ে পয়গম্বরুল নিরোমিণি ও হুন্টির সেরা মানব রসুলে করীম (সা)-এর শানে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে বসল।

পরের আয়াতে এমনি ধরনের অবাধ্য লোকদের অন্তত পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে।

إِنِّ إِلَى رَبِّكَ الرَّجْعِي --- অর্থাৎ সবাইকে তাদের পালনকর্তার কাছে ফিরে যেতে

হবে। এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, মৃত্যুর পর সবাই আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে এবং ভাল-মন্দ কর্মের হিসাব নেবে। অবাধ্যতার কুপরিণাম স্বচক্ষে দেখে নেবে। এটাও অসম্ভব নয় যে, এ আয়াতে গবিত মানুষের গর্বের প্রতিকার বর্ণনা করার জন্য বলা হয়েছে : হে নির্বোধ, তুমি নিজেকে সবকিছুর প্রতি অমুখাপেক্ষী ও স্বেচ্ছাধীন মনে কর কিন্তু চিন্তা করলে তুমি নিজেকে প্রতিটি উঠাবসায় ও চলাফেরায় আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী পাবে। তিনি যদি বাহ্যত তোমাকে কোন মানুষের মুখাপেক্ষী না করে থাকেন, তবে কমপক্ষে এটা তো দেখ যে, তোমাকে প্রত্যেক বিষয়ে আল্লাহর মুখাপেক্ষী করেছেন। মানুষের মুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত মনে করার বিষয়টিও বাহ্যিক বিভ্রান্তি বৈ কিছু নয়। বলা বাহুল্য, আল্লাহ মানুষকে সমাজবদ্ধ জীবরূপে সৃষ্টি করেছেন। সে একা তার কোন প্রয়োজনই মেটাতে পারে না। সে তার মুখের একটি গ্রাসের প্রতি লক্ষ্য করলেও দেখতে পাবে যে, সেটা হাজারো মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং দীর্ঘদিনের সাধনার ফলশ্রুতি, যা সে অন্যায়সে গিলে যাচ্ছে। এত হাজার হাজার মানুষকে নিজের কাজে নিয়োজিত করার সাধা কার আছে? মানুষের পোশাক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অবস্থাও তদ্রূপ। সেগুলো সরবরাহের পেছনে হাজারো লাখে মানুষের শ্রম ব্যয়িত হচ্ছে, যারা কোন ব্যক্তি বিশেষের গোলাম নয়। কেউ তাদের সবাইকে বেতন দিয়ে কাজ করাতে চাইলেও তা সাধ্যাতীত ব্যাপার। এসব বিষয়ে চিন্তা করলে মানুষ এরহস্য জানতে পারে যে, মানুষের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহ করার ব্যবস্থা তার নিজের তৈরী নয় বরং বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা তাঁর অতিশূন্য প্রভাবকে এই পরিকল্পনা তৈরী করেছেন ও চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি কারও অন্তরে কৃষিকাজের ইচ্ছা জাগ্রত করেছেন, কারও মনে কাঠ কাটা ও মিস্ত্রীগিরির প্রেরণা সৃষ্টি করেছেন, কাউকে কর্মকারের কাজের প্রতি উৎসাহিত করেছেন, কাউকে শ্রম ও মজুরি করার মধ্যেই সমৃদ্ধি দান করেছেন এবং কাউকে বাণিজ্য ও শিল্পের প্রতি উৎসাহিত করে মানুষের প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামের বাজার বসিয়ে দিয়েছেন। কোন রাষ্ট্র আইন করে এসব ব্যবস্থাপনা করতে পারে না এবং একা কোন ব্যক্তির পক্ষেও এটা

সম্ভব নয়। তাই এই চিন্তা-ভাবনার অরশাদাবী পরিণতি এই যে **إِنِّ إِلَى رَبِّكَ الرَّجْعِي**

অর্থাৎ পরিশেষে সব মানুষই যে আল্লাহর কুদরত ও প্রভার অধীন, একথা জীবন্ত হয়ে দৃষ্টির সামনে এসে যায়।

رَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا مَلَى --- এখান থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত

একটি ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। নব্বায়েশের আদেশ লাভ করার পর যখন রসূলুল্লাহ (সা) নাবায পড়া শুরু করেন, তখন আবু জাহল তাঁকে নাবায পড়তে বাধা দেয় এবং হুমকি দেয় যে, তবিশ্যতে নাবায পড়লে ও সিদ্ধা করলে সে তাঁর হাড়

পদতলে গিল্পি করে দেবে। এর জওয়াবে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। বলা হয়েছে : **لَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ** — অর্থাৎ সে কি জানে না যে, আল্লাহ দেখছেন? কি দেখছেন, এখানে তার উল্লেখ নেই। অতএব ব্যাপক অর্থে তিনি নামায প্রতিষ্ঠাকারী মহাপুরুষকেও দেখছেন এবং বাধাদানকারী হতভাগাকেও দেখছেন। দেখার পর কি হবে, তা উল্লেখ না করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সেই ভয়াবহ পরিণতির কল্পনাও করা যায় না।

لَتَسْفَعَنَّ بِأُنْصَابِهِ — এর অর্থ কঠোরভাবে হেঁচকানো। **نَامِيَةٍ** শব্দের অর্থ কপালের উপরিভাগের কেশভূচ্ছ। যার এই কেশভূচ্ছ অন্যের মুঠোর ভেতরে চলে যায়, সে তার করতলগত হয়ে পড়ে।

عَلَّا لَا تَطْعَمَ وَلَا تَهْتَبِ — এতে নবী করীম (সা)-কে আদেশ করা হয়েছে যে, আবু জাহলের কথায় কর্পাত করবেন না এবং সিজদা ও নামাযে যশগুল থাকুন। কারণ, এটাই আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জনের উপায়।

সিজদার দোয়া কবুল হয় : আবু দাউদে হযরত আবু হুরায়রা (রা)-র রেওয়া-মতক্রমে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : **أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ** অর্থাৎ বান্দা যখন সিজদায় থাকে, তখন তার পালনকর্তার অধিক নিকটবর্তী হয়। তাই তোমরা সিজদায় বেশী পরিমাণে দোয়া কর। অন্য এক হাদীসে আরও বলা হয়েছে :

فَإِنَّهُ فَوْقَ نَفْسِهِ يَسْتَجِيبُ لَكَ — অর্থাৎ সিজদার অবস্থায় কৃত দোয়া কবুল হওয়ার যোগ্য।

নফল নামাযের সিজদায় দোয়া করার প্রমাণ রয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে এর বিশেষ দোয়াও বর্ণিত আছে। বর্ণিত সে দোয়া পাঠ করাই উত্তম। ফরয নামায-সমূহে এ ধরনের দোয়া পাঠ করার প্রমাণ নেই। কারণ, ফরয নামায সংক্ষিপ্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

আলোচ্য আয়াত যে পাঠ করে এবং যে শুনে, সবার উপর সিজদা করা ওয়াজিব। সহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতে আছে যে, রসূলুল্লাহ (সা) এই আয়াত তিলাওয়াত করে সিজদা করেছেন।

তত্ত্বজ্ঞান
মা'আলমুল
মিনআল